পূর্ণাবতার

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে

প্র

এই লেখকের

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
রবীন্দ্র-সরণী
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ
মাইকেল মধুসূদন
বিচিত্র উপল
নানারকম
চিত্র-চরিত্র
শ্রেষ্ঠ কবিতা
প্রাচীন আসামী হইতে
প্রাচীন পারসীক হইতে
রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ
অনেক আগে অনেক দূরে
বিপুল সুদূর তুমি যে
কেরী সাহেবের মুন্সী
জোড়াদীঘির উদয়াস্ত
রবীন্দ্র-বিচিত্রা
পদ্মা

বেনিফিট অব ডাউট
প্র. না. বি. কাব্যগ্রন্থাবলী
কেরী সাহেবের মুন্সী (পেপারব্যাক)
নিকৃষ্ট গল্প
গল্প-পঞ্চাশৎ
সিন্ধুনদের প্রহরী
অমনোনীত গল্প
বঙ্কিম-সরণী
হংসমিথুন
লালকেল্লা
শাহীশিরোপা
শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব

পূর্ণাবতার

"আমরা সকলেই জরা—প্রত্যেকেই আমরা আদর্শঘাতী।"

১

অবশেষে বুঝি একটা হরিণ মিললো। ঝোপের আড়াল আছে বলে সমস্তটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে যেটুকু আভাসে বুঝতে পারা যাচ্ছে হরিণ তাতে আর সন্দেহ নেই। সেটাও আবার বাচ্চা না, বেশ বড়গোছের। ঘুমোচ্ছে না বিশ্রাম করছে? না, ঘুমোবার সময় এখন নয়, তা ছাড়া ভীরুস্বভাব হরিণ এমন খোলা জায়গায় ঘুমোয় না। ওরা যে কোথায় ঘুমোয় কেউ জানে না। এমন বনের ঘন গহনে ঢুকে পড়ে, সেখানে না চলে শিকারীর পা কিংবা বাঘের চোখ। এটাকে ফসকালে চলবে না, এক তীরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতে হবে। তারপরে লতা দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে পিঠের উপরে ঝুলিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলে জরতী কি খুশীই না হবে! আর খালি হাতে ফিরে গেলে! সে যে কি ভয়াবহ পরিস্থিতি ভাবতেই পারে না। গতকাল খালি হাতে ফিরে গিয়ে যে অবস্থায় পড়েছিল, তা কি কখনো ভুলতে পারবে! প্রথমে মুখ খুলে দিল জরতী, তারপরে ছুঁড়ে মারলো মস্ত একটা চেলাকাঠ। ভাগ্যিস বসে পড়েছিল তাই মাথাটা বেঁচে গিয়েছে, নইলে আজ আর শিকারে বেরোতে হতো না। ভালোই হতো, মরতো বেটি না খেয়ে। স্বামীকে তাক করে চেলাকাঠ ছোঁড়া! যাই হোক, আজ দেখিয়ে দেবে শিকার খুঁজে পাওয়ার চোখ তার যায়নি, আর হাতের নিশানাও অবিকল আছে।

তার মনে পড়ে জরতী শুনিয়েছিল হরিণ খুঁজে পাবে কি করে? বনের দিকে কি আর চোখ আছে, কেবলই পাড়ার ছুঁড়িগুলোর দিকে নজর। আর সেগুলোও যদি হরিণ হতো! সব বরা, তেমনি হোঁৎকা তেমনি কালো তেমনি দাঁতালো। আজ বেটিকে দেখিয়ে দিতে হবে হরিণও তার চোখে পড়ে। হরিণটা পিঠ থেকে নামাতে নামাতে বলবে, ও ভালো মানুষের বেটি, একবার দেখে যা, কেবল বরা নয়, হরিণও ঘায়েল করতে পারি, আর সে হরিণটাও তোর মতো। আহা, তেমনি সরু কোমর, তেমনি চোখ, তেমনি রঙ, বেশির মধ্যে ওর শিঙ আছে, তোর নেই। নে নে, এবার ছাল ছাড়িয়ে ঝলসে দে, বড্ড খিদে পেয়েছে। মনে মনে খুব একচোট হাসে। তখনি ভাবে হাসতে গিয়ে হরিণ পালালে শেষে কাঁদতে হবে, প্রত্যেকদিন চেলাকাঠ এড়িয়ে যাবে না।

নাঃ, ভাগ্য ভালো, হরিণটা তেমনি আছে, পালায়নি। আর এগোনো উচিত হবে না, পায়ের শব্দ বুঝতে ওরা পণ্ডিত, সামান্য পাতার উসখুসটুকু অবধি ওদের কান এড়ায় না। সে তীর-ধনুক বাগিয়ে নেয়। শরীরটা দুর্বল, মাথা ঘুরছে, তবু তাক ভুল করলে চলবে না। শরীরের আর মাথার দোষ কী? সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, বনে বনে মাঠে মাঠে ঘুরে হয়রান হতে হয়েছে। হরিণ বরা দূরে থাক, একটা নেউল সজারু শিয়াল অবধি চোখে পড়েনি, বেটারা সব গেল কোথায়? সেই যে সকালে এক আঁজলা পান্তাভাত খেয়ে বের হয়েছিল, তারপরে দীঘির জল ছাড়া পেটে আর কিছু যায়নি। জলে কি খিদের আগুন নেভে! আরও বেশি করে জ্বলে ওঠে। হতাশ হয়ে যখন ফিরে যাবে ভাবছে তখন একসঙ্গে মনে পড়লো জরতীর চেলাকাঠ আর এই ঝোপটা। ভাবলো ঝোপটা একবার দেখেই যাই, না পাই মাথায় শক্ত করে পাগড়ীটা বেঁধে, চেলাকাঠ থেকে মাথাটা বাঁচাতে হবে তো, জয়-মা বলে ফিরে যাই। এমন সময়ে ঝোপের আড়ালে হরিণ। আর একটু হলেই জয়-মা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল আর কি! তা হলেই হয়েছিল। সাড়া পেয়ে হরিণটাও জয়-মা বলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো।

আরে, এমন সুবোধ হরিণও তো বড় দেখা যায় না! ত্রিশ বছরের ব্যাধগিরির জীবনে কোন হরিণকে এতক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে সে দেখেনি। তবে বোধ করি তার বাড়িতেও জরতী আছে। চেলাকাঠের ভয়েই মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। বেড়ে স্যাঙাৎ বেড়ে, আর একটু স্থির হয়ে বসে থাক্, চিরকালের জন্যে তোর চেলাকাঠের ভয় শেষ করে দিচ্ছি। আরে, রোজ রোজ চেলাকাঠ খাওয়ার চেয়ে একদিনে সব শোধবোধ হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। জরতীর জ্বালায় অনেকদিন নিজেও ভেবেছে, সব শোধবোধ হয়ে যাক। তারপরে মরুক বেটি কেঁদে কেঁদে। তখন চিমটে দিয়েও কেউ ছোঁবে না, তখন বুঝতে পারবে স্বামীর কপালে চেলাকাঠ ভাঙতে গেলে নিজের কপালটাও ভাঙতে পারে। হাঃ হাঃ, বেটি খুব জব্দ হতো।

এবারে সে হাঁটু গেড়ে বসে, ধনুকের একটা কোণ মাটিতে ঠেকিয়ে ছিলা টেনে নিয়ে ডান হাতটা কান অবধি এসে পৌঁছয়, চোখ দুটো তীরের ফলায় নিবদ্ধ, হ্যাঁ তীরের ফলা আর হরিণটার দেহের দৃষ্ট অংশ এবারে সমান সমান হয়েছে। আর কেন, দম বন্ধ করে জয়-মা ভেবে তীর ছেড়ে দেয়। ঝোপের পাতাগুলো কাঁপিয়ে, গোটাকতক ফড়িং উড়িয়ে দিয়ে তীরটা ঢুকে পড়ে ঝোপের মধ্যে। ব্যাধের অভিজ্ঞতা বলে বিঁধেছে, বিঁধেছে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে; ফসকে গেলে

এতক্ষণে হুড়মুড় করে পশুটা ছুটে পালাতো ; এফোঁড়-ওফোঁড় না হলে আর্তরব উঠতো। এ একেবারে এক তীরে দফা নিকেশ, রা-টুকু বের হওয়ার অবকাশ হল না মুখ দিয়ে। সাবাস হয়া ব্যাধের বেটা জরা ব্যাধ। বাপকা বেটা। ধনুকখানা মাথার উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে আনন্দে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ে ঝোপের মধ্যে। ঢুকে পড়েই আস্ত একটা মানুষ আস্ত একটা পাথরের মূর্তি বনে যায়। এ কী! বিস্ময়ে তার ঠোঁট দুটো ফাঁক, চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাত দুটো শিথিল, ধনুক ভূপাতিত, জানু ভঙ্গুর, শরীর কম্পমান, কপালে স্বেদস্রুতি, নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। এ কী! এ কে? এ কী! এ কে? ক্ষণকাল পরে পাথরের মূর্তি ভেঙে পড়ে মাটির উপরে।

২

এ তো হরিণ নয়, এ যে মানুষ! আস্ত একটা মানুষ, মস্ত একটা মানুষ। ঘাসের উপরে সরল উত্তানভাবে শায়িত দীর্ঘদেহী মস্ত একটা মানুষ। এ তো সাড়ে তিন হাতের মানুষ নয়, দেহী যেন দেহটাকে ছাড়িয়েও বিস্তৃত। এ মানুষটিকে আগে তো দেখেনি, এমন মানুষ যে সম্ভব সে ধারণাও ছিল না। এ কে! কোথা থেকে এল! এমন দেবদেহীর অঙ্গে যে তীর বিদ্ধ হতে পারে, সেকথা তার মনেই প্রবেশ করলো না। কিন্তু এ কী রকম মানুষ! এ কি আদৌ মানুষ, না শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা! আর কি গায়ের রঙ! নতুন কলাপাতা যখন সবে গাছের গর্ভ থেকে মুখটি বের করেছে এর রঙটি ঠিক তার মতো। সে রঙ সবুজও নয়, শ্যামলও নয়, আর এক পোঁচ কম হলেই পীত হতে পারতো, আর এক পোঁচ বেশি হলেই হরিৎ হতে পারতো, এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা স্বচ্ছবর্ণ। পরিধানে পীত বসন, স্কন্ধে অবিন্যস্ত পীত উত্তরীয়, সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে বিলম্বিত বুকের উপরে শোভমান একটা রত্ন। দেহের আভায়, রত্নের প্রভায়, বস্ত্রের বিভায় মিলিয়ে একটি দিব্য বিভূতির সৃষ্টি করেছে, ভেদ করে মানুষটিকে নজরে পড়তে চায় না। ঈষন্মুক্ত চোখে জীবনের শেষ চন্দ্রকলা, রক্তিম অধরোষ্ঠের সম্পুটে জীবনের শেষ ব্যঞ্জনা, প্রশস্ত বিশাল উরসের নিয়মিত মৃদু স্পন্দনে প্রশান্ত মানস-সরোবরের স্মৃতি! আর সুগঠিত বলিষ্ঠ পা দুখানি—এ কি! এ কি, পা থেকে রক্তধারা বিনির্গত কেন! এ কি, এখানে তীর হানলো কে! পায়ের পাতা ভেদ করে তীর আমূল বিদ্ধ হয়ে গিয়েছে হাঁটু অবধি। ওরে জরা, এই তোর হরিণ! এই দিব্যদেহে তুই তীর বিদ্ধ করেছিস! এ কি সর্বনাশ! বিস্ময় থেকে ভয়,

ভয় থেকে আতঙ্ক। হঠাৎ বাণাহত হরিণের মতো সে ছুটে পালালো, পড়ে রইলো তার তীর-ধনুক তূণীর।

কুটীরের উঠোনে বসে জরতী কাটারি দিয়ে কাঠ চিরছিল, দূর থেকে দেখতে পেল জরা। অন্যদিন হলে, শূন্যহাতে ফিরলে আগে থেকে সতর্ক হতো, হয়তো আদৌ এগোত না, আজ আর সে-কথা মনেই এলো না, ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো জরতীর কাছে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে জরতী বলল, কিছুই পাওনি দেখছি, একেবারে খালি হাত, তবে রাতটাও খালি পেটে কাটাও।

জবাব দেয় না জরা। এমন বড় হয় না, একটা না একটা অজুহাত মুখে থাকেই। তার নীরবতায় জরতীর চট্‌কা ভাঙলো, ভালো করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সে বলে উঠলো, এ কি জরা, তোমার কি হয়েছে? মুখ শুকনো, শরীর কাঁপছে, কি ব্যাপার! তোমার তীর-ধনুক কোথায়? তূণ গেল কোথায়? কি হয়েছে বলো।

তবু জরা নিরুত্তর। এবারে সে কাছে গিয়ে হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, কি হয়েছে শীগগির বলো।

এবারে জরার মুখ দিয়ে কথা বের হয়, বলে, একটা মানুষ মেরেছি রে।

জরতী খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, এই কথা! তা আগে কি আর মানুষ মারনি? এই তো সেদিন মদ খেয়ে ওপাড়ার তরণীকে খুন করে ফেললে!

আরে সে তো মদ খেয়ে।

আজ না হয় মদ না খেয়েই মেরেছ।

না রে না, তুই বুঝবি নে।

তবে বুঝিয়েই বলো না হয়।

এ সেরকম মানুষ নয়।

মানুষ আবার ক-রকম হয়?

এ মস্ত মানুষ।

মস্ত! রাজাগজা না লম্বা-চওড়ায় মস্ত!

কি করে বোঝাবো তোকে।

আর আমার বুঝে কাজ নেই। তা মারলে কিরকম করে? তোমাকে মারতে এসেছিল?

তাহলে তো কথা ছিল না। মানুষটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, দূর থেকে দেখে হরিণ মনে করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলেছি।

মানুষকে হরিণ মনে করেছ যখন নিশ্চয় মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়েছিলে। আবার বুঝি শুঁড়িপাড়ায় গিয়েছিলে! দেখো, এই যে চেলাকাঠ পড়ে রয়েছে তাই দিয়ে তোমার পা ভেঙে দেব। তোমাকে বারণ করিনি?

এ রকম কথার প্রতিক্রিয়া কি হবে জরতীর অজানা নয়, আঁচলখানা সে কোমরে জড়িয়ে নিল। কিন্তু আজ প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, বরঞ্চ ঠিক বিপরীত ঘটলো। জরা উঠোনের মধ্যে বসে পড়লো। এবারে সত্যসত্যই দুশ্চিন্তার কারণ ঘটলো জরতীর। কাছে গিয়ে সে বসল, বলল, তোমার কি হয়েছে? কাকে মেরেছ? রাজবাড়ির লোক নয় তো!

কিছুতেই জরার মুখে রা বের হয় না।

এ কি, কাঁদছ কেন?

কেন জানি না, জল বারণ মানছে না।

আচ্ছা, সমস্ত পরে শুনবো, আগে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে খাও।

না রে, আমার খাওয়া-নাওয়া ঘুচে গিয়েছে।

তীর-ধনুক কি করলে?

সেখানেই পড়ে আছে।

কেন?

ভয়ে।

মরা মানুষকে এতো ভয়! আচ্ছা, চলো তো দেখে আসি কেমন মানুষ সেটা। নাও, ওঠো।

ওঠার পরিবর্তে শুয়ে পড়লো জরা।

কি হল?

আমি সেখানে যেতে পারবো না।

কেন?

ভয়।

আমি তো সঙ্গে আছি।

তুমি একাই যাও।

কোথায় চিনবো কেমন করে। নয়তো সঙ্গে চলো।

জরা কিছুতেই যাবে না, জরতীও ছাড়বে না। তার কৌতুহলের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল জরার আতঙ্ককে। অবশেষে জরাকে সঙ্গে যেতেই হল। কৌতুহলী নারী দুর্জয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল। বাণবিদ্ধ দেহ তেমনি

পূর্ববৎ শায়িত। সেই দেহটি দেখবামাত্র জরতী ডুকরে কেঁদে উঠল, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ওরে জরা, এ কি করেছিস! এ কি সর্বনাশ করেছিস! কাকে মেরেছিস তুই!

এই বলে মানুষটির পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে মাথা কুটতে লাগলো।

দেবতা, দেবতা, আমরা সর্বনাশ করেছি। ও তোমার অবোধ ছেলে দেবতা, না জেনে মহাপাতক করে ফেলেছে, আমাদের মাপ করো দেবতা।

জরার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তবে তো তার অনুমান মিথ্যা নয়। এ সামান্য লোক নয়, নিশ্চয় কোন রাজাগজা হবে।

জরতী মাথা কুটতে থাকে। জরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই দিব্যদেহের দিকে। দেহের রংটি আরও পাণ্ডুর হয়ে এসেছে, চোখের দৃষ্টি আরও স্তিমিত হয়ে পড়েছে, ক্ষতস্থানের রক্তধারাটি কালো হয়ে কালসাপের আকার ধারণ করেছে। তবু দেহে এখনো প্রাণ আছে, বক্ষস্থলের রত্নটি ঈষৎ স্পন্দিত।

জরতীর আর্ত আবেদন বুঝি প্রবেশ করলো দিব্যদেহীর হৃদয়ে। সে একবারটি অভয় মুদ্রায় তুলে ধরলো দক্ষিণ পাণি। তারপরে সব শেষ। জরতী মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল পায়ের উপরে। বিহ্বল জরার সম্বিৎহীন দেহ শুষ্ক বৃক্ষ-কাণ্ডের মতো রইলো দাঁড়িয়ে।

তখন আকাশে আর সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কূল উপকূল মানছে না, চরাচরের প্রতিটি রন্ধ্র আলো দিয়ে ভরে দিচ্ছে। নীচে সমুদ্রও আজ মরীয়া। সমুদ্রের তীরে তীরে দেশে দেশে যত গুহা-গহ্বর-কন্দর আছে আজ ভরিয়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবু তো এখন সবে সন্ধ্যা। আকাশে পাপিয়া পাখি দীর্ঘ তানে গুণ টেনে নিয়ে চলেছে স্বপ্নের বহরগুলোকে। আর সমুদ্রে সিন্ধু শকুনের দল তারই পসরা ছিনিয়ে নেবার আশায় কর্কশ চিৎকার করছে। জ্যোৎস্নায় ঢেকে দিয়েছে আকাশের তারাগুলোকে, জোয়ার-জলে যেমন ঢাকা পড়ে গিয়েছে উপকূলের নুড়িগুলো। আর কোন পৌরাণিক জগতের উপকূল থেকে একটানা দীর্ঘনিশ্বাস ছুটে আসছে, দুলছে ঝাউবন, শরবন, দুলছে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের লক্ষ হাজার পাতা, যার তলে যোগনিদ্রায় শায়িত সেই মহাদেহী।

৩

বাসুদেব, বাসুদেব, কার বেটা বললে?

বসুদেবের পুত্র বাসুদেব। কি আপদ, এক কথা তোমাকে কতবার বুঝিয়ে

বলবো ! মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি !

বোধ করি তাই জরতী, সব কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছে, কিছু বুঝতে পারছি না।

তবে চুপ করে বসে থাকো।

বসে থেকে কি হবে, চলো বাড়ি ফিরে যাই।

না, আমি যাবো না, আমি এখানেই থাকবো।

চিরকাল ?

হ্যাঁ, না মরা পর্যন্ত।

কেন ?

কেন বুঝতে পারছো না ? যে-পাপ তুমি করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে।

জরতী, এর আগেও তো মানুষ মেরেছি, কই তোমার তো এমন ব্যতিক্রম দেখিনি।

জরা, তুমি একটি আকাট, নিরেট মূর্খ। সেই সব মানুষ আর এই মানুষ ! আর এ কি মানুষ ! এ যে দেবতা।

দেবতা ! এখনি বললে বসুদেবের বেটা, আবার বলছ দেবতা !

তোমাকে বোঝাতে পারবো না বাপু, তবে জেনে রাখো যাকে প্রাণে মেরেছ সে দেবতা।

দেবতারা তো স্বর্গে থাকে, দ্বারকায় আসতে যাবে কেন ?

সে কথা তুমি জানবে কি করে ? বনে বনে জানোয়ার শিকার করে বেড়াতে বেড়াতে বুদ্ধিসুদ্ধি জানোয়ারের মতো হয়েছে। রাজবাড়িতে গিয়ে কথকতা, পাঁচালী শুনলে বুঝতে পারতে মাঝে মাঝে দেবতারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

কেন ?

তাঁদের খুশি।

দেবতারা তো শুনেছি অমর, তবে ইনি আমার শরে প্রাণ হারালেন কেন ?

স্বর্গের দেবতা, স্বর্গে ফিরে যাবেন আশায়।

আচ্ছা, বসুদেবটা কে ?

নাও, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়বার পরে এখন বসুদেবটা কে ? দ্বারকার রাজা।

দ্বারকার রাজা উগ্রসেন, বসুদেব তো নন !

জরা, যাঁর ঘরে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন তিনি রাজার রাজা।

তবে চলো পালিয়ে যাই, রাজবাড়ির লোক এসে পড়লে আমাদের খুন করে ফেলবে।

সে ভয় থাকে তো পালিয়ে যাও।

পালাতে ইচ্ছা করছে কিন্তু পা যে উঠছে না, সমস্ত দেহ কেমন যেন ভারি হয়ে গিয়েছে!

তবে বসে একমনে ভগবানকে ডাকো।

জরতী, ভগবানকে তো কখনো দেখিনি। কিভাবে ডাকতে হয় জানি নে, শিখিয়ে দাও না।

ওরে পাষণ্ড, আর সকলকে ডাকতে শেখাতে হয়। ভগবানকে যেমনভাবেই ডাকো না কেন তিনি সাড়া দেবেন।

সাড়া দেবেন!

নিশ্চয়। মাকে আধোস্বরে অস্পষ্টভাবে শিশু ডাকে, মা কি সাড়া দেন না?

হাতজোড় করতে হয়?

হাতজোড় করা, চোখ বোজা এসব ইচ্ছাধীন, আসল কথা মনে মনে সাচ্চা হওয়া চাই।

তুমি সাচ্চা হয়েছ জরতী?

চেষ্টা তো করি।

তবে আমিও চেষ্টা করবো।...আচ্ছা জরতী, আজ কি গেরণ নাকি? চাঁদটা কালো হয়ে আসছে কেন?

কালো হতে যাবে কেন? আয়নার মতো মস্ত গোল চাঁদ।

না রে না, চোখে ভুল দেখছিস, ঐ দেখ্, ঐ কোণটায় কালো হয়ে এসেছে।

চোখের মাথা খেয়েছ আর কি! যা করছিলে তাই করো, ভগবানকে ডাকো।

ওরে, মাটি কাঁপছে কেন? ভুঁই দোল নাকি! চল্ চল্ পালাই।

কোথায় মাটি কাঁপছে! তোমার নেশা এখনো ছোটেনি!

এই দেখ, আমার বুকের ওপরে হাত দিয়ে দেখ কেমন কাঁপছে।

কাঁপবে না, পাপ করেছ বুক কাঁপবে না!

ঐ দেখ, দুটো বড় বড় তারা খসে পড়ছে। এসব ভালো লক্ষণ নয়, চল পালাই।

কোথায় তারা খসলো?

খসলো না? তবে ওখানে কাঁদছে কে? কান পেতে শোন।

কান্না নয়, ঝাউবনের মধ্যে বাতাসের শব্দ।

তাই তো, ঝাউবনের মধ্যে বাতাসের শব্দই তো বটে! জরতী, আজ আমার চোখ কান মন সব ভুল দেখাচ্ছে, ভুল শোনাচ্ছে, ভুল বোঝাচ্ছে। বসুদেবের বেটা বাসুদেব, দেবতার দেবতা স্বয়ং ভগবান। কি করে জানলে যে ভগবান?

সবাই জানে, সবাই মানে, সবাই মনে করে।

তাহলে ভগবানকে ডাকি। ঐ দেখ গেরণ লেগেছে, ঐ দেখ মাটি কাঁপছে, ঐ শোন কান্না। এর চেয়ে বুঝি পাগল হয়ে যাওয়া ভালো, ওরে এর চেয়ে বুঝি পাগল হয়ে যাওয়া ভালো।...ভগবান, তোমাকে কখনো ডাকিনি, কি করে ডাকতে হয়, কি বলতে হয় জানি নে, ভগবান...না রে, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমার হয়ে তুই ডাক্।...ঐ শোন্ না, কে যেন হাসছে, আমাকে ঠাট্টা করছে।

হাসি নয়, পেঁচার ডাক, তুমি একটু চুপ করো তো।

ঐ যে রাজবাড়ির সেপাই আমায় ধরতে আসছে, পালা, পালা শীগগির। সঙ্গে আয়।

জরতী দেখে ছুটে পালালো সে। ভালোই হল, এখানে থাকলে মনে শান্তি পেতো না।

বাসুদেবের পা দুখানি কোলের উপরে তুলে নিয়ে জরতী বসে আছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। অশ্বত্থ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো মণি-মাণিক্যের কুচির মতো পড়েছে তার সর্বাঙ্গে, সব চেয়ে উজ্জ্বল টুকরোটি তার বুকের রক্তটিতে, সেটি যেন বিধাতার চোখের মতো নির্নিমেষে জ্বলছে। কেন সে এমনভাবে বসে আছে, কতক্ষণ বসে থাকবে কিছুই জানে না, সুসংলগ্নভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার চলে গিয়েছে, অসংলগ্ন কত তুচ্ছ বিষয় না মনে আসছে। কুটীরের চালের উপরে মাঝে মাঝে দুটো কাক এসে বসে, লাউয়ের মাচায় কোথা থেকে একটা ঝিঙেলতা উঠেছে, ঝিঙে আর লাউ পাশাপাশি দুলছে, তেঁতুলগাছে চিল বসে হঠাৎ ডেকে ওঠে, ভোরবেলা পথের ধুলোর উপরে শিশির ফোঁটার দাগ, আঙিনার দূর্বাদল শিশিরের প্রলেপে সাদা, যেমন সাদা হয়ে এসেছে দূর্বাশ্যাম বাসুদেবের দেহ। তুচ্ছ কথার হাতছানি ডেকে নিয়ে আসে...।

বাসুদেবকে নগরের রাজপথে রথারূঢ় অবস্থায় অনেকবার দেখেছে, রথ চঞ্চল রথী শান্ত, চোখ দুটো যেন কোন্ সুদূর লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ, সম্মুখে কে আসছে যাচ্ছে ভ্রূক্ষেপ নেই। আর একদিনের কথা কখনো ভোলবার নয়। এদিকে এসেছিল

শুকনো কাঠকুটো কুড়োতে, চোখে পড়লো বলভদ্র আর বাসুদেব দুই ভাই গঙ্গা-যমুনা প্রবাহের মতো পাশাপাশি সমুদ্রের দিকে চলেছে। সে থমকে দাঁড়ালো, এমনভাবে এত কাছাকাছি তাঁদের দেখবার সুযোগ হয়নি। দুজনে সমুদ্রের জলের রেখাটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন সমুদ্রের দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, দুজনের যুগল ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে লুটিয়ে পড়ে তার পায়ের উপরে এসে পৌঁছল, সে সম্ভ্রমে সরে গিয়ে ছায়ার উদ্দেশে প্রণাম করলো। তারা দাঁড়িয়েই রইলো, ক্রমে সূর্য অস্ত গেল, ছায়া মিলিয়ে গেল, আর একবার প্রমাণ করে বাড়ি ফিরে এলো জরতী।

কয়েকদিন আগে শুনেছিল বলভদ্র যোগে দেহত্যাগ করবেন, বিশ্বাস হয়নি। আবার শুনেছিল এবারে বাসুদেবও দেহত্যাগ করবেন, বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এমনভাবে যে বিশ্বাস করতে হবে কে জানতো।

জরতী, জরতী শীগগির বাঁচা, ওরা ধরতে আসছে।

জরতী চমকে উঠে দেখে, জরা পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

কি হল জরা, কে ধরতে আসছে?

কেমন করে জানবো। মাথায় সাদা পাগড়ি হাজার হাজার লোক, বোধ করি রাজবাড়ির সেপাই।

জরতী বুঝলো জরা বিভীষিকা দেখছে, বলল, হাজার হাজার লোক অথচ দেখতে পাচ্ছি না!

ঐ তো এদিকে আসছে।

হাজার লোক এলে শব্দ হতো।

কেন, শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে।

জরতী কান পেতে শুনলো, সমুদ্রের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

তুমি ভুল দেখছ জরা, না শব্দ না মানুষ।

বিশ্বাস না হয় দেখবে এসো—বলে হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল সমুদ্রের ধারে—ঐ দেখ।

জরতী চমকে উঠল, সাদা পাগড়িপরা সারিবদ্ধ একদল লোক গর্জন করতে করতে সত্যিই তো ছুটে আসছে। কিন্তু শুধু এক লহমার জন্য, পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলো জোয়ারের ফেনাপরা ঢেউয়ের সার।

ভয় ভাঙিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, ওগুলো মাথা নয়, সমুদ্রের ঢেউ।

অবিশ্বাস করবার উপায় ছিল না, জরতীর কথা শেষ হতে না হতে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল।

তাই বলো, আমার মনে হয়েছিল সেপাই। বোধ হয় তারা খোঁজ পাবে না!

কারা?

রাজবাড়ির লোকে!

এত বড় ঘটনা কি চাপা থাকবে?

তা থাকবে না—তবে কেমন করে জানবে যে আমার তীরের ঘায় কি যেন নামটা—

বাসুদেব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুদেবের বেটা বাসুদেব মারা গিয়েছে!

না জানতে পারে, কিন্তু রাজার দণ্ড ছাড়া কি আর কারো দণ্ড নেই?

আবার কার থাকবে?

কেন, বিধাতাপুরুষের।

বিধাতাপুরুষের! আচ্ছা, অজান্তে মারলেও কি পাপ হয়?

তুমি তো অজান্তে মারোনি, বেশ নিশানা করে মেরেছে।

হরিণ ভেবেছিলাম।

এতদিনের শিকারী তুমি, তোমার তা ভাববার কথা নয়।

ওসব বাজে কথা। রাজার দণ্ড ছাড়া আর কিছুকে আমি ভয় করি নে।

তবে চোখে ভুল দেখছ কেন, কানে ভুল শুনছ কেন, মনে ভুল বুঝছ কেন? কত মানুষ তো মেরেছ, এমন কখনো হয়েছে কি?

কি যে বলিস! সে মানুষ আর এ মানুষ!

তফাত কোথায়? তাদেরও চার হাত-পা, এরও তাই।

তা বটে। ঐ দেখ গেরণ লেগেছে, চাঁদের কোণটায় কালো রঙ। ঐ দেখ সব তারা খসে পড়ছে, দলে দলে। ঐ দেখ ভুঁই দোল, মাটি কাঁপছে।

কিছুই নয় জরা, তুমি বাড়ি যাও, ঘুমোও গিয়ে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে তুমিও চলো।

না, আমি ওখানেই থাকবো।

কতক্ষণ?

কেউ না আসা অবধি।

তবে চলো আমিও থাকি।

তুমি থাকবে কেন?

সে কথা তো আমিও বুঝতে পারছি না। আমি চলেও যেতে পারছি না,

ছেড়েও থাকতে পারছি না। মনের মধ্যে কেমন সব ওলটপালট চলছে। এক-একবার মনে হচ্ছে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরি, সব আপদ চুকে যাক। কিন্তু তখনি ভাবি যমদূতগুলো টেনে নিয়ে যাবে নরকে, তপ্ত ডাণ্ডস মারবে গায়ে। তখন মনে হয় তার চেয়ে এই ভালো। আচ্ছা জরতী, তুই তো বলছিলি ভগবানকে ডাকলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।

হ্যাঁ যায়।

তবে আমার হয়ে তুই ডাক্, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা ডাকছি, তুমি স্থির হয়ে বসো।

জরা একমুহূর্ত স্থির হয়ে বসেই হঠাৎ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে—ঐ যে ধক-ধক করে জ্বলছে বিধাতাপুরুষের চোখ—

এই বলে সে ছুটলো বাসুদেবের দেহের দিকে। অগত্যা জরতীও পিছু পিছু ছুটলো।

কই, তার বুকের সেই রত্নটা গেল কোথায়?

জরতী দেখল সত্যিই রত্নটি নেই।

দেখ্ জরতী, এখানে নিশ্চয় কেউ এসেছিল আর সে নিয়ে গিয়েছে।

কি যে বলো জরা, ঐ দেবদেহে হাত দেবে এমন সাধ্য কার?

আমি যেন দেখলাম কালো ছায়ার মতো ছুটে পালালো।

ও তোমার চোখের ভুল। ওটা কৌস্তুভমণি, বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছিল, এখন বাসুদেবের লীলার শেষে আবার বৈকুণ্ঠে চলে গেল।

সেখানে আবার তার গলায় দুলবে?

নিশ্চয় রে নিশ্চয়। জরা, তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও।

তুইও চল্, আমার ভয় করছে।

৪

জরতীর অনুরোধে সে একাই ফিরে চলল বাড়ির দিকে। বাড়ির কাছে আসতেই তার পোষা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ রবে ডেকে এসে তাকে আক্রমণ করলো। জরা বিস্মিত হয়ে যায়—এ কিরকম তার ব্যবহার! অনেক দিনের পোষা কুকুর, বড় প্রিয়, প্রভুর পায়ের শব্দ শুনতে না শুনতে পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে লেজ নাড়তে থাকে, হাত চাটে। জরা ভাবে আজ তার কি হল? সে বলল, বাঘা, বাঘা আমি রে, চিনতে পারছিস না! কুকুর আরও ক্ষেপে ওঠে, তার পায়ে

আঁচড়াতে থাকে। বাঘা এমন ক্ষেপে উঠল কেন! বাঘার ডাকে পাড়ার কুকুরগুলো ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগলো। সে যত তাড়ায় তত বেশি করে তারা আক্রমণ করে। ওদিকে তাদের দেখাদেখি বাড়ির অন্য সব পোষা জানোয়ার ক্ষেপে উঠে তাকে আক্রমণ শুরু করলো। ব্যাধের বাড়িতে পোষা জানোয়ারের অভাব হয় না। তার উপরে আবার জরার নানারকম পশুপাখী পোষার বাতিক ছিল। বেড়াল, বেজি, নেউল, সজারু, গোসাপ অনেকগুলো ছিল। সব একযোগে বিকট রব তুলে তাকে ঘেরাও করলো, কেউ আঁচড়ায়, কেউ কামড়ায়, গোসাপটা গায়ে থুথু ছিটোয়। দাওয়ায় খাঁচায় ঝুলছিল ময়না টিয়া চন্দনা। তারা জেগে উঠে কিচিমিচি রব তুললো। ময়নাটা ক্রমাগত বলতে লাগলো, চোর ডাকাত খুনে পাকড়াও, পাকড়াও। এ বুলি জরা সঙ্কটকালের জন্য সযত্নে শিখিয়েছিল, আজ সেই সব বুলি তার উপরে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো, 'চোর ডাকাত খুনে পাকড়াও'। বিব্রত বিপন্ন ব্যতিব্যস্ত জরা অগত্যা একটা মোটা ঠেঙা নিয়ে কুকুরগুলোকে মারতে লাগলো। কিন্তু সে একা, কুকুর অনেক। একটা মার খেয়ে ভাগে তো আর পাঁচটা এসে কামড়ায়, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। তখন সে ছুটে গিয়ে নিরীহ পাখীগুলোর উপরে পড়লো, তারা পাখা ঝাপটিয়ে কর্কশ চিৎকার করে উঠল, চোর ডাকাত খুনে পাকড়াও, পাকড়াও।

দাঁড়া, পাকড়ানো বের করে দিচ্ছি! আমারই খেয়ে, আমারই ঘরে থেকে আমাকে চোর ডাকাত খুনে বলা!

ধাঁই ধাঁই করে লাঠি চালায়, খাঁচা ভেঙে যায়, কতক উড়ে পালায়, কতক মরে, কতক আধমরা হয়, টিয়েটা মাথার উপরে বসে ঠোকরাতে থাকে। ওদিকে কুকুর বেজি সজারু গোসাপগুলো তো আছেই। চারদিক থেকে আক্রমণ। সে কি করবে। হাত-পা সমস্ত গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, ব্যথায় বেদনায় সে পাগল-প্রায়। এখন সত্যসত্যই তার মাথায় খুন চেপে গেল।

দাঁড়া, মজা করে বাড়িতে বাস করা বের করে দিচ্ছি।

উনুনে আগুন ছিল। সেই আগুন তুলে নিয়ে খড়ের চালে গুঁজে দিল, দেখতে দেখতে সমস্ত চাল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

নে, এবার বাড়িতে বাস করা বের হয়ে যাক। বনের পশু যা বনে ফিরে।

পশুগুলো আরও ক্ষেপে উঠে তাকে আক্রমণ করলো, অগত্যা তখন সে ছুটে পালালো।

বাড়ির চারদিকে বন। আগুন দেখে বনের পশুপাখী সচকিত হয়ে জেগে

উঠে কোলাহল শুরু করে দিল। পেঁচা কালপেঁচা কুটুরে পেঁচা তার মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগলো, চ্যাঁ-চ্যাঁ, সে কি উৎকট ডাক; অকালে উদ্বোধিত উৎক্রোশ পাখী দীর্ঘ তানে আওয়াজ শুরু করলো; হাজার হাজার কাক কা-কা রবে ডেকে উড়তে উড়তে পূর্ণিমার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দিল; বন থেকে বেরিয়ে এলো হুড়ার, ভালুক, বুনো কুকুর। তখন আরও দ্রুত সে ছুটলো। এমন সময়ে কোথা থেকে প্রকাণ্ড একটা বিষধর সাপ ফণা তুলে তার গতিরোধ করে দাঁড়ালো। সে বাঁয়ে ছোটে, সেদিকেও আক্রমণকারী, ডাইনে ছোটে, সেদিকেও তাই। অবশেষে তার মুখ দিয়ে বের হল, ভগবান, রক্ষা করো। হঠাৎ চারদিকে উঠল বিকট হাসির আওয়াজ, তীক্ষ্ণ, উচ্চ, কর্কশ। প্রকৃতিস্থ থাকলে বুঝতে পারতো খট্টাশ ডাক। তখন তার মনে হল পোষা পশুপাখী থেকে শুরু করে চরাচরের সমস্ত জীবজন্তু আজ তার বিরুদ্ধে। উপরে আকাশে তাকিয়ে দেখল, সেখানেও সান্ত্বনা নেই—স্খলিত উল্কাগুলো ছোবল মারবার উদ্দেশ্যে ছুটে আসছে তার দিকে। ঐ একটি মৃত্যুতে যেন নিখিলের নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হয়ে গিয়েছে। কেন, এমন কি অন্যায় সে করেছে, অজান্তে একটা মানুষ মেরে ফেলেছে বই তো নয়! এর আগে জেনেশুনে কত মানুষ মেরেছে, কই তখন তো সবাই নীরব ছিল, তবে এখন কেন! ভগবান না ছাই! বসুদেবের বেটা বাসুদেব, মানুষের বেটা আবার ভগবান হয়, সব বুজরুকি। বাসুদেবের দশটা প্রাণ থাকলে তখন সে দশবার হত্যা করতে পারতো, এমন মনের অবস্থা। মরীয়া হয়ে সে প্রাণপণে ছুটলো, আততায়ীরা এবারে পিছনে পড়েছে, তবু সঙ্গ ছাড়েনি।

তখন তার সব ক্রোধ গিয়ে পড়লো জরতীর উপরে। ঐ বেটিই সব অনর্থের মূল। যত সব আধিক্যেতা। ভগবান! ভগবান তবে মানুষের হাতে মরে কেন! যে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, সে নাকি পৃথিবীর লোককে বাঁচায়! ফেলবো মাগীর টুঁটি ছিঁড়ে, দেখি তার ভগবান কেমন তাকে বাঁচায়।

আর বসুদেবের বেটা যদি সত্যি ভগবান হয়, তবে ভগবান মরেছে, আর ভগবান যদি মরেই থাকে তবে আর কাকে ভয়! পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম সব গিয়েছে ভগাবেটার সঙ্গে। তাহলে আর কাকে ভয়! এই বলে সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সগর্বে উত্থিত করলো চরাচরের মুখের দিকে।

সে ছুটছে আর ভাবছে, দাঁড়া আজ বেটিকেও পাঠাচ্ছি তার ভগবানের সঙ্গে, দুজনেই যাক এক চিতায়।

এ কি জরা, আবার ফিরে এলে কেন? এ কি, পিছনে এত জন্তুজানোয়ার কেন?

আরে, ওরা যে তোর ভগবানের চেলাচামুণ্ডা!

তা আবার ফিরলে কেন?

একটু কাজ বাকী আছে।

কি আবার কাজ—

জয়ন্তী বলা শেষ করবার অবসর পেল না। জরা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে দিল, বলল, নে এবার, বেটি, যা তোর ভগবানের সঙ্গে।

জয়ন্তীর দেহ বাসুদেবের পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়লো। জরা ছুটে পালালো নগরের দিকে। কিয়দ্দূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলো পাখীগুলো ছত্রাকারে উড়ছে বাসুদেবের দেহের উপরে আর পশুগুলো চক্রাকারে ঘিরে রয়েছে তার দেহ। জরা উচ্চস্বরে বলল, নে বেটারা, আজ ভগবানের মাংস খেয়ে জীবন ধন্য কর্, পরজন্মে সব দেবতা হয়ে জন্মাবি!

৫

মদিরা, দরজা খোল্, দরজা খোল্।

দরজা খুলে দিয়ে মদিরা বলল, দরজা যে ভেঙে ফেলবে!

সে ভয় যদি থাকে তবে দরজা বন্ধ করতে নেই।

নইলে দরজা খোলার সুখ পাবো কি করে?

তাই তো দেখছি, তোমার সুখের অবধি নেই।

তা কি আজ নতুন জানলে? তা এত রাতে কি মনে করে?

তোমার তো রাতের বেলারই সংসার। তা ছাড়া তোমার বাড়িতেও কি শেষে ঘড়ি ধরে আসতে হবে?

বেশ, এসেছ যখন বসো।

ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপরে রেড়ির তেলের বাতি জ্বলছিল, পাশেই প্রশস্ত ফরাশ, তার এক পাশে মৃদঙ্গ সেতার বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। এবারে বাতির আলোয় জরাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে মদিরা বলল, এ কি, সর্বাঙ্গ যে ছিঁড়ে পুড়ে গিয়েছে, ব্যাপার কি? তুমি ভালুকের সঙ্গে লড়াই করছিলে নাকি?

নিতান্ত মিথ্যা বলোনি মদিরা, তবে শুধু ভালুক নয়, বুনো কুকুর, হুড়ার, বনবেড়াল, আরও সব জানোয়ার ছিল।

তাই বলো, সপ্তরথীতে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলেছিল। তা বেরিয়ে এলে কি করে?

কপালজোরে।

ইস, সারা গা যে রক্তে ভরে গিয়েছে! দাঁড়াও, কিছু লাগিয়ে দি।

এই বলে কুলুঙ্গি থেকে মহুয়ার তেল নিয়ে এসে ফরসা ন্যাকড়া দিয়ে সযত্নে লাগাতে লাগলো।

বাঃ, বেশ আরাম লাগছে। জানিস মদিরা, আমি মানুষ মেরেছি।

কৃত্রিম আনন্দে মদিরা বলে উঠল, চমৎকার, বীরপুরুষ সন্দেহ নেই। তোমার একটা মূর্তি গড়িয়ে নগরের চকে দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

একটা মানুষ নয় রে, দুটো,—একটা পুরুষ, একটা মেয়েছেলে।

তবে তো দুটো মূর্তি গড়তে হল দেখছি!

ঠাট্টা নয় রে।

কে বলছে ঠাট্টা! দেখনি নগরের চক বীরপুরুষদের মূর্তিতে এমন ভরে গিয়েছে যে জীবিতদের পা ফেলা কঠিন। সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, মায় শিখণ্ডী সব কুরুক্ষেত্রের বীরপুরুষগণ।

মনে হচ্ছে তুই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিস।

মোটেই নয়। এতকাল জন্তুজানোয়ার মেরে হাত পাকাচ্ছিলে, এবারে মানুষে হাত দিয়েছ—এই তো বীরের মতো কাজ!

ঠাট্টা না হলে প্রশংসা।

যেমন বোঝো।

আচ্ছা, ঠাট্টাও থাক, প্রশংসাও থাক, মদ বের কর্।

মদ! মদ কোথায় পাবো! জানো না, মদ তৈরি করা রাজার নিষেধ!

দেশে রাজা আছে নাকি!

আরে, আছে সেই তো ভরসা। নইলে এত চোর-ডাকাত আসে কোথা থেকে?

কেমন?

নিজেকে দিয়ে বোঝো।

আরে, আমাদের তো সবাই জানে। চোরের ওপর যারা বাটপাড়ি করে বেড়ায়, সেই রাজপুরুষদের কথা বলছি।

আমার কি সেই রাজপুরুষদের ভয় নেই?

বল্ ভরসা নেই! রাজার নিষেধে মদ তৈরি বন্ধ হয় না, কেবল তার দামটা

বাড়ে। নে, এখন মদ বের কর্।

মদিরা এক ভাঁড় মদ এনে দিল, জরা বড় আরামে পান করতে শুরু করলো।

দেখ্ মদিরা, পৃথিবীতে কেউ কখনো মদ তৈরি বন্ধ করতে পারবে না।

আহা, কি আশার কথাই না শোনালে!

তবে হ্যাঁ, নামটা বদলাতে পারে এই পর্যন্ত।

কি রকম?

দেবতারা খায় অমৃত বলে, মুনি-ঋষিরা খায় সোমরস বলে, রাজারা খায় সুরা বলে, পশুপাখীরা খায় মধু বলে, আর তার এই দাসস্য দাস জরা খায় ধেনো বলে।

অবশেষে জরাও যে পণ্ডিত হল! এত শিখলে কোথায়?

টোলের পণ্ডিতমশাইকে মধু যোগাই, একদিন শুনি যে তিনি পড়ুয়াদের পাঠ দিচ্ছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম।

টোলে এমন পাঠ দেওয়া হয় জানলে ভর্তি হতাম! তা তাকেই বুঝি গুরু-দক্ষিণা দিয়ে বধ করেছ!

জরা হঠাৎ মদের ভাঁড়টা আছড়ে ভেঙে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, শীগগির বাইরে চল্, মাটি কাঁপছে, মাথার উপরে বাড়ি ভেঙে পড়বে।

পাগল হলে নাকি! না, ধেনোটা খুব অনেকখানি খেয়েছ!

কে কার কথা শোনে। মদিরার হাত ধরে জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, ঐ দেখ্, চাঁদের কোণাটা কালো, গেরণ আরম্ভ হয়েছে।

কি বাজে কথা বলছ জরা!

ঐ দেখ্, দলে দলে তারা খসে পড়ছে।

মদিরা বুঝলো জরা ঘোর নেশাগ্রস্ত—জোর করে তাকে ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল।

জরা তার হাত ছাড়ে না, বলে, আমার কাছে শো।

না, না, ওসব আজ থাক।

সে-কথা বলছি না রে, বলছি, আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কিসের? এখানে কি আগে থাকোনি?

তখন তো মানুষ মারিনি।

বাজে কথা রাখো তো। আমি তোমাকে কত বছর দেখছি, তার মধ্যে অন্ততঃ বিশ-পঁচিশটা মানুষ তুমি মেরেছো।

এ মানুষ আলাদা।

মানুষ মানুষ, তার আবার আলাদা-সালাদা কি!

কিছুতেই কিছু হল না, জরা অঝোরে কাঁদতে শুরু করলো। মদিরা সান্ত্বনার্থে বোঝাতে লাগলো, আরে পাগল, একটা দুটো মানুষ মেরে তোমার এত মনস্তাপ আর রাজবাড়ির পুরুষগুলো যেসব হানাহানি করে বেবাক মরে গেল তার কি হয়।

সব মরেছে?

সব। বুড়ো রাজা আর বলভদ্র বাসুদেব ছাড়া সব। শুনলাম দুদিন আগে বলভদ্রও নাকি যোগে দেহত্যাগ করেছেন।

আর বাসুদেব?

তিনি এখনও আছেন।

মদ মদ, শীগ্‌গির মদ দে।

এই তো এক ভাঁড় গিললে, আবার কি হবে?

দে দে, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

ঢক ঢক করে অনেকখানি মদ খেয়ে ফেলে বলল, বসুদেবের বেটা বাসুদেব তবে এখনো মরেনি!

তিনিই তো শেষ ভরসা।

কেন?

কেন বুঝতে পারো না? ঘরের বড় খুঁটিটা পড়ে গেলে, দালানের ভিৎ নড়ে গেলে কি হয়?

বসুদেবের বেটা তবে এমনি মস্ত লোক!

লোক বলছ কি?

তবে কি দেবতা?

দেবতার দেবতা স্বয়ং ভগবান।

তা তিনি মরলে কি হবে?

ভূমিকম্প শুরু হবে, গ্রহ-নক্ষত্র খসে পড়বে, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়ে যাবে, সমুদ্র এগিয়ে এসে চরাচর গ্রাস করে ফেলবে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না, বনের পশু হয়ে এ ওকে ধরে খাবে।

তবে কেন বিশ্বাস করছ না যে, গেরণ লেগেছে। ভুঁই দোল আরম্ভ হয়েছে, তারাগুলো খসে পড়ছে।

মদের নেশায় বিভীষিকা দেখছ জরা। এখনো বাসুদেব জীবিত।

জীবিত! তবে ও কিসের হলহলা? সত্যই বুঝি সমুদ্র সমস্ত গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। ঐ শোনো শব্দ, কান পেতে শোনো।

এবারে আর মদিরার পক্ষে নিজের কানকে অবিশ্বাস করা সম্ভব হল না, ধীরভাবে কান পেতে শুনে সবলে টান মেরে জরাকে দাঁড় করিয়ে দিল, বলল, প্রাণে বাঁচতে চাও যদি শীগ্‌গির পালাও।

কেন, কি হয়েছে?

আর মুহূর্তকাল বিলম্ব নয়, এই দণ্ডে পালাও।

কোনদিকে যাবো?

ঐ বনের দিকে চলে যাও।

তুমি?

আমার ভয় নেই।

তুমি মেয়েছেলে তোমার ভয় নেই আর আমার পুরুষের ভয়?

এমন ভয় সম্ভব যা পুরুষেরই। আর নয়, পালাও, ঐ শোনো হলহলা আরও কাছে এসে পড়েছে।

সমুদ্রের শব্দ!

না, এ শব্দ আসছে নগরের দিক থেকে।

বনের দিকে যাবো? কিছুই বুঝতে পারছি না।

কালকে এসো, বুঝিয়ে দেব।

জরা যেতে উদ্যত হলে মদিরা বলল, শোনো, তোমার ধুতি ছেড়ে এই ঘাগরা আর কাঁচুলি পরো।

বিস্মিত বিহ্বল জরাকে একরকম জোর করেই নারীবেশে সুসজ্জিত করে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে মদিরা বলল, ঐ বনের দিকে পালিয়ে যাও, শীগ্‌গির।

কিছুই বুঝতে পারছি না—বলতে বলতে জরা বনের দিকে ছুটলো।

দারুণ হলহলা কাছে এসে পড়েছে।

৬

জরা বনের দিকে অন্তর্হিত হলে মদিরা বাড়ির ছাদের উপরে উঠে যে দৃশ্য দেখতে পেলো, তা মোটেই তার কাছে নতুন নয়, আজ ক-রাত ধরে দেখে আসছে, তবু তার অভিনবত্ব ম্লান হয়নি। রাজপুরীর সিংহদ্বার খুলে গিয়ে গলন্ত ধাতবপ্রবাহের মতো একটা বিপুল জনসংঘট্ট বেরিয়ে আসছে, অনেক মশালের আলোয় উজ্জ্বল। হলহলা উঠছে সেই প্রবাহে।

প্রথম রাতে উৎকট অস্বাভাবিক অসাময়িক কোলাহলে তার ঘুম ভেঙে

গিয়েছিল, প্রথমটা বুঝতে পারেনি ব্যাপার কি, তারপরে ছাদে উঠে দেখলো ঠিক সেই দৃশ্য, আজ যেমনটি দেখছে। রাজপুরীর উপকণ্ঠে তার বাড়ি হলেও মাঝখানে সিকি ক্রোশের ব্যবধান। সেই চলমান জনপ্রবাহকে ধাতবপ্রবাহ বলেই তার মনে হয়েছিল ; ধাতবপ্রবাহের মতোই কঠিন কর্কশ ধ্বনি, গলিত ধাতুর মতোই উজ্জ্বল দীপ্তিময় ভয়ঙ্কর সুন্দর। আরো কাছে এসে পড়লে দেখেছিল—লক্ষ্য করেছিল, কারণ তখন স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হচ্ছিল—ঐ চলমান জনপিণ্ড শত শত সুন্দরী যুবতী নারীর সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকের হাতে দীপ্ত মশাল, সেই মশালের আলোয় প্রত্যেকের মুখচোখ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ছিন্ন কাঁচুলির ফাঁকে নিটোল স্তন, ছিন্ন ঘাগরার অবকাশে সুডোল উরু প্রভৃতির প্রত্যেকটি রেখা ক্রমেই অধিকতর চক্ষুগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল। সকলে একযোগে উচ্চস্বরে কিছু বলছিল, যেন কোন কিছুর দাবি, তবে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। তারা আরও কাছে এসে পড়লে তাদের মুখ-চোখের হাবভাবে মদিরা চকিত-ভীত হয়ে উঠল। এ তার অজানা থাকবার কথা নয়, কাম-ব্যবসায়ী সুন্দরী যুবতী হিসাবে এ-ভাবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু এরা কারা, কোথায় চলেছে, কাদের সন্ধানে চলেছে কিছুই বুঝতে পারলো না। হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। তার দরজায় ধাক্কা পড়লো।

সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে জানলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি চাও তোমরা?

অনেক কণ্ঠে উত্তর শুনতে পেলো, তোকে চাই না, দরজা খুলে দে, তোর ঘরে কে পুরুষ আছে তাকে চাই।

সে রাতে তার কামের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল এক বিদেশী বণিক। বেচারী ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

খোল খোল, শীগ্‌গির দরজা খোল।

আমার ঘরে আজ কেউ নেই।

আছে কি নেই পরীক্ষা করবো, দরজা খোল।

না, খুলবো না দরজা। এখান থেকে যাও।

প্রচণ্ড ধাক্কায় আগল ছুটে গিয়ে দরজা হাঁ হয়ে যেতেই একসঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশজন যুবতী প্রবেশ করলো এবং সকলে একযোগে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, ঐ যে!

বণিক হঠাৎ জাগরিত হয়ে উঠে পুরোপুরি সম্বিৎ লাভ করবার আগেই বিশ-পঁচিশজন তার উপরে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো, সকলেই সকলের আগে দখল করতে

চায়। মদিরা বাধা দিতে চেষ্টা করতেই একজন ছুঁড়ে মারলো তার দিকে পানের ডিবে, তার কপাল কেটে গিয়ে রক্তে মুখ-চোখ ভেসে গেল। বাইরে গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখতে পেলো সেই বিশ-পঁচিশজনে মিলে বণিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জবরদখল করবার চেষ্টায় নিযুক্ত।

গেলাম গেলাম, মলাম।

কে কার কথা শোনে! প্রথম টানাটানিতে তার ধুতি আঙরাখা ছিঁড়ে-খুঁড়ে উড়ে গিয়েছে, এখন নগ্ন দেহটার উপরে জুলুম চলছে। কেউ নিজ দাবি ছাড়তে রাজী নয়। শুধু তাই নয়, অপরকে দাবিচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে হানাহানি মারামারি চলছে।

বহিন, তুমি আমার হাতখানা ধরতে এলে কেন?

মর্ ছুঁড়ি, এ হাত কি তোর একচেটিয়া?

যারা দেহের কাছে অগ্রসর হতে পারেনি তারা সকলে মিলে অগ্রবর্তী দলকে আক্রমণ করছে, তখন দুই দলে লড়াই বেধে গিয়ে গৃহের মেঝে যুধ্যমান ভূলুণ্ঠিত নারীদেহে বন্ধুর হয়ে উঠল। বেশভূষা ও অলঙ্কার আর দেহাশ্রয়ী নয়। কুন্তলজাল ছিন্ন ও বিস্রস্ত, গালে মুখে স্তনে উরুতে নখক্ষত ও দংশনজাত রক্তস্রুতি।

ওদিকে বিশ-পঁচিশজনের চুম্বনে আলিঙ্গনে পীড়নে দংশনে বণিক মৃতপ্রায়।

তবু কেউ দখলীকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দাবি ছাড়তে রাজী নয়। অবশেষে কয়েক-বার হিক্কা তুলে বণিক যে কখন প্রাণত্যাগ করলো কারো হুঁশ নেই। তখনো কামোন্মাদিনীগণ দেহটা নিয়ে টানাটানি করছে। কামার্ত নারী ক্ষুধার্ত দ্বীপী।

ঘণ্টাখানেক বাদে যুবতীদের হুঁশ হল যে লোকটা মারা গিয়েছে। তখন সেই দেহ থেকে ক্ষরিত রক্তে অঞ্চল, কাঁচুলি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শোণিত সিক্ত করে যেমন অকস্মাৎ প্রবেশ করেছিল তেমনি অকস্মাৎ প্রস্থান করলো, চল চল, অন্য বাড়িগুলো খুঁজে দেখি গে, আরও পুরুষ আছে।

পরদিন প্রাতে এই বৃহৎ বারাঙ্গনা পল্লীর প্রত্যেক গৃহ থেকে দলিত মথিত পিণ্ডীকৃত পুরুষদেহ বের হতে লাগলো। বারাঙ্গনারা মিলে শ্মশানে তাদের সংকার করলো। অপরাহ্ণে মদিরার গৃহে বারাঙ্গনাদের এক ইষ্টগোষ্ঠী আহূত হল, নেত্রী স্বয়ং মদিরা।

৭

রাজপুরীর বাইরে দক্ষিণ দিকে বৃহৎ বারাঙ্গনা-পল্লী। পল্লীর মাঝখানে মদিরার

বাড়ি, কৌলীন্যে সকলের সেরা না হলেও রূপে ও অর্থে মদিরা সকলের উপরে। তার আহ্বান কেউ উপেক্ষা করতে পারেনি, সকলেরই সমান সঙ্কট। সবাই এসে বসেছে মদিরার বাড়ির বাগানে পম্পা সরোবর নামে পুষ্করিণীর বাঁধানো চাতালে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ, কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ায় এমন ওলটপালট চলছে যে রোদ দাঁত বসাতে পারেনি। চারদিকে ফুলের বাগিচা, গন্ধে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে।

উপস্থিতগণের মধ্যে চোদ্দ-পনেরো থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়সের নারী আছে, কেউবা সদ্য আগত, কেউবা বিদায়ের মুখে। এরা সকলেই সকলের বহিন, সম্বন্ধে সমান, বয়সের ভেদটাকে তেমন আমল দিতে চায় না এরা। তৎসত্ত্বেও, দু'জনের বিশেষ সম্মান, একজন মদিরা, আর একজন বড় বহিন নামে পরিজ্ঞাত, পাড়ার ও রাজপুরীর সকলের কাছেই সে বড় বহিন।

কিছুক্ষণ হল আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, তবে ভূমিকার প্রয়োজন হয়নি, সঙ্কট সকলেরই, সঙ্কটের কারণ সকলেরই পরিচিত।

মদিরা বলছিল, এরকম করে আমরা বেগানা পুরুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারি না। বেচারারা সুখের আশায় এসে প্রাণ হারায়। এই নিয়ে আমার ঘরে পর পর তিনজন মারা পড়লো।

বহিন, তবে তো তোমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে, তিনজন মাত্র। আমার ঘরে এ পর্যন্ত পাঁচজন মারা পড়েছে, বলল চন্দনা নামে একটি মেয়ে।

তখন অনেকগুলো কণ্ঠস্বরে একসঙ্গে রব উঠল, আমার ঘরে চারজন।

আমার ঘরে সাতজন।

আমার ঘরেও সাতজন।

এসব পাপের ভাগ কি আমাদের বহন করতে হবে না?

তখন বড় বহিন সকলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কেন এমন হচ্ছে জানবার জন্যে তিনদিন আগে রাজপুরীতে গিয়েছিলাম। যাদবদের একজনের বউকে বললাম, বউমা, এই যে কাণ্ডটা চলছে এ কি ভালো হচ্ছে! আমি জানতাম যে সেও এই দলে কিন্তু এমন ভাব দেখলাম যেন সে এ ব্যাপারের মধ্যে নেই। বললাম, বউমা, তোমাকে তো বড়ঘরের মেয়ে বলে জানি, আর এদিকে তো রাজবাড়ির বউ, দু'দশজনের জন্য তোমাদের সকলেরই যে নাম খারাপ হতে চলল।

বউটি এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে কথা বলতে শুরু করতেই কোথা থেকে আট-দশজন বউ এসে উপস্থিত হল। আমাকে দেখেও দেখল না। বলল, কি লো, এখনো যে চুপ করে বসে আছিস, তৈরি হয়ে নে, বের হওয়ার সময় হল যে।

বউটি একটু লজ্জা পেলো, আমার কাছে ধরা পড়লো কিনা যে সে-ও এই

দলের লোক, তাদের বলল, এই যে বড় বহিন এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে নিই।

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন বলে উঠল, ও, গোপনে বুঝি শলা-পরামর্শ হচ্ছে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে তার ঘরের মানুষটিকে দখল করবার মতলব! সে হচ্ছে না, সবাই একসঙ্গে বের হব, যার ভাগ্যে যা জোটে।

তখন আমাকে নিজ মূর্তি ধরতে হল, বললাম, দেখো, তোমরা রাজবংশের বউ, তোমরা যদি এভাবে নরহত্যা করতে থাকো তবে আমাদেরও লাগতে হবে তার প্রতিকার চিন্তায়।

কি প্রতিকার করবে ভাবছ?

আমরা আর ঘরে মানুষ বসাবো না।

তবে খাবে কি করে?

খাই না খাই, পাপের ভাগ থেকে তো বেঁচে যাবো।

একসঙ্গে হেসে উঠল অনেকে। বলল, এদিকে ধরেছ বেশ্যাবৃত্তি, ওদিকে পাপপুণ্য সম্বন্ধে এত হিসাব!

বললাম, নরহত্যা তো বেশ্যাবৃত্তির অঙ্গ নয়।

কমই বা কি!

সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অল্পবয়সের একটি মেয়ে ঝাঁজিয়ে উঠে বলল, কেন তাদের বললে না বড় বহিন, যদি নিতান্তই পুরুষ চাই তবে আমাদের পল্লীতে এসে বাস করে না কেন! দেখো না একবার মজা! এদিকে রাজবাড়িতে ঘোমটা টেনে থেকে সতীপনা ফলানোও চাই আবার নিত্যি পরপুরুষ না হলে চলে না।

এই মেয়েটির কোল থেকে কালকে একটি যুবককে কেড়ে নিয়ে আট-দশজনে কাড়াকাড়ি করে মেরে ফেলেছিল। তার অতৃপ্ত কামনা চোখে মুখে রসনায় শতমুখ ভল্লের মতো বের হয়ে পড়লো।

বড় বহিন বলল, কথাটা যে একেবারে পাড়িনি তা নয়। শুনে তারা বলল, তোমরা ছোটলোক, তোমাদের জাতজন্মের ঠিক নেই, তোমরা বেশ্যাবৃত্তি করতে পারো। আমরা যে যদুবংশের বউ।

বললাম, তবে সেইরকম থাকো। তোমরা যা করছ তাতে কাশী কাঞ্চী পাঞ্চাল কোশল সর্বত্র যে ছি-ছি পড়ে যাবে।

একজন বলল, ওগো গুরুঠাকরুণ, একটু খোঁজ নিয়ে দেখো গে, দ্বারকা থেকে প্রাগ-জ্যোতিষ অবধি সর্বত্র এইরকম অবস্থা। আঠারো দিনে আঠারো অক্ষৌহিণী

ক্ষত্রিয় মারা পড়লো, তাদের পত্নীরা কি করবে! এদিকে যদুবংশের সমস্ত পুরুষ তিনদিনে মারামারি কাটাকাটি করে মরলো, তাদের পত্নীরা কি করবে! কি গো গুরুঠাকরুণ, তুমি হলে কি করতে?

আর যাই করি এমন বেলেল্লাপনা করতাম না।

তবু শুনি না কি করতে?

আমাকে উত্তর দেওয়ার সময় দিল না, এক-একজন এক এক রকম মন্তব্য করে বলল: শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে হবিষ্যান্ন করতে করতে ফুলে ইয়া লাশ হয়ে উঠতে!

থান পরে রাত্রিদিন কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে!

শঙ্খধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে চেলি পরে পতির সঙ্গে চিতারোহণ করতে!

এমনি কত কি মন্তব্য, চুপ করে শোনা ছাড়া আর উপায় কি। অবশেষে একটা ছুঁড়ির কথা শুনে সংযম রক্ষা করতে পারলাম না।

কি বলল সে বড় বহিন?

সে বলল, না গো না, স্বামী মরলে ভাশুর-দেওর যাকে হাতের কাছে পেতো টেনে নিয়ে সতীত্ব রক্ষা করতো। একটা দরজা বন্ধ হতেই দশটা জানলা খুলে যেতো।

আমি বললাম, যেমন তোমাদের গিয়েছে। বললাম, দেখো তোমরা বড়-ঘরের বউ, এ পথ ছেড়ে দাও।

তার চেয়ে বলো না কেন আহার পরিত্যাগ করো!

দুই কি এক হল?

অবশ্যই হল না। খাদ্যের চেয়েও বেশি প্রয়োজন পুরুষের সঙ্গ। আগে কাম, পরে ক্ষুধা।

বললাম, তোমরা রাজবংশের বউ, টের পাওনি কখনো ক্ষুধার জ্বালা, তাই ওরকম বলছ।

তোমরা বুঝি ঐ জ্বালাতেই বেশ্যাবৃত্তি ধরেছ?

কথাটা বুঝি নেহাত মিথ্যা নয়, ক্ষুধার জ্বালা না থাকলে অনেকেই ফিরে যেত সংসারে।

অনেকেই, সকলে নয়।

তোমরা যে সকলে দেখছি।

তখন একজন বলল, দেখো বড় বহিন, তোমাকে ভালোমানুষ বলেই জানতাম, কি জন্যে এসেছিলে জানি না। যদি আমাদের মতিগতি ফেরাবার জন্যে এসে থাকো তবে জেনে রাখো সে আশা নেই।

কেন ?

তৃষ্ণায় যার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, সম্মুখে যার শীতল পানীয় সে পান না করবে কেন ? ক্ষুধায় যার সর্বাঙ্গ শিথিল, সম্মুখে যার ভোজ্য পেয় সে গ্রহণ না করবে কেন ? এদের চেয়েও প্রবল, সহস্রগুণে প্রবল নিদারুণ কামের তাড়নায় যার সর্ব দেহমন অগ্নিকটাহবৎ উত্তপ্ত তার কাছে ধর্ম নীতি বিবেক সমাজ সংসার ভদ্রতা মিথ্যার চেয়েও মিথ্যা। কাকে তত্ত্বকথা শোনাতে এসেছ ! নদীকে বলো না কেন নিম্নে প্রবাহিত হয়ো না, অগ্নিকে বলো না কেন উর্ধ্বে উত্থিত হয়ো না, জোয়ারের বন্যাকে বলো না কেন আর অগ্রসর হয়ো না ! কি বলো ?

আমি বললাম, এসব যে নৈসর্গিক নিয়ম।

কামও নৈসর্গিক নিয়ম, অনাদি অনন্ত আদিমতম প্রবলতম নৈসর্গিক নিয়ম।

সে উন্মত্তের মতো বলে চলল, এই দেখো না আগে আমার প্রত্যহ স্বামীসঙ্গ ছাড়া নিদ্রা হত না। কিন্তু পোড়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হতে আমি স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত, আমি অনিদ্র। তার পরে স্বামী যখন ফিরে এল হাতে চাঁদ পেলাম। কিন্তু কে জানতো চাঁদ এমন শীতল, এমন মৃত, এমন জড়পিণ্ড ! কেবলই বীরত্বের গল্প ! ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম, কর্ণ, অশ্বত্থামা, অভিমন্যু ! এ হেন করলো ও তেন করলো, ও জয়দ্রথ বধ করলো, ও অভিমন্যুকে বেষ্টিত করলো, পোড়া গল্প আর ফুরোতে চায় না ! বীরত্বে আমার কী হবে ? তারপরে একদিন গল্প ফুরোতেই আরম্ভ হয় মাতলামি আর হানাহানি, তারপরে সব শেষ, যদুবংশ নির্বংশ ! ক্ষুধার জ্বালায় লোকে পরস্ব আত্মসাৎ করে, পোড়া রাজপুরীতে আত্মসাৎ করবো এমন একটা পুরুষ নেই, কেবল বৃদ্ধ আর শিশু। দেখো, দেখো, এই দেখো আমার সর্বদেহ. বালুখোলার মতো তপ্ত, ধান পড়লে খই হয়ে যাবে। লোকে বলে জ্বর ! জ্বরই বটে তবে সান্নিপাত নয়, কাম-জ্বর, যার বাড়া আর তাপ নেই, পাপ নেই, শাপ নেই !

এই বলে সে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের উপরে স্থাপিত করলো। সত্যি বটে কি তাপ ভেতরে—যেন রক্ত টগবগ করে ফুটছে।

ছাড়লো না আমার হাতখানা, বুকের উপরে চেপে রেখেই বলতে লাগলো, নারীদেহের এ কি জ্বালা, এ কি অভিসম্পাত। পুরুষ ভালোবাসে শুধু মন দিয়ে, নারীর ভালোবাসা সর্বাঙ্গ দিয়ে। নারীদেহের জতুগৃহে আগুন লেগেছে, পুড়ে মলুম জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম জ্বলে মলুম, বলতে বলতে পতনোন্মুখ উল্কার মতো সে ছুটে চলে গেল।

তাকিয়ে দেখি যে শত শত মেয়ে আগুনের হল্কার মতো ছুটে চলেছে, এতক্ষণ

যার সঙ্গে কথা বলছিলাম সেই রাজবধূ রত্নাও তাদের দলে গিয়ে মিশলো, আশে-পাশে কেউ আর কোথাও থাকলো না। শূন্য চত্বরে দাঁড়িয়ে আর কি করি, রাজপুরী থেকে বের হয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে। ভাবলাম স্নান করে যাই, শরীরের গ্লানি দূর হবে, হয়তো বা মনেরও।

স্নান সেরে উঠেছি, দেখি সম্মুখে সূর্যাস্ত বিন্দুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে যেন পাশাপাশি অমাবস্যা আর পূর্ণিমা।

বারাঙ্গনাদের মধ্য থেকে কে একজন শুধালো, কে ঠিক বুঝতে পারা গেল না, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, শুধালো কারা?

বড় বহিন বলল, বলবার সময়ে হাত দুখানি মাথায় ঠেকালো, বাসুদেব আর বলভদ্র। কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম, বললাম, রাজা, এ কি অবস্থায় ফেললে?

বাসুদেব বললেন, বাছা, রাজার রাজাকে ডাকো।

বললাম, রাজা, আমি পাপীতাপী মানুষ, অত বড়র সন্ধান তো জানি নে, তোমাদের ছাড়া তো আর কাউকে চিনি নে।

তিনি বললেন, কি করবে বাছা, সমস্ত রাজার উপরে কাল।

কেন বাবা, একসময়ে তুমি তো কালনাগকে দমন করেছিলে, আজকে এমন কথা বলছ কেন?

এ যে মহাকাল।

তুমিও তো বাবা মহারাজা। এ যে পায়ের তলাকার মাটি টলমল করে উঠেছে।

বাছা, বাসুকির মাথা নড়লে মাটি তো কাঁপবেই।

কেন এমন হল বাবা!

মাঝে মাঝে সংসার ভোলবদল করে, তারই সূচনা বাসুকির মাথা নাড়ায়।

সংসার তো বেশ চলছিল।

তবু কখনো কখনো ঢেলে সাজা দরকার হয়ে পড়ে, তাকেই মন্বন্তর বলে, ইন্দ্রপাত বলে, বিপ্লব বলে, যার যেমন দৃষ্টির প্রসার।

কি দরকার ছিল বাবা!

নইলে মানুষ বড্ড একপেশে হয়ে পড়ে, তখন তাকে দোপেশে করবার জন্যে উল্টো দিকে ঝাঁকুনি দিতে হয়।

কিন্তু বাবা, এ যে রসাতলমুখো নামছে!

তাতেই তো আশা যে আবার উপরের দিকে উঠবে। পাহাড়ে চড়াই-

উৎরাই দেখনি ?

কিন্তু বাবা, তুমি থাকতে বাসুকির উপরে ভার ছেড়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল ?

বাছা, তোমাদের মতো আমিও তো বাসুকির মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

জিভ কেটে বললাম, ও কি কথা বাবা, তুমি যে দেবতা।

তিনি কি উত্তর দিতেন জানি না, বলভদ্র বলে উঠলেন, চলো হে বাসুদেব, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হল।

তাঁরা দুজনে অস্তগিরি উদয়গিরির মতো চলে গেলেন রাজপুরীর দিকে— যতক্ষণ চোখে পড়লো চেয়ে দেখলাম।

বড় বহিন থামলো। তার কথার প্রতিক্রিয়ায় সভাস্থল এমনি নিস্তব্ধ হল যে মৌমাছিগুলোর গুঞ্জন শ্রুতিগোচর হয়ে উঠল।

সবাই ভাবছে কে কি বলবে। এমন সময় মল্লিকা নামে সেই কিশোরী মেয়েটি বলে উঠল, সবই তো শুনলাম, অমাবস্যা পূর্ণিমা উদয়গিরি অস্তগিরি কিছুই বাদ গেল না, কিন্তু আমার কোল থেকে যে মানুষটাকে কেড়ে নিয়ে বাঘিনীরা মেরে ফেলল তার কি করছ !

সকলেরই তো মনে মনে ঐ এক অভিযোগ, তবে মল্লিকার কিছু তীব্র। আর সকলে অভ্যাসের বশে নেশাকে ব্যবসা বলে নিয়েছে, মল্লিকার এখনো নেশা। ঐ যুবকটির সঙ্গে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে আসে, হয়তো আর কিছুকাল পরে পেশা হয়ে দাঁড়াতো, কিন্তু তার আগেই ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার কোল থেকে। সেই দারুণ অতৃপ্তি প্রতিহিংসার ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, জিজ্ঞাসা করছে এর কি প্রতিকার নেই !

মদিরা বলল, মৃত্যুর আর কি প্রতিকার বহিন ?

কেন, দেশে কি রাজা নেই ?

রাজার কথা এইমাত্র তো শুনলে। তাছাড়া পরশু তো বলভদ্র দেহত্যাগ করেছেন।

তবে চলো সবাই যাই অমাবস্যা মহারাজার কাছে। তিনি তো কৌরব-পাণ্ডব সব্বাইকে খতম করে এসেছেন, আর এর একটা বিহিত করতে পারবেন না !

তার কথা শুনে বড় বহিন ও মদিরা, তারাই পাড়ার মুরুব্বী, বলে উঠল, মল্লিকার যুক্তি মন্দ নয়, চলো সকলে মিলে গিয়ে বাসুদেবের পায়ে কেঁদে পড়ি।

সেই সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে সভাভঙ্গের উপক্রম হল, এমন সময়ে সবাই দেখতে পেলো, ভজন দাস ছুটতে ছুটতে আসছে। লোকটা সামান্য, তবে এদের কাছে

অসামান্য, নিঃস্বার্থপর ভাবে এদের দেখাশোনা করে, সকলকেই বলে বহিন, সকলে বলে দাদা।

বহিন বহিন, সর্বনাশ হয়েছে!

কি হয়েছে দাদা?

কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভজন দাদা বলল, সর্বনাশ, মন্বন্তর, ইন্দ্রপাত, বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন!

সমস্ত সভা একসঙ্গে বলে ওঠে—অসম্ভব।

স্বচক্ষে দেখে এলাম সমুদ্রতীরে চিতা-শয্যায় শায়িত।

বড় বহিন বলে, তবে বুঝি তিনিও বলভদ্রের মতো যোগে দেহত্যাগ করেছেন।

না, বড় বহিন না, কাল রাতে এক ব্যাধ তীরের আঘাতে তাঁকে নিহত করেছে।

এমন দুঃসংবাদের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, বস্তুত সকলেরই বিশ্বাস ছিল বাসুদেব দেবতা, জরা-মৃত্যুর অতীত। বিস্ময় প্রকাশ করবার ভাষা কেউ খুঁজে পায় না।

কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করলো মল্লিকা, বলল, দেবতা না ছাই! একটা তীরের আঘাত যিনি সহ্য করতে পারেন না, তাঁরই কাছে নাকি যাচ্ছিলাম প্রতিকারের আশায়!

সকলকে নীরব দেখে বলল, কি, সবাই যে হাঁ করে বসে থাকলে?

কি করা যায় তাই ভাবছি।

তবে বসে বসে ভাবো, আমি চললাম।

কোথায়?

যেখানে দু চোখ যায়—বলে অধিক ভূমিকা মাত্র না করে অন্ধকারের মধ্যে সে প্রস্থান করলো।

৮

আগের রাতের কথা। ঘাগরা, কাঁচুলি ও দোপাটায় ভূষিত হয়ে বনের দিকে দৌড়ল জরা। মদিরা দরজায় দাঁড়িয়ে কোন্ দিকে যেতে হবে দেখিয়ে দিয়েছিল। জরার যদি সম্বিৎ থাকতো তবে নিজের নূতন বেশভূষায় ও আচরণে বিস্ময় বোধ করতো কিংবা আদৌ নূতন বেশ স্বীকার করতো না। কিন্তু তার

মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না, অপরাহ্ণ থেকে যে-অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার ঢেউ একটার পর একটা তার মনের উপরে এসে ধাক্কা মেরেছে তাতে কোন লোকের পক্ষেই সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সে মূঢ়ের মতো মদিরার নির্দেশিত পথে ছুটে চলল। ছুটবার যথেষ্ট কারণও ছিল, পিছনে, খুব দূরে নয় তবু তখনো নজরের বাইরে একটা তুমুল কলরব শ্রুত হচ্ছিল, যার অনুরূপ কিছু সে আগে কখনো শোনেনি।

বনে বনে ঘোরা তার অভ্যাস, শ্বাপদের গর্জন শুনেছে, আহত পশুর আর্তনাদ শুনেছে, জনতার ক্রুদ্ধ কলরব শুনেছে, মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের শব্দ, পাহাড়ে ধস নামার ভৈরব আরাব, দাবানলের হুঙ্কার, সমুদ্রে জোয়ারের শঙ্খধ্বনি কিছুই তার অপরিচিত নয়। কিন্তু এখন যে আওয়াজ তার কানে আসছে, তার সঙ্গে কোন অভিজ্ঞতার মিল হয় না। হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ থেকে হাজার হাজার ক্ষুধিত নেকড়ের আর্ত আকাঙ্ক্ষা শব্দরূপে নির্গত হলে খানিকটা যেন মেলে এই আওয়াজের সঙ্গে। জরাকে বন্য বললেই হয়, বনে-অরণ্যে যার ভয় নেই আজ লোকালয়ে সে ভীত বোধ করলো, বনকে মাতৃক্রোড়ের মতো বোধ হল তার, বনের দিকে ছুটলো সে। সেই উৎকট শব্দ যতই নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগলো তার গতিও হতে লাগলো তত দ্রুততর। অবশেষে ধ্বনির কাছে গতি হার মানলো, শব্দের অনুমানে বুঝলো শব্দের হেতু প্রায় তার পিঠের উপরে এসে পড়েছে। এতক্ষণ চোখ ছিল সামনের দিকে, এবারে পিছনে ফিরে তাকালো। তাকিয়ে যা দেখলো, এমনি অভূতদৃষ্ট যে ক্ষণকালের জন্য ভয় পেতেও ভুলে গেল।

সে দেখলো তার তিন-চার রসি পিছনে বিপুল এক জনপিণ্ড ছুটে আসছে। সে মানুষও বটে আবার যেন মানুষও নয়। হাজারখানেক মানুষ অতি ঘনিষ্ঠ অতি পিনদ্ধভাবে গায়ে গায়ে সংমর্দিত হয়ে একটা পিণ্ড পাকিয়ে গিয়েছে, তারা যেন আর আলাদা নয়, তাদের মন ব্যক্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা সমস্তই একীভূত। এরকম দৃশ্য আগে কখনো জরার চোখে পড়েনি। মেলায় নিবিড় জনতা দেখেছে, গায়ে গায়ে সন্নিদ্ধ হলেও তারা আলাদা—এরা এক। বিস্ময় কমতেই ভয় এসে ঢুকলো মনে, ভয় ঢুকতেই মনে পড়লো মদিরার পরামর্শ, নিরুপায় হলে গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করো, ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। কার হাতে মৃত্যু, কেন মৃত্যু, তাড়াতাড়ির মুখে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিল। সম্মুখেই একটা শাল্মলী গাছ ছিল। তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে পড়ে ঘন পাতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হল। ততক্ষণে সেই বিপুল জনপিণ্ড গাছের তলায় এসে পৌঁছেছে।

জরার যদি সম্বিৎ থাকতো তবে বুঝতে পারতো যে জনপিণ্ড যতই বিপুল

হোক, অন্ধকার রাতে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। যা দেখছিল তা মশালের আলোয়, তবে এত বুঝবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। গাছের উপরে প্রচ্ছন্ন থেকে সে যা দেখলো তাতে ভয় আর বিস্ময় সমান আসন দখল করে নিল তার মনে। নিতান্ত কাছে এসে পড়ায় পিণ্ডকে এবারে আলাদা করে দেখা সম্ভব হচ্ছে। হাজারখানেক মানুষ। মানুষ, তবে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল, চোখ-মুখে তাদের তীব্র আভা, খোলা চুলে যেন তারই ধোঁয়া। সে দেখতে লাগলো উড়ে গিয়েছে তাদের দোপাট্টা, খুলে গিয়েছে তাদের কাঁচুলি, ঘাগরাগুলোও আর ঠিক সুবিন্যস্ত নয়। সেই বিপর্যস্ত বেশভূষার ফাঁক দিয়ে দেহের স্বেদোজ্জ্বল হেমকান্তির উপরে মশালের আলো দ্বিগুণ প্রতিফলিত। দূর থেকে শ্রুত উৎকট ধ্বনিপিণ্ড এবারে বেশ বোধগম্য হচ্ছে, ঐ হাজার কণ্ঠে একটিই আকাঙ্ক্ষা একটিই শব্দ—পুরুষ কই, পুরুষ কই! পুরুষ-সন্ধানে যদুকুল রমণীগণ নির্গত, অভিসারে নয়—মৃগয়ায়।

যদুবংশের পুরুষগণ পরস্পরে হানাহানি করে নিহত হলে রাজপুরীতে অবশিষ্ট রইলো অশক্ত বৃদ্ধ ও শিশুর দল, আর অবশিষ্ট রইলো যুবতী পুরন্ধ্রীগণ। যদুবংশের পুরুষগণ যেমন বীর তেমনি মদ্যপ, কাজেই নারীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সময়াভাব তাদের। এখন তারা নিহত হতেই রাজপুরী মধ্যে হাহাকার উঠল, শোকের উচ্ছ্বাস দূর হতেই পুরন্ধ্রীগণ নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করলো। প্রথমে কিছুদিন তারা সংযত ছিল, কেননা বলভদ্র ও বাসুদেব জীবিত। তারা নামে রাজা না হলেও কাজে বটে, তাদের অদৃশ্য বিভূতি ভয় না করে উপায় নেই। এমন সময় খবর এলো বলভদ্র দেহত্যাগ করেছেন। নারীদের বুকের উপর থেকে একখানা পাষাণভার নেমে গেল, কিন্তু তখনো চেপে রইলো আর একখানা পাথর, সেখানাই বড়। বাসুদেব জীবিত। তাকে ভয় না করবে কে? বলভদ্রকে যা ভয় তা ঐ বাসুদেবের সুবাদে। কিন্তু বাসুদেবকে ভয় নিতান্ত বাস্তব। দুর্লঙ্ঘ্য। অনেকে মনে মনে তার মৃত্যুকামনা করতে শুরু করলো।

দিনের বেলায় রমণীরা সংযত হয়ে রাজপুরী-মধ্যে বাস করতো, কিন্তু সন্ধ্যা হতেই তাদের মতিগতির পরিবর্তন শুরু হতো। প্রথমে শুরু হতো প্রসাধন, তারপর সকলে মিলে সুরাপান, সবশেষে মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে দলে দলে বিভিন্ন দিকে বের হয়ে পড়তো পুরুষমৃগয়ায়।

রাজপুরীর ঠিক বাইরে দক্ষিণ দিকে বৃহৎ বারাঙ্গনা-পল্লী। প্রথমে সকলেই সেদিকে যেতো, কয়েকদিন পরেই প্রতিযোগিতার চাপে যদুবংশের নারীরা তিন-

চারটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তর দিকে ঘন বন, সেদিকে যারা যেতো তাদের প্রধান রত্না।

বনের মধ্যে কাঠুরিয়ারা কাঠকুটো ডালপালা দিয়ে ঘর বেঁধে বাস করে, কেউবা স্থায়ী কেউবা সাময়িক। স্থায়ী কুটিরগুলোর কাছে কিছু কিছু শাক-সব্জির গাছ, দু-চারটে গরু-ছাগল, আর স্থায়ী-অস্থায়ী সকল কুটিরেই বড় বড় পোষা বুনো কুকুর। এরাই দিন-রাতের পাহারাদার, বিশেষ করে রাতের। সারাদিন খেটেখুটে কাঠুরের দল সাঁঝ না লাগতেই ঘুমিয়ে পড়ে, বাতি জ্বালাবার কড়ি যোগাবার সাধ্য নেই তাদের। কখনো কোন কাঠুরে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললে শ্বাপদের হাতে প্রাণ হারায়। কিংবা হয়তো আহত অবস্থায় অনেক রাতে ফিরে আসে। এই কাঠুরে পল্লী জরার পরিচিত।

জরা গাছের উপরে থেকে দেখতে পেলো নারীর জনতা সেই পল্লীর দিকে চলেছে, কেন চলেছে বুঝতে পারলো না। চুরি ডাকাতি অবশ্যই নয়। হঠাৎ মশালের আলোয় চোখে পড়লো গাছের নীচে একটা নেকড়ে বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে আছে, তার মনে হল এখনি শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, শিকার কাছেই ছিল। দল ছাড়া একটি মেয়ে বাঘের আওতার মধ্যে। জরা ভাবলো চিৎকার করে মেয়েটিকে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু চিৎকার করবার আগেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটলো। বাঘ ও মেয়েটি মুখোমুখি হল, শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার উল্লাসসূচক লেজ আছড়াতে লাগল বাঘটা, মুখে-চোখে তার কি হিংস্র উল্লাস, মশালের আলোয় সমস্ত দেখা যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাঘটা লেজ গুটিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটে পালালো। জরা ভাবলো, এ কি ব্যাপার, এ কেমন করে সম্ভব হল! নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ শিকার ছেড়ে পালানো তো বাঘের স্বভাব নয়! একবার ভাবলে মশালের আলো দেখে বাঘটা ভড়কে গিয়েছে, কিন্তু তার মনে হল না যে মশালের আলো দেখে নয়, মশালের আলোয় মেয়েটির মুখ দেখে বাঘ ভয় পেতে পারে। কামার্ত নারীর মুখে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার ছাপ যে শ্বাপদের পক্ষেও আতঙ্কের হতে পারে কেমন করে বুঝবে জরা!

বাঘের পলায়নে যখন সে বিস্ময় অনুভব করছে তখন কাঠুরে-পল্লীর দিক থেকে একটা কোলাহল এসে তার কানে ঢুকলো। নারী-জনতার কোলাহল ছিল একতরফা, এখন দোতরফা কোলাহল। ব্যাপার কি? তাকিয়ে দেখে যে ঐ নারীর জনতা কাঠুরেদের কুটিরের উপরে চড়াও হয়েছে। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বড়ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়েছিল জরার, তবে আবার এরা

হতদরিদ্রের উপরে চড়াও হল কেন? মূর্খ জরা কেমন করে বুঝবে যে হতদরিদ্রের কুটিরেও এমন কিছু থাকতে পারে যা রাজরাণীর কাম্য!

বাঘা বাঘা কুকুরগুলো আক্রমণ করছে মেয়েদের কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে নিদ্রিত বা অর্ধজাগ্রত কাঠুরেদের টেনে বের করে আনছে, কাঠুরে রমণীরা লাঠিসোঁটা দিয়ে দমাদম পিটোচ্ছে আততায়িনীদের, কুকুরগুলো কামড়ে তুলে নিচ্ছে গায়ের মাংস, কিন্তু হুঁশ নেই নির্লজ্জাদের। পাঁচ-সাতজনে ধরে বাইরে আনছে একটি পুরুষকে, অমনি তাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কাড়াকাড়ি, যারা আদৌ পায়নি তারা এসে জুটছে, তখন কাড়াকাড়ি তীব্রতর হয়ে উঠছে। মশালের আলোর আভায় সে দেখতে পেলো অন্যদের অনবধানতার সুযোগে একটি মেয়ে একটা কাঠুরেকে কিছু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। অমনি বিশ-পঁচিশজন ছুটলো সেদিকে, সবাই মিলে মেয়েটাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে পুরুষটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এমন অবস্থায় আপসে ভাগাভাগি হয় না, কেউ কারো অংশ ছাড়তে রাজী নয়, ফলে বিশ-পঁচিশজনের টানাটানিতে পুরুষটি ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। যার ভাগে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পড়লো তাই নিয়ে মেয়েদের কি উল্লাস! এদিকে কুকুরে কামড়ে খণ্ড খণ্ড মাংস তুলে নিচ্ছে, কাঠুরে রমণীরা লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, মাথা থেকে রক্ত ঝরছে, শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, তবু কারো হাত থেকে স্খলিত হচ্ছে না দেহখণ্ড, পালাবার কথা মনেই আসছে না, রক্তাপ্লুত দেহে উন্মাদিনীদের সে কী কামনৃত্য!

এতক্ষণে জরা বুঝতে পারলো কেন মদিরা তাকে নারীবেশ পরতে পরামর্শ দিয়েছিল, কেন তাকে বনের দিকে যেতে বাধ্য করেছিল। তার মনে হল পুরুষ-সন্ধানে এই উন্মাদিনীগণ নিশ্চয় মদিরার ঘরে হানা দেয়, তবে যে তারা বনের দিকেও যায় এ বোধ করি মদিরার জানা নেই, নইলে এদিকে আসতে পরামর্শ কেন? জনপদের সঙ্কটে লোক বনে পালায়, এখন দেখল বনের সঙ্কটও কম নয়। তবে তো আর পালানোর জায়গা রইলো না। এতক্ষণ প্রত্যক্ষ ঘটনার ভয়াবহতায় চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে ছিল, এবারে আতঙ্কে শরীর অসাড় হবার উপক্রম হল। সে কোনমতে গাছের ডাল আঁকড়ে কাঠুরে পল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। নূতন আর দেখবে কি। সেই একই দৃশ্যের পুনরাবর্তন।

একদিকে কামোন্মাদিনী নারীর দল, অন্যদিকে কাঠুরে রমণী ও শিকারী কুকুর। পুরুষ! হ্যাঁ, আছে বইকি। তাদের কতক ছিন্নভিন্ন দেহ হয়ে মৃত, কতক অর্ধমৃত, কতক পলায়িত। পলায়নপর পুরুষকে দেখলেই শতাধিক

প্রতিযোগিনী গিয়ে পাকড়াও করে তাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতৃপ্ত কামপ্রয়াস ঘোষণা করে, তারা ধাবিত হয় অন্য একজন পলায়ন-পরের পিছে। কতক্ষণ যে চলল এই নিষ্ঠুর কাণ্ড তার হুঁশ নেই, হঠাৎ এক-সময়ে দেখল যে কাঠুরে-পল্লী জ্বলছে। নারীদের মৃগয়া শেষ হয়েছে, এবারে ফিরবার আগে মশাল দিয়ে জ্বালিয়ে দিল ঘরগুলো। কাঠকুটোর ঘর-বাড়ি এক আধ দণ্ডের মধ্যেই জ্বলে পুড়ে নিভে শেষ হয়ে গেল। নারীরা ফিরে চলল নগরের দিকে। কাঠুরে নারীরা শিশুদের হাত ধরে পালালো গভীরতর অরণ্যের দিকে।

জরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো গাছের উপরে, যখন দেখল যে কেউ কোথাও নেই, আর কারো আসবার সম্ভাবনাও নেই, তখন সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামলো, ভাবলো দেখাই যাক কটা মরলো, কটা আধমরা হয়ে রইলো। খানিকটা অগ্রসর হতেই চমকে উঠল জরা। এই বিজন অরণ্যে, গভীর রাত্রে, সদ্য শ্মশানে হাসে কে!

কঠিন কর্কশ হাসির গমক অন্ধকারের আবলুশ কাঠকে করাত দিয়ে চিরছে, অন্ধকারও অটল, সে হাসিও থামে না। বনের ভাবগতিক জরার অজানা থাকবার কথা নয়, তার সম্বিৎ হল, বুঝলো ওটা হাসি নয়, খট্টাসের ডাক। মনে মনে বলল, তাই বলো খট্টাস।

শেষের শব্দটি হয়তো জোরে বলেছিল, অমনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে শুনতে পেলো, ঠিক ধরেছ, খট্টাসই বটে, ওটাই আমার নামে দাঁড়িয়েছে।

এবারে সত্যি সত্যিই ভয় পেলো জরা, শুষ্ক কণ্ঠে শুধালো, তুমি কে?

আবার সেই করাতে কাটচেরা শব্দ। জরা ভাবে, ইস, কি কর্কশ, কঠিন! শুধায়—কে তুমি?

ঐ তো নিজেই বললে খট্টাস।

ও তো নাম হল, পরিচয়টা কি?

এই ঘোর অন্ধকারে পরিচয় দেব কিভাবে, আলো থাকলে পরিচয় পেতে।

আমার পরিচয় তো অন্ধকারেই পেলে।

না, তখনো অন্ধকার হয়নি, মদিরার ঘর থেকে বের হওয়ার পরেই তোমার পিছু পিছু আছি।

কেন বলো তো?

তোমাকে বড় দরকার।

আমাকে দরকার! এমন কথা তো এই প্রথম শুনলাম!

এখনো কিছুই শোনোনি।

তবে না হয় খুলেই বলো। কিন্তু তার আগে বলো তো কি কাণ্ডখানা হয়ে গেল!

এর মধ্যে আর বলাবলির কি আছে। চোখেই তো সব দেখলে।

দেখলাম তো, বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে পারলে না তবে গাছে উঠেছিলে কেন? ঘাগরা কাঁচুলি পরেছিলে কেন?

নইলে যে প্রাণে মারা যেতাম।

তবে আর বুঝবার বাকি রইলো কি?

সবই। এরা কারা? এদের ঘরে কি পুরুষ নেই, এদের মনে কি লজ্জাশরম নেই, দয়ামায়া নেই, এদের কি শাসন করবার কেউ নেই?

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলে, কোন্‌টার উত্তর দেব?

সবগুলোই দাও, একে একে দাও।

সেই ভালো। এরা যদুবংশের নারী।

তার মানে রাজবংশের বউ!

চমকালে কেন? বউ আছে, মেয়ে আছে, সব রকম আছে।

স্বামী-পুত্র তো আছে!

ছিল, এখন নেই।

তার মানে?

বনে বনে পশু শিকার করে ফেরো, এদিকের খবর কিছুই রাখো না দেখি। যদুবংশের পুরুষগুলো সব হানাহানি করে মরেছে, থাকবার মধ্যে আছে উগ্রসেন, বসুদেবদের মতো কতকগুলো বুড়ো আর সত্যভামা রুক্মিণীদের মতো কতকগুলো বুড়ী, আর আছে হামাহাঁটা শিশু। সমর্থ পুরুষ বলতে কেউ নেই যদুকুলে।

তাই বলে এই রকম ব্যবহার করতে হবে!

নাও, শোন একবার কথা। সমর্থ পুরুষ না থাকলে সমর্থ নারীর চলে কি করে!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ যে পশুর মতো কাণ্ড।

আরে মূর্খ, এক জায়গায় যে পশু আর রাজবংশের মেয়ে সমান। শোননি, নীতিবাগীশরা বলাৎকারকে ঘুরিয়ে পাশবিক অত্যাচার বলে।

বলে নাকি?

তাই তো, তুমি জানবে কি করে।

তাই বলে এমন কাণ্ড! বনে থেকেও মানুষের স্বস্তি নেই!

আরে গণ্ডমূর্খ, মানুষ যখন পশুর ভূমিকা নেয় তখন বন ছাড়া আর কোথায় যাবে!

এবারে দেখছি বন ছাড়তে হবে।

বন ছেড়ে কোথায় যাবে শুনি, গিয়েছিলে তো মদিরাদের পাড়ায়, পালালে কেন?

তবে দেশান্তরী হব।

কোন্ দেশে যাবে? সব জায়গাতেই এই কাণ্ড চলেছে। শোননি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী পুরুষ মরেছে, তাদের আঠারো অক্ষৌহিণী স্ত্রী কি করছে? যদুবংশেও যা কুরুবংশেও তাই, কাশী কাঞ্চী মদ্র পাঞ্চাল অঙ্গবঙ্গ প্রাগ্‌জ্যোতিষ সর্বত্র তাই, সমস্ত দেশ আজ অকাল বৈধব্যের কামনার তাপে তপ্ত বালু-খোলা হয়ে আছে। যাও না, পা ফুটে খই হয়ে যাবে।

ভাই খট্টাস, তুমি এত কথা জানলে কি করে? শিরোমণি মশায়ের টোলে তো কখনো দেখিনি তোমাকে!

কাঠচেরা হাসি ওঠে। চমকে ওঠে জরা, এখনো হাসিটায় সে অভ্যস্ত হয়নি, বলে, ঐ হাসিটা থামাও, ও যেন করাত দিয়ে কাঠ চেরার শব্দ।

তাতে ভয় কি তোমার! তোমার বুক তো কাঠের নয়।

এমন হাসি তো মানুষকে হাসতে শুনিনি।

আমি যে মানুষ জানলে কি করে? অন্ধকার একটু ফিকে হোক, চোখে দেখলেই আর ব্যাখ্যার দরকার হবে না।

ততক্ষণ না হয় আগের প্রশ্নটার উত্তর দাও। তোমাকে তো আমার মতো মুখ্যু-সুখ্যু লোক মনে হয় না। এত কথা শিখলে কোথায়?

সব বলবো, সব বলবো, আঁটি ভেঙে শাঁস অবধি বলবো, কিছু বাদ যাবে না। তবে তোমাকে ছাড়ছি নে।

আমাকে কি এমন দরকার? দেখছই তো আমি তোমার মতো পণ্ডিত নই।

তবে টোলে দেখা হবে বলছিলে কেন?

টোলে কি শুধু পোড়োরাই যায়! আমি সেখানে মধু যোগাই।

মধু না মদ! সেই মধু খেয়ে টোলের পোড়ো বুঝি টলে পড়ে।

নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে খট্টাস, খ্যাক, খ্যাক, খ্যাক!

ঐ হাসিটা বরদাস্ত করতে পারে না জরা, ভাবে কাজের চাপে না রাখলে লোকটা হাসতেই থাকবে, কাজের প্রস্তাব করে বলে, চলো না এগিয়ে দেখি,

কাঠুরেদের কি অবস্থা হল।

ও আমার খুব দেখা আছে, তুমি দেখো গে।

কবে দেখলে ?

প্রত্যেক রাতে দেখছি।

বলো কি, চমকে শুধায় জরা, তোমাকে ওরা দেখতে পায় না!

খুব পায়।

তবে যে পাকড়াও করে না বড়!

সে গুড়ে বালি, সে গুড়ে বালি—বলে হেসে ওঠে খট্টাস।

ভাই খট্টাস, হাসিটা কমিয়ে কথায় ভাগ বাড়াতে পারো না ? খুলেই বলো না কি বলতে চাও ?

ওরা জানে আমাকে দিয়ে ওদের কাজ চলবে না—তা না হলে কি ছেড়ে দিত ?

তার মানে ?

তার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, আমি হিজড়ে। খ্যাক, খ্যাক, খ্যাক।

কি বললে ?

বললাম, হিজড়ে হিজড়ে হিজড়ে, বুঝলে!

নিজের মুখে স্বীকার করলে! তুমি কি মানুষ ?

ও গুণটা না থাকলে যদি মানুষ না হয় তবে মানুষ নই।

তাই বলে নিজে বলে বেড়াবে!

না বলে আর করি কি, হাটের মধ্যে যে হাঁড়ি ভেঙে গিয়েছে। দেখো না, যদুবংশের মাগীগুলোকে দেখলে পুরুষে পথ ছেড়ে দিয়ে পালায় আর সেই মাগীগুলো আমাকে সম্মুখে দেখলে অযাত্রা মনে করে পথ ছেড়ে দেয়। তাতেই ওদের কাছাকাছি থেকেও বেঁচে রয়েছি। তোমাকে দেখতে পেলে প্রাণটা যেতো।

তা হোক বাপু, আমার গা কেমন ঘিন-ঘিন করছে, আমি চললাম।

চলবে কোথায় চাঁদ, এতক্ষণ যে তোমার সঙ্গে আনন্দ করলাম তা কি যেতে দেওয়ার জন্যে ? না সেই সন্ধ্যাবেলা থেকে যে তোমাকে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি শুধু দুটো বিশ্রম্ভালাপ করবার জন্যে!

কেন, আমাকে এখন দরকার কিসের ?

বলো কি! তুমি যে কাজ করেছ তা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জুন কেউ করতে পারেনি, তোমার নাম যে সোনার অক্ষরে পুথির পাতায় লেখা থাকবে।

কি যত সব বাজে বকছ ?

এতক্ষণ তাই বলছিলাম বটে, এবারে তবে আসল কথায় আসি।

এই বলে খট্টাস ট্যাঁক থেকে একটা পাথর বের করলো, নিশান্তের অন্ধকারের মধ্যেও তার দ্যুতি কারো চোখ এড়ালো না।

চমকে উঠলো জরা। বলল, কোথায় পেলে পাথরটা!

তবেই দেখো ঠিক লোককে ধরেছি কিনা, সাধে কি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে?

গর্জে উঠে জরা শুধালো, কোথায় পেলে পাথরটা?

নির্বিকারভাবে খট্টাস বলল, যেখানে তুমি দেখেছিলে।

আমি কোথাও দেখিনি।

বটে! তবে চমকে উঠলে কেন?

সোজাসুজি বলো না, কোথায় পেলে।

যে লোকটাকে খুন করেছিলে তার গলায়।

দোষ অস্বীকার করবার ভঙ্গীতে জরা বলল, কাকে খুন করলাম আমি?

বাসুদেবকে। এবারে হল তো। আরও বলবো? বাসুদেবকে খুন করবার পরে বুঝতে পারোনি লোকটা কে? তাই গিয়েছিলে গিন্নীকে ডাকতে। বুদ্ধি যোগাবার উদ্দেশ্যে যে পুরুষ গিন্নীকে ডাকে, সে তো হিজড়েরও অধম।

ওসব থাক, যা বলছিলে বলো। ভেক যেমনভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সাপের দিকে তেমনি অসহায়ভাবে জরার দৃষ্টি নিবদ্ধ খট্টাসের মুখে।

তুমি গিয়েছ তখন জরতীর সন্ধানে। আমি হঠাৎ এসে পড়ে দেখলাম, বা বা, এ কাজটি করলো কোন্ বীরপুরুষ। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম বাসুদেব ভিরকুটি মেরে পড়ে আছে, ওর আবার নানা রকম ঢঙ কিনা! কিন্তু না, বেটা মরেছে, আগাগোড়া মরেছে, ষোল আনা মরেছে, পায়ের পাতা থেকে মাথার ব্রহ্মতালু অবধি মরেছে সন্দেহ নেই। বাব্বা, বাঁচা গেল। সেদিন গিয়েছে ধলাটা, আজ গেল কালাটা। বাঃ বাঃ! কিন্তু এমন কাজটি করলে কোন্ বাপের সুপুত্তুর! এই সব কথা ভাবছি এমন সময়ে বুকের উপরে চকচক করে উঠল পাথরটা। তখনি নিয়ে ট্যাঁকে পুরলাম, বেটা গিয়েছে, কিছু চিহ্ন রেখে দিলাম। এমন সময়ে তোমরা দুজনে গুটিগুটি এসে উপস্থিত হলে। কি স্যাঙাৎ, মনে পড়চে!

দেখো দেখো, মাটি কাঁপছে, ভুঁইদোল শুরু হয়েছে—আর দেখতে পাচ্ছ না চাঁদের ঐ কোণাটায় গেরণের ছায়া পড়েছে!

ভয় নেই জরা, ও ভুঁইদোলও নয়, গেরণের ছায়াও নয়, সমস্ত মনের ভয়।

মনের ভয় !

মনের ভয় বইকি ! পাপের শুরুতে ওরকম হয়ে থাকে, আমারও হয়েছে। আর খানিকটা এগিয়ে গেলে ঠিক উল্টো মনে হবে।

উল্টো আবার কি রকম ?

তখন গেরণের চাঁদকে মনে হবে পূর্ণিমার চাঁদ আর সত্যিকার ভুঁইদোলকে মনে হবে অচলা অটলা পৃথিবী। কেমন, ভাষা শুনে বুঝতে পারছ যে টোলে পড়েছি।

খট্টাসের কথায় জরা কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করলো না, বরঞ্চ তার ত্রাস যেন বৃদ্ধি পেলো। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, পালাও পালাও, ঐ শুনছ না গর্জন ! হাজার হাজার ডাকিনী তাড়া করে আসছে—এই বলে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু তার আগেই খট্টাস ধরে ফেলেছে তার হাত, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে আমার বড় দরকার।

আমাকে দিয়ে এ সংসারে কারো কিছু দরকার নেই, আমি মুখ্যুসুখ্যু ব্যাধের ছেলে। আমাকে ছেড়ে দাও।

তবে শোনো, তুমি ব্যাধের ছেলে নও, তুমি রাজপুত্র।

এখন রহস্য ভালো লাগে না।

রহস্য নয়, জরা, কিংবা রহস্যই বটে। তুমি ব্যাধপুত্র নও, তুমি রাজপুত্র।

কার পুত্র বললে ?

রাজপুত্র। যেমন বাসুদেব রাজপুত্র, বলভদ্র রাজপুত্র, তেমনি রাজপুত্র তুমি।

জরার মুখের দিকে তাকিয়ে খট্টাস বলে উঠল, কি, বিশ্বাস হচ্ছে না! না হওয়ারই কথা বটে। সমস্ত খুলে বলছি। চলো, আমার বাড়িতে চলো, এদিকেও ভোর হয়ে এল।

॥ ৯ ॥

কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা।

রাজপুরীর মণিকুট্টিম নামে প্রাসাদের অলিন্দে সন্ধ্যাবেলায় বসুদেব অহিফেন-নেশায় বিভোর হয়ে একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। একাকী তবু একা নয়, যেহেতু নেশার ঝোঁকে নিজেই পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ করছিলেন, যুক্তিতে ফাঁক ছিল না, তবে মাঝে মাঝে বাক্যে যে ফাঁক পড়ছিল সেটা অহিফেন প্রসাদাৎ।

মদ্যপান অতিশয় কদাচার। আর তাইতেই তো রাজার নিষেধ। ধন্য ধন্য

রাজা। (হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়লেন) কিন্তু অহিফেনের উপর রাজার দৃষ্টি পড়েনি তাই রক্ষে (আবার ঝিমকানি)। সৃষ্টির আদিতে কারণ সমুদ্র, তারপরে পৃথিবী, আগে মত্ত তারপরে—হ্যাঁ, তুমি কে?

চমকিয়ে উঠলেন বসুদেব। চমকাবার হেতু এই যে এ সময়টিতে কারো আসবার আদেশ ছিল না তাঁর কাছে। সঙ্গদোষে অহিফেন নেশার তাল কেটে যায়, অহিফেনী চিরনিঃসঙ্গ।

কে, কে তুমি?

আমি তারা।

তারা তো সাতাশটি, তার মধ্যে কোন্‌টি?

আমি আকাশের তারা নই।

তবে কি উদারা মুদারা তারা?

আহা সে তারাও নই।

তবে কোন্ তারা তাড়াতাড়ি বলে ফেল, সময় নষ্ট করো না।

একদিন তো আমি এলে সময় নষ্ট হতো না।

তখন তো চাঁদ অহিফেন ধরিনি, তাই বৃথা অনেক সময় নষ্ট করেছি। শীগগির বল কে তুমি?

চিনতে না পারলে আর বলে কি লাভ? এবারে বক্তার গলা ধরা-ধরা।

দেখো বাপু, সত্যি কথা বলতে কি, এই সময়টিতে কেউ আমার নয় আর আমি কারো নই।

অন্য সময়ে যে আসতে দেয় না প্রহরী।

এখন এলে কি করে?

প্রহরীও যে অহিফেনের নেশায় ঢুলছে।

বাহবা, বাহবা, প্রহরীর বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। তা যখন এসেই পড়েছ আর গোলমাল করে নেশাটাও ফিকে করে এনেছ, তখন বলেই ফেলো ব্যাপার কি?

চিনতে না পারলে কি বলবো! একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে ক্ষতি কি?

এতক্ষণ পরে বসুদেব জ্ঞানচক্ষু ষোল আনা উন্মীলিত করে তাকালেন এবং তাকিয়েই বলে উঠলেন, ও, তুমি তারা! তা এতক্ষণ বলোনি কেন? বসো, বসো।

না, বসবো না, দাঁড়িয়েই বলে যাই যা বলতে এসেছিলাম।

আবার কি হল?

নতুন কিছু হয়নি, যা হওয়ার তা অনেক আগেই হয়েছে।

তবু শুনি।

আমার জরার কি করলে শুনি?

ছেলেটার নাম জরা রেখেছ নাকি? তা বয়েস কত হল?

এইবার অগ্রাণে চার বছর পূর্ণ হবে।

বলো কি, এরই মধ্যে চার বছর হয়ে গেল?

তা হবে না! বয়স তো বাড়ে বই কমে না।

সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

আপনিই তো আনতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

তা বটে! সব কথা আবার মনে থাকে না।

সে কি রাজার ছেলে হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে?

আরে রাজার ছেলেরাই তো বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। শোননি, পাণ্ডু রাজার ছেলেরা বারো বারো চব্বিশ বছর বনে বনে ঘুরে বেড়ালো, আজই না হয় রাজগী পেয়েছে।

তাদের সবাই রাজার ছেলে বলে জানতো, তাই বনেও খাতির ছিল, আমার জরাকে তো জানে কাঙালের ছেলে বলে।

সময় হলেই জানবে, শুধু রাজার ছেলে বলে নয়, একেবারে রাজা বলে। ও হবে নিষাদদের রাজা।

অর্থাৎ ব্যাধ-চোয়াড়দের রাজা। এ কি একটা বিচার হল? বাসুদেবের মতো জরাও তো আপনার পুত্র, তবে দুয়ে এমন প্রভেদ কেন?*

তারা অনেক আশা করে এসেছিল, এখন বসুদেবের শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্য শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। আজ তার সমস্ত আশার সমাধি। অনেক দিন অনেক বার জরার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিনতি করবার উদ্দেশ্যে সে বসুদেবের কাছে এসেছে, প্রত্যেকবার হবে হবে, ব্যবস্থা করে দেব শুনেছে। আজ সেটুকু ভরসাও অন্তর্হিত হল।

যুবতী তারা রাজবাড়ির দাসী ছিল। বর্ণে সে শূদ্রাণী! তার গর্ভে বসুদেবের ঔরসে একটি পুত্রের জন্ম হয়, সে আজ চার বছর আগেকার কথা। কাজেই শিশুটি বাসুদেবের বৈমাত্র ভাই। শিশুটির জন্মের পরে বসুদেব তার মাকে বোঝায়

---

* শূদ্রাণী স্ত্রীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জরার জন্ম। হরিবংশ। ২।১০৩।২৭

তার আর রাজবাড়িতে না থাকাই উচিত, লোকে তাকে দাসী মনে করবে অথচ সে রাজপুত্রের মাতা। আবার ছেলেটি বড় হলে লোকে তাকে দাসীপুত্র মনে করবে অথচ সে বাসুদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা। অবোধ রমণী সহজেই এই স্তোকবাক্য বিশ্বাস করে। বিশেষ তার মনে আত্মসম্মানবোধ কিছু প্রবল হওয়াতে সে এভাবে রাজবাড়িতে বাস করতে অসম্মত হয়ে নগরের বাইরে বনের ধারে কুটিরে বাস করতে থাকে।

সে মাঝে মাঝে গোপনে এসে বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুত্রের জন্য এক-খানি গ্রাম ভিক্ষা করতো, আর রাজারাজড়াদের অভ্যস্ত রীতিতে একখানি গ্রামের বদলে পঞ্চগ্রাম দানের প্রতিশ্রুতি পেতো। যতই দিন যেতে লাগলো তারার আশা-ভরসা ততই ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করে নেবার আশায় এসেছিল, কিন্তু যা শুনলো তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আর উপায় রইলো না।

তারা বসুদেবের উপরে ভরসা করে বসে না থেকে পুত্রকে সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করতে লাগলো। সাধ্যের মধ্যে বন থেকে কাটকুটো কুড়িয়ে বিক্রয়, ফলমূল আর শাকসব্জি দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি। তবে সে একটি কাজ করলো, জরাকে ছেলেবেলা থেকেই তীর-ধনুক চালনা করতে উৎসাহিত করলো, ভাবলো আর কিছু না হোক ব্যাধবৃত্তি করে জীবিকার্জন করতে পারবে। ব্যাধের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্রমে শিকারে তার হাত পাকা হয়ে উঠল।

মাঝে মাঝে পুত্র জিজ্ঞাসা করতো, মা, আমার বাবা কোথায়?

মা হাত দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিত। পুত্র কি বুঝতো জানি না। মা কেন আকাশের দিকে দেখাতো তাও জানি নে, হয়তো আকাশস্পর্শী রাজবাড়ির অট্টালিকার কথা তার মনে পড়তো।

আজ রাজবাড়ি থেকে ফিরে এসে বুঝলো বসুদেবের আশা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য—তখন সে জরাকে রীতিমতো নিপুণ ব্যাধ করে তোলবার দিকে মন দিল। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে বসুদেবের উক্তি তার মনকে প্রভাবিত করেছিল, জরা হবে নিষাদদের রাজা। তবে সেই রাজগীর দীক্ষাই তাকে দেওয়া যাক না কেন।

বছর পনেরো-ষোল বয়সেই জরা রীতিমতো পাকা তীরন্দাজ হয়ে উঠল, বাঘ ভালুক বরাহ এক তীরের ঘায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতো সে। তার বীরত্বের খ্যাতি এমন ছড়িয়ে পড়লো—রাজ্যের ব্যাধের ছেলেরা এসে তার নেতৃত্ব মেনে নিল। তারা মাঝে মাঝে ভাবতো হয়তো বসুদেবের কথাই সত্য হতে চলল, কালক্রমে সে ব্যাধদের রাজা হয়ে উঠবে। এই সময় একটি শূদ্রাণী কন্যার সঙ্গে

জরার বিবাহ দিল তারা। বিবাহের কিছুদিন পরে তারার মৃত্যু হল। জরা খুব কাঁদলো, তারপরে মায়ের সৎকার করলো, আর তারপরেই দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়লো শিকারে।

॥ ১০ ॥

কি, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলে কেন?

জরা নিরুত্তর।

কি হল, কথা বলো না কেন? এত বড় একটা সুসংবাদ শুনিয়ে দিলাম, একেবারে ব্যাধের পুত্র থেকে রাজপুত্র হলে, কোথায় মিষ্টান্ন খাওয়াবে তা নয় যেন শূলদণ্ডের কথা শুনলে। নাও ওঠো—ওই বলে খট্টাস হাত ধরে টানলো জরার।

জরা উঠবার কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করলো না।

তবে বসে থাকো, আমি চললাম।

এবারে জরা মুখ তুললো, সেই আবছায়া অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না, দেখা গেলে মনে হত এক দণ্ডের মধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে তার মুখের উপর দিয়ে, পাকা ইমারত ধসে পড়ে গিয়েছে।

কি সংবাদই না শোনালে! আমি শেষে কিনা ভাইকে হত্যা করলাম!

এই কথা শুনে খট্টাশ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু অবসর পেলো না, জরা বলে চলল, বাসুদেব আমার ভাই, আমি বাসুদেবের ভাই, তাকে কিনা শেষে বধ করলাম! এই বলে কপালে করাঘাত করতে লাগলো।

কেন, তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? যদুবংশের দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকতেও অনুতাপ করছ?

কি দৃষ্টান্ত?

কি দৃষ্টান্ত শুধাচ্ছো? ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে, জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে হত্যা করেছে, যে যাকে সম্মুখে পেয়েছে হত্যা করেছে। রক্তের স্রোত নীল সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। আরও শুনতে চাও? ঐ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী লোক হানাহানি করে মরলো তারা কি ভাই-বন্ধু বিচার করেছে? আর ঐ যে বাসুদেবের হত্যা তোমার প্রাণে এমন বেজেছে, সেই বাসুদেবই তো এই হত্যার প্ররোচনাদাতা।

বাসুদেব প্ররোচনাদাতা!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। বাসুদেব বলো বাসুদেব, কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ, ভক্তির মাত্রা আর

এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে ইচ্ছা করলে বলতে পারো শ্রীকৃষ্ণ। সেই বেটাই তো সব নষ্টের গোড়া।

কিছু বুঝতে না পেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে জরা।

অর্জুনের সারথি হয়ে বসুদেবের বেটা যখন রথ স্থাপন করলো কুরু-সৈন্যের সম্মুখে, তখন অর্জুন বলে উঠল, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এদের মারতে হবে! এরা যে সবাই ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, শালা-সম্বন্ধী। না বাসুদেব, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। তখন বাসুদেব কি বলল জানো?

জরা মূঢ়ের মতো শুধায়, কি বলল?

বলল, কর্তব্যের অনুরোধে ধর্মের অনুরোধে যুদ্ধ করো, মরলে তোমার কোন গ্লানি নেই। এরকম যুদ্ধ করাই ধর্ম, না করাই অধর্ম। বুঝলে?

না, বুঝলাম না। সেটা হল লড়াই, আর এটা চোরের মতো লুকিয়ে মারা, জন্তু-জানোয়ার মনে করে মারা, এ হলো গিয়ে—

দাঁড়াও, আগে ঐ কথা দুটোর জবাব দিয়ে নিই। অক্ষৌহিণী সৈন্য মুখোমুখি না হলে বুঝি লড়াই হয় না? তবে দ্বৈরথ যুদ্ধটা কি? আর চোরের মতো লুকিয়ে মারা—জয়দ্রথকে কিভাবে মারা হয়েছিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে কিভাবে মারা হয়েছিল? অশ্বত্থামা যে ঘুমন্ত বালকদের হত্যা করেছিল—এসব তবে কি! ভাই জরা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আদ্যন্ত বিবরণ জানলে কোন হত্যায় আর মনে গ্লানি হয় না।

সব তো বুঝলাম কিন্তু মন যে মানে না।

তবে মনটা তোমার হাতছাড়া হয়েছে বুঝতে হবে। এর আগে কি কখনো মানুষ মারোনি?

মেরেছি বইকি।

তবে?

তারা তো ভাই নয়।

আবার ভাই! শুনলে তো ভাইকে মারাই সব মারার সেরা। নিজের ভাইকে না মেরে পরের ভাইকে মারলে বুঝি বীরত্ব হতো! আরে ছোঃ ছোঃ, সে তো ব্যাধ-চোয়াড়ের কাজ।

আমি ব্যাধ ছাড়া আর কি?

এতক্ষণ তবে তোমাকে কি শোনালাম, তুমি ব্যাধ নও, চোয়াড় নও, তুমি রাজপুত্র, তুমি বসুদেবের পুত্র বাসুদেবের ভাই। বংশে, রক্তে, জাতিতে তোমার জুড়ি নেই ভূ-ভারতে।

কিন্তু পৃথিবী যে কেঁপে উঠেছিল, চাঁদে যে গেরণ লেগেছিল, সমুদ্র যে গর্জে উঠেছিল!

ওসব কিছুই হয়নি, শুধু তোমার মনটায় ভয়ে ছোবল মেরেছিল।

তাই বা হবে কেন?

আর যাতে না হয় তারই ব্যবস্থা করবার জন্যেই তো পাকড়াও করেছি তোমাকে।

কি করবে আমাকে দিয়ে?

অনেক কাজ, মস্ত কাজ।

আমি করবো মস্ত কাজ!

হ্যাঁ তুমি করবে, তুমিই করবে, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সে-কাজ হবে না।

আমি একা?

একা নও, হাজার হাজার লোক আছে।

তবে আবার আমাকে কেন?

তোমাকে এইজন্যে যে তোমার কপালে রাজটীকা আছে, তোমার দেহে রাজরক্ত আছে, তুমি রাজপুত্র। চলো, আর দেরি নয়।

তার আগে একটা কাজ সেরে আসতে হবে।

আবার কি এমন কাজ পড়লো?

আমার স্ত্রী মরে পড়ে আছে।

কোথায়?

বাসুদেবের পায়ের কাছে।

মারলো কে?

যন্ত্রচালিতবৎ জরা বলল, আমিই মেরেছি।

বাহবা বাহবা—বলে লাফিয়ে উঠল থট্রাস। বলল, যদুবংশ যা পারেনি, কুরুপাণ্ডব যা পারেনি—তুমি সেই কাজ করেছ। তোমাকে কিছুতেই ছাড়া হচ্ছে না।

তারপরে কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা নামিয়ে এনে শুধালো, সে বুঝি বাসুদেবকে রক্ষা করতে গিয়েছিল?

না, বাসুদেব আগেই মারা গিয়েছিল। জরতী ধিক্কার দিয়েছিল আমাকে।

ধিক্কার দিয়েছিল তোমাকে! এমন স্ত্রীকে মারাই ধর্ম, না মারাই অধর্ম। তবে সে কি আর এতক্ষণে পড়ে আছে, শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী-হত্যায় যার হাত কাঁপেনি সেই স্ত্রীর দেহটা শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়েছে শুনে শিউরে উঠল জরা, বলে ফেলল, না না, তা কি করে হবে!

পত্নীর দেহটার উপরে স্বামীর নিঃসপত্ন অধিকার, সেই দেহে শিয়াল-কুকুরের হস্তক্ষেপ জরার মতো পাষণ্ড স্বামীর পক্ষেও দুঃসহ।

খট্টাস বলল, যাও, শীগগির ফিরে এসো।

জরা রওনা হতে যাবে এমন সময়ে খট্টাসের মুখের দিকে তাকালো। তখন ভোরের আলো ফুটে ওঠায় সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। জরা যে-মুখ দেখল সে অতি ভয়ঙ্কর। চোখ দুটো বিপর্যয় টেরা, বাঁ দিকের চোয়াল বিষম বাঁকা, দাঁত কতক আছে কতক নেই। সমস্ত মুখমণ্ডল যেন ভূকম্পনে বিপর্যস্ত, কেবল উদ্ধত নাসিকা ও সুদৃঢ় চিবুক এই দুটো আজ যেন আত্মরক্ষা করে সগৌরবে দণ্ডায়মান। গায়ের রঙ মরচে-পড়া লোহার মতো, দেখলে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। আর হাসিটা, জরার বিস্ময় দেখে একবার হেসেছিল লোকটা, অতিশয় মারাত্মক, সেই বিশদৃশ হাসির আভায় সমস্ত মুখখানা অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

জরা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, জরতীর দেহটা কোথাও নেই। আর বাসুদেবের দেহের শেষ চিহ্ন দগ্ধকাষ্ঠে ও নির্বাপিত অঙ্গারে তরঙ্গিত হচ্ছে সমুদ্রের সাদা ফেনায় ও মন্থর তরঙ্গ-দামে।

॥ ১১ ॥

বাসুদেবের মৃত্যু-সংবাদ লোকমুখে রাজপুরীতে গিয়ে পৌঁছলে রাজপুরুষ ও অমাত্যগণ এসে উপস্থিত হল। বৃদ্ধ, শিশু ও নারী ছাড়া যদুবংশীয় কেউ আর জীবিত ছিল না। যথাসাধ্য সকলে মিলে অন্ত্যেষ্টি সৎকার করলো। বাসুদেবের পত্নীগণের মধ্যে রুক্মিণী ও জাম্ববতী চিতায় আরোহণ করে পতির অনুগমন করলো, সত্যভামা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বনে প্রস্থান করলো। এসব পুরানো কথা, কাজেই আমাদের প্রয়োজন-বহির্ভূত। অন্ত্যেষ্টি সৎকার শেষ হতে হতে রাত শেষ হয়ে এল। সকলে সমুদ্রে স্নান সাঙ্গ করে ফিরে চলে গেল। মৃতপ্রায় জরতীকে কেউ লক্ষ্য করলো না।

উষাকালে সমুদ্রের সঞ্জীবনী বায়ুতে ধীরে ধীরে জরতীর চৈতন্য হতে শুরু করলো, তখনো চৈতন্যের আলো-আঁধারি—পুরো জ্ঞানও নয়, পুরো অজ্ঞানও নয়

এইরকম অবস্থা। হঠাৎ সে অনুভব করলো কেউ যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন এসেছে বুঝবার ক্ষমতা তার ছিল না, সে অসহায়ভাবে যেমন পড়ে ছিল তেমনি পড়ে রইলো।

সদ্য প্রাতঃস্নান সাঙ্গ করে একজন দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি জরতীর কাছে এসে দাঁড়ালো। সে এসেছিল বাসুদেবের অন্ত্যেষ্টি-সৎকারে যোগদানের উদ্দেশ্যে। কাজ শেষ হয়ে গেল, চিতায় এক আঁজলা জল দিয়ে যখন ফিরতে উদ্যত, তখন ঝোপের আড়ালে প্রচ্ছন্নপ্রায় জরতীর দেহে চোখে পড়লো তার। প্রথমে কৌতূহল, দ্বিতীয় মৃতদেহ কার, তারপরে অনুসন্ধিৎসা, এ কি সত্যই মৃত; তারপরে অনুকম্পা—যদি মৃত না হয়, তবে শুশ্রূষা আবশ্যক প্রভৃতি ভাবের প্রেরণায় নত হয়ে মৃতদেহটিকে পর্যবেক্ষণ করলো; বুঝলো, না মৃত নয়, তবে মৃতপ্রায় বটে; শীঘ্র প্রতিকার না হলে মরতে বিলম্ব হবে না। তখন সে উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এসে স্ত্রীলোকটির মাথায় দিল; আর নিকটে অনুসন্ধান করে বনৌষধি তুলে এনে রস নিষ্কাশিত করে তার নাসারন্ধ্রে ও কানের মধ্যে দিল। জরতীর এমনিতেই চৈতন্যোপলব্ধি হচ্ছিল, এখন জলসিঞ্চনে এবং ওষধির সাহায্যে শীঘ্রই পূর্ণজ্ঞান ঘটলো। সে উঠে বসতে চেষ্টা করলে পুরুষটি বাধা দিয়ে বলল, মা. আরও একটু সুস্থ হও, তারপর উঠো।

জরতী বলল, প্রভু, আপনার কৃপায় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি—এই বলে তাঁকে প্রণাম করলো।

পুরুষটি বলল, চলো তোমাকে ঘরে রেখে আসি, তুমি একা যেতে পারবে মনে হয় না।

জরতী বলল, আমার ঘর নেই।

তখন দুজনে নিম্নোক্ত কথোপকথন হল।

তোমাকে তো সধবা বলে মনে হচ্ছে, তোমার স্বামী কোথায়?

প্রভু, আমি হতভাগিনী, আমার স্বামী থেকেও নেই।

তোমার ঘরও নেই, স্বামীও নেই, তুমি এখানে কিভাবে এলে, কেন মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলে, সেসব কথা না হয় পরে শুনবো, এখন আমার ঘরে চলো।

আপনি তো প্রভু, সন্ন্যাসী।

কি করে বুঝলে? ওঃ বুঝেছি, পরনের গেরুয়া কাপড়াখানা দেখে। সাদা ধুতি সমুদ্রের জলে শীঘ্র ময়লা হয়ে যায় বলে স্নানের সময়ে গেরুয়া বসন পরি।

তারপরে একটু হেসে বলল, সংসারের অনেক ময়লা আত্মসাৎ করে গেরুয়ায়। না মা, আমি গৃহী, আর আমার স্ত্রী আছে। চলো, তোমাকে নিয়ে আর

কাছে পৌঁছে দিই, আমার মতোই নিশ্চিন্তে থাকবে।

কিন্তু প্রভু—

ওর মধ্যে কিন্তু নেই মা।

আমি যে নীচ জাত।

আমি তো তা জানতে চাইনি, তাছাড়া বৈতরণী পেরিয়ে গেলে এপারের সমস্ত চিহ্ন তলিয়ে যায়, মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তুমি তো বৈতরণী পেরিয়ে এসেছ।

এসব কথা পুরোপুরি বুঝবার ক্ষমতা জয়তীর ছিল না, মোটের উপরে বুঝলো যে, পুরুষ যিনিই হোন তাঁর দ্বার তার কাছে অবারিত।

এবার জয়তী একটু দ্বিধা করে বলল, আপনার পরিচয় তো জানি না, যদি অনুমতি করেন তবে আপনাকে প্রভু বলেই ডাকবো।

তাছাড়া আর কি বলে ডাকবে! সবাই আমাকে প্রভু বলেই ডাকে, আমার পুরো নাম প্রভুদয়াল।

তারপর হেসে বললেন, দেখো তো, পিতামাতার কি কৃপা, তাঁরা এমন নাম রেখেছিলেন যে কারো উপরে প্রভুত্ব না করেও আমি সকলের প্রভু।

এইভাবে কথোপকথন করতে করতে দুজনে চলছিল, প্রভুদয়াল আগে, জয়তী পিছনে। জয়তী দেখছিল, কি উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, সমস্তটা ঋজু, কোথাও এতটুকু টোল খায়নি। মাথার প্রলম্বিত ঘন চুলে মাঝে মাঝে সাদা কেশ, বার্ধক্য যেন পরোয়ানাখানা সিংহদ্বারে ঝুলিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখনো ভরসা করে প্রবেশ করতে সাহস পাচ্ছে না।

ঐ যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ মা, ওরই কাছে কয়েক ঘর লোকের বসতি, অধিকাংশই জেলে, ঐখানে আমার ঘর।

আমি জানি, ওখানে কখনো-সখনো খরগোশ শিকারে এসেছি।

চমৎকার, শিকার করতেও জানো দেখছি। তবে কি জানো, খরগোশ বড় ভীরু প্রাণী, ওদের শিকার করে আনন্দ নেই।

জয়তীর মুখে প্রায় এসে পড়েছিল যে, বাঘ-ভালুক শিকারের অভ্যাসও তার আছে। কিন্তু ভাবলো, না, একথা স্বীকার করলে আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে কতক্ষণ। তার বদলে সে বলল, না জেনে প্রভু বলে ডেকেছি, এখন জানবার পরে তো আর নাম ধরে ডাকতে পারি না।

বেশ তো, একটা 'জী' যোগ করে প্রভুজী বলো, অনেকেই তাই করে।

ক্রমে তারা পাহাড়তলি গ্রামটার কাছে এসে পড়লো। এখানে সমুদ্রতীর

ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, এক কোটিতে পাহাড়গুলি, বিপরীত কোটিতে জরতীর কুটির। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পাক দিয়ে উঠলো জরতীর বক্ষ-কুহরে।

জরতীকে নিয়ে কুটিরে উপস্থিত হলে প্রভুদয়ালের পত্নী কিছুমাত্র বিস্মিত হল না, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, এসো, মা। যেন এতক্ষণ তার প্রতীক্ষাতেই ছিল।

জরতী আশ্চর্য বোধ করলো, ভাবলো, ইনি কি জানতেন যে আমি আসবো। না শুধিয়ে পারলো না, আপনি কি করে জানলেন যে আমি আসবো?

শোন কথা একবার। এমন তো নিত্য ঘটছে, তাই জানতাম কেউ আসবে।

এমন কি রোজ হচ্ছে?

হচ্ছে বইকি মা! অসহায় স্ত্রী-পুরুষ-শিশুকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন, কুকুর-বেড়াল বাদ যায় না। শুনবে কি মা, একদিন তো একটা খোঁড়া বাঘ নিয়ে এসে হাজির, আমি তো ভয়ে মরি।

প্রভুদয়াল হেসে বলল, সে-সব তালিকা না হয় পরে শুনিয়ো, এখন জরতী-মাকে কিছু খেতে দাও, দেখছ না মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

জরতীকে নিয়ে কুটিরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে সে শুধালো, তা মা, আপনাকে কি বলে ডাকবো?

কাশ্যপের মা বলো, সবাই তাই বলে।

জরতী ভাবলো একবার জিজ্ঞাসা করে, কাশ্যপ কোথায়, তারপর ভাবলো, হয়তো মারা গিয়েছে, জিজ্ঞাসা করলে অকারণে ব্যথা দেওয়া হবে।

তার মুখের ভাব দেখে প্রভুদয়াল বলে উঠলো, কাশ্যপ বলে কেউ নেই, আমরা নিঃসন্তান।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জরতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, তবে!

তবে তো জানি না। অনেককাল আগেকার কথা, জেলেপাড়ার সকলে, কেন জানি না, ঐ নামে ডাকতে শুরু করলো, তারপর থেকে ঐটাই বাহাল হয়ে আছে।

অমনি ডাকতে শুরু করলো বুঝি! সেই যাকে বেড়ালের বাচ্চা বলে এনে-ছিলে, পরে দেখা গেল বাঘের বাচ্চা—তারই তো নাম দেওয়া হয়েছিল কাশ্যপ। তার পর থেকেই আমি কাশ্যপের মা।

সে বাঘটা কোথায় মা?

প্রভুদয়াল বলল, বনের বাঘ বনে গিয়েছে, মাঝ থেকে উনি রয়ে গেলেন কাশ্যপের মা।

কাঙালের মায়ের সঙ্গে কুটিরে প্রবেশ করে জরতী দেখল, হ্যাঁ কুটির বটে, তার নিজের কুটিরকেও হার মানায়। আহা, চালের ছাউনির কি মুন্সীয়ানা। সূর্য দেখা যায় অথচ জল পড়ে না। আর ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তাদের অনুপস্থিতি, গোটা দুই হাঁড়িকুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, সব অভাব পূর্ণ করে দিয়েছে প্রভুদয়ালের পত্নীর মূর্তিটি। সারস পাখীর বুকের পালকের মতো রঙটি, সাদাও নয়, কালোও নয়, স্নিগ্ধ নামে যদি কোন রঙ থাকতো তবে সেই রঙ, দেখলেই মা বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। গলায় তুলসীর মালা, দীর্ঘ-বিলম্বিত চুলের গোড়ায় একটি গেরো, একখানি মোটা বসন, হাতে একখানি লোহার কঙ্কণ ছাড়া সর্বদেহ নিরাভরণ।

জরতীর আহার শেষ হলে দুজনে কুটির থেকে বের হয়ে এলে প্রভুদয়াল বলল, জরতী মা নিশ্চয় ভাবছে এই তো এদের দশা, তার উপরে আবার আমাকে জোটালো, এখন তিনজনেরই না খেয়ে মরতে হবে।

জরতী জিভ কেটে বলল, বাবা, এমন কথা আমার মনেও হয়নি, আপনি আমাকে প্রাণ দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, আর আমি এমন কথা ভাববো! বাবা, আমি পাপী, তবে পাষণ্ড নই।

না মা, তুমি ভাববে কেন? তবে অনেকে ভাবে কিনা। এমন কি আমার অনুগত জেলেদের মধ্যেও অনেকে ভাবে। সেদিন জগন্নাথ বুড়ো বলল, বাবা, এত কষ্ট করো কেন? তোমাকে তো আমাদের রাজা খুব খাতির করেন, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি চেয়ে নাও না কেন?

জরতী বলল, জগন্নাথ তো মিথ্যা বলেনি বাবা, কিছু ব্রহ্মোত্তর থাকলে তো এত কষ্ট হতো না।

কষ্টটা কিসের মা, খাওয়ার পরার এই তো! আমাদের দেখেই বুঝতে পারছ, আমরা অনাহারক্লিষ্ট নই, আর অঙ্গেও বসন আছে। তবে আবার কেন? দেখো মা, শুধু দেহধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, তা জোটাতে কষ্ট হয় না, তার অতিরিক্ত দাবি করলেই গোলমাল শুরু হয়। সংসারে যত হানাহানি রেষারেষি, যত রক্তগঙ্গা, ঐ অতিরিক্তটুকুর দাবি নিয়ে। এই যে এত বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা হয়ে গেল, তার মূলে ঐ অতিরিক্তর দাবি।

জরতী বলল, আপনার কথা শুনে চললে সংসারে তো গরীব থাকে না।

আমি কথা শোনাবার কে, আর আমার কথা শুনেই বা লোকে চলবে কেন? তবে একথা জেনো, কিছু গরীব লোক চিরকাল থাকবে, তবে তাদের সবাই যে ভাঙা কুটিরবাসী তা ভেবো না, সোনার মন্দিরেই গরীব লোকের সংখ্যা বেশি।

সে কি রকম বাবা ?

তবে শোন, তারপরে জনান্তিকে বলল, কাশ্যপের মা, তোমার তো এসব বক্তৃতা অনেকবার শোনা হয়েছে। এখন গৃহকার্য সম্পন্ন করে নাও।

জয়ন্তী ভাবলো, যা গৃহ তার আবার কাজ !

কাশ্যপের মা বলল, তা সত্যি, ও-সব কথা শুনতে শুনতে আমার কানের পোকা মরে গিয়েছে।

মরে যায়নি ব্রাহ্মণী, কানের পোকা মাথায় গিয়ে ঢুকেছে।

এই দম্পতির কথা শুনে জয়ন্তীর বুকের ভিতরে পাক দিয়ে উঠল, আহা, এমনিভাবেই তো তাদের মধ্যেও হাসি-ঠাট্টা চলতো, কালকেও বেঁজিটার চাল-চলন নিয়ে দুজনে অনেক রহস্য চলেছিল। তার পরে হঠাৎ কি হল, সমস্ত উড়েপুড়ে গেল। কোথায় জরা, আর কোথায় আজ সে !

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আবার আরম্ভ করলো প্রভুদয়াল, আমি মাঝে মাঝে রাজা উগ্রসেনকে দর্শন করতে যাই, রাজা আমাকে খুব আদর করেন। বলেন, ঠাকুর, তুমি এলে আনন্দ পাই, কারণ তুমি কখনো কিছু চাও না। অন্য সকলে আসে নানারকম দাবি নিয়ে, তাদের বড় ভয় করি।

আমি বললাম, মহারাজ, আপনার আছে, আপনি দান করবেন বইকি, আপনার কি ভয় করা চলে।

তিনি বললেন, ঠাকুর, দান তো যথাসাধ্য করি, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারি না। এত ব্যয়বাহুল্য হয়ে গিয়েছে যে নিত্য অভাব, নিত্য টানাটানি। তাই যে লোক কিছু চায় না, তাকে দেখলে আপনজন বলে মনে হয়।

ঐ পর্যন্ত বলে একটু থেমে বলল, তবেই তো দেখলে মা, ঐ সোনার সিংহাসনে বসে রাজা উগ্রসেন গরীব, আর পাতার কুঁড়েয় থেকেও আমার অভাব নেই। অভাবের অভাবই ধন।

নাও, অনেক হয়েছে, এখন খেতে হবে না ? ওঠো।

প্রভুদয়াল আহারের উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করলো।

রাত আর কাটতে চায় না জয়ন্তীর। কুটিরের মধ্যে তিনজনে পাশাপাশি ভূমিশয্যায়। ওরা দুজনে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম সুখের পায়রা, সুখীর কাছে আসে, দুঃখীকে তার বড় ভয়।

কি হল জরার, কোথায় গেল সে ! একমুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল। তারও তো জীবিত থাকবার কথা নয় ! জরা গলা টিপে ধরেছিল, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তবে আবার জ্ঞান ফিরে আসতে গেল কেন ! সে কি কেবল জীবনব্যাপী মৃত্যুর

যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে! কুটিরখানাও নেই, দূর থেকে তার আগুনের আভা দেখতে পেয়েছিল। অজ্ঞাতসারে একবার হাতটা যায় গলায়, সেখানে এখনো লেগে আছে জরার আঙুলের বজ্রস্পর্শের দাগ। আজ সারাদিন আঁচল দিয়ে সেটা ঢাকবার চেষ্টা করেছে। প্রভুদয়ালের চোখে পড়েনি, কিন্তু এড়াতে পারেনি কাশ্যপের মায়ের চোখ। অবশ্য মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি সে, তবে তার চোখ বারে বারে জিজ্ঞাসা করেছে—ওটা কিসের দাগ? সে-ও চোখে চোখে উত্তর দিয়েছে, না, ওটা কিছু নয়। কিন্তু স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে! সেই উত্তরে যে সমস্ত ইতিহাস বেরিয়ে পড়বে। আজ সে দিনের মধ্যে অনেকবার ভেবেছে, সব খুলে বলবে প্রভুজীর কাছে, কিন্তু মন সরেনি। কোন্ স্ত্রী প্রকাশ করতে চায় স্বামীর দুর্গতির ইতিহাস! তাছাড়া তাতে বিপদ আছে স্বামীর। বাসুদেবকে হত্যা, বাসুদেব যে স্বয়ং ভগবান!

একবার সুযোগ বুঝে কথাটা পেড়েছিল প্রভুজীর কাছে, বলেছিল, বাবা, ভগবান বাসুদেব অবশেষে দেহত্যাগ করলেন।

প্রভুজী বলেছিল, মা, ভগবানের কি জরা-মৃত্যু আছে?

তবে কেন তিনি গেলেন?

দেখো মা, যাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি নড়ে না, তিনি কেন গেলেন, কেমন করে বুঝবো? একমাত্র তিনিই জানেন।

কিন্তু বাবা, যে লোকটা মারলো তার কি হবে?

রাজার শাসনে কি হবে রাজা জানে। তবে একথা নিশ্চয় ভগবানের বিধান অনুসারে কোন দণ্ডই হবে না।

কেন?

কেন কি, লোকটা তো তাঁরই ইচ্ছায় চালিত হয়ে মেরেছে।

বাবা, বাসুদেব এত বড় বীর, শেষে কিনা তিনি সামান্য একটা লোকের হাতে মারা পড়লেন!

তাই তো স্বাভাবিক মা। ভারতবর্ষে এত বড় বীর কে আছে যে তাঁর সমকক্ষ! ওই তো বললাম, সামান্য কুশাঙ্কুরের আঘাতটা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, তিনি দেহত্যাগ করবেনই, একটা উপলক্ষের মাত্র প্রয়োজন, ব্যাধের ঐ তীরটা সেই উপলক্ষটা জুগিয়েছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীর কি অস্ত্রের অভাব ছিল, তবে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রথচক্র ধারণ করতে গেলেন কেন?

কেন বাবা!

সব অস্ত্রই তাঁর কাছে সমান, সব মানুষই তাঁর কাছে সমান, সমস্ত চরাচর তাঁর ইচ্ছার অঙ্গ।

তর্কে পেরে ওঠে না জয়তী, চুপ করে থাকে।

কি মা, চুপ করে রইলে যে? মনটা বিষণ্ণ কেন? শুধায় প্রভুদয়াল।

আর তো চোখে দেখতে পাবো না বাসুদেবকে, উত্তর দেয় জয়তী।

এই কথা, চোখে দেখতে চাও? তাই দেখিয়ে দেবো।

এ কথাটা আরও দুর্বোধ্য মনে হয় জয়তীর কাছে, প্রশ্নাত্মক চোখে তাকায় সে প্রভুজীর দিকে।

এই সব প্রশ্নোত্তর-মালা জপ করতে থাকে বিনিদ্র জয়তী, অবশেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল জয়তীর, উঠে দেখে স্বামী-স্ত্রী কেউ শয্যায় নেই। সে বাইরে এসে প্রভুদয়ালকে শুধায়, মা কোথায় গেলেন?

ঐ দেখো গিয়ে সমুদ্রের ধারে।

সে তাড়াতাড়ি চলল সমুদ্রের দিকে। বেশি যেতে হল না, কাছেই দেখতে পেলো কাশ্যপের মা একটা চুবড়ি নিয়ে কি যেন সংগ্রহ করছে।

ও কি করছ মা?

এসো না বাছা, আমাকে একটু সাহায্য করো।

সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটা রাশিরাশি শামুক, ঝিনুক, কড়ি এনে ফেলছে বালুর উপরে, বেছে বেছে তারই কতক তুলছে চুবড়িতে কাশ্যপের মা। সেও কুড়োতে লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুড়ি উঠল ভরে।

এগুলো কি হবে মা?

এখনই দেখতে পাবে বাছা।

এমন সময় তিনজন নুলিয়া জেলে এসে হাজির হল। যে কাঠের টুকরোতে করে তারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, সেই কাঠের মতো সরল দীর্ঘ কালো তাদের গায়ের রঙ, পরনে এক টুকরো কাপড়, মাথায় তেকোণা পাতার টুপি। তাদের দেখে কাশ্যপের মা বলল, আজ দেরি কেন বাবা জগন্নাথ?

মা, আজ অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলাম।

অনেক মাছ বুঝি পেলে?

তা কিছু পেয়েছি মা, তুমিও তো অনেক পেয়েছ, চুপড়ি যে ভরে গিয়েছে। তাহলে নিয়ে যাই?

হ্যাঁ, নিয়ে যাও।

কি দিয়ে যাবো তোমাকে?

আজ কিছু আটা আর চাল দিয়ে যেয়ো। আর দেখো, একখানা গ'ড়ে শাড়িও চাই। এতে যদি না কুলোয় তবে না হয় শাড়িখানা থাক।

এতেই কুলিয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

তারপর একটু থেমে শুধালো, বক্তা সেই জগন্নাথ, এই মেয়েটি কে মা?

ওটি আমার মেয়ে।

তার কথা শুনে তিনজনে হেসে উঠল, মায়ের বাড়িতে যে আসে সে-ই হয় মেয়ে, নয় ছেলে, কেবল আমরাই বাদ।

তোমরা বাদ কেন বাবা। তোমরাই খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ।

তোমাকে খাওয়াবো পরাবো এমন আমাদের সাধ্যি কি? যে আমাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, তোমাকেও ভরণপোষণ করছে সে। এই আমাদের বাবা, এই আমাদের সমুদ্দুর।

সে কথা সত্যি বাবা। ওরই নুন খেয়ে তো সবাই মানুষ।

হুলিয়ারা চুপড়ি নিয়ে চলে গেলে কাশ্যপের মা বলল, চলো মা এবার বাড়িতে যাই।

সমস্ত ব্যাপারটা অবোধ্য লাগল জরতীর কাছে। সেটা বুঝতে পেরে কাশ্যপের মা বলল, বুঝলে না, এই হচ্ছে আমাদের জীবিকার উপায়। আমি চুপড়ি ভরে শামুক-ঝিনুক কুড়োই, ওরা এসে দোকানে নিয়ে গিয়ে বিনিময়ে আমাদের দরকারী জিনিস এনে দেয়।

তারপরে মন্তব্য করলো, আমাদের দরকারই বা কতটুকু।

জরতী বলল, আমি এসে তো দরকার বাড়িয়ে দিলাম।

সেইজন্যেই তো দু-মুঠো বেশি কুড়োলাম। কারো ক্ষতি হল না, না তোমার না আমার না সমুদ্রের, ওর নাম তো আবার রত্নাকর কিনা!

পাহাড়তলীর যে দিকটায় প্রভুদয়াল-দম্পতির কুটির তার একটা অংশ সমুদ্রের উপরে ঝুঁকে পড়েছে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লে গভীর জলে পড়তে হবে। জরতী দেখল অপরাহ্ণবেলায় প্রভুদয়াল সেখানে একখানা পাথরের উপরে বসে একমনে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ালো, বুঝতে পারলো না তিনি দেখছেন, না ধ্যান করছেন। সময়বিশেষে ও দুই যে এক কি করে জানবে জরতী।

সমুদ্র তার অপরিচিত নয়, কিন্তু তাকে এমন মুগ্ধভাবে দেখবার কি আছে

ভেবে পায় না সে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ফিরছে তীরের দিকে, সমুদ্রে দলে দলে নুলিয়ার নৌকা ফিরছে, পাখীর বিন্দুগুলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে নৌকার রেখাগুলো। পশ্চিম দিগন্ত সূর্যাস্তের আভাময়, কাজেই সূক্ষ্ম রেখা ক্ষুদ্র বিন্দু কিছুই চোখ এড়ায় না। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের জলতল মৃদুভাবে কম্পিত হচ্ছে। এসব দৃশ্য কত দিন সে দেখেছে। ব্যাধের গৃহিণী হলেও সমুদ্রের কাছে তার ঋণ কম নয়, যেদিন শিকার না জোটে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে কাজ চালাতে হয়। তার পক্ষে অবশ্য নুলিয়ার মতো নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও হয় না। ঢেউয়ের ঝাপটায় মাছ এনে ফেলে ডাঙায়, জলের টানে নেমে যাওয়ার আগেই চট্‌পট ধরে ফেললেই হল। কাজটায় সে খুব পটু।

কি দেখছ মা?

জরতী চমকে উঠে ভাবে, কেমন করে জানলেন প্রভুজী যে সে এসেছে। তাই সে পাল্টে শুধালো, কেমন করে জানলেন বাবা যে আমি এসেছি! পা টিপে টিপে এসেছিলাম যাতে আপনি না জানতে পারেন।

না মা, পায়ের শব্দ পাইনি।

তবে কি করে জানলেন?

অনুভবে। যাক গে, বসো—বলে একখণ্ড পাথর দেখিয়ে দিলেন।

না বাবা, আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, দরকার আছে।

আমাকে দিয়ে কি দরকার বাবা?

তুমি বলেছিলে বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন, তাঁকে আর দেখতে পাবে না।

দেহত্যাগ করলে আর কি করে দেখতে পাওয়া যায়।

আমি তো এতক্ষণ তাঁকেই দেখছিলাম।

অবিশ্বাসে বিস্ময়ে ব্যগ্রভাবে শুধায়, কোথায় তিনি?

এই তো তোমার সম্মুখে।

কিছু বুঝতে পারে না জরতী, বলে, কোথায়?

ঐ তো, সম্মুখে।

ও তো সমুদ্র।

বাসুদেব নয় কেন?

তবু কিছু বুঝতে পারে না, বলে, বাবা আমি অবোধ।

প্রভুদয়াল বলতে আরম্ভ করে, সুনীল সমুদ্রে তাঁর দেহের নীল আভা দেখো,

সমুদ্রের উদার বিস্তারে তাঁর বিশাল বক্ষস্থল, ঐ দেখো তাঁর বক্ষ মৃদু নিশ্বাসের তালে কম্পিত, আর সূর্যাস্তের দীপ্তি তাঁর বক্ষের কৌস্তুভ মণি। মা, প্রাচীনেরা কল্পনা করেছিলেন যে সৃষ্টির আদিতে নারায়ণ সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, আজও তিনি তেমনি শয়ান রয়েছেন কেবল দেখবার অপেক্ষা।

সকলের কি তেমন দেখবার চোখ থাকে বাবা?

গোড়ায় কারোরই থাকে না। আমারই কি ছাই চোখ সম্পূর্ণ খুলেছে?

কি করলে সে চোখ পাওয়া যায়?

আর যে করেই হোক চোখ বুজে থেকে নয়। চোখ মেলে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন দৃষ্টি খুলে যায়।

কথাগুলো যতই অবিশ্বাস্য হোক, বক্তা বিশ্বাসভাজন জরতীর কাছে। ভাবে, চেষ্টা করলে একদিন বুঝতে পারবে।

এমন সময় জগন্নাথ এসে উপস্থিত হয়।

কি জগন্নাথ, তার পরে খবর কি?

খবর কিছু নেই বাবা, মা-ঠাকরুণকে বদলী জিনিস দিতে এসেছিলাম, ভাবলাম একবার বাবাকে প্রণাম করে যাই।

বেশ বেশ, বসো।

আপনার সামনে কি বসতে পারি?

প্রভুদয়াল হেসে বললেন, তবে না হয় দাঁড়িয়ে থেকেই উত্তর দাও। নগরের দিকে তো যাওয়া-আসা করো, রাজবাড়ির খবর কি?

রাজা নেই, তার রাজবাড়ি।

সে কি কথা! মহারাজা উগ্রসেন তো রয়েছেন।

তা আছেন বটে। তিনি অবশ্য নামে রাজা, কিন্তু সবাই জানে আসল রাজা ছিলেন বাবা বাসুদেব।

কে এমন কাজ করলো হে?

কি জানি বাবা। শুনলাম একটা ব্যাধ ধরা পড়েছে, তারই নাকি কাজ। আরও শুনলাম আগামীকাল লোকটাকে শূলে দেওয়া হবে।

কেউ লক্ষ্য করলো না যে, জগন্নাথের কথা শুনবামাত্র জরতী মাটিতে বসে পড়লো।

বলো কি হে! একেবারে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে?

আজ্ঞে তা জানি নে, তবে বিচার হয়ে গিয়েছে যে লোকটার শূলদণ্ড হবে।

তা বটে। আমারই ভুল হয়েছিল, আগে বিচার পরে প্রমাণ এই হল

এখনকার রীতি। তা লোকটা কেন এমন গর্হিত কাজ করলো কিছু জানা গিয়েছে?

সকলের অজ্ঞাতসারে জরতী উঠে গিয়ে কুটিরে প্রবেশ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

রাতের বেলায় প্রভুদয়ালের পায়ের উপর পড়ে মাথা কুটতে লাগলো জরতী।

প্রভু বাঁচাও, বাঁচাও সেই হতভাগ্যকে, যার হাতে নিহত হয়েছেন কৃষ্ণ বাসুদেব। তার চেয়ে বেশি হতভাগ্য আর একজন আছে যে সেই হন্তারককে রক্ষা করতে অনুরোধ করছে। জানি নরকেও আমার স্থান হবে না প্রভু, তবু না অনুরোধ করে পারছি না, সে আমার স্বামী।

এইভাবে কথাগুলো বলতে বলতে মাথা কুটে চলল জরতী, না আছে কথার বিরাম, না আছে মাথা কুটবার বিরাম, না আছে বিরাম চোখের জলের ধারায়।

তার অসংলগ্ন কাতরোক্তি থেকে প্রভুদয়াল ও তার স্ত্রী বুঝলো যে জরতীর স্বামী জরার শরনিক্ষেপের ফলে নিহত হয়েছেন বাসুদেব। না জেনেই শরনিক্ষেপ করেছিল একথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা, বাসুদেবকে হত্যা করায় তার স্বার্থ ছিল না, যদিচ বাসুদেবকে সে চিনতো না। জরতী যে ঘটনাস্থলে এসে স্বামীকে ধিক্কার দিয়েছিল, স্বামী যে ক্রোধের বশে তাকে গলা টিপে নিহত মনে করে চলে গিয়েছে—তার এক প্রমাণ প্রভুদয়ালের মৃতপ্রায় জরতীর সাক্ষাৎলাভ, আর এক প্রমাণ জরতীর কণ্ঠে পাঁচ আঙুলের নীলার কান্তির মতো ছাপ। দিনের বেলায় ঐ ছাপ অনেকবার চোখে পড়েছিল কাশ্যপের মায়ের, মেয়েদের চোখে এসব চিহ্ন প্রায়ই এড়ায় না, যদিচ দেখেনি প্রভুদয়ালের চোখ। মেয়েদের চোখ কাছের খুঁটিনাটি দেখে, পুরুষের চোখ দূরের বড় বড় বস্তু। মেয়েদের চোখ অণুবীক্ষণ, পুরুষের চোখ দূরবীক্ষণ।

কাশ্যপের মা অনেকবার ভেবেছিল জরতীকে শুধাবে ঐ নীলার কণ্ঠি এলো কোথা থেকে, সুযোগ করে উঠতে পারেনি। যাক, এখন রহস্যের সমাধান হল।

প্রভুদয়াল মূঢ়ের মতো বসে আছে, অনেকক্ষণ তার পা ভিজে হিম হয়ে গিয়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় তার অবস্থা। স্বীকারোক্তির প্রথম অভিঘাতে একবার তার মনে হয়েছিল, হতভাগিনীকে কুটির থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারপরে মনে হয়েছিল মেয়েটার কি দোষ—মৃত্যু যাচ্ঞা করে তার তো প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন বাঁচাবে মহাপাতকীকে, আর বাঁচাবার উপায়টাই বা কি, ক্ষমতাই বা তার কোথায়!

এমন সময় কাশ্যপের মা বলে উঠল, দেখো, তুমি তো ইচ্ছে করলেই

বাঁচাতে পারো।

কি বলছ অদিতি, আমি বাঁচাবো!

সঙ্কটকালে পত্নীর আসল নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কি বলছ অদিতি, রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে আমি বাঁচাবো কেমন করে?

কেন, কঠিনটা কি! রাজা তোমাকে সমাদর করেন, তুমি তাঁর কাছে কোনকালে কিছু প্রার্থনা করোনি, আজ এই লোকটার প্রাণভিক্ষা চাও না কেন?

প্রভুদয়াল ভাবলো এ না হলে আর স্ত্রীবুদ্ধি—কঠিন কাজে সরল পন্থা আবিষ্কার।

বলল, প্রার্থনা করতে গেলে ছোট হয়ে পড়তে হয়। স্বয়ং ভগবান যখন প্রার্থনা নিয়ে বলিরাজের সভায় গিয়েছিলেন তখন তাকে বামনরূপে যেতে হয়েছিল।

অদিতি হটবার পাত্রী নয়, বলল, স্বয়ং ভগবান যদি বামন রূপ ধরে থাকেন তাহলে তুমিও না হয় ধরলে, বিশেষ তাতে দুজনের প্রাণরক্ষা হয়।

দুজন আবার কোথায় দেখলে কাশ্যপের মা?

তুমি কি ভাবছ স্বামী মরলে ঐ মেয়েটা বেঁচে থাকবে? তুমি তো কতবার বুঝিয়ে বলেছ ভগবানকে কেউ মারতে পারতে পারে না, নিজের কার্য উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, কার্য উদ্ধার করে চলে গিয়েছেন, ঐ লোকটা নিমিত্তমাত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন যেমন নিমিত্তমাত্র হয়েছিলেন, এখানে ঐ লোকটাও তেমনি নয় কি!

এ তর্কের উত্তর খুঁজে পায় না প্রভুদয়াল, কারণ এ সমস্ত যুক্তি তার নিজেরই, বুঝিয়েছে পত্নীকে আর জরতীকে। সে চুপ করে থাকে, তবু মনস্থির করতে পারে না।

কুটিরের মধ্যে তিনটি প্রাণীর নিশ্বাসের সঙ্গে তালরক্ষা করে বাইরে সমুদ্রে চলছে উত্তাল গর্জন। যে সমুদ্র এই কিছুক্ষণ আগে শান্ত ছিল এখন সে উদ্দাম। দুই ঢেউয়ের উত্থান-পতনের বিরামের মধ্যে শ্রুত হয় নিশাচর পাখীর কর্কশ তীক্ষ্ণ রব। ও যেন দুটো শব্দের পার্থক্যটাকে সরু সুতো দিয়ে গ্রথিত করে তোলবার চেষ্টা। শব্দের তোরণ ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠে শিখর রচনা করে হঠাৎ ধসে পড়ে যায়—কলকলিয়ে ছুটে চলে আসে সর্পিল ঢেউগুলো উপকূল ছাড়িয়ে অনেক ভিতরে।

জরতী পা ছাড়েনি, সে এমনি নিস্তব্ধ যে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হতে পারতো যদি না মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠতো। প্রভুদয়ালের মনে আত্মমর্যাদা ও

অনুকম্পার লড়াই চলছে, কে জিতবে কে হারবে। আর অদিতির মনে দয়ার অটল দণ্ডকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে কৌতূহলের একটি সূক্ষ্ম স্বর্ণাভ বল্লরী। শূলদণ্ডে মৃত্যু, না জানি মরণের সে কি অভিনব পন্থা!

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রভুদয়াল। বলল, অদিতি, নিজের মর্যাদাকে আর বড় করে তুলবো না, কাল সকালে রাজার কাছে গিয়ে জরার প্রাণভিক্ষা করবো।

এতক্ষণ নৈরাশ্যের তরঙ্গে তাড়িত হওয়া সত্ত্বেও, হয়তো বা সেইজন্যেই চৈতন্য লোপ পায়নি জরতীর, এবারে আশার উপকূল চোখে পড়তেই লুপ্তজ্ঞান হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো।

দ্বারকাপুরীর দক্ষিণ মশান আজ লোকে লোকারণ্য। সমুদ্র আর পুরীর প্রাচীরের মধ্যে প্রকাণ্ড মাঠ, সমুদ্রের দিকে বালুর চর, উপরের দিকে শুকনো ডাঙা, কাছে কোথাও গাছপালা নেই। এখানেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের সাজা হয়ে থাকে—শূল, মুণ্ডচ্ছেদ, হস্তচ্ছেদ যার প্রতি যেমন আদেশ, নিকটেই সমুদ্রের ধারে মৃতদেহ দাহের ব্যবস্থা, সেটা সরকারী খরচে হয়ে থাকে এই যা লাভ।

অনেককাল মৃত্যুদণ্ড কারো হয়নি। বাসুদেবের প্রভাবে রাজ্য সুশাসিত ছিল, তস্করাদি স্বকর্মে নিরস্ত ছিল। আর যারা খুনে তাদের অনেক মারা পড়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, বাকিদের শখ সাময়িকভাবে মিটে গিয়েছিল সেই মহাহবে মানুষ খুন করা বীরত্বে। লোকে একরকম ভুলেই গিয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা। দক্ষিণ মশানটা স্মৃতিযোগে মাত্র মনে ছিল। আজ এতকাল পরে সেখানে শূলদণ্ডের ব্যবস্থা হবে শুনে কাতারে কাতারে লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। দিবা প্রথম প্রহরের ঘণ্টা বাজলে অপরাধীকে শূলে চড়ানো হবে। গতকাল ঢোল বাজিয়ে নগরে ঘোষণা করা হয়েছিল। কৌতূহলে আর উৎসাহে সে রাতে লোকের ঘুম হল না, ভোর হওয়ার আগেই তারা মশানের দিকে রওনা হল। যারা অত্যুৎসাহী অর্থাৎ ব্যাপারটা ভাল করে দেখতে চায়, রাতের বেলাতেই তারা এসে শূলের কাছাকাছি জায়গা দখল করে নিয়েছিল। যারা পরে এসেছে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যেতে চায়, দুই দলে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়, মারামারি শুরু হয়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, আরে বাপু, খুনোখুনিটা কালকের জন্য তুলে রেখে দাও, আজকে একটাই যথেষ্ট।

অপর একজন উত্তর দেয়, যতক্ষণ শূলে চড়ানো না হচ্ছে ততক্ষণ চলুক না। আমার আবার লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটবার শব্দ শুনতে বড় ভালো লাগে।

তৃতীয় ব্যক্তি বলে, পরের মাথা ফাটলো ভালোই শোনায় বটে।

আগের লোকটা বলে, নেহাত মিথ্যা বলোনি, নিজের মাথা ফাটলে শোনবার মতো মনের অবস্থা থাকে না।

কেন, আমরা আছি কি করতে ?

এমন সময় 'ঐ এসেছে, ঐ এসেছে' রব ওঠে।

আরে, কে এসেছে ?

তোমার সম্বন্ধী।

সে তো তুমি অনেকক্ষণ হাজির আছ।

ঐ যে নিয়ে আসছে, ঐ—ঐ দেখো।

সকলে ঘাড় উঁচু করে, কিছু চোখে পড়ে না, তখন আবার সামনে এগোবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ওদিকে রাজার শান্ত্রী ও কোটালের দল 'হঠ যাও, হঠ যাও' রব করে লাঠি ঘোরাতে থাকে।

মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁক, সেখানে মনুষ্যপ্রমাণ উঁচু একটা লোহার শূল প্রোথিত। একজন জল্লাদ এরণ্ড তৈলে সেটাকে মার্জিত করছে। কাছেই গোটাকতক কুকুর শেষ অঙ্কের আশায় লেজ নাড়তে নাড়তে সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে সমর্থন করছে।

ঐ নুলোগুলো মরতে এসেছে কেন ? বলে ওঠে একজন।

আর একজন তার অনুসরণ করে বলে, শুধু কি নুলো ! ঐ দেখ, কানা খোঁড়া কুঁজো কুষ্ঠী—বাপ রে কত ! হাজার হাজার মনে হচ্ছে !

কেন, ওদের কি দেখবার শখ হয় না ?

কিন্তু অন্ধগুলো কেন ? ওরা দেখবে কি করে ?

দেখতে না পায়, শুনবে। ঐ যে কে যেন বলেছিল মাথা ফাটবার শব্দ শুনতে ভালো লাগে ?

কিন্তু এ আপদগুলো এলো কি করে ?

কেন, নৌকো দেখতে পাচ্ছ না ?

তাই তো বটে ! অনেক নৌকো জড়ো হয়েছে ! একজন ছড়া কেটে বলে উঠল :

শখ দেখে যে মরে যাই
নৌকা নিয়ে এলো তাই।

আর একজন তার অনুবৃত্তি করলো

কানায় দেখে কালায় শোনে
বোবায় শেখে নথ গোনে।

অনেকে বলে ওঠে, দেখো একবার রঙ্গ। চলতে পারে না তবু লাঠি ভর করে খুঁড়িয়ে গড়িয়ে আসা চাই।

আর কুঠেগুলোর রকম দেখো, হাতে-পায়ে কাপড় জড়ানো, বেটারা লাঠি ধরেছে কি করে?

প্রাণের দায়ে ঐ লাঠিই ওদের ভরসা।

তা হোক, ওদিকে যেয়ো না, ওদের বাতাস লাগলেও রোগে ধরবে।

আরে আমরা কি যাচ্ছি, ওরাই যে এসেছে।

এমনিতরো উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে।

বাস্তবিক লোকগুলোর কথা মিথ্যা নয়। মশানের দক্ষিণ দিকে চরের উপরে সমুদ্রের ধারে অনেকটা জায়গা হাজার দুই কানা খোঁড়া নুলো পঙ্গু কুঁজো ও কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তে ভরে গিয়েছে। সকলেরই হাতে বিকলাঙ্গের শেষ নির্ভর লাঠি। সমুদ্রে ছোট ছোট নৌকো, ডোঙা, নুলিয়াদের মাছ ধরবার কাষ্ঠখণ্ড—তাকে নৌকো না বলাই উচিত। এ সমস্তর সংখ্যাও কম নয়। বেশ বুঝতে পারা যায় তারা অধিকাংশ নৌকোয় এসেছে। জনতার অন্য অংশে কোলাহল, কেবল এরা নীরব ও স্থির। জনতা যথাসম্ভব এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে অবস্থান করছে। অনেকে মাঝে মাঝে এদের ব্যঙ্গ করছে, ধিক্কার দিচ্ছে, কিন্তু এরা সেসব শুনেও শুনছে না, সকলেই শূলটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

একদিকে মেয়েদের দঙ্গল বড় কম হয়নি। তাদের উৎসাহটাই সবচেয়ে বেশি। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে নতুন স্বাদ এনেছে শূলে চড়ানোর ব্যাপারটা। সকাল-বেলায় উঠে ঘরের কাজ সমাধা করবার জন্যে তারা অপেক্ষা করেনি, দরকারও ছিল না, যেহেতু স্বামী-পুত্রেরাও চলে এসেছে, কোলের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েরা এসে জুটেছে। একটা ছোট ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মা, ঐ লোহার ডাণ্ডাটা কি হবে?

কি হবে কি রে বোকা ছেলে—ঐটার ওপরে লোকটাকে বসাবে।

ছেলে আবদার ধরলো, ওটার ওপরে আমি বসবো মা।

যেমন দস্যি তুই হয়েছিস, একদিন হয়তো সত্যি বসতে হবে।

না, আমি আজই বসবো।

তার কথা শুনে পার্শ্ববর্তিনীরা হেসে উঠল। তাদের একজন বলল, আহা মাসি, বসিয়ে দাও না কেন, ছেলে আবদার ধরেছে।

ছেলের মা বলল, ওকে নয়, ওর বাপকে পেলে বসিয়ে দিতাম।

ভালোই হতো মাসি, আর একটা ঘর করবার সুযোগ পেতে।

তুই যেমন পেয়েছিস।

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

কাজেকাজেই মাসি, সব সময়ে তো বড় কথা বলবার সুযোগ হয় না।

ছেলেরা মায়ের কাছে আবদার ধরেছে। কেউ বলছে, মা, ছোলাভাজা কিনে দাও। কেউ বলছে, মা, রামদানার লাড্ডু খাবো।

ফেরিওয়ালারা নানারকম খাদ্য বেচাকেনা করছে, মাটির খেলনা থেকে মুখরোচক খাদ্য কিছুই বাদ পড়েনি।

কোন ফেরিওয়ালা বলছে, নাও খোকা, আচ্ছা রামদানার লাড্ডু, কেউ বলছে এই রথটা কিনে নাও খোকা—এই দেখো রথের ওপর কৃষ্ণ আর অর্জুন।

জনসাধারণ বাসুদেবের মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছিল, কারণ বাসুদেব সুখে-দুঃখে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন, ছেলেদের খেলাধুলায় যোগ দিতেন, কখনো তাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতেন। তারা যখন শুনলো যে বাসুদেব মারা গিয়েছেন সকলে সত্যি দুঃখিত হল আর তাদের রাগ হল হত্যাকারীর উপরে। কিন্তু এখন তারা সেই হত্যাকারীর প্রতি একপ্রকার কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল, আজ তার জন্যেই এমন জমায়েত সম্ভব হল। কতকাল যে এমন মেলা বসেনি! ফেরিওয়ালারা সুযোগ বুঝে দু'পয়সা রোজগার করে নিচ্ছে, বাসুদেব তো আর ফিরবেন না, তবে দুটো পয়সা কামাই করবার সুযোগ হারিয়ে কি লাভ!

এমন সময়ে রাজপুরীর দিক থেকে নাকাড়ার শব্দ উঠল, অমনি সমস্ত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল, জয় জগন্নাথ! ঐ আসছে, ঐ আসছে!

এবারে সত্যসত্যই আসছে। জনকুড়ি সশস্ত্র শাস্ত্রীর পাহারাধীন জরা সত্যই আসছে। কিন্তু হেঁটে আসবার কষ্ট সহ্য করতে হয়নি তাকে। গাধার উপরে উল্টোভাবে সে আসীন, মাথা তার ন্যাড়া করে দিয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া হয়েছে, ঘোলের ধারা এখনো সর্বাঙ্গে চিহ্নিত। হাত-দুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা, পা-দুটো খোলা, নইলে গাধায় চাপাবার অধ্যায়টা বাদ দিতে হয়। আর তার আগে-পিছে বাজছে রাজার নাকাড়া। মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গাধায় চাপানোর অধ্যায়টা শূলদণ্ডের আসামীর পক্ষে গায়ে চিমটি কাটবার মতো অতি তুচ্ছ ব্যাপার হলেও দর্শকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মল্লযুদ্ধের ভূমিকা যেমন বাগ্‌যুদ্ধ—এও অনেকটা তেমনি। শূলে চড়ালেই রাজ-বিচারের সীমা ফুরালো, —তাই আগে যতটা সম্ভব লোকটাকে নাজেহাল করে নেওয়া যায়। কায়িক দণ্ডের ভূমিকা মানসিক লাঞ্ছনা। মনুষ্যত্ববোধকে একেবারে গুঁড়িয়ে নিষ্পিষ্ট করে না দিতে পারলে শান্তি পায় না মানুষের ন্যায়বুদ্ধি।

জনতা শৃঙ্খলা ভেঙে ছুটে চলল সেইদিকে, বেপরোয়া লাঠি চালাতে লাগলো শান্ত্রীরা, মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো অনেকের, তবু কারো হুঁশ নেই। ফাটা মাথা জোড়া দিলেই চলবে, কিন্তু এমন জলুস তো রোজ হয় না। সামান্য মাথার জন্য পরোয়া করলে চলবে কেন, এইরকম ভাব জনতার।

অবশেষে ভিড় ঠেলেঠুলে জরার গাধা এসে দাঁড়ালো শূলদণ্ডটার কাছে, তখন নগরপাল জরাকে গলাধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল, বদ্ধহস্ত অবস্থায় সে পড়ে গেল। তাকে বললেই নামতো, কিন্তু রাজবিচারের মর্যাদা রক্ষার পক্ষে বোধ করি সেটা যথেষ্ট নয়। সে পড়ে যেতেই দুজন শান্ত্রী এসে তার পা দুখানা আচ্ছা করে বেঁধে দিল। তখন সে অসহায়ভাবে পড়ে রইলো। এদিকে পিঠ হাল্কা হয়ে যেতেই গাধাটাও বোধ করি নিতান্ত অসহায় বোধ করলো, এখন সে লেজ খাড়া করে উদাত্ত-অনুদাত্তপ্লুত স্বরে আপত্তি জানাতে জানাতে মরীয়া হয়ে জনতা ভেদ করে দৌড় মারলো। সামনে থেকে সরে যাও কামড়ে দেবে, পিছন থেকে সরে যাও চাঁট মারবে—রব করতে করতে ছেলের দল ছুটলো পিছনে।

এদিকে জনতার চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জরা মরে আর কি!

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে উঠল, আরে লোকটা যে মরে যাবে, তখন শূলে চাপাবে কাকে!

আর একজন উত্তর করলো, মরে যাবে, দেহটা নিয়ে তো যাবে না?

পূর্বোক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি বলল, আর মরা মানুষকে শূলে চাপিয়ে কি লাভ! আসল মজাটাই তো বাদ পড়ে যাবে।

পাছে আসল মজাটা বাদ পড়ে যায়, পাছে মৃত্যুযন্ত্রণা ও মুমূর্ষুর কাতরোক্তি ফাঁক পড়ে যায়, শুধু দেহটা শূলস্থ করে কি লাভ, মনুষ্যজীবনে দেহটা তো নগণ্য, আত্মাই তো মুখ্য, প্রভৃতি নিগূঢ় বিষয় চিন্তা করে জনতা সরে গেল। জরা হাঁফ ফেলবার অবকাশ পেলো। যারা বলে জনতা কাণ্ডজ্ঞানহীন তারা মূর্খ।

তখন জনতার মধ্য থেকে নানারকম রব উঠতে লাগলো, কই গো, কখন হবে?

আর তো দেরি করতে পারি না, আজ আবার একাদশীর পারণ, খিদেয় নাড়ি জ্বলে গেল।

তবে এসেছিলে কেন মরতে?

আঃ মলো যা, মরতে না মরা দেখতে। তুই মর্, তোর চোদ্দপুরুষ মর্।

আহা বাছা, ছেলেটা যে কেঁদে সারা হল, মাই দাও না মুখে।

অতটুকু ছেলে আনতে গেলে কেন?

কার কাছে রেখে আসি বাবা। তাছাড়া ভাবলাম ছেলেটাই বা বাদ পড়ে কেন, দেখে নিক, শরীরে পুণ্য হবে।

ও কি বুঝবে?

বুঝবে বাবা বুঝবে, এ সংসারে কেউ অবুঝমান নয়। ছেলেটার বাপকে যখন ঝাঁটাপেটা করি তা দেখে ও হেসে ওঠে।

বাপ রে বাপ, এ ছেলে বেঁচে থাকলে না জানি কি হবে!

কি আর হবে, মাকে লাঠিপেটা করবে।

না বাপু, আর অপেক্ষা করতে পারি না। আজ সকালে আবার গোয়ালা বুড়োর আসবার কথা সুদটা মিটিয়ে দেবার জন্যে, আমি বাপু যাই।

যাও, সুদের আশায় এই আসলটা খোয়াবে।

অনেকেই যাই-যাই করছে কিন্তু কেউ নড়ছে না। দেরি হয় সকলেরই অগোচর ইচ্ছা, কারণ একবার হয়ে গেলেই তো মজা ফুরালো, কাজেই আশার সুতো যতটা দীর্ঘ করা যায়।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একমাত্র চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সম্ভব। চিৎ হয়ে পড়ে রইলো জরা। সুসংলগ্নভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার অনেকক্ষণ লোপ পেয়েছিল —অথচ চিন্তা না করে থাকাও কঠিন, তাই নানারকম চিন্তার উড়ো খড়কুটো তার মনের মধ্যে প্রবেশ করছিল, ভালো করে তাদের দেখে নেবার আগেই পরবর্তী অনুপ্রবেশকারীদের পথ ছেড়ে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার উপায় নেই, হঠাৎ চোখে পড়লো অমুচ্চ আকাশে দুটো শকুন উড়ছে, তারাও জনতার মতো প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল, তবে তাদের প্রত্যাশা কিছু মাংস। জরা এত বুঝলো না, মৃত্যু যে অত্যাসন্ন একথা বুঝেও মানুষে বুঝতে চায় না। সে ভাবলো, আহা, হাতে তীরধনুক থাকলে এক তীরে দুটোকে নামাতে পারতো। মনে পড়লো, একবার জরতীর সঙ্গে বাজি রেখে এক তীরে তিনটে টিয়েপাখীকে গেঁথে ফেলেছিল। টিয়ে কত ছোট, শকুন কত বড়, ও নিশ্চয় পারে। এই প্রথম জরতীর কথা মনে পড়লো। না, আগেও একবার পড়েছিল, যখন তার মাথায় ঘোল ঢেলে দেওয়া হলে তার একটা ধারা গড়িয়ে ঢুকেছিল তার মুখে। সেই ঈষৎ লবণাক্ত ঘোলের স্বাদ মনে পড়িয়েছিল তার গৃহস্থ জীবনের ও গৃহিণীর স্বাদ। ঘোলটা তার বড় প্রিয় খাদ্য। জরতী সেইজন্যে মাঝে মাঝেই ঘোল তৈরি করতো, সে লুব্ধনেত্রে বসে বসে সেই বিচিত্র প্রক্রিয়া দেখতো। ভাবতো এই তো যথেষ্ট হয়েছে, অকারণে আবার খানিকটা মন্থন করা কেন! এবারে দিলেই হয়, এক চুমুকে জামবাটি শূন্য করে ফেলে।

জয়তী বলতো, এত তাড়া করলে কি হয়, দেখছ না এখনো সবটুকু ননী ওঠেনি!

সে বলতো, রাখো তোমার ননী, না হয় ওটুকুও খেয়ে ফেলি।

তুমি বড় লোভী।

আর তুমি! পাথরের খাদা বোঝাই তেঁতুলের ঝোল যে পার করে দাও!

তুমি খাও না বলেই আমাকে খেতে হয়, নইলে নষ্ট হবে।

নাও, অনেক হয়েছে, এখন দাও।

যারা ঘোল ঢালছিল তাদের একজন বলে উঠল, লোকটার তেষ্টা পেয়েছে, আর একটু ঘোল দাও।

একজন বাটি করে ঘোল দিচ্ছিল। পূর্বোক্ত জন বলল, না না, মাথায় ঢেলে দাও, গড়িয়ে মুখে ঢুকুক।

তাই দেওয়া হল। কিন্তু এবারে আর জরা খেলো না, হাত দিয়ে মুছে ফেলল, তখনো হাত খোলা ছিল।

হঠাৎ জনতার কোলাহল কানে যেতেই, এতক্ষণ জনতার উপস্থিত সম্বন্ধে তার সম্বিৎ ছিল না, সে ভাবলো—এরা সব কারা, এখানে এত সকালে কেন। কোনরকমে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো চারদিকে চক্রাকারে জনপ্রাচীর। এবারে তাদের কথা ও কথার অর্থ বোধ হতে লাগলো জরার।

একজন বলছে, আর মিছে দেরি কেন? দাও চাপিয়ে, ওদিকে যে হাটের বেলা বয়ে গেল।

তাই শুনে অপর একজন বলল, আরে আজ কি আর হাট বসবে, সবাই যে এখানে।

তাহলে এখানেই হাট বসালে হতো, ফিরবার আর তাড়া থাকতো না।

প্রত্যুত্তরে অপর একজন বলল, যা বলেছ ভাই, একসঙ্গে রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হতো।

রথ দেখা বলে রথ দেখা! মায় রথের ডগায় হনুমানকে অবধি দেখা হতো।

এই কথায় সকলের মনে পড়ে গেল যে আসল কাজটাই বাকি, এখনো চাপানো হয়নি লোকটাকে শূলে।

তখন একজন বালক, এতক্ষণ সে বয়স্কদের উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনে জ্ঞানবান হয়ে উঠেছে, লাঠির খোঁচা মেরে জরাকে বলল, এই বুনো, ওটা দেখেছিস? এই বলে লাঠি দিয়ে ইশারায় শূলটা দেখিয়ে দিল।

এবারে প্রথম জরার চোখে পড়লো শূলটা, তাই তো, ঐ তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদণ্ডটা কেন!

সে যন্ত্রচালিতবৎ বলে উঠল, ওটা কেন ?

একজন বলল, কেন এখুনি বুঝতে পারবে।

একজন রসিক বলল, বুঝতে পারবে নিশ্চয়, কিন্তু বোঝাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

পূর্বোক্ত রসিক ব্যক্তি নিজ রসিকতার প্রতিক্রিয়ায় আহ্লাদিত হয়ে তান দিয়ে গান ধরলো

'ডুব দিয়ে রসের সাগরে
কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে গো।'

তারপরে আখর শুনিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলো, শূল তিন রকম ভাই, পিত্তশূল, অম্লশূল আর লৌহশূল। আগের দুটোয় ভুগে এখনো বেঁচে আছি, এ বেটা লৌহশূলে চেপে ডুবে মরবে।

বেটার কচ্ছপের প্রাণ, সহজে মরবে মনে হয় না।

এবারে একজনের হুঁশ হল, শুধালো, বেটা কি করেছে ?

দেখা গেল যে অধিকাংশেই জানে না কি তার অপরাধ। তার আবশ্যকও ছিল না, কেননা অবশ্যই একটা অপরাধ আছে, নইলে রাজা দণ্ড দেবেন কেন ?

নাও ভাই, এখন ওসব কচকচি রাখো, যে-আশায় এসেছি, সেটা এখন হয়ে যাক।

জনতার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি থেকে জরা বুঝতে পারলো এত আয়োজন তারই জন্যে, ঐ শূলে হবে তাকে চাপানো। সমস্ত দেহ শিউরে উঠল, কিন্তু এখুনি মনে হল খট্টাস তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, জরা ভাই, এখন এদের সঙ্গে মারামারি করে লাভ নেই, এরা অনেক। এখন ওদের সঙ্গে যাও। যথাকালে আমাদের দলবল নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করবো, নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু কোথায় খট্টাস, কোথায় বা তার দলবল! সে চারদিকে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পায় না খট্টাসকে।

জরা জরতীর দেহ দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে খট্টাসের কাছে বসতে সে বলে উঠল, যাক দেরি হয়নি, এবারে বসো, আমাদের কর্তব্য বলছি।

এমন সময়ে ঘরের দেয়ালে কয়েকটি ছায়া পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার পিছনে কায়াধারীরা প্রবেশ করলো—নগরপাল ও চারজন শাস্ত্রী।

জরা তাদের প্রবেশের কারণ বুঝতে পারলো না, তবে খট্টাসের না বুঝবার কারণ ছিল না। অনেকবার সে রাজপুরুষগণ কর্তৃক বন্দী হয়েছে, যদিচ প্রত্যেক-

বারেই মুক্তিলাভ করেছে। সে জরার কানে কানে বলল, তোমাকে [illegible] এসেছে, এখন বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। ওরা পাঁচজন তায় সশস্ত্র, এখন যাও, যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়ে আনবো, কোন ভয় নেই।

রাজপুরুষগণ বিহ্বল জরাকে বন্দী করে নিয়ে চলে গেল, থট্টাস চলল তার দলবলের সন্ধানে।

বাসুদেবের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাজা উগ্রসেন প্রধান নগরপালকে ডেকে আনিয়ে জরুরী আদেশ দিলেন, যেমন করেই হোক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। নগরপাল বাসুদেবের মৃতদেহের কাছে গিয়ে দেখল যে, পায়ে একটি তীর বিদ্ধ। তীর দেখে বুঝলো অবশ্যই একজন তীরন্দাজের কাজ। নগরপালের বুদ্ধি সূক্ষ্ম, চিরকালই ও-বস্তুটা সূক্ষ্ম হয় রাজপুরুষদের। তারপরে ন্যায়শাস্ত্রের অপরিহার্য নিয়মের সূত্র অনুসরণ করে বুঝলো তীরন্দাজ একজন শিকারী। তখন সে অন্য রাজপুরুষগণের সঙ্গে পরামর্শ করে থট্টাসের আড্ডায় হানা দিল, কারণ সমাজ-বিরোধীদের মজলিশের স্থান বলে জানা ছিল। সেখানে গিয়ে থট্টাসকে দেখল, তাকে চিনতো বলেই বুঝলো সে শিকারী নয়, অতএব অন্য লোকটা নিশ্চয় শিকারী। তাকে বন্দী করে বুদ্ধির গৌরবে গোঁফে তা দিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকালো, তাদের চোখে দেখতে পেলো সার্থক গৌরবের দীপ্তি। তখন সকলে মিলে জরাকে বেঁধে নিয়ে প্রস্থান করলো। ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কী না সম্ভব!

রাজসভায় অপরাধীর বিচার হয়ে থাকে এমন একটা কথা জানতো জরা, তবে রাজদণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। এবারে হাড়ে হাড়ে জেনে বুঝতে পারলো রাজদণ্ড কাল্পনিক কোন বস্তু নয়, একেবারে নিরেট সত্য, আর তার প্রক্রিয়াটা পীড়াদায়কভাবে কায়িক ব্যাপার। রাজদণ্ডের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার অন্তে সে যখন নেতিয়ে পড়েছে, তখন শাস্ত্রীদের একজন তাকে লাথি মেরে ভূপাতিত করে বলল, থাক বেটা এখন শুয়ে, আর রাত্রির মধ্যে যদি না মরিস, তবে কাল সকালে শূলে চড়ে স্বর্গে যাওয়ার সুখ অনুভব করতে পারবি। বিচারটা অপরাধী ধরা পড়বার সময়েই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এত বিশ্লেষণ করে দেখবার মতো তার মনের অবস্থা ছিল না। গায়ের ব্যথায় ও মনের অসাড়তায় শীঘ্রই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

জরা স্বপ্ন দেখছে, সে-স্বপ্ন এমন জীবন্ত যে, জেগে উঠেও তার সন্দেহ ঘোচে না—আদৌ তা স্বপ্ন কিনা কিংবা সত্যই একটা আবির্ভাব ঘটে গিয়েছে। সে দেখল একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকেছে। অন্ধকার এমন ঘন যে, নিজেকে

অবধি দেখতে পাওয়া যায় না, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে টের পাওয়া যায় অস্তিত্ব। সে চলেছে তো চলেইছে, কোথায়, কেন, জানে না। হঠাৎ চমকে উঠল, এ কোন্ রূঢ় শব্দ, খট্টাসের হাসি নাকি! না, গুহার গা থেকে একখানা পাথরের টুকরো গড়াতে গড়াতে পড়লো। এ অন্ধকারের আর শেষ নেই। এ কি সত্যিই কোনো গুহা, না কোনো অজগরের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! বোধ করি তাই হবে। তখন সে দেহ-মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, বাসুদেব, বাসুদেব, দয়া করো, রক্ষা করো, আমি পাতকী, মহাপাতকী। আবার সেই রূঢ় শব্দ। না, এবারে খট্টাসের হাসি না হয়ে যায় না। না, এবারেও গড়ায়মান পাথরের টুকরো।

হঠাৎ অনুভব করলো তার সমস্ত গা ঘামে ভিজে গিয়েছে, যেন এখুনি স্নান করে উঠেছে, সমস্ত শরীর হিম, মনে হল তার শেষ মুহূর্ত সমাগত। তখন ভাবলো যদি মরতেই হয়, তার আগে একবার দ্রুত প্রাণভরে বাসুদেবকে ডেকে নেবে। বাসুদেব বাসুদেব বলে চিৎকার করতে করতে তার গলা ভেঙে গেল, কই, কেউ তো সাড়া দিল না। জরতীর কাছে শুনেছিল বাসুদেব দয়াময়, ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না, তবে শুধু মুখে ডাকলে হবে না, মনের আন্তরিকতা থাকা চাই।

কোথায় তার মনে আন্তরিকতা! তখন সে বাসুদেব বলে ডাকতে ডাকতে পাথরের দেয়ালে মাথা কুটতে লাগলো। দেয়াল পাথরের বলেই টলল না। দরদর ধারা গড়াতে লাগল কপালে, হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝলো রক্ত, ঘাম এত ঘন হয় না।

রক্তস্রাবে শ্রান্ত হয়ে, যখন বসে পড়লো, তখন সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে। সম্পূর্ণ হতাশা মৃত্যুর চেয়েও নিরেট। তার প্রত্যয় হল এ অন্ধকার গুহারও নয়, অজগরের উদরেরও নয়, এ সেই জগৎ যেখানকার চন্দ্রে এবং সূর্যে চিরন্তন পূর্ণগ্রহণ। এবারে কেঁদে উঠল, এ কান্নায় সত্যই আন্তরিকতা ছিল। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় নয়, নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার ইচ্ছায় এ কান্না। পাপ জীবনের অঙ্গ, নৈরাশ্য জীবনের অস্বীকৃতি। ঐ অবস্থাটা পাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ সে দেখতে পেলো দূরে, অতিদূরে একটি আলোর বিন্দু, জোনাকির চেয়ে বড় নয়। বিন্দুটা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে—ছুটে আসছে তার দিকে, যত কাছে আসছে তত আয়তনে বড়, প্রভায় উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এবারে সেই আলোকময় গোলক একটি উজ্জ্বল চক্রের আকার ধারণ করেছে। মনের মধ্যে চমক দিয়ে গেল—

এই কি সেই গল্পে শ্রুত সুদর্শন চক্র! তবে বুঝি তাকে বধ করবার উদ্দেশ্যেই তার আবির্ভাব! এক মুহূর্ত আগে যে সে সহস্রবার মৃত্যুকামনা করেছিল, ভয়ে বিহ্বল হল তার মন। তখনি মনে হল চক্র যদি এসে থাকে, তবে নিশ্চয় সঙ্গে আছেন চক্রধারী। ভয়ের থেকে উছলে উঠল আনন্দের বিদ্যুৎ। মেঘ বিদ্যুৎ অবিচ্ছেদ্য, ভয় আনন্দও কি তাই নয়!

এ কে! সম্মুখে তার এ কে? কে এই দিব্যদেহধারী পুরুষ? কেমন করে চিনবে জরা, এমন তো কখনো চোখে দেখেনি! তবে বুঝলো, যাঁর প্রভায় অন্ধকার জ্বলে উঠেছে, মুক্তিদান তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। পা জড়িয়ে ধরবার আশায় সে নত হল, নত হতেই চোখে পড়লো, বাম চরণে একটি রক্তের রেখা। মূর্ছিত হয়ে পড়বার আগে বুঝলো তবে তো বাসুদেবই এসেছেন বটে। কিন্তু কেন? দণ্ডদান, না মুক্তিদান—কি তাঁর অভিপ্রায়! যিনি এমন উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল সমুজ্জ্বল, যিনি এমন নির্জন প্রসন্ন সুন্দর, তিনি কি মুক্তি না দিয়ে দণ্ড দিতে পারেন! জরা মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই শান্ত্রী কারাকক্ষের দরজা খুলে গুঁতো মেরে জাগিয়ে দিল জরাকে। জরার তখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি, সে বলে উঠল, দয়াময়, তবে সত্যই এসেছ!

বাপ রে, বেটা যে এক রাত্রির মধ্যে মস্ত ধার্মিক হয়ে উঠল।

এই বলে মারলো আর এক গুঁতো।

জরা বুঝলো, এ ব্যক্তি আর যেই হোক দয়ামায়া তার বিশেষ গুণ নয়।

চল্ বেটা।

জরা শুধালো কোথায়?

বিকট মুখভঙ্গী করে শান্ত্রী বলে উঠল, আবার কোথায়! বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছি, নে এগো।

জরা ভাবলো বাসুদেবের তো বৈকুণ্ঠেই বাস।

তারপরে পর পর অল্পক্ষণের মধ্যে তার যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ঘটলো, তা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সূচক মনে হল না। নাপিত এসে মাথা মুড়িয়ে দিল, দুজনে টেনে বসিয়ে দিল উল্টো করে গাধায়, একজন এক হাঁড়ি ঘোল ঢেলে দিল মাথার উপরে। তারপরে জনতার ধিক্কারধ্বনির মধ্যে এসে পৌঁছল দক্ষিণ মশানে। এখানে অসহায়ভাবে শুয়ে শুয়ে স্মরণ করছে বাসুদেবকে নয়, খট্টাসকে। বাসুদেবের আবির্ভাব মায়া হলেও খট্টাসের আবির্ভাব কখনো মিথ্যা হবে না। খট্টাসের সেই বিদায় আশ্বাস এখানে তার কানে বাজছে। রক্ষা করবে তো ভাই—জিজ্ঞাসার

উত্তরে থট্রাস বলেছিল, জরা, পুণ্যাত্মারা পাপীদের এড়িয়ে চলে বলেই তারা পরস্পরকে রক্ষা করে, পাপের ডোরে পাপীরা ঘনিষ্ঠ, সে-ডোরের বাঁধন বড় শক্ত।

জরা যখন এইসব চিন্তা করছিল, জনতা যখন বিলম্ব দেখে অধীর হয়ে উঠছিল, জয়ন্তী তখন জনতার একান্তে বসে কাঁদছিল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার সামর্থ্য তার হয়নি, সাহসেরও অভাব হয়েছিল। কি দেখতে কি দেখবে। জরার দণ্ড দেখতে আসেনি সে, প্রভুদয়াল ক্ষমাপত্র নিয়ে উপস্থিত হবেন, জরা মুক্তি পাবে, তখন তাকে নিয়ে ফিরে যাবে এই আশায় এসেছিল। কিন্তু কোথায় এই ভিড়ের মধ্যে প্রভুদয়াল! রাজা কি সত্যই তাঁর প্রার্থনা পূরণ করবেন! অন্যথা জরার দণ্ড অবধারিত—আশা-আকাঙ্ক্ষায়, আকাঙ্ক্ষার ভাগটাই বেশি, সে কাঁপছিল।

একজন প্রবীণা তাকে শুধালো, বৌ, কাঁদছ কেন?

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। প্রবীণা আবার শুধালো, তোমার কি হয়েছে?

এবারে জয়ন্তী বলল, মা, আমি বড় দুঃখী।

এ-সংসারে দুঃখী কে নয় বৌ, তার জন্য কাঁদতে গেলে সারাজীবন কেঁদেই কাটাতে হয়।

কোথায় দুঃখ মা! সবাই তো হাসছে। সবাই তো গোলমাল করছে।

ও সমস্তই কান্নার রকমফের বৌ, দেখোনি জল হিমে জমে কঠিন হয়, এ হলোও কান্নার রূপান্তর। আমার দুঃখের কথা যদি জানতে—

কিন্তু তার দুঃখের ইতিহাস বলা আর হয়ে উঠল না, গম্ভীর রবে দামামা বেজে উঠল। জনতা হৈ-চৈ করে উঠল, ঐ যে নগরপাল আসছে, এবারে হবে।

সত্যই মুখ্য নগরপাল শূলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘন ঘন দামামা বেজে সকলকে আশ্বাস দিচ্ছে, এবারে অপরাধীকে শূলে চড়ানো হবে। আশার উপকূল দেখতে পেয়ে জনতা শান্ত ভাব ধারণ করেছে।

একটা লম্বা লোকের মাথা আর সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। যারা দেখতে পাচ্ছিল না, তাদের সবিশেষ জ্ঞাত করছিল সে। কাছেই উপবিষ্ট ছিল জয়ন্তী। সব কথা সে শুনতে পাচ্ছিল।

লম্বা লোকটা বলে যাচ্ছে, এবারে চারজন শাস্ত্রী মিলে অপরাধীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছে। বাঁধন খোলা শেষ হয়ে গিয়েছে। শাস্ত্রীরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লোকটাকে। আহা, কিবা ভঙ্গিমে লোকটার! মাথা ন্যাড়া, ঘোল

চালায় মাঝে মাঝে সাদা হয়ে গিয়েছে। দেখো দেখো, লোকটার একেবারে ভয়ডর নেই, আবার টুল টুল করে তাকানো হচ্ছে! নে নে, ভালো করে সব দেখে নে, এখুনি জন্মের দেখা শেষ হয়ে যাবে।

জরতী শুনছে আর কাঁদছে।

লম্বা লোকটা বলছে, এবারে সকলে মিলে লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে শূলের দিকে, এখুনি চাপিয়ে দেবে। তারপরে পার্শ্ববর্তীদের আশ্বাস দিয়ে বলে, তখন তোমরা সবাই দেখতে পাবে।

এবারে সবাই মিলে লোকটাকে উঁচুতে তুলছে।

আরও কিছু সে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথা শেষ হতে পারলো না।

জনতার দক্ষিণ দিকে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য অনুভূত হল। কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, চুপ করো বাপু, শেষ মুহূর্তে রসভঙ্গ করো না—ইত্যাকার নানাপ্রকার শব্দ উঠতে থাকলো ভিড়ের মধ্যে থেকে। যারা ভিড়ের পিছনের দিকে দাঁড়িয়েছিল, তারা দেখতে পেলো হঠাৎ বিকলাঙ্গের দল উঠে দাঁড়িয়েছে; দেখতে পেলো বিকলাঙ্গগণ, কানা-খোঁড়া, ন্যুব্জ-কুব্জ প্রভৃতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। সকলে দেখে অবাক হয়ে গেল তাদের সকলেরই সুস্থ সবল শরীর, মাংসপেশী থেকে স্বাস্থ্যের বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কোথায় খুলে পড়েছে তাদের গায়ের মাথার পটি, আর যে লাঠিগুলো ভর করে তারা এসেছিল, সেগুলো অপূর্ব দক্ষতায় ঘূর্ণিত হচ্ছে তাদের হাতে। তারা সকলে শিক্ষিত সেনানীর মতো ব্যূহবদ্ধভাবে ঘূর্ণ্যমান লাঠি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সকলের আগে আগে খট্টাস। তখন জনতার বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে পালা পালা ভাব, ভাবের সঙ্গে ভঙ্গী, যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো, সকলের আগে পালালো শান্ত্রী ও নগরপাল। মুহূর্তমধ্যে দক্ষিণ মশানের মস্ত মাঠ জনশূন্য হয়ে গেল। তখন খট্টাস পরিচালিত জনব্যূহ বিমূঢ় জরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল। জয়ধ্বনি আসবামাত্র খট্টাসের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, চলো সকলে নগরের দিকে, আজ রাজবাড়ি লুটবো। তারপরে সেই করাতে কাঠ চেরা অট্টহাসি—যা শুনলে গায়ের রক্ত জমে হিম হয়ে যায়। খট্টাসের আদেশ পেয়ে জনতা আবার জয়ধ্বনি করে উঠল আর তারপরেই বাঁধভাঙা স্রোতের মতো সবাই ছুটলো নগরের দিকে।

ঠিক সেই সময়ে রাজার ক্ষমাপত্র হাতে নিয়ে প্রভুদয়াল এসে উপস্থিত হয়ে দেখল মশান জনশূন্য, কেবল একান্তে একটি নারী মূর্ছিত। কাছে গিয়ে দেখল জরতী। তার চৈতন্য সম্পাদন করে তাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। প্রকৃত অবস্থার কিছুই সে জানতে পেলো না, জরতীও জানতে পেলো না, তবে এইমাত্র

জানলো যে, জরা জীবিত আছে।

সভাসদহীন বিরাট সভাগৃহে একটি দীপশিখা-নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র ছায়াসঙ্গী রাজা উগ্রসেন সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। সারাদিন এইভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। মাঝে মাঝে আর্ত নগরের তুমুল হলহলার উচ্ছ্বাস এসে সমুদ্রতরঙ্গের অভিঘাত যেমন তীরভূমিতে পৌঁছয় তেমনিভাবে আঘাত করেছে বৃদ্ধ রাজার কর্ণে। করবার কিছু নেই। রাজার হাত-পা অনুচর-পরিচর, তারা সকলেই পলাতক, নয় লুঠেরাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুণ্ঠনে নিযুক্ত। অরক্ষিত নগরের অসহায় নৃপতি।

যদুবংশের বীরগণ সকলেই মৃত। এখন যারা আছে সকলেই বেতনভুক। সারা মাসের বেতনের চেয়ে বেশি একদিনে জুটবে আশায় তারা লুঠেরাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অমাত্যগণ বৃদ্ধ, তারা অশক্ত। মহিষীদের অনেকে বলভদ্র ও বাসুদেবের সঙ্গে সহমৃতা। অন্যেরা অন্তঃপুরে রোরুদ্যমানা। আর রাজপুরনারীরা! তাদের কথা ভাবতে চায় না উগ্রসেন, তাদের কীর্তি কিছুদিন হল রাজার কানে এসে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। কিছু করবার নেই।

এমন সময়ে পদশব্দে সচকিত হয়ে উঠলো উগ্রসেন, শুধালেন, কে?

মহারাজ, আমি কঞ্চুকী।

নগরের কি সংবাদ?

দস্যুরা নগর পরিত্যাগ করে গিয়েছে।

তার মানে নগরে লুণ্ঠন করার মতো আর কিছু নেই। শাস্ত্রীগণ কি করলো?

মহারাজ, কতক দস্যু-হস্তে নিহত, অধিকাংশ দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

রাজপুরনারীগণ?

কঞ্চুকী কোন উত্তর দিল না।

কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন কঞ্চুকী? থাক, তোমার নীরবতাই উত্তর। অর্জুনকে আনতে আহুক কবে যাত্রা করেছে?

তা ক'দিন হল মহারাজ।

এখনো ফেরেনি? দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুর পথ কত যোজন কঞ্চুকী?

যাতায়াতে অনেক শত যোজন পথ, মহারাজ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উগ্রসেন বললেন, যাতায়াতে অনেক শত যোজন পথ ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

কঞ্চুকী নিঃশব্দে প্রস্থান করলো।

প্রবলপ্রতাপশালী যদুবংশের রক্ষক মহারাজা উগ্রসেন মাথায় হাত দিয়ে একাকী বসে রইলেন। এমনি সংসারের রাজগী বটে! তীব্র অট্টহাসি ধ্বনিত হল। কে হাসে! না, শূন্য কক্ষের আলো-আঁধারিতে গোটাকতক চামচিকে উড়ছে, তাদেরই পাখার শব্দ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

কুরুক্ষেত্রে মহাহব শেষ হইয়া গেলে ভারতব্যাপী নিস্তব্ধতার যবনিকা টানিয়া দিল। সে রকম স্তব্ধতাও বুঝি কথনো কোন দেশে দেখা দেয় নাই, সে রকম রোদনের ধ্বনিও কথনো শুনা যায় নাই। শুধু নিস্তব্ধতা বুঝি অসহ নয়, কিন্তু সঙ্গে যদি রোদনের রোল থাকে তবে তাহা অতিবড়-পাষণ্ডের পক্ষেও সহিষ্ণুতার অতীত হয়। মেঘাবৃত অমারজনীর ভৈম অন্ধকার যেমন ক্ষুদ্র দীপ-বর্তিকার আলোয় দৃশ্যগোচর হইয়া উঠিয়া হৃদয় ভয়ে সঙ্কুচিত করিয়া দেয় ইহাও অনেকটা সেই রকম। অনেকটা তবে সর্বৈব নয়। অমারজনী নৈসর্গিক নিয়ম কিন্তু এ মহাযুদ্ধ কোন্ নিসর্গের নিয়মসঞ্জাত! তারপরে সামান্য আঠারোটি দিনের মধ্যে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া যাওয়ায় অকস্মাতের নখচঞ্চু এক মুহূর্তের মধ্যে যেন সমস্ত দেশটার হৃদয়পিণ্ডকে অতর্কিতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। কি হইল বুঝিতেও কিছু সময়ের প্রয়োজন, এক্ষেত্রে তাহাও পাওয়া গেল না। যে দুঃখ শনৈঃ শনৈঃ আসে তাহার তীক্ষ্ণতা আর তেমন আঘাত করে না। আকস্মিক দুঃখই দুঃখ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ থেকে প্রভাস, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা যবনিকায় আচ্ছাদিত হইল, সমগ্র জনসংখ্যার আঠারো অক্ষৌহিণী জীবলোক হইতে অপসারিত হইল। জেতা-বিজিতে আর বড় প্রভেদ রহিল না, সকলেরই গৃহে একই রোদনের রোল, সকলেরই গৃহে একই হাহাকার। যেদিকে তাকাও শূন্য গৃহ, যেখানে যাও নাবালক ও নারী, রুগ্ন ও অশক্তগণ। কালবৈশাখীর ঝড়ে এক লহমায় আমের মুকুল ঝরিয়া গিয়া কানন যেমন রিক্ত হইয়া যায়, এই মহাকালবৈশাখীতে পুরন্ধ্রীগণের শঙ্খ কঙ্কন কেয়ূর প্রভৃতি স্খলিত হইয়া পড়িল, সুমেরু ও কুমেরুতে এক রাত্রের তুষারপাতে যেমন দিগ্‌বিদিক সাদা হইয়া যায়—এখানেও তেমনি বিধবার শুভ্র বসন চারিদ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সিংহাসনে আরোহণ করিতে গেলে এমন অনেক ক্রন্দন, এমন অনেক দুঃখ, এমন অনেক রক্তপ্রবাহ অতিক্রম করিতে হয়। সিংহাসনে চড়া কি সহজ ব্যাপার! না জানি সিংহাসন সৃষ্টি করিয়াছিল কে! পদ্মাসন বিধাতার সৃষ্টি, সিংহাসন শয়তানের।

ভারতের বুকফাটা অশ্রুপ্রবাহের এক অঞ্জলি ধরিয়া রাখিয়াছে মহাভারতের স্ত্রীপর্ব, সমস্ত ধারণ করিতে পারে এমন মহাকাব্য ও মহাকবি সম্ভবে না।

যুদ্ধে যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিল এবারে মহামারী আসিয়া তাহাদের দাবি করিল। মহামারীর পথ প্রশস্ততর করিয়া দিল দুর্ভিক্ষ। কে আগে কে পরে বিচার

নিরর্থক, ও দুই প্রায় একসঙ্গে আসে, ওরা শয়তানের যমজ সন্তান। হাজারে হাজারে মরিল, লাখে লাখে মরিল, কে তাহার হিসাব রাখে! কেহ রোগে মরিল, কেহ অনাহারে মরিল, অনেকেই দুইয়ের অভিঘাতে মরিল। মহাভারতকার তাহার হিসাব রাখেন নাই, জনসাধারণের দুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করে নাই, জন-অসাধারণদের লইয়াই তিনি ব্যস্ত। কিন্তু না, বোধ করি অবিচার করিলাম, সে দুঃখের তীব্র প্রবাহে নামিলে তিনি ভাসিয়া যাইতেন, মহাভারত আর লেখা হইত না, যেটুকু জানিতে পাইয়াছি তাহাও জানিতাম না। ঐ এক গণ্ডূষ অশ্রু দেখিয়া অশ্রুসমুদ্র কল্পনা করিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। মহাকবিরা দীপশিখা জ্বালেন, চরাচর চোখে পড়ে; অকবিরা দাবানল জ্বালায়, সব পুড়িয়া মরে, নিজেরা সুদ্ধ।

ভারতযুদ্ধে দেশের ক্ষাত্রশক্তি সমূলে বিনষ্ট হইল ইহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ উক্তি। যদুবংশ ক্ষত্রিয়, তাহারা আরও ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিল। তাছাড়া যুদ্ধ যে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই করিত এমন নয়, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, তাহারা বীর ছিল। আবার রাজর্ষি জনক ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কৃষিকার্য করিতেন। এইসব উদাহরণ বুঝাইয়া দেয় যে বর্ণভেদ সত্ত্বেও কর্মে ভেদ ছিল না, যদিচ স্থূল-ভাবে ভেদরেখা ছিল বটে। কাজেই বুঝিতে পারা উচিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত আঠারো অক্ষৌহিণীর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষত্রিয় হইলেও অন্য বর্ণের লোকেরও অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র (যদি ঘটোৎকচকে তাহা বলা যায়) প্রভৃতিও নিহতদের মধ্যে ছিল। কেবল একটি কথা সত্য। ভারতের রাজন্যবর্গ প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ক্ষত্রিয়। ইহার ফল বড় ভয়ানক হইল। সেকথা পরে বলিব, এখন অন্য কথা।

হঠাৎ দেশের প্রজাসংখ্যার অতিবৃহৎ অংশ লোপ পাওয়ায় একটা বৃহৎ শূন্যতার সৃষ্টি হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য প্রভৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হইল। প্রধান নগরগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িল, জনপদসমূহও জনবিরল হইল, অকর্ষিত কৃষিক্ষেত্র অত্যল্পকালে আগাছায় ভরিয়া উঠিল, আর দুই-এক বছরের মধ্যে জনপদ ও নগরগুলি অরণ্যে পরিণত হইয়া শ্বাপদের বাসভূমিতে পরিণত হইল। পৃথিবীর মাটিতে উদ্ভিদ ও শ্বাপদের মৌলিক অধিকার, সেই অধিকার তাহারা ফিরিয়া পাইল। প্রজার যে-অংশ মহামারী ও দুর্ভিক্ষের হাতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা শ্বাপদের পেটে গেল। এহেন অবস্থায় মহাশূন্যতা, মহাস্তব্ধতার এবং মহাবিষাদের মধ্যে পাণ্ডবগণ নিঃসপত্ন। রাজ্য লাভ করিলে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এমন মহাপ্রহসন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

ভারতের এই রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা বহির্জগতে প্রচার হইতে বিলম্ব হইল না। উত্তর-পূর্বে, ম্লেচ্ছ, বাহ্লীক, গান্ধার প্রভৃতি সীমান্তবহির্গত ও সীমান্তশায়ী রাজ্যগুলি এবারে আমিষলুব্ধ জন্তুর মতো চঞ্চল হইয়া উঠিল, পাণ্ডব-কৌরবের মিলিত বাহুবলে এতকাল তাহারা শাসিত ছিল। মুমূর্ষু বীরকেও লোক ভয় করে, মৃত বীরের কাছেও অগ্রসর হইতে দ্বিধা করে। ভারতকে দুর্বল, ক্ষাত্রশক্তিশূন্য জানিয়াও তাহারা স্থগিতগতি হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তারপরে যখন ভারতযুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে অন্তঃসারশূন্য রাজ্য নাবালক পৌত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বৈরাগ্য জন্মিয়াছে অছিলায় পাণ্ডবগণ হিমালয়ের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার উদ্দেশ্যে মহাপ্রস্থান করিল তখন আর বহিঃশত্রুর দ্বিধা-সঙ্কোচের কারণ রহিল না। আততায়ী কর্তৃক ভারত আক্রমণ শুরু হইয়া গেল। ভারতযুদ্ধের আগে ভারতবর্ষ কখনো বহিঃশত্রুর অধীন হয় নাই। তারপর হইতেই আততায়ীর অভিযান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ইহাই ভ্রাতৃযুদ্ধের পরম পরিণাম। এত কথা কেন বলিলাম যথাস্থানে তাহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে।

॥ ২ ॥

সেদিন দক্ষিণ মশান থেকে ফিরে এসে জরতী শয্যাগ্রহণ করলো। কতবার সে ঘটনাবলীকে ক্রম অনুসারে সাজাতে চেষ্টা করেছে, পেরে ওঠেনি। কতক দূর ঠিক এসে মালিকাছিন্ন হয়ে ঘটনাগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে, আবার কুড়োতে লেগে যায়, কিন্তু সব কুড়িয়ে আনবার আগেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠে আবার সেই ব্যর্থপ্রয়াস। মাঝে মাঝে নিদ্রা না এলে সমস্ত মন অসাড় হয়ে গিয়ে দুঃখ অনুভব করবার শক্তিটুকু বোধ করি চলে যেতো। তবে কি দুঃখানুভূতির ভূমিকারূপেই বিধাতা নিদ্রার সৃষ্টি করেছেন!

কাশ্যপের মা যতবার এসে ডেকে গিয়েছে, জরতী মা ওঠো, মুখ-হাত ধোও, একটু দুধ খেয়ে নাও।

অবোধের মত জরতী তাকিয়ে থেকেছে, কথার অর্থ যেন তার মাথায় প্রবেশ করেনি।

কাশ্যপের মায়ের অনেক কাজ, তার মধ্যে প্রধান সমুদ্রের ধার থেকে শামুক-ঝিনুক কুড়িয়ে আনা, ওইগুলোর বদলে তার সংসার চলে। বসে থাকতে পারেনি। ফিরে এসে দেখেছে জরতী তেমনি বিহ্বলের মতো পড়ে আছে, ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে যে বেওয়ারিশ জমি সেখানে তার মনটা ভ্রাম্যমাণ।

দক্ষিণ মশানের ব্যাপারটা কি করে কি হল বুঝতে পারে না। একবার মাত্র এক লহমার জন্যে দেখতে পেয়েছিল জরাকে, সে চেহারা ভুলতে পারে না কিছুতে। জরা সুস্থ সবল নীরোগ, কালো পাথর কুঁদে-কাটা তার দেহের গড়ন। মাথায় কালো কোঁকরা চুলের কী বিন্যাস, টানা চোখ, চিবুকের মাঝখানে একটু গর্ত, লোহার শাবলের মতো দু বাহু, আর কী সমাহিত শক্তি! সবশুদ্ধ মিলিয়ে যেন কালোর একটা অচঞ্চল ঘূর্ণি। পাড়ার মেয়েরা চেয়ে দেখতো। জরতী মনে মনে হাসতো—ঐ দেখা পর্যন্তই সার, কাছে ঘেঁষতে পারবে না, ও আমার। আর কী চেহারা দেখলো সেদিন! এই দুদিনের মধ্যে কালোতে যেন মরচে ধরে গিয়েছে! মাথার চুল গেল কোথায়, সাদা ওগুলো কি! সে যে ঘোলের দাগ কেমন করে বুঝবে অবোধ নারী! দণ্ডবিধি সম্বন্ধে সে যে নিতান্ত অজ্ঞ! হয়তো আরও একটুক্ষণ দেখতে পারতো, কিন্তু ইতিমধ্যে চোখের জলের পর্দা নামলো মাঝখানে। প্রতিবিম্ব ধারণের জন্যই জলের সৃষ্টি, চোখের জলের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সমস্ত আচ্ছন্ন করে দেয়। সে ভাবে, এ কি মূর্তি! এর চেয়ে যে না দেখা ভালো ছিল! সুন্দরের মধ্যে কোথায় ছিল এমন বীভৎসতা! কিন্তু বেশী ভাববার অবকাশ পায় না। হঠাৎ একটা তুমুল হট্টগোল ওঠে, সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সে বুঝি মুহূর্তের জন্যে সম্বিৎ হারিয়ে ছিল। জ্ঞান হয়ে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভুজী—আর সমস্ত মাঠটা জনশূন্য।

প্রভুজী বলেন, ওঠো মা।

সে বলে, জরাকে না পেলে উঠবো না।

জরাকে অবশ্যই পাবে। তবে আজ কি কিছুকাল পরে বলতে পারি না।

তবে কি—

না, তার মৃত্যু ঘটেনি।

তবে?

তাকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছে।

কারা?

ঠিক বুঝতে পারছি না, পরে খোঁজ করে দেখবো, এখন বাড়ি ফিরে চলো।

প্রভুজীর সঙ্গে সে বাড়ি ফিরে আসে।

প্রভুজী হাঁক দেন, মা'র কি নিদ্রাভঙ্গ হল?

ব্যস্তসমস্ত হয়ে জরতী বলে ওঠে, হ্যাঁ বাবা, আমি জেগেছি।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, সারারাত যায় জাগরণে গিয়েছে সে আবার জাগবে

কি করে ! জরতী ঘর থেকে বের হয়ে এসে প্রভুজীকে প্রণাম করে, ওটা তার নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

প্রভুজী হেসে বলে, মায়ের প্রাতঃপ্রণাম দিয়ে আমার দিবসটি আরম্ভ হয়।

লজ্জিত হয়ে জরতী বলে, বাবা, তাহলে তো আমার মঙ্গল হতো।

মনে মনে আমার বদলে বলে জরার। প্রভুজী আধা-সন্ন্যাসী হলেও লোকের মর্মজ্ঞ—ঐ মধুর ছলনাটুকু বুঝতে পারেন, বলেন, মঙ্গল হবে বইকি মা, তবে আমার আশীর্বাদের জোরে নয়, তোমার পুণ্যে।

আমার পুণ্যে ! অবাক হয়ে যায় জরতী।

অবাক হলে কেন মা ?

আমি সামান্য ব্যাধের স্ত্রী।

যিনি গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতিদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি ব্যাধ-পত্নীকে সৃষ্টি করেননি। এই যে এখানে ডোবায় জল ভরে রয়েছে আর ঐ যে মহাসমুদ্র দুই-ই কি একই কারিগরের হাতের তৈরী নয় !

কথা বলতে বলতে তারা সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছেছে। তখন জোয়ারের ঢেউয়ের ঝালরগুলো অব্যবহিতক্রমে একটার পরে একটা এসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে আর বালুর উপরে ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে নানা রঙের নানা আকারের শামুক ঝিনুক প্রভৃতি।

জরতী বলে, বাবা, আমি কিছু কুড়িয়ে নি, মাকে দেবো।

আজকের মতো তার কুড়ানো হয়ে গিয়েছে।

তবে না হয় থাকবে, কালকে কাজে লাগবে।

কেন মা, কালকে কি এত বড় সমুদ্রটা থাকবে না ! কালকের কাজ কাল, আজকের কাজ আজ।

জরতী বুঝতে পারে না এই দম্পতিকে, এই কদিনেও বুঝতে পারেনি।

শোন মা বলি, বলে প্রভুজী, শামুক ঝিনুকের বদলে আমরা চাল-ডাল সংগ্রহ করি এই তো। এখন দেখো আজকের খিদের জের যদি আগামীকাল টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে আগামী কালকের জন্যে আজকে জমিয়ে রাখবো কেন ?

জরতী বলে, বাবা সবাই তো তাই করে।

কেমন ? শুধায় প্রভুজী।

চাষী আগামী বছরের জন্যে ধান-চাল জমিয়ে রাখে; গেরস্তও যে-যেমন পারে জমায়।

ওরে পাগলী, তারা নির্ভর করে চাষের ওপরে, চাষ নির্ভর করে বৃষ্টির ওপরে —যা নাকি দেবতার খেয়ালের ব্যাপার। আমাদের সমুদ্র তো শুকোবে না। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে যদি আবার অগস্ত্য মুনি দয়া না করেন। এই বলে হেসে ওঠে।

ভারি ভালো লাগে তার হাসিটি জরতীর। শুধু মুখ চোখ নয়, সমস্ত মানুষটা যেন হাসতে থাকে। দেহ মন বাক্য সবাই অংশীদার ঐ হাসির। সর্বাত্মক হাসিতে সমস্ত মানুষটার প্রকাশ, ওতে বড় ফাঁকি চলে না।

তারপরে কথা থেমে যায়, দুজনে নীরবে এগিয়ে চলে সমুদ্রের দিকে। জরতী নীরব হলেও তার মনের কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রভুজীর। বলে, জরার সন্ধান এখনো পাইনি, তবে আশাও ছাড়িনি। লোক লাগিয়ে দিয়েছি মা, খুঁজে ঠিক বের করবে।

কুণ্ঠিত একটা 'কিন্তু' বের হয় জরতীর মুখ দিয়ে।

এর মধ্যে কিন্তু নেই মা, বেঁচে সে আছে এ বিষয়ে আমার মনে এতটুকু সংশয় নেই।

তবে কেন বাবা—

তার বাক্য শেষ হওয়ার আগেই প্রভু বলেন, তবে এই জন্যে যে, পৃথিবীটা ছোট নয়, আর পৃথিবীর লোকের সংখ্যাও নাকি অসংখ্য।

তাতে কি হয়েছে?

বুঝলে না মা, সে এখন লুকিয়ে থাকতে চায়। কতক লোক মিলে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে সত্য কিন্তু তাই বলে রাজদণ্ডের হাত থেকে তো রেহাই পায়নি। লুকিয়ে থাকতে হবে বইকি।

তবে কি চিরকাল লুকিয়ে থাকতে হবে?

রাজদণ্ড তো চিরকালের হিসাব করে না।

চিরকালের হিসাব তবে কার, বাবা?

যিনি রাজার রাজা, ভগবান।

বাসুদেব?

বাসুদেবও বলতে পারো, ক্ষতি নেই।

তবে তাঁর কথা বলো, শুনতে বড় ভালো লাগে।

বেশ তো, সন্ধ্যেবেলায় বলবো, কাশ্যপের মাও শুনবে, তারও ভালো লাগে।

তারপর তারা বাড়ির দিকে ফেরে।

প্রভুজী বাড়িয়ে বলেনি। জরার সন্ধানে লাগিয়ে দিয়েছে জগন্নাথকে, সর্বত্র

তার গতি, সর্বজনের সঙ্গে তার মেলামেশা, জয়াকে খুঁজে বার করবেই সে। জয়া যে জীবিত সে বিষয়ে সত্যই কোন সন্দেহ ছিল না প্রভুজীর মনে।

॥ ৩ ॥

সন্ধ্যাবেলা কুটিরের বাইরে বটগাছের তলে বসে তিনজনে—প্রভুদয়াল, অদিতি, জয়তী। কত বিষয়ে কথা হয়। শাস্ত্র, পুরাণ, কুরু-পাণ্ডব, বাসুদেব—কত বিষয়ে কত কথা। জয়তী অবাক হয়ে ভাবে, এত কথাও আছে সংসারে! কই, সে তো কিছুই জানতো না! এমনিভাবে কথাবার্তা চলতে চলতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়ে রাতের প্রহরের পর প্রহর চলে যায়, আকাশে তারার সংখ্যা বাড়তে থাকে, শুক্লপক্ষ হলে চাঁদ উজ্জ্বলতর হয়, কৃষ্ণপক্ষ হলে হাজার মানিক জ্বলে ওঠে হাজার ঢেউয়ের মাথায়। প্রভুজী বলে ওঠে, জয়তী মা, অনন্তনাগের হাজার ফণার কথা শুনেছ তো—আজকে নিজে চোখে দেখে নাও।

কই বাবা? বলে সচেতন হয়ে ওঠে জয়তী, কোথায় বাবা?

এতক্ষণ তার মন ছিল অন্য দিকে যদিচ শব্দগুলো বাতাসের নিয়মে অর্থ হারিয়ে ফেলে তার কানে প্রবেশ করছিল। এবারে কৌতূহলে বলল, কোথায় বাবা?

ঐ যে, সমুদ্রে।

জয়তী শুনেছিল সমুদ্রের মধ্যেই কোথাও থাকে অনন্তনাগ।

কোথায়?

ঐ যে হাজার ঢেউয়ে হাজার ফণা আর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে খদ্যোতের মতো মাণিক জ্বলছে।

জয়তীর আশাভঙ্গ হয়। এই কি অনন্তনাগ! অন্ধকার রাতে এ তো চিরকাল দেখছে।

তার আশাভঙ্গের ভাবটা বুঝতে পারে প্রভুদয়াল। মা, শাস্ত্রকারগণ সামান্য বস্তু দেখে অসামান্য কল্পনা করেন—এর চেয়ে বড় শক্তি তো আর নেই। সেইজন্যই তো তাঁরা নমস্য।

জয়তী শুধায়, শাস্ত্রকারেরা কি সব জানেন?

শোনো পাগল মেয়ের কথা! সব কথা কি জানতে পারে! তবে অনেকের চেয়ে বেশী জানেন।

আচ্ছা বাবা, অজান্তে পাপ করলে কি তার ফল ভোগ করতে হয়?

শাস্ত্রকারেরা নিশ্চয় জানেন।

তবে বলি শোনো, শাস্ত্রকারদের শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিশ্চয়তা বলে কিছু নেই।

অজান্তে পাপ করলে কেন ফল ভোগ করতে হবে, জোর দিয়ে শুধায় জরতী।

শিশু আগুনের স্বভাব জানে না, তবু তো তার হাত পোড়ে।

এর যথোচিত উত্তর খুঁজে পায় না জরতী।

কতবার সে মনে মনে ভেবেছে জরা তো জেনেশুনে বাসুদেবকে হত্যা করেনি, তবে কেন তার এহেন দুঃখ-দুর্দশা! প্রভুদয়ালের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার পরে একদিন লুকিয়ে বাড়িখানা দেখতে গিয়েছিল। সব ভস্মীভূত।

প্রভুজী বলে, মা, জরা না জেনে বাসুদেবকে হত্যা করেছে, তবে কেন তোমাদের কুটির পুড়ে গেল?

অবাক হয়ে যায় জরতী, কেমন করে জানলেন প্রভুজী!

সেটুকু বুঝতে বাধে না প্রভুদয়ালের। তুমি ভাবছ কেমন করে জানলাম। মা, ঘরের মায়া আর বটের ছায়া মনকে টানবেই। জানতাম তুমি যাবেই, জানলাম তোমার মুখ দেখে সে বাড়ি-ঘর আর নেই। এই তো দেখছ আমাদের চালচুলোর অবস্থা, মাথার ওপরে একখানা চাল আর পাকের জন্যে একটা চুলো। তবু যখন এখানে আসি মনটা শান্ত হয়। হয় না কাশ্যপের মা?

কাশ্যপের মা তালের পাতা দিয়ে চাটাই বুনছিল, সে কাজে এমনি তার হাত পেকেছে যে অন্ধকারেও দিব্যি বুনে যায়। প্রভু ঠাট্টা করে বলে, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও বুনতে পারে।

কাশ্যপের মা উত্তর দেওয়ার আগেই প্রভুজী সামনের দিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে, কি বাবা জগন্নাথ, কিছু খবর পেলে?

জগন্নাথ কখন উপচ্ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছে।

সে একটি প্রণাম সেরে নিয়ে বলল, চারদিকে লোক লাগিয়েছি, আমি নিজেও খুঁজছি। বোধহয় দু-একদিনের মধ্যে কিনারা করতে পারবো।

জরতী উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠে।

জগন্নাথ বলে, এতদিনে খবর মিলতো। কিন্তু বাবা, রাজধানীর যে অবস্থা এখন সমস্তই বে-খবর, বে-পাত্তা।

সমস্ত শুনছি, আগে বসো।

জগন্নাথ বলে, নগর এখন নামে রাজধানী। বাজারে গিয়ে শুনলাম যে, বসুদেব নাকি যোগস্থ হয়ে দেহরক্ষা করবেন, রাণী-মা'রা চিতারোহণ করে স্বর্গে যাবেন।

আর মহারাজা ?

তিনি আছেন অর্জুনের অপেক্ষায়, তাঁর হাতে যদুবংশের নারী আর শিশুদের সঁপে দিয়ে তিনিও যোগস্থ হবেন।

আর কি শুনলে ?

শুনলাম তো নানারকম কথা। যদুবংশের মেয়েরা নগর ছেড়ে যাওয়ার পরেই নাকি সমুদ্র এসে গ্রাস করবে সমস্ত নগরটা।

লোকজনের মতিগতি কিছু বুঝতে পারলে ?

অনেক লোক ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে গাঁয়ের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে, প্রতিদিনই যাচ্ছে।

কেন বলো তো ? তাদের কানে কি সমুদ্রগ্রাসের কথাটা উঠেছে ?

তা বলতে পারি নে, উঠলেও হয়তো বিশ্বাস করতো না।

তবে ?

এখানে থাকবে কি নিয়ে ? চাল ডাল বস্ত্র তরিতরকারির দাম দশগুণ হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ এসব এমন মহার্ঘ হতে গেল কেন ? ফুরিয়ে গিয়েছে নাকি ?

কিছু না বাবা, সমস্ত গুদামে চেপে রেখে বলছে মাল নেই, কখনো বা বলছে মহাজনে দাম চড়িয়েছে আমরা কি করবো। রাজা না থাকলে যা হয় তাই আর কি।

কেন, মহারাজ তো এখনো জীবিত।

বাবা, রাজা তো দশজনকে মিলিয়ে রাজা। মন্ত্রী শাস্ত্রী সৈন্যসামন্ত সব যদি যায় তবে এক রাজা আর কতটুকু !

তবে তো বড় চিন্তার কথা হল দেখছি !

আরও শুনলাম বাবা, কিঙ্কর ঠাকুরের দল নাকি এখন দেশ শাসন করবে।

কিঙ্কর ! চমকে ওঠে প্রভুদয়াল।

দুজনের অনেক বছরের অনেক আবর্জনা সরে গিয়ে প্রথম যৌবনের ছবি চোখে পড়ে, তার নিজের ও সতীর্থ অনন্তর। অধ্যয়নের শেষ অধ্যায়রূপে বেদান্তে পাঠ নেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল সমন্তপুরের বিখ্যাত বৈদান্তিক অধ্যাপক মহানন্দ স্বামীর চতুষ্পাঠীতে। সেখানে সতীর্থ পেলো অনন্তকে। দুজনেরই তরুণ বয়স, দুজনেই অধীতশাস্ত্র আর দুজনেই দেদীপ্যমান। কিন্তু অনন্ত একের উপরে সওয়াই। তার চেহারায়, মুখে চোখে এবং বুদ্ধিতে ক্ষুরের ধার ঝলমল করছে। তার দিকে তাকাতেই হবে অথচ বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাবে না।

এমন দুজনের মধ্যে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। এক্ষেত্রে হল উল্টো—ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। আচার্যদেব নামকরণ করলেন অনন্ত আর সান্ত।

কিছুদিন পরে অনন্ত প্রস্তাব করলো, প্রভু ভাই, গুরুগৃহে বাস তো কিছুকাল পরে, এবারে চলো সতীর্থগৃহে।

অনন্ত কয়েক বছর আগে সংসারী হয়েছে, প্রভুদয়াল তখনো অকৃতদার। গুরুর অনুমতি নিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে প্রভুদয়াল চলে এলো অনন্তের গৃহে। সংসারে তার স্ত্রী আর শিশুপুত্র। আনুষ্ঠানিকভাবে কোন নাম পাকা না হওয়ায় নানা জনে নানা নামে তাকে ডাকে। কেউ বলে চটক, কেউ বলে কপোত, কেউ বলে আর কিছু—যখন যা মনে আসে। অনন্ত যদি হয় হীরের চাঙড়, তবে তার ছেলে হীরের টুকরো, সর্বদা ঝকমক করছে। বেশ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটছে প্রভুদয়ালের। অধ্যয়ন করে যে সময় হাতে থাকে তা ভাগাভাগি হয়ে যায় পিতা ও পুত্রের মধ্যে, পুত্রের ভাগেই বোধ করি কিছু বেশি পড়ে।

অনন্ত বলে, প্রভু, একটা মজবুত দেখে নাম দাও ছেলেটার, যাতে চিরকাল টিকে থাকে।

প্রভু বলে, ভাই, নামের স্থায়িত্ব দাতার ওপরে নয়, গ্রহীতার ওপরে। এই দেখ না কেন, বাসুদেব এমন কিছু মজবুত নাম নয়—কিন্তু থাকবে চিরকাল।

ওসব দেবতা অবতারের কথা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কথায় এসো। আচ্ছা মজবুত নাই হল, এমন কিছু দাও যা অসামান্য, শুনলে থাকতেই হবে।

প্রভু বলল, এ মন্দ বলোনি। দাঁড়াও, একবার অমরকোষখানা আউড়ে দেখি।

পরদিন প্রাতে বলল, অনন্ত তোমার ছেলের নাম স্থির করেছি।

কি, স্বপ্নে পেলে নাকি?

প্রায় সেই রকম। কিঞ্জল্ক নামটা কি রকম?

শোনবামাত্র পছন্দ হয়ে গেল অনন্তর, বলল, একেবারে অসামান্যতায় অসামান্য, শুনলে ভুলবার উপায় নেই, অথচ অর্থটা কোমল।

আর মস্ত এই গুণ যে কোন মানবসন্তানকে ইতিপূর্বে এ নাম দেওয়া হয়নি।

আর এর পরেও দেওয়া হবে না। বলে অনন্ত।

কারণ এরূপ ভৈম সাহস আর কোন সন্তানের পিতার হওয়া অসম্ভব।

অনন্ত বলে, পিতার যদি বা হয় মাতার ভয়ে সে সাহস সম্বরণ করতে হবে।

প্রভু হেসে বলে, এক্ষেত্রেও তাই হবে নাকি? তাহলে তো এমন নামটা মাঠে মারা গেল।

মাভৈঃ! ভাই, আমি গৃহিণীকে রাজী করিয়ে নেবো, অসামান্যতার দিকে তার বড় টান।

তারপর হেসে উঠে বলে, তোমাকে দিয়েই আরম্ভ হয়েছে বুঝি।

তারপরে বলল, দেখো ভাই অনন্ত, বহুকাল পরে যদি তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা হয় চিনবার আর কোন উপায় থাকবে না। কেবল ঐ নামটি ছাড়া।

তারপরে একটু চিন্তা করে বলল, দেখো, তোমার এই ছেলে বিদ্যা বুদ্ধি মনীষায় তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে।

এবং ঐ নামের জোরে অসামান্যতাকেও, কি বলো প্রভু!

যাই হোক, নামটা ক্রমে বেশ কায়েম হয়ে বসলো—এখন সবাই ডাকে কিঞ্জল্ক। ভালোর চেয়ে অদ্ভুতে মানুষের আগ্রহ বেশী। কামধেনুর চেয়ে বেশী ভিড় জমে পাঁচ ঠ্যাংঅলা গোরুটার কাছে।

আহারের সময় হল যে—বলে অদিতি।

আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করে প্রভুদয়াল, কিন্তু ঘুম আসে না। জগন্নাথ-কথিত এই কিঞ্জল্ক ঠাকুর কে! যে-নামের দ্বিত্ব হবে না আশা করে অনন্তর পুত্রের নারকরণ করেছিল সেই অত্যদ্ভুত নাম কি আরও একজনের আছে! কিংবা সেই শিশুই জগন্নাথের কিঞ্জল্ক ঠাকুর। জগন্নাথ আরও বলেছিল, কিঞ্জল্ক ঠাকুরের আর তার দলের অসাধ্য কিছু নেই, তারাই সেদিন রাজধানী লুট করেছিল, এ অঞ্চলে যত রাহাজানি লুঠতরাজ নরহত্যা সমস্তই নাকি তাদের কীর্তি। জগন্নাথ বলেছিল, অনেকদিন থেকে তাদের দৌরাত্ম্য চলছে তবে বাসুদেব যতদিন জীবিত ছিলেন একটু চেপে-চুপে ছিল, এখন উদোম হয়ে উঠেছে।

প্রভুদয়াল জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন, রাজা?

রাজাকে কোন কালেই মানেনি, এখন তো তিনি নামেমাত্র রাজা। ওকথা ছেড়ে দাও বাবা।

বিনিদ্র প্রভু ভাবে, সেদিনের সেই সরল নিষ্পাপ কিঞ্জল্ক কি আজকের সমাজ-বিরোধীগণের নেতা! না, তা কখনো হতে পারে না।

তখনই মনে পড়ে যায় অনন্তর উদ্বেগপূর্ণ কথা। সে বলেছিল, ভাই প্রভু, তুমি সজ্জন পণ্ডিতবিশেষ, আমার বন্ধু, তোমার আশীর্বাদ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, ও হয়তো দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হবে। কিন্তু—

কিন্তু আসে কেন তোমার মনে অনন্ত?

আসবার যে সঙ্গত কারণ আছে।

কি কারণ খুলেই বলো না অনন্ত ভাই।

অনন্ত বলে, আমাদের বংশে হয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয় নয়তো দুর্দান্ত সমাজদ্রোহী দস্যু।

এ কী বলছ অনন্ত!

সত্যি কথাই বলছি, ইচ্ছে করে কেউ বংশের নিন্দা করে! আমার পিতা দিগ্বিজয়ী চতুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিল, কিন্তু পিতামহ আর প্রপিতামহ ছিলেন নরঘাতী দস্যু। সেই অপরাধে দুজনেরই রাজবিচারে শূলে দণ্ডের বিধান হয় তবে ব্রাহ্মণ বলে প্রাণদণ্ড হল না, নির্বাসিত হলেন তাঁরা পার্বত্যপ্রদেশে। সে অঞ্চলে এখনো তাঁদের নামে ত্রাসের সঞ্চার করে।

প্রাচীন কথা যাক, তুমি তো সাধুপুরুষ আর পণ্ডিত, তোমার পুত্র সম্বন্ধে এমন আশঙ্কা করছ কেন? আমার তো মনে হয় আগে যাই হয়ে থাক, হয়তো অশিক্ষা বা অসৎ সংসর্গে হয়ে থাকবে, তোমার পুত্র সম্বন্ধে এমন আশঙ্কার কারণ আছে বলে মনে হয় না।

তোমার আশীর্বাদ সত্য হোক, তবে অন্যদিকে যে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি।

অনন্ত, সমস্তই প্রহেলিকা বলে বোধ হচ্ছে। খুলে বলো অন্য দিকটা আবার কি?

অনন্ত বলে, রক্তের প্ররোচনা। আমাদের বংশে রক্তে আছে প্রতিভার বীজ। কখনো তাতে অমৃতফল ফলে, কখনো বিষফল। পাণ্ডিত্য ও দস্যুতা একই শক্তির রূপান্তর। আমাদের রক্তে একই সঙ্গে আছে আশীর্বাদ আর অভিশাপ। এ থেকে নিষ্কৃতি নেই আমাদের বংশের কারো।

তবে কি তুমি বলতে চাও রক্তের প্ররোচনায় আমরা চলতে বাধ্য? স্বাধীন ইচ্ছা বলে আমাদের কোন সত্তা নেই?

এর উত্তর সংক্ষেপে আছে এবং নেই।

বিস্তারিতভাবে বলো, দাবি করে প্রভুদয়াল।

ধনীর গৃহে নাচের আসরে গিয়ে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছ যে, সভাস্থলে চারদিকে ঠাসাঠাসি ভিড়, ন স্থানং তিলধারণং, কিন্তু মাঝখানটায় খানিকটা বেশ ফাঁকা। কেন বাপু, ঐ ফাঁকটুকু কেন? আরে ওখানে যে নাচ হবে। আমাদের জীবনের কাঠামো মোটামুটি রক্তের শাসনে সুনির্দিষ্ট, সেখানে এতটুকু স্বাধীনতা নেই তবে মাঝখানে একটুখানি খালি আছে, সেখানে স্বাধীন ইচ্ছার লীলা। ভাই প্রভু, আমি যা হয়েছি তা আমার অতিবৃদ্ধ পুরুষের রক্তের শাসনের ফল—ভালো এবং মন্দ দু-ই। এবারে বুঝলে কিঙ্কর সম্বন্ধে উদ্বেগের কারণ?

সেই অনেককাল আগেকার কথা। হ্যাঁ, তা প্রায় ত্রিশ বৎসর হবে বইকি, মনে পড়ে যায় প্রভুদয়ালের। স্বভাবতঃই মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, নিদ্রা যদি না আসে তাতে নিদ্রার দোষ দেওয়া চলে না। ঐ একটি অদ্ভুত নামের স্মৃতি উসকে খুঁচিয়ে দিল অনেককাল আগেকার ছাই-চাপা-পড়া স্মৃতি। অনন্তর গৃহ ও দুমস্তপুরের চতুষ্পাঠী ত্যাগ করবার পরে আর কখনো অনন্তর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তাতে কি আসে-যায়, মনের মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ড! পূর্বতম পুরুষ থেকে অনাগত উত্তরতম পুরুষ সমস্তই স্মৃতি ও প্রত্যাশারূপে মনোব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত।

সারারাত তার মনের মধ্যে অন্ধ বাদুড়ের মতো পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে—এই কিঙ্কঙ্ক কে! রাজশাসনের স্থলে যে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়! জগন্নাথের মুখে তার সম্বন্ধে শুনেছিল, লোকটা এমন দুর্ধর্ষ আর তার দলবল এমন ভারী ও দুর্বিনীত যে অনায়াসে শাসনপরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সমর্থ। কিঙ্কঙ্ক সম্বন্ধে তার কৌতূহল থাকলেও আসল জিজ্ঞাসা ছিল জয়া সম্বন্ধে, তার খোঁজখবর করতে জগন্নাথকে বলে দিয়েছিল। প্রভুর ধারণা জয়া জীবিত! তখনই মনের মধ্যে খোঁচা মারে, যদি সে সত্যই কিঙ্কঙ্কের দলভুক্ত হয়ে থাকে। ওরকম একটা দুঃসাহসী দল ছাড়া সেদিন আর কারা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে!

জয়ার সম্বন্ধে প্রভু আশা না ছাড়লেও মনের নিভৃতে জয়তী ছেড়ে দিয়েছে তার জীবিত থাকার প্রত্যয়, তবে মনের উপরতলায় এখনো আশাটা ছাড়েনি। যে নৌকোখানা আগাগোড়া বানচাল হয়ে নদীগর্ভে নিমজ্জিত এখনো তার মাস্তলের আগায় নিশানটা আশা-সমীরণে আন্দোলিত।

॥ ৪ ॥

সেদিন সন্ধ্যায় জয়তী বলল, বাবা, আজ একটু বাসুদেবের কথা বলো।

প্রভুদয়াল এই রকম প্রশ্নই আশা করছিল, তবে জয়তীর জিজ্ঞাসার আশায় ছিল। অনেককালের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, মনে প্রশ্ন না জাগলে কোন বিষয়ের উত্থাপন আর খিদে না হলে খাদ্যগ্রহণ—কোনটার ফল ভালো হয় না। যদিচ সে জানতো জয়া জীবিত তবু দৈবের কথা বলা যায় না। জয়তীর মনটা যদি ভগবদ্‌মুখী হয়, সে তো মঙ্গলের কারণ।

প্রভু বলল, মা, বাসুদেবের কথার কি অন্ত আছে, কোথা থেকে আরম্ভ করবো ভাবছি।

জয়তী বলল, বাবা, তত্ত্বকথার আমি কি বুঝবো, যে-সব কথা আমি বুঝবো তাই বলো।

বেশ বলেছ মা, তত্ত্বকথার আমিই বা কি বুঝি !

এই বলে সে আরম্ভ করলো, বাসুদেব আমাকে খুব কৃপা করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাত্রা করবার আগে আমাকে বললেন, প্রভুদয়াল, তুমি সঙ্গে চলো।

আমি বললাম, প্রভু, আপনি যখন বলছেন যাবো, আপনার অনুরোধ আদেশ। কিন্তু প্রভু, সেখানে গিয়ে আমি কি করবো, যুদ্ধবিগ্রহের আমি কিছুই জানি নে, আমি নিরীহ ব্রাহ্মণ।

আমার কথা শুনে বাসুদেব হেসে বললেন, সে কী হাসি, এক মুহূর্তে মনের মধ্যে আলো জলে ওঠে, বললেন দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এঁরাও তো ব্রাহ্মণ, তবে অবশ্য তোমার মতো নিরীহ নন। ভয় নেই প্রভুদয়াল, তোমাকে অস্ত্রধারণ করতে হবে না, রণক্ষেত্রেও যেতে হবে না, তুমি থাকবে উপপ্লব্য নগরে, সেখানে পাণ্ডব রমণীগণ থাকেন।

এর পরে আর কি কথা, চললাম বাসুদেবের সঙ্গে। যথাসময়ে উপপ্লব্য নগরে গিয়ে পৌছলাম, বাসুদেবের অনুগ্রহে আমাকে কোনরকম অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

জয়তীর বড় কৌতুহল এই মহাযুদ্ধের বিবরণ শুনবার। শুধালো, বাবা, কোনদিন রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন ?

গিয়েছিলাম বইকি। তবে দুদিন মাত্র, একদিন যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে, একদিন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে। বাসুদেব বললেন, প্রভুদয়াল, যুদ্ধ না হয় নাই করলে, একবার যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখে আসতে ক্ষতি কি !

তারপরে সে আরম্ভ করে, কি বলবো মা, বর্ণনা করি এমন ভাষা নেই। কুরুক্ষেত্রের মাঠ সীমাহীন, অনেককাল আগে একবার তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিলাম। সেদিন গিয়ে দেখি, সে-মাঠের চেহারা বদলে গিয়েছে। দু'দিকে বড় বড় ধবল শিবির, হাতী ঘোড়া রথ পদাতিক গিসগিস করছে, আর কত রকম যে অস্ত্রশস্ত্র—দেখা দূরে থাকুক, তাদের নামগুলো পর্যন্ত জানি নে। আমি তো মা ভয়ে ভয়ে দূরে থাকি, কি জানি, কখন কোন্‌টা ছুটে গিয়ে গায়ে লাগে। খোন্তা কুড়ুল কোদাল লাঙল থাকতে মানুষে কেন যে অস্ত্রশস্ত্র বানায় বুঝতে পারি না। আর সে কি বলবো মা, যোদ্ধাদের সে কী সাজসজ্জা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মে-চর্মে আচ্ছন্ন, তার ওপরে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে, তাকানো যায় না। আমি তো দূর থেকে নমস্কার করে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসি।

জয়ন্তী শুধায়, আর একদিন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে গিয়েছিলেন ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আরম্ভ করে, সেদিন না গেলেই বুঝি ভালো ছিল, কিন্তু না বলবার উপায় নেই—বাসুদেবের আদেশ। কি দেখেছিলাম আর কি দেখলাম! বুঝলাম সমস্তই বাসুদেবের লীলা, আঙুল দিয়ে যুদ্ধের সূচনা আর তার পরিণাম দেখিয়ে দিলেন। বাসুদেব সকালবেলাতেই বললেন, চলো প্রভুদয়াল, আজ একবার দেখে আসবে রণক্ষেত্র, সেদিন দেখেছিলে, আজ আর একবার দেখো।

প্রভুদয়াল বলে চলে, বাসুদেবের সঙ্গে রথে চলেছি। যখন কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পড়েছি এমন সময়ে কানে প্রবেশ করলো এক বিলাপধ্বনি, সে-রোদন যেন মেদিনীর গর্ভ থেকে বিরাট একটা জলস্তম্ভের মতো আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে, না দেখতে পাচ্ছি তার মূল, না দেখতে পাচ্ছি তার শিখর। পরে বুঝেছিলাম জলস্তম্ভই বটে! যত কৌরব বীর নিহত হয়েছে, তাদের পত্নী মাতা ভগ্নীগণের সঞ্চিত অশ্রু বাষ্পীয় স্তম্ভাকারে আকাশে উঠে গিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটছে।

কার পায়ে গো ? এই প্রথম কথা বললো অদিতি, এতক্ষণ সে নীরব শ্রোতা ছিল।

কার পায়ে কেমন করে বলবো কাশ্যপের মা, ওপারে কি আছে কি জানি।

এই দারুণ কাহিনী শোনবার আগ্রহে শুধু দুটি নারী নয় আকাশের সমস্ত তারাগুলো সংযত নীরব হয়ে আসন গ্রহণ করে, ভাটার সমুদ্র স্বাভাবিক কল্লোল স্থগিত রাখে। অধিক কি, চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতা শ্বাস রুদ্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে।

প্রভুদয়াল বলতে থাকে, রানীমাতা গান্ধারীর খেদবাক্য দীর্ঘকাল আগে শুনেছিলাম, আজও চোখের জলে ক্ষোদিত হয়ে আছে মনের মধ্যে। মা, জলের মতো তীক্ষ্ণ আর কিছু আছে কি! স্ফটিকের পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যায় ওর কোমল স্পর্শে। এ সংসারে যা কিছু, যত কোমল তত কঠিন।

গান্ধারী দূর থেকেই দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিনীর অধিপতি দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন করে রক্তাক্ত দেহে শুয়ে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই যে, নারীরা নিহত পতিগণের পরিচর্যা করছেন। লক্ষ্মণ-জননী দুর্যোধনপত্নী মস্তকে করাঘাত করে পতির বক্ষে পতিত হয়েছেন। আমার পতি-পুত্রহীনা পুত্রবধূরা আলুলায়িত কেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহীন দেহ এবং দেহহীন মস্তক দেখে

অনেকে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণী পত্নী মাংসলোভী গৃধ্রদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ শোন। শ্বাপদগণ আমার পুত্র দুর্মুখের মুখমণ্ডলের অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাঁকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ অধিক শৌর্যশালী বলত সেই অভিমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাট-দুহিতা বালিকা উত্তরা শোকে আকুল হয়ে পতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ করে বলছেন, বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ'মাস পরেই নিহত হলে! ওই দেখ, মৎস্যরাজের কুলস্ত্রীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের পত্নী জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতলে পড়ে গেছেন, শ্বাপদগণ কর্ণের দেহের অল্পই অবশিষ্ট রেখেছে। গৃধ্র ও শৃগালগণ সিন্ধু-সৌবীররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করছে, আমার কন্যা দুঃশলা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছে। হা-হা, ওই দেখ, দুঃশলা তার পতির মস্তক না পেয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে ঊর্ধ্বরেতা সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণপত্নী কৃপী শোকে বিহ্বল হয়ে পতির সেবা করছেন, জটাধারী ব্রাহ্মণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ শকুনিকে শকুনগণ বেষ্টন করে আছে, এই দুর্বুদ্ধিও অস্ত্রাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন।

তারপর গান্ধারী বললেন, মধুসূদন, তুমি কেন এই যুদ্ধ হাত দিলে? তোমার সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফলভোগ করতে হবে। পতির শুশ্রূষা করে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি, তার দ্বারা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—তুমি যখন কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তোমার জ্ঞাতিগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছত্রিশ বৎসর পরে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাত্যহীন পুত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের নারীরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমাদের নারীরাও সেইরূপ হবে।

মহামনা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করে বললেন, দেবী, আপনি যা বললেন, তা আমি জানি; যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যই আপনি অভিশাপ দিলেন। বৃষ্ণিবংশের সংহারকর্তা আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবের অবধ্য, তাঁরা পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উক্তি শুনে পাণ্ডবগণ উদ্বিগ্ন ও জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হলেন।*

* মহাভারত—সারানুবাদ, স্ত্রীপর্ব, রাজশেখর বসু

প্রভুদয়াল অনেকক্ষণ থেমেছে, তবে শ্রোতা দুজনের আগ্রহ থামেনি। তাদের মনে হচ্ছে কথা এখনও শেষ হতে বাকি। যে-কথা শেষ হলেও মনে হয় যে শেষ হয়নি, তাই নিয়েই কাব্য। তখন সমস্ত আকাশ ওই নিদারুণ দুঃখে বেদনায় টনটন করছিল। আর সমুদ্রে মৃদু-স্পন্দিত ঢেউয়ে সেই অতল রোদন যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছিল। সমুদ্র কি তবে চোখের জল দিয়ে তৈরী! হবেও বা। দুয়েরই স্বাদ যে লবণাক্ত!

এমন সময়ে অদূরে জগন্নাথ এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে উঠে গেল প্রভুদয়াল, দুজনে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল ও শুধালো, খবর কি জগন্নাথ?

জগন্নাথ বলল, বাবা, আজ সব খবর এনেছি। আজ রাতেই রাজধানীর পশ্চিমদিকে যে লাটু পাহাড় আছে, তারই গুহার মধ্যে কিঙ্কঠাকুরের দল নাকি জরাকে রাজতিলক পরাবে।

রাজতিলক কেন?

তাকেই নাকি ওরা রাজা করবে।

মহারাজ উগ্রসেন থাকতে!

ওরা বলে, মহারাজের রাজগী গিয়েছে, তিনি এখন হাত-পা কাটা সেপাই।

প্রভুদয়াল শুধালে, ওদের দলে কত লোক?

লোকের অভাব কি বাবা! রাজ্যের যত চোয়াড়, বদমাশ সবাই ওই দলে, হাজার হাজার হবে।

প্রভুদয়াল বলে, তুমি বলতে চাও ওদের দলপতি কিঙ্কঙ্ক?

হ্যাঁ বাবা, সবাই তাই বলে, জানে।

ওই লোকটাকে তুমি দেখেছো?

সবাই দেখেছে, বাবাও দেখেছেন।

দেখেছি! চমকে ওঠে প্রভুদয়াল। কিন্তু এই অদ্ভুত নাম তো কখনও শুনেছি মনে পড়ে না!

জগন্নাথ বলল, এ-নামে অল্প লোকেই তাকে জানে। খট্টাস নামে সকলের কাছে সে পরিচিত।

কি সর্বনাশ! আবার চমকে ওঠে প্রভুদয়াল। স্বগতভাবে বলে, কিঙ্কঙ্কই খট্টাস! তবে তো অনন্তর আশঙ্কা মিথ্যা হয়নি! তারপরে জগন্নাথকে শুধায়, তাহলে জরা ওই খট্টাসের হাতে পড়েছে! তবে তো তার রক্ষা নেই!

জগন্নাথ বলে, আর যাই কর বাবা, তুমি একা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ো না। এমন কাজ নেই যা ওদের অসাধ্য।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রভুদয়াল বলল, না, আমার জন্যে ভেবো না। এখন তুমি যাও। কালকে সন্ধ্যায় একবার দেখা করো।

॥ ৫ ॥

তুমি তো বেজায় বেজার করলে বাপু! না, না, না।

না, খট্টাস ভাই, আমি অপরাধ করেছি।

অপরাধ করোনি, যা করেছ তার নাম আহাম্মুকি, এখনো করছ।

কি বলছ! আমি কি নরহত্যা করিনি, দেবতাকে হত্যা করিনি!

এই দেখো, আবার আহাম্মুকি শুরু হল।

কেন?

কেন কি? ন্যায়শাস্ত্র পড়লে বুঝতে পারতে একসঙ্গে দুটো স্বতোবিরুদ্ধ সত্য হতে পারে না। ভালোই করেছ, অনেক সময় বেঁচে গিয়েছে। ন্যায় সাংখ্য বেদ বেদান্ত সব গুলে খেয়ে বুঝেছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা সুবৃহৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

বলো কি ভাই, তবে সবাই টোলে ঢোকে কেন?

অনেক কারণে, সবাই ঢুকছে বলে ঢোকে, অন্য কাজ নেই বলে ঢোকে, বাপের তাড়নে ঢোকে।

তার কথা শেষ হতে না দিয়ে জরা শুধায়, তুমি ঢুকেছিলে কেন?

বাপ মস্ত পণ্ডিত ছিল, আমাকেও পণ্ডিত করার বাসনা, তাই কানে ধরে টেনে নিয়ে গেল টোলের পণ্ডিতমশায়ের কাছে। ফল হল উল্টো। অন্যরা পণ্ডিত হয়ে বেরিয়ে এসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বরাভয় মুদ্রা দেখতে পায়, আমি দেখতে পেলাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুদ্রা। এই বলে সে হেসে ওঠে। সেই করাতে কাঠচেরা হাসি।

ভাই, তোমার হাসিটা থামাও।

আবার হেসে উঠে বলে, কেন, বেশ মধুর লাগছে না, না? তা না হয় থামাচ্ছি, কিন্তু তুমিও আহাম্মুকি থামাও।

আহাম্মুকিটা কোথায় দেখলে?

ঐ যে একই সঙ্গে উল্টোপাল্টা কথা বলছ, নরহত্যা আর দেবতা-হত্যা।

বেশ, বুঝিয়ে দাও।

এটা তো বোঝো যে, একই সঙ্গে এক ব্যক্তি মানুষ আর দেবতা হতে পারে না। যদি মানুষ মেরে থাকো, তবে আর দেবতা মারোনি। আর দেবতাকে

তো মারাই যায় না, শোননি যে দেবতারা অমর!

ভাই, বাসুদেব যে দেবতার দেবতা স্বয়ং ভগবান!

নাও, মানুষ গেল, দেবতা গেল, এখন ভগবান! আচ্ছা প্রমাণ করে দিচ্ছি যে, লোকটা ভগবান ছিল না। এটা তো জানো যে, ভগবানের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আর লোকটা যখন বসুদেবের ঘরে জন্মেছে, আর তোমার শরে মরেছে, তখন প্রমাণ হয়ে গেল বেটা ভগবান হতেই পারে না।

আচ্ছা ভগবান নাই হল, মানুষ তো বটে!

এবারে হাসালে জরা। মানুষ তো কি হয়েছে? মানুষ মারা কি অপরাধ!

আরে, সেরকম মানুষ নয়।

তবে কি রকম মানুষ? নিশ্চয় বনমানুষ, বনে যখন তার দেখা পেয়েছিলে!

যুক্তিতে হার মেনেও হারে না জরা, চিৎকার করে ওঠে, ভগবান ভগবান, সে যে ভগবান!

আবার শুরু হল আহাম্মুকি। যদি বসুদেবের ঘরে জন্মালেই ভগবান হয়, তবে তুমিও ভগবান। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

তারপরে সে কতকটা যেন নিজের মনে বকে যায়—ছেলেগুলো একটু বড় হতেই টোলে ভর্তি করে দেওয়া বাপমায়ের কর্তব্য। তত্ত্বজ্ঞান লাভের, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের এমন স্থান আর নেই। লেখাপড়া শিখলে তবে না বুঝতে পারা যায় লেখাপড়ার মূল্য কানাকড়িও নয়! ষড়দর্শনের নির্গলিতার্থ হচ্ছে সব ধাপ্পা, সব ফাঁকি, ব্রহ্মাণ্ড একটি অশ্বাণ্ড।

কি বলছ ওসব!

বলছি না, আজ রাত দ্বিপ্রহরে তোমার কপালে রাজতিলক পরানো হবে!

কেন?

আরে, রাজতিলক না পরলে রাজা হবে কেমন করে? এটা তো সহজ কথা।

আর আমি যদি রাজা হতে না চাই?

চাঁদ আর কি! রাজা হতে না চাই! রাজা না হলে তোমাকে ছাড়ছে কে?

তোমরা আর কাউকে রাজা করো না, দলে তো লোকের অভাব নেই!

এবারে সুর চড়িয়ে ধমক দিয়ে ওঠে থট্টাস।

তোমার মতো এমন বেয়াক্কিলে লোক তো দেখিনি বাপু। বুদ্ধি না থাকে না থাকুক, রাজার বুদ্ধি যত কম হয়, রাজপুরুষদের তত সুবিধে, কিন্তু তোমাকে

যে সন্ত-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলাম তার প্রতিদান কি এই! আমরা রক্ষা না করলে এতক্ষণে যে শেয়াল-শকুনে ছিঁড়ে খেতো!

সেই বিকট হাসি হেসে ওঠে জরা, বাসুদেব রক্ষা করতো।

একটা তীরের ঘা থেকে নিজেকে যে রক্ষা করতে পারে না, সে করবে রক্ষা অপরকে! জরা, সত্যি করে বলো তো কখনো টোলে পড়েছিলে কিনা, নইলে এমন মূর্খ হলে কি করে?

ভাই, তুমি তো মূর্খ নও, তুমি তো টোলে পড়েছিলে!

বুঝিয়ে দি, ঐ যে গান শোননি, 'ডুব দিয়ে রসের সাগরে, কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে গো।' টোলে ঢুকে অধিকাংশই পণ্ডিত মূর্খ হয়ে ডুবে মরে, আমার মতো দু-একজন ভেসে ওঠে, তারা বুঝতে পারে ব্রহ্মাণ্ড অশ্বাণ্ড, চরাচর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর নীতিধর্ম সত্য বিবেক সুচতুর শাস্ত্র-ব্যবসায়ী আর ধনিকদের উদ্ভাবিত ধাপ্পা। বুঝেছ?

না।

আর বুঝে কাজ নেই, তোমাকে রাজতিলক পরতেই হবে, তা না হলে তোমাকে দিয়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। কি, চুপ করে রইলে যে?

ভাবছি।

বেশ, আত্মচিন্তা করো তাতে ক্ষতি নেই, ইতিমধ্যে আমার দলবল এসে পৌঁছক।

জরা শুধালো, তোমার দলবল আবার কারা?

তুমি তো শুধু আহাম্মুক নও, অকৃতজ্ঞও বটে; এই যে সেদিন তোমাকে সন্ত-মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল যারা!

তাই বলো।

নাও, বসো, এই পাথরখানার ওপরে বসে আত্মচিন্তা করো, আমি গুহার মধ্যে গিয়ে দেখি অভিষেকের আয়োজন কতদূর কি হল। জরা, সতর্ক করে দিচ্ছি, খবরদার, পালাবার চেষ্টা করো না। আমার হাতে আড়াইশো শিকারী কুকুর আছে। যেখানে থাকো, পাকড়ে নিয়ে আসবে। পালাবে একখানা, ফিরে আসবে আড়াইশোখানা হয়ে।

এই বলে সে লাটু পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো।

পাথরখানার উপরে বসে সে ভাবতে চেষ্টা করে। ভাববে কি, ভাববার শক্তিও তার বুঝি লোপ পেয়ে গিয়েছে। খুব দোষ দেওয়া যায় না, আজ পাঁচ-ছদিন তার উপর দিয়ে পর পর যে অঘটনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, একটা আস্ত ঐরাবত

তাতে ভেসে যায়—সে তো অশিক্ষিত ব্যাধ মাত্র। কথায় বলে চিন্তাসূত্র। সূত্রের দুটো মুখ, একটা থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু ওর মনে সমস্ত সুতোটা এমন জট পাকিয়ে গিয়েছে, শুরু করবার পথ খুঁজে পায় না। অন্ধকার গলিতে যেমন মানুষ অন্যায়ভাবে মাথা ঠুকে মরে, তেমনিভাবে ঘটনাগুলোর মাথা ঠুকতে লাগলো, তবু বের হওয়ার পথ চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল জরতীকে, সেদিনের পরে আজ এই প্রথম। মনে পড়তেই তার উপরে বিষম ক্রোধ হল, মনে হল তার সমস্ত দুর্গতির মূলে ঐ জরতী। কেন সে ভালো করে ধীরভাবে মিষ্টি ভাষায় বুঝিয়ে দিল না! কিছুর মধ্যে কিছু নেই, মৃতদেহটা দেখেই কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো—এ কি করেছিস জরা, কাকে বলতে কাকে মেরেছিস! আ মলো যা! সে কি ভেবেচিন্তে মেরেছে, হরিণ ভেবে মানুষ মেরে ফেলেছে এই তো! কতবার সে মানুষ মারতে গিয়ে হরিণ মেরে ফেলেছে, কই তখন তো দোষ হয়নি!

সে ঘটনাটা তার বেশ মনে আছে। পাশের গাঁয়ের এক ব্যাধের সঙ্গে তার খুব রেষারেষি ছিল, কার নিশানা বেশি সই। দুজনেরই দুটো দল ছিল, প্রত্যেক দল ভাবতো তাদের সর্দারের হাত সেরা। একদিন ঘটনাক্রমে আড়াই প্রহরের বনে, বনটা পার হতে আড়াই প্রহর সময় লাগতো, তাই ঐ নাম, একটা হরিণের পিছু নিল দুইজনে, সে আগে, জরা পিছনে। হঠাৎ জরার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, ভাবলো ওকে মেরে ফেললেই তো সমস্ত রেষারেষির মীমাংসা হয়ে যায়। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। মানুষটাকে তাক করে ছুঁড়লো তীর, ঠিক সেই সময়ে হরিণটা ঘুরে গিয়ে এমন পাক খেলো যে, তীরটা মানুষকে না লেগে হরিণটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। লোকটা ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—এর চেয়ে আমাকে মারলেই পারতে!

জরা বলেছিল, সেই চেষ্টাই তো করেছিলাম, ফসকে গেল, আমি কি করবো।

হরিণটা কাঁধে করে নিয়ে এসে জরতীর পায়ের কাছে সগর্বে ধপাস করে ফেলে দিয়ে সমস্ত ঘটনা বলল। কই, তখন তো দোষ দেয়নি, এ কথা তো বলেনি যে, মানুষটাকে মারতে চেষ্টা করেছিলে কেন? আর এখন হরিণ ভেবে মানুষ মেরে ফেলায় কি কান্না! একবার বলে রাজা, একবার বলে ভগবান, একবার বলে নরকেও তোর ঠাঁই হবে না! হারামজাদী মাগী! যা বেটি বৈকুণ্ঠে, এতক্ষণে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে পৌঁছে ভগবানের পায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে! হারামজাদী ছোটলোকের বেটি!

জরার দৃঢ় বিশ্বাস হল সেদিনের পর থেকে যা কিছু ঘটেছে তার সমস্ত দায়িত্ব

জরতীর, বিচিত্র যুক্তির বলে তার মনে হল বাসুদেবের মৃত্যুর জন্তও দায়ী জরতী। কেন? কেন আবার কি! হরিণ নিয়ে না গেলে বেটি এমন দাপাদাপি করে যে জরার ভয় হয়। সে তো ফিরবে বলেই স্থির করেছিল এমন সময়ে মাগীর মুখ মনে পড়ায় আরও একটু খুঁজে দেখতে গিয়েই তো কাণ্ডটা ঘটলো। যেমন বেটি ভগবানকে মেরেছে ভগবানও তেমনি তার সাজা দিয়েছেন। এখন দুজনেই এক রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

এই দৃশ্যটি কল্পনা করবা মাত্র তার হাসি পেলো। বৈকুণ্ঠে জরতীকে নিয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্র লক্ষ্মীদেবী গলায় কাঁসর বাজিয়ে বলে উঠলেন, পৃথিবীতে তো শুনতে পাই ষোল হাজার ছেনালী মাগী নিয়ে অনেক নীলেখেলা করেছ, তাতেও শখ মেটেনি, একটিকে দেখছি আবার ছাঁদা বেঁধে নিয়ে এসেছ! দাঁড়াও, সমাদর করি। এই বলে যান ঝাঁটার সন্ধানে। হাঃ হাঃ হাঃ।

বাঃ বাঃ, মুখে হাসি ফুটেছে যে, এই তো চাই!

জরা দেখতে পায় খট্টাস কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে অপ্রস্তুত হয়।

থামলে কেন ভাই, লজ্জা কিসের? এ সংসারে রাজগী নিয়েই তো যত হাসিকান্না। এই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা হয়ে গেল তার মূলে এই রাজগীর দাবি। পাণ্ডুর বেটা রাজা হবে না ধৃতরাষ্ট্রের বেটা রাজা হবে! তা ভাই, তোমাকে তো আর লড়াই করতে হবে না, তোমার বেলায় নিছক হাসি, কান্নার নামটি পর্যন্ত নেই।

জরা মূঢ়ের মতো বলে, না, তা ভেবে হাসিনি।

অজুহাতটা কানে না তুলে খট্টাস বলে, দাঁড়াও না, দলবল আসুক, তারপরে সবাই মিলে তোমাকে রাজা সাজাবো—দেখবে কাকে রাজা বলে।

আবার না জানি কি হাঙ্গামা হবে ভেবে জরা বলে ওঠে, আবার সাজপোশাকে দরকার কি, এই তো বেশ আছি!

তা কি হয়, সাজপোশাক হবে, তারপর কপালে রাজতিলক পরানো হবে—তা না হলে সবাই রাজা বলে মানবে কেন? আর একটু ধৈর্য ধরো, দলবল এসে পড়লো বলে। এই বলে সে আবার গুহার মধ্যে প্রবেশ করে।

জরা আবার গালে হাত দিয়ে চিন্তা করে—এই দলবল বলতে কারা? তাদের সঙ্গে খট্টাসের কি সম্বন্ধ? তারা কি বেতনভোগী ভৃত্য, না এমনিতেই অনুগত? এমন কত প্রশ্নের খড়কুটো ভেসে বেড়ায় তার চিন্তাস্রোতে। তবে কি তারাই তাকে সেদিন উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল! তারাই সম্ভব, কিন্তু কেন তাকে উদ্ধার করতে গেল? ঠিক বটে, এতক্ষণ পরে মনে পড়েছে—রাজপুরুষেরা যখন

বন্দী করে থট্টাস আশ্বাস দিয়েছিল, ওরা অনেকে, এখন কিছু করা সম্ভব নয় তবে যথাকালে উদ্ধার করে আনবো, ভয় পেয়ো না, এখন যাও। থট্টাস তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে বটে।

জরার আরও মনে পড়ে, লৌহদণ্ডটার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে পড়ে আছে, চারিদিকে জনতা আর কোলাহল; সে-সব তার চোখেকানে ঢুকছে না, সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে দুর্বোধ্য লাগছে। এমন সময়ে জন-দুই শান্ত্রী এসে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। এমন সময়ে প্রচণ্ড কোলাহলের ধাক্কায় তার সম্বিৎ ফিরে এল। ও কারা লাঠি সড়কি বল্লম নিয়ে এগিয়ে আসছে? ও কি, সবাই পালাচ্ছে কেন, এ আবার কি হাঙ্গামা? আরে রাজপুরুষেরাও যে ছুটে পালাচ্ছে! এ কি, তবে তো রাজপুরুষেরাও দরকার হলে পালায়! তার বিশ্বাস ছিল যে তারা অজেয়।

ও কি, ও কি, আবার আমাকে পাকড়াও কর্‌্বো কেন বাপু! রাজ-পুরুষদের হাত থেকে রক্ষা করে এবারে তোমরা খুন করবে! কেন? কই, কেউ কোন উত্তর দেয় না, সকলে মিলে শূন্যে তুলে নিয়ে এসে নৌকোর উপরে ফেলে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপণীর তাড়নায় তীরবেগে ছুটে চলে নৌকো। কিছুক্ষণ পরে ঘস শব্দ করে নৌকো ভিড়লো বালুচরে, অমনি সবাই মিলে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একজন লোকের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলল, এই নাও সর্দার!

জরা মুখ তুলে চেয়ে দেখল—থট্টাস।

থট্টাস হেসে উঠে বলল, কেমন, কথা দিয়েছিলাম রক্ষা করতে পারলাম কিনা!

তারপরে ব্যাখ্যা করে, রাজপুরুষেরা কথা দেয় রক্ষা করে না; সাধুপুরুষেরা কথাও দেয় না রক্ষাও করে না; আর থট্টাসের এই দল যাকে আমি বলি কিম্পুরুষ তারা কথা দেয় এবং রক্ষা করে—প্রমাণ তুমি স্বয়ং।

মূঢ়ের মতো জরা বলে, কিন্তু কেন রক্ষা করতে গেলে?

সে কথা আগে একবার বলেছি, শান্ত্রীদের গুঁতোর চোটে ভুলে বসে আছ, আবার না হয় বলবো। এখন চলো, খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করবে।

জরাকে নিয়ে এগোতে এগোতে শুধায়, বেটারা কিছু খেতে দিয়েছিল, না শুধু ঘোল খাইয়েই কর্তব্য শেষ করেছে?

গুপ্তচরদের মুখে সব সংবাদ রাখতো থট্টাস।

তারপরে বলে, বেশ, ওরা খাইয়েছে ঘোল, আমরা খাওয়াবো দই চিঁড়ে গুড়, পেট ভরে যত চাও।

একটু থেমে বলে, একটা রহস্যের উত্তর দাও দেখি, দই আর ঘোলে

তফাত কি ?

জরা বলে, দই পেটে দেয় আর ঘোল মাথায়।

বাঃ বাঃ, বেশ বলেছ, আমি আর একটা উত্তর দিই। গুটিপোকার গুটি দেখেছ ? দিব্বি জমাট বাঁধা। দই হচ্ছে সেই গুটি, জমাট বাঁধা, নড়তে চায় না। এবারে বলো ঘোলটা তাহলে কি ? পারলে না। তবে আমি বলি, ঘোল হচ্ছে সেই গুটি ভেদ করে বের হওয়া প্রজাপতি, উড়ে বেড়ায়, ঘোল ওড়ে না তবে গড়িয়ে যায়।

তুমি এত কথা শিখলে কোথায় ভাই ?

সমস্তপুরের আচার্যের টোলে, পাকা চারটি বছর পড়েছি।

ছেড়ে দিলে কেন ? শুনেছি টোলে পড়া শেষ করতে বারো বছর লাগে!

যাদের লাগে তাদের লাগে, চার বছরেই ওদের বিদ্যার পুঁজি ফুরিয়ে গেল, না ছেড়ে দিয়ে কি করি!

কি শিখলে ?

শিখলাম এই যে, আগেই তো বলেছি, ব্রহ্মাণ্ড একটি অশ্বাণ্ড আর চরাচর একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। আরও শিখলাম এই যে, কতকগুলো মতলববাজ ব্রাহ্মণে মিলে তাদের পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্রিয় রাজাদের প্ররোচনায় মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান নাম দিয়ে কতকগুলো ধাপ্পার সৃষ্টি করেছে। নাও, এসে পড়েছি।

এই বলতে বলতে তারা গুহার মুখে এসে দাঁড়াল, বলে, এই আমাদের রাজপ্রাসাদ, আপাততঃ এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, পরে একেবারে উগ্রসেনের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে বসাবো তোমাকে।

এই বলে সে ডাক দেয়, মঘা!

মল্লবেশধারী সুঠাম এক যুবক এসে অভিবাদন করে দাঁড়ায়।

জরাকে দেখিয়ে বলে, এ হচ্ছে রাজপুত্র জরা, পরশু তার অভিষেক হবে। এখন একে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্নানাহারের বন্দোবস্ত করে দাও। যাও ভাই জরা। এই বলে সে প্রস্থান করে।

জরা লোকটার সঙ্গে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। এ ব্যাপার ঘটেছিল দুদিন আগে।

আজ পাথরখানার উপরে বসে সেই সব কথা মনে পড়ে জরার—যেন অনেক দিন আগে দেখা অস্পষ্ট স্বপ্ন।

নাও, ওঠো।

চমকে উঠে জরা সম্মুখে দেখতে পায় খট্টাসকে, শুধায়, কেন, কি করতে হবে ?

তোমার এখনো সম্বিৎ হল না, তোমার আজ কি হয়েছে ?

আজ নয়, ক'দিন থেকে ।

সেই বসুদেবের বেটাকে মারবার পর থেকে। আরে বসুদেবের একটা বেটা গিয়েছে আর একটা বেটা আছে, আজ সে রাজা হবে। আহা, বসুদেবের কি সৌভাগ্য, বড় বেটা তো রাজা হতে পারলো না, এখন দেখে যাক ছোট বেটার অভিষেক হচ্ছে।

না ভাই, আমার রাজা হয়ে কাজ নেই, আমার রাজ্যে কাজ নেই, অভিষেকে কাজ নেই, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। এই বলে সমুদ্রের দিকে দৌড় মারলো।

মঘা, পাতক, অঙ্কুশ—ধর ধর।

নিজেও তাদের পিছু পিছু ছুটলো।

ওদের মধ্যে একজন বলল, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে।

আরে সেটাই তো আশার কথা, প্রকৃতিস্থ মানুষ দিয়ে আমাদের কাজ হওয়ার নয়।

ততক্ষণে মঘা এগিয়ে ধরে ফেলেছে জরাকে। জরা হাত ছাড়াবার জন্যে জোর করছে, কাকুতি-মিনতি করছে।

কেন, তোমার কি হয়েছে বলো তো ?

কতবার তো বলেছি খট্টাস, আমি যে মানুষ খুন করেছি!

এই কথা ? মঘা, তুমি কটা খুন করেছ ?

কে হিসাব রেখেছে সর্দার!

শুনলে তো, এবারে ভালোমানুষের মতো সুড়সুড় করে সঙ্গে চলো দেখি।

আমার রাজা হয়ে কাজ নেই।

তোমার কাজ না থাকে আমাদের আছে, সেইজন্যেই তো গরজ।

তোমরা কেউ রাজা হও না কেন ?

সে সম্ভব হলে আর তোমাকে বলবো কেন। নাও, তাড়াতাড়ি চলো, সবাই অপেক্ষা করছে।

কথা বলতে বলতে তারা গুহাভিমুখে এসে পৌঁছয়।

দাঁড়াও, ঢুকো না।

বেশ মজা তো। এখনই বললে তাড়াতাড়ি চলো, আবার বলছ ঢুকো না!

আরে, ঢুকতে তো হবেই, কিন্তু তার আগে বেশভূষা করবে না ?

বেশভূষায় কি হবে ?

বলো কি ! বেশভূষাতেই তো মানুষ রাজা হয়, নইলে সন্ন্যাসীতে আর রাজায় তফাত কি ? দেখো না, মাথায় কেশরগুলোর গৌরবেই সিংহ পশুর রাজা। কেশর ছেঁটে দাও, সিংহ শেয়ালের সামিল হয়ে যাবে। শোনো ভাই জরা, এইরকম কতকগুলো বেশভূষা আচার-আচরণ আর সংস্কারের সমষ্টির নাম মনুষ্যসমাজ। এ সব নাই বলেই বনের পশুকে পশুসমাজ বলে না।

বিস্ময়ে জরা বলে ওঠে, তুমি এতও জানো ! হাজার হোক টোলে পড়েছ তো !

সত্যি কথা বলতে কি, টোলে পড়ে কিছুই শিখিনি, যা শিখবার শিখেছি টোল ছাড়বার পরে। নাও এখন চলো—ঐদিকে ছোট আর একটা গুহা আছে, ওখানে তোমার রাজবেশ হবে।

সেই গুহাতে প্রবেশ করবার সময়ে খট্টাস ইঙ্গিতে অনুচরদের বলে দিল লোকটার দিকে তারা যেন নজর রাখে, শেষ মুহূর্তে পালালে সব মাটি হয়ে যাবে।

দণ্ড-দুই পরে জরাকে নিয়ে বের হয়ে এলো খট্টাস। বলল, চলো এবার রাজসভাতে যাই।

যন্ত্রচালিতের মতো চলল জরা।

উঁহু, ও হল না, তুমি আমাদের আগে আগে চলো। এখন তুমি রাজা, আমরা সবাই তোমার অনুগত প্রজা। তারপর বলল, নাও, এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি, এই হচ্ছে মঘা, এ পাতক, এ অঙ্কুশ, এ তক্ষক। কেমন, নামগুলো কেমন কেমন লাগছে, না ! এসব আমার দেওয়া নাম, বাপ-মায়ে অবশ্য অন্য নাম দিয়েছিল। আমাদের যেমন কাজ তেমনি নাম হওয়া চাই তো !

তারপরে বলল, বাপ-মায়ে আমার নাম দিয়েছিল কিঞ্জল্ক। শুনেছি টোলে বাবার এক সহপাঠী ঐ নামটা দিয়েছিল। কেমন, খুব মিষ্টি না ? মানেটাও বেশ মিষ্টি, পদ্ম না ঐরকম একটা কিছু। আরে ছোঃ, অত মধুর নামটা আমার চেহারার সঙ্গে মিলবে কেন, বিশেষ হাসিটার সঙ্গে—তাই বদলে করলাম খট্টাস।

জরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখল গুহাটার আয়তন অল্প নয়। রেড়ির তেলে কাপড় ভিজিয়ে তৈরি হয়েছে অনেকগুলো মশাল। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে দাঁড় করানো, সেই আলোতে ধোঁয়াতে মিলে গুহায় আলো-আঁধারি। পাঁচ-ছশো লোক এতক্ষণ গুঁড়ি মেরে বসেছিল, এবারে উঠে দাঁড়ালো। জরা দেখল সকলেই মঘাদের মতো সুঠাম সবল দেহের অধিকারী। কারো গায়ে বস্ত্র নেই, কেবল পরিধানে বস্ত্র। গলায় তাদের কালো সুতোয় ছোট তাবিজ, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। তার একবার মনে হল এরাই তাকে সেদিন উদ্ধার করে এনেছিল।

গুহার ছাদ থেকে মাঝে মাঝে পাথর ঝুলে থেকে আলোক বিতরণে বাধা জন্মাচ্ছে। সকলেরই চোখ তার দিকে।

তারা দেখল, হ্যাঁ, রাজা হওয়ার যোগ্য লোক বটে, দেহ সুঠাম সবল দীর্ঘ, কিন্তু তার বেশি বুঝবার উপায় নেই, রেশমের পোশাকে আবৃত, গলায় নিষ্ক নির্মিত হার, দুই হাতে অঙ্গদ, কানে কুণ্ডল, কোমরে কটিবন্ধে অসি, পায়ে জুতো, মাথায় তার একজন ধরে আছে ছাতা।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আরে, মাথাটা যে খালি, একটা মুকুট হলে মানাতো।

কথাটা শুনতে পেয়ে খট্টাস বলল, সেটাও হবে, অভিষেকের সেটাই তো আসল উপকরণ।

রেশমী বস্ত্র আবৃত একখানা পাথর দেখিয়ে দিয়ে খট্টাস বলল, বসো।

জরা বসলো। তখন খট্টাস জনতাকে সম্বোধন করে বলল, ভাইসব, এই আমাদের রাজা। এতদিন আমাদের সব ছিল কেবল অভাব ছিল রাজার। যাকে তাকে তো রাজা করা যায় না। তাই সন্ধানে ছিল, এতদিনে মিলেছে।

ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, তিলপতন শব্দ শোনা যায়। উপলক্ষটা গুরুতর আর সবাই ভয় করে খট্টাসকে। তার অসাধ্য কিছু নেই, তার অবাধ্য হওয়ার কল্পনাও কেউ করে না। এখুনি যদি হুকুম করে তবে ঐ মঘা পাতক বা কোন লোকের মুণ্ড নেবে, এমন কতজনকে চোখের সম্মুখে নিহত হতে দেখেছে তারা।

খট্টাস বলে চলে, আমাদের রাজা বনবাদাড় থেকে কুড়িয়ে আনা নয়—রাজা সত্যই রাজবংশের লোক। এ হচ্ছে বসুদেবের ঔরস-পুত্র, মানে বাসুদেবের বৈমাত্র ভাই, যাকে এক তীরের ঘায়ে খতম করে যদুবংশ ধ্বংস সম্পূর্ণ করেছে। এখন ন্যায়তঃ ধর্মত এ হচ্ছে যদুবংশের রাজা, রাজ্য-রাজধানীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। কাজেই দেখো, যোগ্য লোক এনেছি কিনা। এবার নাও, অভিষেক করে ওর কপালে তিলক, মাথায় মুকুট পরিয়ে দাও।

তখন সকলে উল্লাসে জয় রাজার জয় ধ্বনি করে উঠল। প্রথমে খট্টাস নিজের আঙুল কেটে রক্ত বের করে তার কপালে ফোঁটা দিল। তারপর একে একে কলে আঙুল কেটে রক্ততিলক পরালো। পাঁচ-ছশো লোকের রক্তবিন্দুতে জরার পাল ভিজে গিয়ে বেশভূষা অবধি সিক্ত করে দিল।

তিলক পরানো হলে খট্টাস একটি সোনার মুকুট নিয়ে পরিয়ে দিল তার ায়। আর গলায় ঝুলিয়ে দিল সোনার হারে সেই কৌস্তুভ মণি। ব্যাখ্যা রে বুঝিয়ে দিল এই মণি পরতো বসুদেবের এক বেটা, এবারে পরলো তার আর

বেশভূষায় কি হবে ?

বলো কি ! বেশভূষাতেই তো মানুষ রাজা হয়, নইলে সন্ন্যাসীতে আর রাজায় তফাত কি ? দেখো না, মাথায় কেশরগুলোর গৌরবেই সিংহ পশুর রাজা। কেশর ছেঁটে দাও, সিংহ শেয়ালের সামিল হয়ে যাবে। শোনো ভাই জরা, এইরকম কতকগুলো বেশভূষা আচার-আচরণ আর সংস্কারের সমষ্টির নাম মনুষ্যসমাজ। এ সব নাই বলেই বনের পশুকে পশুসমাজ বলে না।

বিস্ময়ে জরা বলে ওঠে, তুমি এতও জানো ! হাজার হোক টোলে পড়েছ তো !

সত্যি কথা বলতে কি, টোলে পড়ে কিছুই শিখিনি, যা শিখবার শিখেছি টোল ছাড়বার পরে। নাও এখন চলো—ঐদিকে ছোট আর একটা গুহা আছে, ওখানে তোমার রাজবেশ হবে।

সেই গুহাতে প্রবেশ করবার সময়ে খট্টাস ইঙ্গিতে অনুচরদের বলে দিল লোকটার দিকে তারা যেন নজর রাখে, শেষ মুহূর্তে পালালে সব মাটি হয়ে যাবে।

দণ্ড-দুই পরে জরাকে নিয়ে বের হয়ে এলো খট্টাস। বলল, চলো এবার রাজসভাতে যাই।

যন্ত্রচালিতের মতো চলল জরা।

উঁহু, ও হল না, তুমি আমাদের আগে আগে চলো। এখন তুমি রাজা, আমরা সবাই তোমার অনুগত প্রজা। তারপর বলল, নাও, এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি, এই হচ্ছে মঘা, এ পাতক, এ অঙ্কুশ, এ তক্ষক। কেমন, নামগুলো কেমন কেমন লাগছে, না ! এসব আমার দেওয়া নাম, বাপ-মায়ে অবশ্য অন্য নাম দিয়েছিল। আমাদের যেমন কাজ তেমনি নাম হওয়া চাই তো !

তারপরে বলল, বাপ-মায়ে আমার নাম দিয়েছিল কিঞ্জল্ক। শুনেছি টোলে বাবার এক সহপাঠী ঐ নামটা দিয়েছিল। কেমন, খুব মিষ্টি না ? মানেটাও বেশ মিষ্টি, পদ্ম না ঐরকম একটা কিছু। আরে ছোঃ, অত মধুর নামটা আমার চেহারার সঙ্গে মিলবে কেন, বিশেষ হাসিটার সঙ্গে—তাই বদলে করলাম খট্টাস।

জরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখল গুহাটার আয়তন অল্প নয়। রেড়ির তেলে কাপড় ভিজিয়ে তৈরি হয়েছে অনেকগুলো মশাল। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে দাঁড় করানো, সেই আলোতে ধোঁয়াতে মিলে গুহায় আলো-আঁধারি। পাঁচ-ছশো লোক এতক্ষণ গুঁড়ি মেরে বসেছিল, এবারে উঠে দাঁড়ালো। জরা দেখল সকলেই মঘাদের মতো সুঠাম সবল দেহের অধিকারী। কারো গায়ে বস্ত্র নেই, কেবল পরিধানে বস্ত্র। গলায় তাদের কালো সুতোয় ছোট তাবিজ, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। তার একবার মনে হল এরাই তাকে সেদিন উদ্ধার করে এনেছিল।

গুহার ছাদ থেকে মাঝে মাঝে পাথর ঝুলে থেকে আলোক বিতরণে বাধা জন্মাচ্ছে। সকলেরই চোখ তার দিকে।

তারা দেখল, হ্যাঁ, রাজা হওয়ার যোগ্য লোক বটে, দেহ সুঠাম সবল দীর্ঘ, কিন্তু তার বেশি বুঝবার উপায় নেই, রেশমের পোশাকে আবৃত, গলায় নিষ্ক নির্মিত হার, দুই হাতে অঙ্গদ, কানে কুণ্ডল, কোমরে কটিবন্ধে অসি, পায়ে জুতো, মাথায় তার একজন ধরে আছে ছাতা।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আরে, মাথাটা যে খালি, একটা মুকুট হলে মানাতো।

কথাটা শুনতে পেয়ে খট্টাস বলল, সেটাও হবে, অভিষেকের সেটাই তো আসল উপকরণ।

রেশমী বস্ত্র আবৃত একখানা পাথর দেখিয়ে দিয়ে খট্টাস বলল, বসো।

জরা বসলো। তখন খট্টাস জনতাকে সম্বোধন করে বলল, ভাইসব, এই আমাদের রাজা। এতদিন আমাদের সব ছিল কেবল অভাব ছিল রাজার। যাকে তাকে তো রাজা করা যায় না। তাই সন্ধানে ছিল, এতদিনে মিলেছে।

ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, তিলপতন শব্দ শোনা যায়। উপলক্ষটা গুরুতর আর সবাই ভয় করে খট্টাসকে। তার অসাধ্য কিছু নেই, তার অবাধ্য হওয়ার কল্পনাও কেউ করে না। এখুনি যদি হুকুম করে তবে ঐ মঘা পাতক বা কোন লোকের মুণ্ডু নেবে, এমন কতজনকে চোখের সম্মুখে নিহত হতে দেখেছে তারা।

খট্টাস বলে চলে, আমাদের রাজা বনবাদাড় থেকে কুড়িয়ে আনা নয়—রাজা সত্যই রাজবংশের লোক। এ হচ্ছে বসুদেবের ঔরস-পুত্র, মানে বাসুদেবের বৈমাত্র ভাই, যাকে এক তীরের ঘায়ে খতম করে যদুবংশ ধ্বংস সম্পূর্ণ করেছে। এখন ন্যায়তঃ ধর্মত এ হচ্ছে যদুবংশের রাজা, রাজ্য-রাজধানীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। কাজেই দেখো, যোগ্য লোক এনেছি কিনা। এবার নাও, অভিষেক করে ওর কপালে তিলক, মাথায় মুকুট পরিয়ে দাও।

তখন সকলে উল্লাসে জয় রাজার জয় ধ্বনি করে উঠল। প্রথমে খট্টাস নিজের আঙুল কেটে রক্ত বের করে তার কপালে ফোঁটা দিল। তারপর একে একে সকলে আঙুল কেটে রক্ততিলক পরালো। পাঁচ-ছশো লোকের রক্তবিন্দুতে জরার কপাল ভিজে গিয়ে বেশভূষা অবধি সিক্ত করে দিল।

তিলক পরানো হলে খট্টাস একটি সোনার মুকুট নিয়ে পরিয়ে দিল তার মাথায়। আর গলায় ঝুলিয়ে দিল সোনার হারে সেই কৌস্তভ মণি। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল এই মণি পরতো বসুদেবের এক বেটা, এবারে পরলো তার আর

এক বেটা। সকলে আবার রাজার জয়ধ্বনি করে উঠল।

খট্টাস বলল, আমাদের রাজার নাম জরা। ঐ দুটো শব্দ উল্টে দিলেই হয় রাজ। জরা উল্টে রাজ, উল্টে জরা। শুধু বংশে নয়, নামে সুদ্ধ রাজা।

এই বলে নিজের রসিকতায় সে সেই করাতে কাঠচেরা হাসি হেসে উঠল, আর সেই সঙ্গে সেই জনতা অনুরূপ শব্দে হাসতে লাগলো। তারা সর্দারের হাসিটি অভ্যাস করে নিয়েছে।

এতক্ষণ পরে জরা প্রথম কথা বলল, বলল, এ কিরকম রাজা! রানী না হলে রাজা মানাবে কেন?

কতক লোকে বলে উঠল, কথাটা তো ভাই ঠিক।

কিন্তু হাতের মাথায় এখন দুপুর রাতে রানী কোথায় পাওয়া যাবে! এ বিষয়ে কেউ ভেবে দেখেনি, তাই সকলে চুপ করে থাকলো।

এমন সময় সকলে দেখল ভিড় ঠেলেঠুলে কে একজন এগিয়ে আসছে, আরে, এ যে মেয়েছেলে, হঠাৎ এলো কোথা থেকে!

মেয়েটি জরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমি রানী হতে রাজী আছি, কিন্তু সাবধান, রাতের বেলায় কাছে আসবে তো নাক কামড়ে কেটে নেব।

জরা অসহায়ভাবে খট্টাসের দিকে তাকিয়ে শুধালো, সর্দার, এ কিরকম রানী, রাতের বেলায় কি আমি রাজা নই। আমি দিনেও রাজা, রাতেও রাজা। কি বলো সর্দার?

মেয়েটি বলল, তবে আমি চললাম, থাকলো তোমার রাজগী।

আরে করো কি, করো কি বলে—জরা খপ করে তার হাত ধরে ফেলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মন্দ নয়।

মন্দ হলে কি রানী হতে এসেছি?

এই আকস্মিক প্রশ্নটুকুর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না, কি উত্তর দেওয়া যায় না ভেবে পেয়ে সকলে নীরব, খট্টাসও।

এ মেয়েটি মল্লিকা, বারাঙ্গনা পল্লীতে সেই নবাগতা, যার কোল থেকে মানুষ ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষোভে প্রতিকারের সন্ধানে সে বের হয়ে পড়েছিল।

কোথায় যাবে কার কাছে যাবে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অজ্ঞাতসারে তার পা চলল রাজবাড়ির দিকে, অবচেতনার ইঙ্গিত এই যে—সব অভিযোগের প্রতিকার পাওয়া যায় রাজার কাছে। রাজবাড়ির দেউড়িতে আজ কেউ বাধা দিল না, কে দেবে বাধা! সিপাহী-শাস্ত্রী কেউ উপস্থিত নেই। ঢুকে দেখল চত্বরের পরে চত্বর খাঁ খাঁ করছে, জনপ্রাণীর মধ্যে গোটাকয়েক শীর্ণ কুকুর ধুলো শুঁকে বেড়াচ্ছে

আর শিকলে বাঁধা একটা পোষা বাঘ নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে, বোধ হয় অনেক দিন আহার জোটেনি।

সে সোজা রাজা উগ্রসেনের দরবারকক্ষে প্রবেশ করলো। এ কি, কেউ কোথাও নেই যে! অত বড় ঘরটাকে নিয়তির ব্যাদিত রন্ধ্রের মতো মনে হল। ঝাড়ের বাতিগুলোর কয়েকটা তখনো জ্বলছে। নিভিয়ে দেবার কথা কারো মনে পড়েনি। অবশেষে চোখে পড়লো দূরে একপ্রান্তে বিস্তৃত সিংহাসনের উপরে কে একজন নিদ্রিত। পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে দেখল, এ কি, রাজা উগ্রসেন যে! চামরধারী ছত্রধারী ব্যজনকারীহীন নিঃসঙ্গ রাজা শেষ আশ্রয় সিংহাসনের উপরে অসহায় ভাবে নিদ্রিত। পাছে ঘুম ভাঙে তাই নিশ্বাস রোধ করে ঠাহর করে দেখল তাঁর দু'চোখে জল পড়েছে—এখনো লেগে আছে তার শুষ্ক চিহ্ন। এই একটিমাত্র দৃশ্যে সমস্ত রাজ্য-রাজধানীর অবস্থা তার মনে চমক মেরে গেল। এখানে কে শুনবে তার অভিযোগ, স্বয়ং রাজা নিজের অভিযোগের ভারে সুষুপ্ত।

যেমন পা টিপে টিপে গিয়েছিল, তেমনি ভাবে ফিরে এলো, এবারে চলল রানীমা রুক্মিণীর কাছে। আজ সকলের কাছে সকল দ্বার অবারিত, বারণ করবার লোক কোথায়? রুক্মিণীকে সে চিনতো, বড় বহিনের সঙ্গে দু-একবার এসেছে। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখল একখানা জীর্ণ কাঁথা পেতে তিনি শায়িত। মল্লিকাকে দেখে উঠে বসে শুধালেন, কি চাই বাছা?

মল্লিকা বুঝলো এ নারী আজ তার চেয়েও অসহায়—এঁর কাছে দুঃখের কথা বলে কেন বৃথা দুঃখ দেওয়া!

কিছু না মা, একবার দেখতে এলাম।

কি আর দেখবে! বলে তিনি উদাসভাবে চেয়ে রইলেন, চোখের তারায় বহির্জগতের এতটুকু প্রতিফলন নেই।

মল্লিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে ফিরে চলল। তার মনে হল শ্মশানও বুঝি এর চেয়ে সজীব, শ্মশানের চেয়েও যদি কিছু করুণ থাকে, তবে তা এই শূন্য রাজপুরী। একবার মনে হল রাজবাড়ির বউদের ঘরে ঢুকে ধিক্কার দিয়ে যায় কিন্তু তাদের কথা মনে হতেই ঘৃণায় সারা গা ভরে উঠল। সে তখন রাজবাড়ি ছেড়ে বের হয়ে যেদিকে চোখ যায় সোজা চলল, দেখল, কিছুক্ষণ পরে বাজারের মধ্যে এসে পড়েছে। দেখতে পেল বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা নেই বললেই হয়, অধিকাংশ বিপণি বন্ধ, যেগুলো খোলা তার মালিকেরা মোটঘাট বেঁধে গোশকটে ভরতি করছে। ভাবলো, কি হল, এ যে একসঙ্গে রাজ্য রাজা রাজধানী পাট

গুটোচ্ছে, ব্যাপারটা কি !

এমন সময়ে ভজনদাস তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে শুধালো, কি বাছা, কোথায় গিয়েছিলে ?

মল্লিকা সব বিবৃত করলো। ভজনদাস ললাটে করাঘাত করে বলল, এখন কি আর রাজার রাজত্ব আছে যে প্রতিকার পাবে ! যার রাজত্ব তার কাছে যাও, খট্টাস ঠাকুরকে গিয়ে ধরো, কিছু হলেও হতে পারে।

সে কে ? শুধালো মল্লিকা।

সে-ই এখন সব।

কোথায় পাবো তাকে ?

যাও লাটু পাহাড়ের দিকে।

আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে সে চলল লাটু পাহাড়ের দিকে।

জলের মধ্যে তেল পড়লে যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, দুঃখেরও সেইরকম প্রকৃতি। একস্থানের দুঃখ ক্রমে ক্রমে সর্বস্থানীয় হয়ে ওঠে। রাজার নাশে রাজ্যনাশ, রাজ্যনাশে প্রজার সর্বনাশ।

মল্লিকা জানতো খট্টাস লোকটা ভালো নয়, তার দলবলও তথৈবচ। সে বুঝলো ভালোর কাল গিয়েছে, এখন মন্দ দিয়েই কাজ চালাতে হবে। অবস্থাবিশেষে বিষ মহৌষধ। সে স্থির করলো খট্টাসের কাছে সর্বতোভাবে অনুগত হবে, তবে যদি পারে রাজবাড়ির হারামজাদী বউগুলোকে জব্দ করতে। এইরকম চিন্তা করতে করতে সে যখন লাটু পাহাড়ের গুহায় এসে ঢুকলো, তখন জমায়েত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কিভাবে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা যায় ভাবছে, তখনই কানে এসে পৌছল রানীর কথাটা। এই তো সুযোগ, সে ভিড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে আত্মপ্রকাশ করলো। তারপরের ঘটনা সুবিদিত।

খট্টাস বলল, নাও রাজা-রানী দুই-ই হল, কোন অঙ্গহানি হল না, এবারে ভোজের আয়োজন করো।

অনুচরেরা তখনই তালপাতার চাটাই বিছিয়ে দিয়ে গোটাকতক ঝলসানো হরিণ এনে ফেলল, আর এলো ভাঁড় ভাঁড় মদ।

নাও জরা, শুরু করো। বলল খট্টাস।

জরাকে কেবল সে নাম ধরে ডাকতো আর সবাই বলতে শুরু করেছে রাজা।

জরা একটা ভাঁড় তুলে নিতেই সকলে এসে পড়লো খাদ্য ও পানীয়ের উপরে —কেবল খট্টাস নয়। সে একান্তে দাঁড়িয়ে সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করে কৌতুক অনুভব করছিল। কেন যে এই সব আয়োজন, দলবল জোটানো, রাজা খুঁজে

বের করে অভিষেক—এসব রহস্য আর কারো কাছে ফাঁস করেনি, নিজের মনে রেখে দিয়েছিল।

মদ্যপানে কিঞ্চিৎ বিহ্বল হয়ে সে শুধালো, তোমার নামটি কি ভাই?

মল্লিকা সরোষে বলে উঠল, মেয়েছেলে আবার ভাই হয় কি করে?

তবে কি বোন?

তাই মনে কর না কেন?

আরে তুমি যে রানী।

লোকদেখানো রানী, ভুলো না যেন, তাহলে নাকটি যাবে।

কেউ তাদের প্রেমালাপ শুনছিল না—সবাই পানাহারে ব্যস্ত।

এমন সময়ে একজন খট্টাসকে একান্তে ডেকে নিয়ে কানে কানে কি যেন বলল। সে কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে পাতককে ডেকে বলল, আমি চললাম, তোমরা খাওয়াদাওয়া করো। আর দেখো, রাজা-রানীর বাসরে পাহারা থাকে যেন, নইলে নাককাটা রাজা নিয়ে রাজত্ব করতে হবে।

এই বলে মঘাকে সঙ্গে করে প্রস্থান করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে জরার দৃষ্টি পড়লো তার মুখের দিকে, মদের বাষ্পকলুষিত আলো-আঁধারির মধ্যে। জরা দেখলো সে-মুখ অতি ভয়ঙ্কর।

॥ ৬ ॥

গুহা থেকে বের হয়ে ক্রমে বাজারের মধ্যে এসে পড়লো খট্টাস, তার লক্ষ্য রাজবাড়ি তবে সেখানে যাওয়ার পথে বাজার অতিক্রম করতে হয়। দেখল সেই গভীর রাতেও বাজারে চাঞ্চল্য, দোকানে আলো, লোকজন চলাফেরা করছে, মানে গাড়ি বোঝাই হচ্ছে, অনেক দোকানে অবশ্য ঝাঁপ বন্ধ, ভাবলো ব্যাপার কি?

একজন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলো, কি হে, ব্যাপার কি?

লোকটা একটা বস্তা গাড়িতে তুলতে তুলতে বলল, আর ব্যাপার! গাঁয়ে চলেছি।

হঠাৎ গাঁয়ে চললে কেন, সেখানে ব্যবসা চলবে কি করে?

আর ব্যবসা! এখানে যে সব অতলে তলিয়ে যাবে!

বিস্মিত হয়ে খট্টাস বলে, অতলে তলিয়ে যাবে! খুলেই বলো না!

আমার সময় নেই ঠাকুর, তুমি এগিয়ে দেখো। এই বলে দড়ি দিয়ে গাড়ির

মালগুলো বাঁধতে শুরু করলো, অধিক কথা বলবার অবসর নেই তার।

খান-দুই দোকান পেরিয়ে এক চেনা দোকানীকে শুধালো, কি হে ছিদাম, এত রাতে সব মাল টানাটানি করছ কেন?

খট্টাসকে চিনতো সে, বলল, ঠাকুরমশাই যে, প্রাতঃপ্রণাম।

মাঝরাতে প্রাতঃপ্রণাম, পাগল হলে নাকি!

দোকানী বলল, ব্রাহ্মণের সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখনই প্রাতঃকাল। আর পাগল হওয়ার কথা যদি বলো তবে বলি পাগল হতে আর বাকি কি!

আরে কী হয়েছে খুলেই বলো না।

শোননি, পাণ্ডব যে এসে পৌঁছেছে!

এই সংবাদটা পেয়েই খট্টাস হঠাৎ গুহা পরিত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছিল, তবু সংবাদটা আর একটু বিস্তারিত শুনে নেবার আগ্রহে শুধালে, পাণ্ডুর পাঁচ বেটা, কোন্‌টা এসেছে?

আরে, ঐ যে মস্ত বড় বীর যেটা।

এত বড় বীর আর নাম জানো না!

আমি ধান-চালের কারবার করি, রাজাগজাদের নামের খবর কি রাখি। আরে ঐ যে আমাদের সুভদ্রাঠাকুরুণের বর।

তাই বলো, ধনঞ্জয়।

না না ঠাকুর, অমন বিকট নাম নয়, শুনলাম অর্জুন না কি যেন।

ভুল শোননি। অর্জুন, পার্থ, ধনঞ্জয় সবগুলোই তার নাম।

এবারে বিস্ময়ে হাতের মালটা রেখে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, বাবা, এতগুলো নাম!

হতেই হবে, ঠগ-জোচ্চোরের একটা নাম হলে চলে না।

বলো কি ঠাকুর, অত বীর আর সে কিনা ঠগ-জোচ্চোর!

ঠগ-জোচ্চোর নয়! তার সমস্ত বীরত্ব যে ঠগামি। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ সকলকে ঠগামি করে মেরেছে।

দোকানী ভারত-যুদ্ধের বিবরণ কিছু কিছু জানতো, বলল, তাঁর সারথি যে ছিলেন স্বয়ং বাসুদেব।

খট্টাস বলল, সে বেটা তো ছিল ঠগের শিরোমণি। তার আবার একশো আটটা নাম।

দোকানী কানে হাত দিয়ে বলল, অমন কথা বলতে নেই, তিনি ছিলেন স্বয়ং নারায়ণের অবতার।

তাই একটা ব্যাধের বাণে মারা গেলেন।

সে তাঁর লীলা।

বেশ, লীলা তো লীলা। এখন তোমরা পালাচ্ছ কেন বল তো?

ঠাকুর, তুমি এত বড় পণ্ডিত আর এই সামান্য কথাটা জানো না! রাজবাড়ির জ্যোতিষীঠাকুর বলে গিয়েছেন অর্জুন যখন রাজবাড়ির মেয়েছেলেদের নিয়ে রাজপুরী পরিত্যাগ করতে যাত্রা করবেন অমনি সমুদ্র ছুটে এসে সমস্ত গ্রাস করবেন।

এবারে খট্টাস সত্যসত্যই বিস্মিত হল—এ কথাটা সে শোনেনি। তবে কথাটা তার আদৌ বিশ্বাস হল না।

ওহে ছিদাম, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে রাজজ্যোতিষী আর তুমি দুজনেই আচ্ছা করে গাঁজায় দম দিয়েছ।

তাতে কি অসাধ দেবতা। তবে গাঁজিলের বাপের মাথাতেও এসব কথনো আসবে না। জ্যোতিষীঠাকুর বলে গেলেন এ সমস্ত নাকি শাস্তরে লেখা আছে।

এখন মনে হচ্ছে শুধু গাঁজা নয়, তোমরা সকলেই গাঁজা ভাং চরস মদ টেনেছ।

ঠাকুর, ওসব যারা টানে তাদের ঐ দেখা যাচ্ছে, একটু এগিয়ে দেখো।

খট্টাস তাকিয়ে দেখল অদূরে একটা দোকানে বড় সোরগোল হচ্ছে, অনেক লোক জমে গিয়েছে। কি ব্যাপার দেখবার কৌতূহলে খট্টাস সেদিকে অগ্রসর হল।

সেখানে পৌঁছে দেখল যে দুশো মজা। সেটা শুঁড়ীর দোকান। মদ, ভাং, চরস, গাঁজা সমস্তই আছে কিন্তু এখন প্রায় না থাকবার মধ্যে। দোকানের লোকেরা সেগুলোকে গাড়িতে চাপাবার চেষ্টা করছে। আর শ-দুই লোক টেনে নামাবার চেষ্টায় নিযুক্ত। দুই দলের মধ্যে মদের ভাঁড়, চরস, গাঁজা প্রভৃতির থলি নিয়ে এক বিষম টানাটানি পড়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা মদের ভাঁড় উল্টে গিয়ে সমস্ত মদটা মাটিতে পড়ে গেল। দোকানী হায় হায় করে উঠল, ন দেবায় ন ধর্মায় গেল সমস্ত। খট্টাস দেখল যে দোকানী কিছু ভুল করেছে, কেননা এক বিন্দু মালও নষ্ট হল না। জন কুড়ি-পঁচিশ লোক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা যেমন শুষ্ক ছিল তেমনি শুষ্ক করে দিল। খট্টাস পুরাণ কাহিনীতে বিশ্বাসী নয়, তবে অন্ততঃ অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলো।

খট্টাস দোকানীকে বলল, কি হচ্ছে?

হচ্ছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। মালগুলো গাড়িতে যে তুলবো তার উপায় নেই।

গাড়িতে তুলবে কেন হে?

গাঁয়ের দিকে যে রওনা হব।

কেন বল তো?

দোকানী বলল, ঠাকুর সবাই জানে আর তুমি জান না? রাজবাড়ির বউ-ঝিরা রওনা হয়ে গেলেই সমুদ্র এসে যে সব গ্রাস করবে।

একজন মাতাল বলে উঠল, তোমার প্রাণে ভয় থাকে তো যাও। আমরা নড়ব না আর এ ভাঁড়গুলোও নিয়ে যেতে দেব না। আকণ্ঠ পান করে নারায়ণের মতো কারণ-সমুদ্রে ভাসমান হয়ে থাকব।

খট্টাস দোকানীকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি এই সব গাঁজাখুরি প্রচারে বিশ্বাস কর?

কাছেই বসে একদল গাঁজেল নিবিষ্টমনে সকর্ম সাধন করছিল। তারা এক-বাক্যে বিচিত্র কণ্ঠে বলে উঠল, গাঁজাখুরিটা মিথ্যা প্রচার হল। এখন হাতের কাছে পুরাণগুলো নেই, নইলে দেখিয়ে দিতাম পিতামহ ব্রহ্মা আদিযুগে গাঁজার নেশাতেই এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

তারপরে আবার একবার দম দিয়ে দোকানীর উদ্দেশে বলে উঠল, তোমার যেখানে খুশি যাও, থলি-কটা পাচ্ছ না।

খট্টাস দেখল যে, এ পালা সহজে শেষ হবে না। মঘাকে বলল, আমার এখানে কিছু দেরি হবে মনে হচ্ছে, তুমি সোজা রাজবাড়িতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে দেখো সত্যই অর্জুন পৌঁছেছে কিনা আর পৌঁছে থাকলে সকলে যাত্রার আয়োজন শুরু করেছে কিনা। ফিরে এসে আমাকে বাজারের মধ্যেই পাবে, আর এদিকে রাত্রিও শেষ হয়ে এল।

মঘা রাজবাড়ির উদ্দেশে প্রস্থান করল।

খট্টাস যতক্ষণ মঘার সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলছিল সেই অত্যল্প কালের মধ্যে মউতাতিগণ নিজ নিজ বস্তু সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে বসে গিয়েছে। আর বেচারা দোকানদার শূন্য দোকানে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। খট্টাসকে দেখে বলল, ঠাকুর, দেখলে কাণ্ডখানা, আমার ব্যবসা তো গেলই, আর কিছুক্ষণ থাকলে সপরিবারে সমুদ্রের জলে প্রাণটাও যাবে।

খট্টাস বলল, কি আর করবে বাপু। যে সময় পড়েছে, প্রাণ বাঁচানোই কঠিন। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানো? তোমরা না হয় চলে গেলে। এই

যে লোকগুলো নেশা করে পড়ে রইলো এরা তো ডুবে মরবে।

দোকানী করুণ ভাবে হেসে বলল, যদি নিতান্তই ডুবে মরে তবে সেই একেবারে মরবার পরে বুঝতে পারবে। সে একরকম মন্দ নয় ঠাকুর। সংসারে সবার চেয়ে মরার ভয়টাই গুরুতর।

খট্টাস বলল, তোমার তো অনেক তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে।

না হয়ে উপায় আছে? প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে শ-খানেক মউতাতি এসে বসে, তাদের কথাবার্তা শুনলে আমি তো সামান্য লোক, স্বয়ং বেদব্যাসেরও তত্ত্বজ্ঞান হত।

খট্টাস বলল, কি আর করবে বলো। বিপদকালে অর্ধেক পরিত্যাগ করতে পণ্ডিতরা উপদেশ দিয়েছেন। কাজেই এবারে প্রাণটা নিয়ে পালাও।

দোকানী শুধালো, ঠাকুর, তুমি যাবে না?

আমি ওসব গাঁজাখুরি কথায় আদৌ বিশ্বাস করি না। এই বলে সে এগিয়ে চলল। যে দিকেই তাকায় দেখতে পায় যে নগর ছেড়ে সবাই গাঁয়ের দিকে চলেছে, কেউ গাড়িতে কেউ পায়ে কারও মাথায় বোঁচকা-বুচকি—এমনি কাতারে কাতারে অসংখ্য লোক। তখন তার একবার মনে হল সবাই কি একটা গুজবের উপর নির্ভর করে চলেছে? আর গুজবটা রটলো কিভাবে? ভাবলো কি মূলে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে। তখনই মনে হলো, না, আর কিছুই নয়, মতলববাজেরা নগর লুট করবার উদ্দেশ্যেই এই সব কথা রটিয়েছে। তবে এটা নিশ্চয় বুঝলো, এই পলায়নপর জনতাকে ফেরাবার উপায় নেই। সমস্ত রাত অনিদ্রায় গিয়েছে—একটু বিশ্রাম করবার মানসে একটা গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে যেমনি বসেছে, কখন অজ্ঞাতসারে ঘুমিয়ে পড়লো জানতেও পারলো না।

অনেকটা ঘুমিয়ে নিয়ে চোখ খুলতেই খট্টাস দেখতে পেলো সম্মুখে প্রভুদয়াল উপবিষ্ট। বলল, সকালবেলাতেই তোমার মুখ দেখলাম, না জানি দিনটা কেমন যাবে!

প্রভুজী বলল, আমার অন্ততঃ ভালোই যাবে।

দুজনে মুখচেনা পরিচয় ছিল।

অবশ্যই যাবে, এ রকম বদন আর একখানি দেখতে পাবে না।

কেন বাবা, তোমার মুখ এমন খারাপ কেন?

তা বইকি। ভূমিকম্পে নাড়া খাওয়া অট্টালিকার মাথা বেঁকে গিয়েছে আর চোখের তারা দুটি রেষারেষি করে পরস্পরের মুখ দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। এমন মুখ এ রাজ্যে আর দুখানি দেখতে পাবে না। একবার দেখলে ভোলবার

উপায় কি ?

চেহারা তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, ভগবান যাকে যেমন দিয়েছেন।

তা বটে, তবে আমার ওপরে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আচ্ছা ঠাকুর, তোমাদের ভগবান তো সর্বশক্তিমান, এমন আর একখানি মুখ গড়তে পারেন ?

ও কথা থাক—

বাধা দিয়ে খট্টাস বলল, থাকবে কেন ? পাড়ার ছোট মেয়েরা আমার মুখ দেখলে ভয়ে ছুটে পালায় আর যুবতীরা অযাত্রা মনে করে।

কেন বলো তো ?

অবশ্যই বলব। তোমরা ধার্মিকরা যে সুখকে ব্রহ্মস্বাদসহোদর বলো সেই সুখের মুখে ছাই দিয়েছেন তোমাদের ভগবান, আমাকে হিজড়ে করে ছেড়ে দিয়েছেন।

আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে প্রভুজী বলে উঠল, কই, বাল্যকালে তো এমন বুঝতে পারা যায়নি।

ওটা তো একটু বয়স না হলে বোঝা যায় না ঠাকুর।

আর বাল্যকালে তো মুখখানিও সুন্দর ছিল।

এত ইতিহাস জানলে কি করে ঠাকুর, তুমি তো বাল্যকালে আমাকে দেখনি।

কে বলল দেখিনি—আমিই তো শৈশবে তোমার নামকরণ করেছিলাম কিঞ্জল্ক।

তাই বলো, তুমিই এই সর্বনাশটি করেছিলে ! ঐ নামটা বারংবার উচ্চারণ করতে গিয়েই গোটাচারেক দাঁত পড়ে গিয়েছে। এই দেখো—বলে হাঁ করে দেখিয়ে দিল।

কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে প্রভুজী চুপ করে রইলো।

খট্টাস বলতে লাগলো, এতক্ষণে সব মনে পড়ছে বটে। পিতার কাছে শুনেছিলাম যে তাঁর এক সহপাঠী নামটি দিয়েছিলেন। তা ঠাকুর, আমার এমন সর্বনাশ করতে এত জায়গা থেকে সমস্তপুরে মরতে গিয়েছিলে কেন ?

দূরে আর কই, আমার পৈতৃক নিবাস তো সমস্তপুরের কাছেএক গাঁয়ে ছিল।

তা আজ আবার কোন্ সর্বনাশের মতলব নিয়ে ভোরবেলাতে দেখা দিলে ?

এবার আসল কথায় এলো প্রভুদয়াল, বললে, শুনলাম জরাকে তোমার দলে ভর্তি করেছ, ও সামান্য ব্যাধের ছেলে, ওটাকে ছেড়ে দাও না কেন।

আহা-হা, একেবারে প্রাণ জল করে দিলে ঠাকুর !

কেন বাবা ?

দাঁড়াও, একে একে বলছি। ব্যাধের ছেলে হলেই সামান্য হবে এমন কেন ভাবছ। ভারতবর্ষের কাব্যের ইতিহাসে দুটি ব্যাধ অমর হয়ে থাকবে। তোমাদের আদিকবি বাল্মীকি এক ব্যাধের ব্যাধোচিত কার্য দেখে মা নিষাদ উচ্চারণ করে অভিশাপ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন চিরজীবী হবে না। অথচ দেখো আজ পর্যন্ত আদি শ্লোকের সুবাদে স্মরণীয় হয়ে আছে লোকটা। কেমন সত্য কিনা?

ওকে কি থাকা বলো বাবা, ও তো ঘৃণায় স্মরণীয় হয়ে থাকা।

ঘৃণায় বলো কি ঠাকুর—ঠিক সময়ে বাণটি মেরে পাখীটাকে মেরে না ফেললে রামায়ণ লেখা হত কি? রামায়ণ ও নিষাদটার সমান পরমায়ু। এবারে এসো মহাভারতে। জরা বাণটি নিক্ষেপ করে বসুদেবের বেটাকে হত্যা না করলে মহাভারত কি সমাপ্ত হত? রামায়ণের সূত্রপাত এক ব্যাধের শরে, মহাভারতের সমাপ্তি আর এক ব্যাধের শরে। কথাটা ভেবে দেখো ঠাকুর।

এই অপূর্ব ব্যাখ্যা অবাক হয়ে শোনে প্রভুদয়াল।

আরও আছে ঠাকুর। জরা সামান্য লোক নয়, সে হচ্ছে বাসুদেবের বৈমাত্র ভাই।

পাগলের মতো কি বলছ কিঙ্কর!

ঠাকুর, দয়া করে ও নামটা ছাড়ো। খট্টাস বলে ডেকো।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। কিন্তু এ কি প্রলাপোক্তি করছ, বসুদেবের সমস্ত পত্নীকেই তো জানি, জরা তাঁদের কারও গর্ভজাত নয়।

ঠাকুর, সারাদিন মালা ঠকঠকিয়ে বেড়াও, পত্নী কি সব সময় ঘরে থাকে?

তবে?

তবে আর কি। শোননি দেশে দেশে কলত্রাণি! তেমন সুযোগ পেলে বাড়ির দাসী, বনের রাক্ষসী, জলের নাগকন্যা সবাই সাময়িকভাবে পত্নীত্ব লাভ করতে পারে। বিশেষ করে রাজাদের।

মূঢ়ের মতো প্রভুদয়াল বলে, রাজাদের!

শুধু রাজাদের নয় সেই সঙ্গে মুনিঋষিদেরও ধরতে হবে। তেমন সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আমরা অনেকেই হয় রাজপুত্র নয় ঋষিপুত্র।

জুগুপ্সায় প্রভুদয়াল বলে উঠল, ধিক্ পাপ আলোচনা।

পাপ আলোচনা বটে! শকুন্তলা-জন্মের কাহিনীটা কি? আর ভরত-জন্মের কাহিনীটা? ঠাকুর, পুরাণগুলো পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছে ধার্মিক পুরুষদের ধ্যানভঙ্গ করতে এক দণ্ড সময়ই যথেষ্ট। একটুখানি আঁচলের বাতাস, বারকয়েক ঘুঙুরের শব্দ, ব্যস্, আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন ধ্যানস্থ মুনি-ঋষি,

রাজাদের বেলায় ওটুকু অছিলারও প্রয়োজন করে না। যে যত ধার্মিক সে তত লম্পট। ভাঙাক তো দেখি শকুনির ধ্যান আর আমাদের এই মঘা আর পাতকের। বেশি ঘাঁটিও না ঠাকুর, ঐ সমন্তপুরের চতুষ্পাঠীতেই আমার শিক্ষা। কাজেই স্বীকার করে নাও, জরা রাজপুত্র, আর ব্যাধ হলেও সামান্ত ব্যাধ নয়।

বেশ, না হয় স্বীকার করে নিলাম। এখন আমার কথা হচ্ছে ওকে ছেড়ে দাও।

কি চমৎকার আবেদন করলেন। কেবলই কালকে রাতে তাকে সবার সম্মুখে রাজতিলক পরালাম আর ভোরবেলাতেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে!

ওকে দিয়ে তোমার দরকার কি?

বোঝাতে গেলে অনেক কথা বোঝাতে হয়।

বেশ তো বলো না, আমার তাড়া নেই।

তবে শোন ঠাকুর, ওকে আমাদের রাজা করবো।

॥ ৭ ॥

খট্টাস বলে চলে, ও হবে আমাদের রাজা।

প্রভুদয়াল বলে, কেন বাপু, একটা রাজায় কি সাধ মেটেনি আর তাছাড়া রাজা হওয়ার কি পরিণাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তা দেখলে। আবার রাজা!

ওসব রাজা হয় রাজত্ব করবার জন্যে।

তোমাদের রাজা? শুধায় প্রভুদয়াল।

তোমাদের রাজাগুলোকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে।

তবেই তো আবার কুরুক্ষেত্র হল।

এবারে হবে একতরফা কুরুক্ষেত্র।

না কিঙ্কর, তুমি ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ। বেশ বুঝলাম জরা তোমাদের রাজা হল, তাকে অভিষেক করলে, কিন্তু তার প্রজা, কোথায় তার রাজত্ব?

প্রজার অভাব কি। এই যে আছে মঘা, পাতক, নরক, আতঙ্ক।

এই পাঁচ-সাতজন!

পাঁচ-সাত নয়, হাজার দু'হাজার আছে। সেদিন কারা আসন্ন শূলদণ্ড থেকে জরাকে রক্ষা করেছিল দেখলে বুঝতে পারতে।

প্রভুদয়াল দেখেছিল, তবে তারা যে খট্টাসের দল বুঝতে পারেনি আর তাদের উদ্দেশ্যটাও তলিয়ে দেখেনি। এখনও প্রকাশ করলো না যে সে দেখেছিল।

বলল, বেশ, সমস্তই বুঝলাম, কিন্তু ওকে কেন? তুমিই তো দেখছি দলের পাণ্ডা, তুমি রাজা হও না কেন?

খট্টাস বলল, কার্যতঃ আমিই অবশ্য রাজা তবে প্রকাশ্যত চলবে না।

কেন?

এ তো সহজ, সোনার টুকরো যতই মূল্যবান হোক তাকে মুদ্রা বলে চালানো যায় না, তার উপরে একটা ছাপ দরকার। ওর সেই ছাপ আছে, ও রাজবংশের লোক। সবাই সহজে ওকে মেনে নিয়েছে, নিয়েছেও দেখতে পাবে। আরও এক কথা। রাজা হওয়ার চেয়ে সিংহাসনের আড়ালে বসে সুতো টানাটানি করে রাজাকে ওঠানো-বসানো-নাচানো অনেক গুরুতর কাজ।

প্রভুদয়াল বলে, বুঝেছি ক্ষমতা আছে দায়িত্ব নেই। এই তো?

অনেকটা।

কিন্তু সঙ্কট এলে মরবে তো ঐ নিরীহ লোকটা?

কি আর করা যাবে। আর রাজা না হলেও চিরজীবী হয়ে থাকবে না।

আরও একটু খুলে বলো, এই যে মঘা আতঙ্ক নরক এরা ওকে মানবে কেন?

ওকে সম্মুখে রেখে পৃথিবীর রাজাগুলোকে শাসিত করবে।

এই হাজার দু'হাজার লোক! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী দরকার হয়েছিল।

এখানেও হবে। আজ দু'হাজার আছে কালক্রমে দুশো হাজার হবে, নদী এগোতে এগোতে গভীরতর প্রশস্ততর হয়।

কিন্তু ওদের লাভ কি?

ক্ষতিটা কি?

প্রভুদয়াল বলল, ক্ষতি এই যে, প্রাণে মরতে ওরাই মরবে।

ঘরে বসে থাকলেও বেঁচে থাকবে না। ওদের ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখেছো কি?

তুমি যে পথে নিয়ে যাচ্ছ সে পথে ভবিষ্যৎ দূরে থাকুক বর্তমানটা যে মারাত্মক।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে সেই সঙ্গে জেনে নাও যে ওদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কোনটাই সুখের নয়।

প্রভুদয়াল বলল, সেই ভরসায় ওদের টেনে আনছো?

না ঠাকুর, সেই টানে ওরা আপনি ধরা দিতে এসেছে। মঘা দশ বছর রাজকারাগারে ছিল। তার পরের বার ধরা পড়ে শূলদণ্ডের আদেশ পায়।

তখন পালিয়ে চলে এসেছে।

প্রভুদয়াল শুধালো, রাজপুরুষেরা জানে না?

ও পাশের রাজ্যের প্রজা। দেশে অনেকগুলো রাজ্য থাকবার এই সুযোগ। এক রাজ্যে অপরাধ করে অপর রাজ্যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায়। পাতক বলে আমার এক অনুচর আছে। তাদের অবস্থা ভালো ছিল। পূর্বপুরুষের কোন এক দেনার দায়ে তার জমিজিরাত বাড়ি-ঘর নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়ে গেল। সেই সঙ্গেই গেল তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান। আর যে লোকটার নাম নরক তার বৃত্তান্ত শুনলে অপরাধীকে নয় নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করবে। গাঁয়ের এক প্রধান তার বোনকে বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। নরক ছুটে গিয়ে লোকটাকে খুন করলো। কাজেই খুনের দায়ে উপস্থিত হল বিচারকের কাছে। অনেক তর্কযুক্তির পরে বিচারক সিদ্ধান্ত করলো নরক লোকটা অত্যন্ত পাষণ্ড। নিজের বোনকে বলাৎকার করতে গেলে যে লোকটা বাধা দিতে এসেছিল তাকে খুন করে ফেলে।

প্রভুদয়াল শুধালো, বোন সাক্ষী ছিল না?

ছিল বইকি! তবে বিচক্ষণ বিচারক স্থির করল ভাইকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে উল্টো কথা বলছে মেয়েটি।

ঠাকুর শুধালো, নরকের কি সাজা হলো?

বিচারক আদেশ দিল যে তার দুই হাত কেটে ফেলে দিতে হবে। এমন অবস্থায় যা একমাত্র করণীয় তাই করল নরক। জহ্লাদের হাত থেকে রাম-দা কেড়ে নিয়ে এককোপে তাকে দুখানা করে ফেলল, যারা বাধা দিতে এসেছিল তাদের ওই রাম-দা দেখিয়ে পালিয়ে চলে এল।

প্রভুদয়াল শুধালো, সব লোকেরই কি এইরকম ইতিহাস?

না, এইগুলো নিতান্ত ব্যতিক্রম। অধিকাংশ লোক অভাবের তাড়নায় এসে জুটেছে। শৈশবে এরা স্নেহ পায়নি, বাল্যকালে শিক্ষা পায়নি, যৌবনে জীবিকা পায়নি—এরকম অবস্থায় কী তাদের কর্তব্য বলতে পারো?

প্রভুদয়ালকে নিরুত্তর দেখে খট্টাস বলে যেতে লাগল, ঠাকুর, তোমাদের শাস্ত্রে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ছ'টা রিপুর কথা বলেছে। ওসব নিতান্ত শৌখিন ব্যাপার। বাঘ যেমন পশুদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে, তেমনি ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে চরাচরের সমস্ত প্রাণীকে। হতভাগ্য মানুষের দুখানা মাত্র পা, সে বেচারী পিছিয়ে আছে, আর মরতে মরছে তারাই। ইতর প্রাণী একটা আরেকটাকে ধরে খেতে পারে, মানুষকে সেটুকু সুযোগ দেয়নি বিধাতা। তবে হ্যাঁ, রূপান্তরে

মানুষও মানুষের খাদ্য। দুর্বলকে প্রবল মারছে, গরীবকে ধনী মারছে আর প্রজাকে মারছে রাজা। এই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ মার—এই তো তোমার সমাজ। প্রাণভয়ে তারা যদি পালিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে যোগ্য নেতার স্মরণ নেয় তখন তোমরা বলে থাকো এসব সমাজবিরোধী কার্য। আর এ বিরোধের সূত্রপাতটা কোথায় কেউ খোঁজ করে না। নদী যখন গভীর গম্ভীর জলোন্মত্ত হয়ে জনপথ ভাসিয়ে দেয়, লোকে হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু তার সূত্রপাত যে কোন্ দুর্গম গিরিশিখরের ক্ষুদ্র ঝরণায় কেউ খোঁজ রাখে কি? নদীর বন্যাকে যদি শাসন করতে চাও তবে তার শুরু করো পাহাড়ের ঝরনায় বাঁধ বেঁধে। নইলে নদীও বারণ মানবে না, এরাও।

খট্টাসের কথা শুনে সত্যিই চিন্তিত হয়েছিল প্রভুদয়াল। এসব কথা যে একেবারে তার অপরিচিত তা নয়, তবে কখনো এমন তলিয়ে চিন্তা করেনি। অভাবকে বর্জন করে সে ধনী, অভাবকে লালন করলে যে কি দুরবস্থা হয় তা জানবার সুযোগ তার হয়নি। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো যে খট্টাস অনেকক্ষণ থেমেছে। সে শুধালো, তোমরা কি করতে চাও শুনি?

খট্টাস বলল, এই সংসারব্যাপী ক্ষুধার গলা টিপে ধরতে চাই। যতক্ষণ সংসারে উঁচু নীচু উচ্চাবচ আছে ততক্ষণ ক্ষুধার শান্তি নেই। তাই আমরা বর্তমান অবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সব ভেঙেচুরে সমতল করে দিয়ে ওলটপালট করে দিতে চাই।

প্রভুদয়াল বলল, তাতেই বা সমস্যার সমাধান হচ্ছে কি করে? সব ওলটপালট হয়ে গেলে ধনী নীচে আসবে গরীব উপরে যাবে। যে অসাম্য সেই অসাম্যই রয়ে গেল তবে রূপান্তরে, সেটা ভেবে দেখেছো?

খট্টাস বলল, ভাববার মতো মনের অবস্থা আমাদের নয়, আমরা সব ভেঙেচুরে উড়িয়ে-পুড়িয়ে সমভূমি করে দিতে চাই।

বাপু হে! ভাববার মতো তোমাদের যে মনের অবস্থা নয় তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি। এখনই বললে সব ওলটপালট করে দিতে চাও, আবার বললে সমভূমি করে দিতে চাও। সমভূমির স্থানে স্থানে জল জমে থাকে, সেই বদ্ধ জল অস্বাস্থ্যের কারণ। বদ্ধ জলের মতো বদ্ধ ধনও সমাজে অস্বাস্থ্য ঘটায়।

ঠাকুর, তোমার গায়ে তাপ লাগেনি তাই হিসেবী লোকের মতো কথা বলছো। আমাদের অবস্থা অন্যরকম, তাই কথার ধরনও ভিন্ন। ওলটপালট হয়ে গেলে তারপরে কি হবে একথা ভাবতে বসলে ওলটপালট করা যায় না। তবে মনের মধ্যে এই ভরসা আছে কোন না কোন রকমে ইতিহাসের গতিটা ভালোর

দিকেই যাবে।

সেটা তোমার আশামাত্র। মূলে কোন যুক্তি আছে কিনা আদৌ জানো না।

খট্টাস বলল, বেশ তো, থাকলে তুমিও তো বলতে পারো।

আমি কি সর্বজ্ঞ!

সর্বজ্ঞ না হও ভাববার মতো অবস্থা তোমার আছে, গায়ে তোমার তাপ লাগেনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রভুদয়াল বলল, তোমার মনের সঙ্গে মিলবে কিনা জানি না, তবে যখন অনুরোধ করছো তখন বলবো। দেখ কিঙ্কর! পল্বলে চাঁদের ছায়া পড়ে কিন্তু জোয়ার ভাঁটা খেলে না, তার জন্যে চাই মহাম্বুধির বিস্তার। সমাজে ক্ষুদ্র এক খণ্ডে অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে সমস্তটার অনুমান করা উচিত নয়। তুমি তোমার সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার দ্বারা মোহগ্রস্ত বলেই তোমার দৃষ্টি সবটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তুমি যাকে ওলটপালট বলছো তার নাম সামাজিক বিপ্লব। এই সামাজিক বিপ্লবের সত্যের উপরেই আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠা। সেই তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করছি, দেখো তোমার কি মনে হয়। কিঙ্কর, আমি পণ্ডিত নয়, শাস্ত্র-চর্চাও সামান্য করেছি, আমার যা কিছু জ্ঞান বাসুদেবের নিকটে পাওয়া, তিনি আমাকে বড় কৃপা করতেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম, আবার কখনো কখনো তিনিও ডেকে পাঠাতেন।

খট্টাস বলল, তাই বলো ঠাকুর, তুমি তার চেলা!

বাপু হে, সবাই তাঁর চেলা, কেউ জেনে কেউ না জেনে। যে তাঁকে পূজো করছে সে-ও, যে আঘাত করছে সে-ও। শোনো। সেবারে যে বড় ভূমিকম্পটা হয়ে গেল তার পরদিন গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। তিনি শুধোলেন, প্রভুদয়াল, ভূমিকম্পের সময়ে কোথায় ছিলে?

বললাম, প্রভু, আমার কুটিরের মধ্যে ছিলাম।

তিনি বললেন, তবে তো নিশ্চিন্তে ছিলে। ইচ্ছে হল শুধাই, প্রভু, আপনি কোথায় ছিলেন? ইচ্ছাময় আমার মনের প্রশ্ন অনুমান করে নিয়ে বললেন, আমি ছিলাম মনোময় নামে প্রাসাদের উপরে, তাড়াতাড়ি নেমে আসতে হল।

আমি বললাম, প্রভু, তবে তো আপনার প্রাসাদের চেয়ে আমার কুটির অনেক বেশি আরামের। বার-দুই জোরে নাড়া দিল, তবে পড়বে কি সবই তো নড়বড়ে, কাজেই যেমন ছিলাম তেমনি বসে রইলাম।

তিনি বললেন, একবার গিয়ে দেখে এসো মনোময় প্রাসাদটা ঘটোৎকচের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, আর একটু হলে আমার প্রাসাদ আমাকেই চাপা

দিত, পক্ষপাত করতো না।

আমি শুধোলাম, বাবা, মাঝে মাঝে এমন ভূমিকম্প কেন হয়?

বাসুকি যে মাথা নাড়া দেন।

সেটুকু তো জানি প্রভু, কিন্তু হঠাৎ তিনি মাথা নাড়তে যান কেন? তিনি কি জানেন না ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে!

বাসুদেব বললেন, হয়তো জানেন বলেই মাথা নাড়া দেন।

বুঝতে না পেরে শুধালাম, সে কি রকম বাবা!

এ আর বুঝলে না, মানুষ বড় গেঁতো, যেখানে গেঁথে বসে আর নড়তে চায় না, তাদের সজাগ করবার উদ্দেশ্যেই মাথা নাড়েন।

আমি বুঝতে পারিনি অনুমান করে নিয়ে বললেন, এই দেখ না কেন, এই মনোময় প্রাসাদটা ভেঙে গড়বার ইচ্ছা অনেকদিন থেকে আছে, হয়ে ওঠেনি। সকলের মতো আমারও গেঁতো স্বভাব। এবারে আর না গড়ে উপায় রইলো না।

বাবা, আমার কুটির তো ভেঙে গড়বার ইচ্ছে নেই, সাধ্যও নেই যদি ভাঙতো।

আরে সেইজন্যেই তো ভাঙেনি।

আমি বুঝতে পারিনি অনুমান করে নিয়ে বললেন, বাসুকির মাথা নাড়া মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় পাকা করে অট্টালিকা তুলে চিরস্থায়ী হল মনে করবার মতো ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না। সমস্তই ফিরে ফিরে গাঁথতে হবে, তাতেই মানুষের মুক্তি, তার জীবনের সার্থকতা। তোমার পাতার কুটির বাতাসে নড়ে, ঝড়ে কাঁপে, তাই আর ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না।

এতক্ষণ খট্টাস চুপ করে শুনছিল, চুপ করে কারো কথা শোনা তার অভ্যাস নয়, এবার বলল, ঠাকুর, তোমার এই ভূমিকম্প-তত্ত্ব আমার দুর্বোধ্য। আমার ধারণা কি জানো, তোমাদের ঐ লীলাময় লীলাচ্ছলে তোমার পাতার কুটিরকে ব্যঙ্গ করলেন, জানিয়ে দিলেন যে তিনি থাকেন সুরম্য হর্ম্যে আর তুমি থাকো খড়ো ঘরে।

বাপু হে, সে কথাটা সর্বজনবিদিত, তা নূতন করে জানাবার কি হেতু থাকতে পারে? আগে সবটা শোন, পরে মন্তব্য করো। তিনি বললেন, প্রভুদয়াল, যেসব সমাজ ইমারতের মতো অচল অটল করে গড়া তাদের ধূলিসাৎ করবার জন্যে সামাজিক বিপ্লবের দরকার হয়, নামান্তরে তাকে মন্বন্তর, ইন্দ্রপাত, যুগপরিবর্তন বলা হয়ে থাকে।

খট্টাস বলে উঠল, মন্বন্তর খুব জানি, সেবারে চোদ্দ লক্ষ না খেতে পেয়ে

মরলো। আর বাসুদেবের মতো লোকের মৃত্যুকেই বোধ করি তোমরা ইন্দ্রপাত বলে থাকো। আবার শুনতে পাচ্ছি দ্বাপর যুগও নাকি শেষ হয়ে এলো, এর পরে কলির আরম্ভ, সে না জানি কি ব্যাপার হবে!

কিঞ্জল্ক, তুমি জানো সবই, তবে অর্থগ্রহণ করতে পারো না।

এই অবস্থাকেই বোধ করি তোমরা জ্ঞানপাপী বলো।

না, এই অবস্থা অজ্ঞানপাপী, অজ্ঞানের বাড়া পাপ নেই।

না ঠাকুর, তোমাদের ঐ ভেল্‌কি দেখানো শাস্ত্রীয়জ্ঞানে আমার প্রয়োজন নেই, তাড়াতাড়ি মহাভারত সেরে নাও, এখুনি আমার লোক এসে পড়বে।

সেই ভালো। অন্য সমাজ যাই হোক, সেখানে হয়তো বাইরে থেকে বিপ্লব আনবার প্রয়োজন হলে হতে পারে, আমাদের সমাজে বাইরে থেকে আনবার প্রয়োজন নেই।

কেন?

আগেই বলেছি কেন, বিপ্লবের সত্যকে স্বীকার করে আমাদের সমাজ গঠিত। মন্বন্তর, ইন্দ্রপাত, যুগপরিবর্তন সমস্তই এই সমাজব্যবস্থার অঙ্গীভূত। পাতার কুটির এর প্রতীক, যেমন বাসুকির মাথা নাড়া দেওয়া প্রতীক হচ্ছে নিত্য বিপ্লবের।

আচ্ছা ঠাকুর, এই বিপ্লবটি ঘটাবে কে?

কেউ নয়, এ ঘটবে, চিরকাল ঘটে আসছে নিজের নিয়মে। ফল পেকে উঠলে নিজের নিয়মে পড়ে।

থট্টাস বলল, এমনও তো হতে পারে, কোন কারণে পড়লো না!

তখন তাকে পাড়বার জন্যে অবতারের প্রয়োজন হয়।

এই আবার এক শাস্ত্রীয় ধাপ্পা—অবতার! আমি অবতার মানি নে।

খুবই মানো বাবা, মানো না ঐ শব্দটাকে। আচ্ছা ঐ শব্দটাকে বাদ দিয়ে বলছি। মনে করো না কেন অবতার মানে মহাশক্তিমান পুরুষ।

এবার পথে এসো—ওটা মানতে রাজী আছি।

প্রয়োজন উপস্থিত হলে মহাশক্তিমান পুরুষ আবির্ভূত হন ধর্মের গ্লানি দূর করবার উদ্দেশ্যে।

ধর্ম শব্দটা আমার কানে তপ্তশূল বিদ্ধ করে দেয়, ওটাকে বাদ দিতে হবে।

বেশ তাই দিচ্ছি। মনে করো না কেন যখন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছয় তখন একজন মহাপুরুষ এসে মরচে পড়ে গিয়েছে বলে যে চাকা ঘুরতে চাইছে না তাকে সবলে ঘুরিয়ে দুঃসময়ের অবসান ঘটিয়ে

নূতনের সূচনা করে দেন।

তোমার মতে বাসুদেব বোধ করি সেই রকম এক মহাপুরুষ!

এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ বাবা, তাঁর মতো বিপ্লবী আর কে? এমন আগেও হয়নি, পরেও হবে না।

পরে হবে না জানলে কি করে?

তাহলে বুঝতে হবে তিনিই নামান্তরে এসেছেন। বাসুদেব বিপ্লবপুরুষ।

থট্টাস মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে প্রভুদয়াল বলে উঠল, কিঞ্জল্ক, আমাদের সকলের আশা ছিল তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হবে, সজ্জন হবে। তোমাদের পণ্ডিতের বংশ, সাধুসজ্জনের বংশ। আজ তোমাকে এই অবস্থায় দেখে বড়ই দুঃখবোধ করছি।

এরকম প্রসঙ্গান্তর প্রত্যাশা করেনি থট্টাস। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও সামলে গিয়ে বলল, ঠাকুর, আমার সাধুসজ্জন হওয়ার উপায় কি? আমাদের বংশে হয় সাধুসজ্জন হয়, না হয় দুর্বৃত্ত পাষণ্ড হয়, এ দুয়ের বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ।

বেশ তো, তুমি শেষের পথটা বেছে নিলে কেন?

আমি তো বাছিনি, ঐ পথটা আমাকে বেছে নিয়েছে। বাবার কাছে নিশ্চয় শুনেছ যে, দু'এক পুরুষ অন্তর আমাদের বংশে একটা করে পাষণ্ড দেখা দেয়। আমার প্রপিতামহ ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন মহাপাষণ্ড। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ হেন পাপ নেই করেননি। আমার পিতামহ নাকি আরও নরাধম ছিলেন। আমি খুন জখম লুণ্ঠন গৃহদাহ ব্রহ্মহত্যা নারীহত্যা সমস্তই অকাতরে করেছি, তবে আমাকে নপুংসক করে দিয়ে বিধাতা যে কত হাজার নারীর ধর্মরক্ষা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পথ রুদ্ধ, পথ রুদ্ধ, ভালো হওয়ার পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ—এ আমার রক্তের প্ররোচনা। সত্যি কথা বলতে কি ঠাকুর, তোমাকে দেখবার পর থেকে অনেক বার ইচ্ছে হয়েছে, হাত নিশপিশ করেছে তোমার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবার—সৎ লোকেরা আমার চোখের বিষ। তুমি পালাও ঠাকুর, শীগগির পালাও। দুর্দম রক্ত আমার প্রত্যেক ধমনীতে ছোবলাচ্ছে—বিষে শরীর জর্জর হয়ে গেল, শীগগির পালাও।

প্রভুদয়াল তাকিয়ে দেখল থট্টাসের বিকৃত মুখ অধিকতর বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি রক্তপিঙ্গল আর মুখমণ্ডলের সমগ্র মাংসপেশীর মধ্যে কেমন একটা চক্রাবর্তন চলছে। এ মুখ ভয় পাওয়াবার মতো মুখ বটে। তবে কিছুমাত্র ভীত না হয়ে প্রভু বলল, এখন তোমার মন অশান্ত, আমি চললাম। কিন্তু তার

আগে একবার জরার সঙ্গে দেখা হয় না ?

না, না, কিছুতেই না। সেই দুর্বলচিত্ত লোকটা কিছুতেই তোমার বক্তৃতার তোড় সামলাতে পারবে না। আমাকেই প্রায় কাবু করে ফেলেছিলে। রক্ষা করে দিয়েছে আমার রক্তের প্ররোচনা। ঠাকুর, আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছার অধীন নই, রক্তের অঙ্কুশ আমার মহামাত্য।

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে গর্জন করলো, পালাও পালাও—শীঘ্র পালাও।

প্রভুদয়ালের মনে হল এখনি সে তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমন সময়, দেখতে পেলো দুজন লোক ছুটে আসছে। খট্টাসের কছে পৌঁছে অনতি-উচ্চস্বরে কিছু বলল, তার মধ্যে জরা শব্দটা কানে প্রবেশ করলো প্রভুদয়ালের।

তাদের কথা শুনে খট্টাস চিৎকার করে উঠল, সর্বনাশ, সমস্ত বুঝি মাটি হয়! অনুচরদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। এই বলে সে সমুদ্রের দিকে তীরবেগে ধাবিত হল।

প্রভুদয়াল বুঝলো আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, অগত্যা সে বাড়ি ফিরে চলল। সে বুঝলো যে কিঙ্করের মত ফেরানো দেবতাদেরও অসাধ্য। জ্ঞানের আগুনে পুড়লে লোকে খাঁটি হয়ে ওঠে, তখন পণ্ডিতকে বলে বিদগ্ধ। কিন্তু এই লোকটা পুড়ে একেবারে ঝামা হয়ে গিয়েছে, তা দিয়ে গঠনকার্য অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, ছুড়ে মারলে মানুষ ঘায়েল হয় বটে, খট্টাস এখন সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ধীর পদে চলতে চলতে সে ভাবতে লাগলো তাদের কথোপকথনের পরম্পরা। খট্টাস জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাকুর, তোমার ঐ পল্বল আর সমুদ্রের তুলনাটা বুঝলাম না।

প্রভু বলেছিল, এ তো সহজ কথা। পল্বলে চাঁদের ছায়া পড়ে বলে সে যদি ভাবে যে তার বুকেও জোয়ার-ভাঁটা খেলবে—তা তো হওয়ার নয়। বুঝলে না, তোমার আমার মতো সামান্য লোক ঐ পল্বল, কখনও কখনও তাতে বৃহৎ ভাবের ছায়া পড়তে পারে, তবে ঢেউ ওঠাতে হলে চাই বৃহৎ ব্যক্তিত্ব—যার সীমা যুগ-পরিধিকে স্পর্শ করবে। এরকম বৃহৎ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ যুগে-যুগান্তরে এক-আধবার আসেন। এ যুগে এসেছিলেন বাসুদেব। ভারত-জোড়া ভাবসমুদ্র অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। তিনি উত্তাল করে তুললেন জোয়ার—চারদিকে ক্ষুদ্র সীমা-পরিসীমা ডুবে একাকার হয়ে গেল। তারই চরম প্রকাশ হচ্ছে ভারত-যুদ্ধ। তোমার আমার মতো সামান্য লোক বিদ্রোহী, আর লোকোত্তর পুরুষ বাসুদেব বিপ্লবী। দীর্ঘকাল ধরে জমে-ওঠা সমস্ত ক্লেদ অপসারিত করে তিনি ভবিষ্যতের ভূমিকা রচনা করে গেলেন বর্তমানের অকলঙ্ক পটের ওপরে।

এইরকম কথাবার্তা যখন হচ্ছে হঠাৎ কি সংবাদ পেয়ে লোকটা ছুটে চলে গেল অনুচরদের নিয়ে। প্রভুদয়াল বুঝলো তাকে সংশোধন নিজের সাধ্যের অতীত। পাপীর উদ্ধারের আশা আছে, জ্ঞানপাপী উদ্ধারের বাইরে।

বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে একান্তে ডেকে বলল, দেখো, জরার দেখা পেলাম না বটে তবে জেনে এসেছি তাকে এখন নিয়ে আসা অসম্ভব। সে অসৎ সঙ্গে পড়েছে, তারা ছাড়বে না জরাকে।

অদিতি শুধালো, তবে জরতীকে কি বলবো?

বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই, শুধু জানিয়ো যে সে সুস্থ আছে, হয়তো কিছুকাল পরে তার দেখা পাওয়া যাবে, আমি চেষ্টায় আছি।

রাজবাড়ির খবর কিছু পেলে?

প্রভু বলল, না, সেদিকে যাওয়ার অবকাশ হয়নি, তবে আজই একবার যাবো ইচ্ছে আছে।

তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, খবর আর ভালো হবে কি করে! আলো নিভে গেলে সবই অন্ধকার।

॥ ৮ ॥

ছুটতে ছুটতে ওদের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

খট্টাস শুধালো, তোমরা কখন টের পেলে যে গুরু নিখোঁজ?

নরক বলল, কাল রাতে ভোজ সেরে ঘুমোতে অনেক দেরি হল, উঠতেও বেলা হল। কে একজন যেন বলে উঠল, আরে রাজা তো দেখছি সকলের আগে উঠেছে। বেশ নিশ্চিন্ত আছি। অনেকক্ষণ পর সম্বিৎ হল যে রাজা নিখোঁজ।

রানী কি করছিল?

সে তখনো পড়ে ঘুমোচ্ছিল, তাকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রাজা কোথায়, সে ঝাঁজিয়ে উঠে বলল, আমি কি জানি! তোমাদের রাজা তোমরা খোঁজ গে। মিছিমিছি সকাল বেলাতেই ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে, অনেকদিন পরে আরামে ঘুমিয়েছিলাম।

মল্লিকার কথা মিথ্যা নয়। সেই যে প্রতিকারের আশায় বারাঙ্গনা-পল্লী থেকে বের হয়েছিল তারপরে আজ ক'দিন ক'রাত তার না ছিল আহার, না ছিল ঘুম। গত রাত্রে প্রতিকারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে বুঝেছিল এই দুর্বৃত্তদের সহায়তাতেই যদুবংশের মেয়েগুলোকে

জয় করতে পারে। এত কথা খট্টাসের দলের জানবার নয়, খট্টাসেরও নয়। তাই তারা বুঝতে পারেনি হঠাৎ মেয়েটি এলো কোথা থেকে, এলোই বা কেন আর স্বেচ্ছায় রানী পদটাই বা দাবি করলো কেন! মোটের উপর তারা খুশী হয়েছিল, ভেবেছিল রানীর লোভ দেখিয়ে রাজাকে আটকে রাখতে বেগ পেতে হবে না।

অঙ্কুশ বলল, তখন চারদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। ইতিমধ্যে নরকভাই আর আমি এলাম খবর দিতে।

তারপরে শুধালো, কোন্ দিকে যাবে সর্দার?

যেদিকে সে গিয়েছে, সংক্ষেপে বলল খট্টাস।

তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে লোকটা গিয়েছে সমুদ্রের ধারে সেই মহানিমগাছতলায় যেখানে বাসুদেব নিহত হয়েছিল। ভাবলে না জানি লোকটা কি করে বসে, জলে ডুবেই মরে না গলায় ফাঁস দেয়! যেভাবেই হোক লোকটা হাতছাড়া হলে এ রাজ্যে তাকে রাজা করবার আশা সমূলে গত হবে। এ পর্যন্ত মনের গভীর পরিকল্পনা কাউকে জানায়নি। ধনঞ্জয় এসে যদুবংশের মেয়েগুলোকে নিয়ে গেলে জরাকে সম্মুখে রেখে রাজ্য আর রাজধানী দখল করে নিয়ে তাকে সিংহাসনে বসাবে। বাসুদেবের বৈমাত্র ভাইরূপে সে যে রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী একথা লোককে বোঝানো কঠিন হবে না। এখন হঠাৎ যদি লোকটা মরে কিংবা বেপাত্তা হয়, তাহলেই সর্বনাশ। অবশ্য কাল থেকে একটা আশঙ্কা মাঝে মাঝে চমক মেরেছে মনের মধ্যে, যদুরমণীরা চলে গেলে সমুদ্র নাকি গ্রাস করবে নগরটা। দুই হাতে আশঙ্কাটা ঠেলে ফেলে দিয়েছে। যত সব গাঁজাখুরি ব্যাপার, ছোট মুখে বড় কথা। না, জরাকে তার চাই-ই। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, অঙ্কুশ, নরক, শীগগির, ঐ যে গাছের ডালের উপরে লোকটা।

তিনজনেই দেখতে পেলো, খট্টাস সকলের আগে, মহানিমগাছটার একটা ডালের উপরে বসে ডালের সঙ্গে দড়ি বাঁধছে জরা।

তোরা গিয়ে শীগগির ওকে টেনে নামা, দেখিস যেন গলায় ফাঁস না দিতে পারে। সব মাটি হয়ে যাবে।

ওরা দুজনে ছুটে গিয়ে গাছে উঠে জরাকে টেনে নামালো। হতভম্ব জরার মুখ দিয়ে কেবল বের হল, বাঃ, এ তো বেশ মজা!

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল, কেমন করে ওরা খবর পেলো, কেনই বা তাকে টেনে নামাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারল না। এ যদি মজা না হয় তবে মজা আর কাকে বলে।

মাঝরাতে হঠাৎ কে যেন ধাক্কা দিয়ে জরার ঘুম ভাঙিয়ে দিল, এখনো পড়ে ঘুমোচ্ছ! সে ধড়মড় করে জেগে ভাবলো রানীটার কাজ—চেয়ে দেখল রানী অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কখনও যে জেগে ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই।

ওঠো ওঠো বাইরে চলো, ওঠো ওঠো বাইরে চলো—ক্রমাগত শুনতে লাগলো। মনের মধ্যে নয়, একেবারে কানে শুনতে পাচ্ছে। আর সে ডাক এমনই নির্দেশাত্মক, অমান্য করে এমন কি সাধ্য! নিশিতে-পাওয়া লোকের মতো সে গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল। এবারে শুনতে পেলো, ঐ শুনছ না হাজার হাজার কণ্ঠের কোলাহল—ঐদিকে চলো।

জরা কান পেতে শুনলো, সত্যই তো অদূরে মহাকোলাহল ধ্বনিত হচ্ছে। সেই ধ্বনি লক্ষ্য করে চলতে চলতে সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হল—ঐ তো কোলাহল! হতবুদ্ধি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সমুদ্রের দিকে চেয়ে। ভাবলো কে বলছিল কানে কানে কথা, এখন নীরব কেন? কতক্ষণ পরে জানে না হঠাৎ তার সম্বিৎ হল যে ভোরের আলো ফুটছে, কিন্তু এ জায়গায় অন্ধকার এখনো এমন নিবিড় কেন? এ কি গাছের ছায়া? উপরে তাকিয়ে দেখলো প্রকাণ্ড গাছ; নীচে তাকিয়ে দেখে তপ্ত কটাহের উপরে পা পড়লে মানুষ যেমন লাফিয়ে ওঠে তেমনি লাফিয়ে উঠে দেখলো এ সেই স্থান। না, কিছুতেই ভুল হতে পারে না, চারিদিকে মাটি ভাটি আগাছার জঙ্গল, মাঝখানটায় ফাঁক—আর সে কিনা একেবারে সেইখানটিতে এসে দাঁড়িয়েছে! হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জায়গাটাকে দু হাতে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, বাসুদেব, বাসুদেব, আমায় রক্ষা করো। চোখের জল আর ক্রন্দনধ্বনি দু-ই অবিরাম—সমস্ত জায়গাটা ভিজে গেল। এত জল কোথায় থাকে মানুষের চোখে!

কি করছে, কেন করছে, ভালো বুঝতে পারবার আগেই সে উঠে পড়লো মহানিমগাছটায়, বসলো একটা মোটা ডালের উপরে, চোখে পড়লো পাশের ডালটাতে জড়িয়ে উঠেছে একটা বুনো লতা। হাত দিয়ে দেখলো বেশ নরম আর দড়ির মতো নমনীয়, একটানে অনেকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে যে ডালটায় বসেছিল সেটার সঙ্গে বেশ শক্ত করে বাঁধলো। এ পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে করে ফেলল, এমন সময়ে চোখে পড়লো ডালের সঙ্গে তখনও কয়েকটা পাটকিলে রঙের ফুল দুলছে, এত টানাটানিতে ছিঁড়ে পড়ে যায়নি, সামান্য বন্য ফুলের জীবন তাও কত দুর্মর। ঐ ফুলগুলো দেখতে তার বেশ মজা লাগছিল। কেমন দুলছে, দুটো মৌমাছি তাদের উপরে বসবার চেষ্টা করছে, তবে কেন যেন সাহস করছে না। সে ভাবলো বসতে পারুক আর নাই পারুক তাতে তার কি।

এমন সময়ে অনেক মানুষের কোলাহলে সচেতন হয়ে উঠল, তাকিয়ে দেখল কারা সব ছুটে আসছে। সে স্থির করলো আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, কিন্তু তার আগেই জন দু-তিন গাছে উঠে পড়ে তাকে টেনে নামালো। এতক্ষণে বুঝলো এরা সেই সর্দারের দল।

থট্টাস গর্জন করে উঠল, তবে রে পাষণ্ড, তোমাকে রাজা করেছি গলায় দড়ি দিয়ে মরবার জন্যে! এত তাড়া কিসের? যখন আমাদের কাজ ফুরোবে আমরাই দড়ি যুগিয়ে দেব, তোমাকে আর কষ্ট করে খুঁজতে হবে না। অনড্বান কোথাকার!

থট্টাসের টোলের পাঠ একেবারে নিষ্ফল হয়নি, মাঝে মাঝে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ ফসকে। দলের লোকে অবাক হয়, সর্দার আবার ওদিকেও আছেন! পণ্ডিত সমাজে পাণ্ডিত্যের আদর না থাকলেও মূর্খ সমাজে এখনও আছে।

মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো জরা। তখন দলের দিকে তাকিয়ে সর্দার বলল, রানী, রাজা তোমার জিম্মায় রইলো। রানীগিরি বজায় রাখতে চাও তো রাজাকে বাঁচিয়ে রেখো। ওটা নিতান্ত মূর্খ নির্বোধ নরাধম।

খবর পেয়ে গুহা থেকে দলবল সবাই এসে জুটেছে।

নরক বলল, সর্দার, লতাটা খুলে ফেললে হয়, নয়তো কখন আবার রাজা উঠে ঝুলে পড়বে।

ঝোলবার যদি ওর এতই সাধ তবে আর অপূর্ণ থাকে কেন? কেউ একজন উঠে লতাটা বেঁধে একটা দোলনা তৈরী করে ফেল তো?

সর্দারের আদেশের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও প্রতিবাদ করবার সাহস কারো ছিল না। একজন উঠে দোলনা তৈরী করে ফেলল।

নাও, এবারে রাজা-রানীকে উঠিয়ে আচ্ছা করে দুলিয়ে দাও। বেটা একা ঝুলতে চেয়েছিল, এবারে দুজনে দুলুক।

তারপরে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল, বাসুদেব বৃন্দাবনে অনেক দোল খেয়েছে, এবারে তার ভাই দোল খাক। তাও কিনা আবার বাসুদেবের হত্যাভূমির বক্ষে। বাঃ-বাঃ-বাঃ!

শেষোক্ত উচ্ছ্বাস দোদুল্যমান রাজা ও রানীর প্রতি লক্ষ্য করে।

মঘা থাকলে যেন খুশী হত।

কে একজন বলে উঠল, ঐ যে সে আসছে।

কি মঘা, খবর কি?

খবর যেমন আশা করা গিয়েছিল। কালকে অর্জুন এসে পৌছেছেন। আগামী কাল মধ্যাহ্নে সকলকে নিয়ে হস্তিনা রওনা হবেন।

উত্তম সংবাদ। তারা মথুরাদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাত্রা করবে, সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে নগর অধিকার করতে হবে। সমস্ত দলবল নিয়ে যথাসময়ে যথাস্থানে তোমরা উপস্থিত থাকবে।

দোলনায় বসে সব শুনতে পাচ্ছিল মল্লিকা। সে দেখলো সমস্ত মাটি হওয়ার যোগাড়। নগর অধিকারে তার কি আনন্দ! রাজত্বে তার কি সুখ! সে চায় নির্লজ্জ যদুরমণীগণের লাঞ্ছনা। বিশেষভাবে রম্ভা আর কামনা নামে দুই জনের। তারাই তার কোলের মানুষটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ভোগ করতে পারেনি, আর দশজনের টানাটানিতে ভিন্ন ভিন্ন দেহ হয়ে মারা গিয়েছিল।

সে দোলা থেকে নেমে পড়ে বলল, সর্দার, আমার একটা প্রার্থনা আছে।

সর্দারের মনটা খুশী ছিল, বলল, প্রার্থনা কি, বলো আদেশ। রানী কি কখনো প্রার্থনা করে!

আদেশ বললে যদি খুশী হও তবে তাই।

কি চাই?

রাজবাড়ির দুটি বধূকে আমার দাসী করে রাখতে চাই।

চমৎকার! কিন্তু মাত্র দুটি? দুশো নয় কেন, দাসী না হলে রানীকে মানাবে কেন? তবে কি জানো, রাজপুরী থেকে ছিনিয়ে আনা সহজ নয়, তবে ওরা যখন দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে পড়বে তখন পাকড়ে আনলেই চলবে, তুমি নাম বলে দিও।

নাম বললে চিনতে পারবে কেন, আমি নিজেই সঙ্গে যাবো।

মঘার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে খট্টাস বলল, দেখেছ মঘা, কেমন লড়িয়ে রানী যোগাড় করেছি! তাই হবে রানী।

তারপরে মঘা তারক অসুর অঞ্জন পাতক প্রভৃতি প্রধানদের বলল, যেমন আদেশ করলাম সেইরকম করতে যেন ভুল করো না। যাও, এখন সকলকে ডেকে নিয়ে জড়ো হও গে, আর বেশি সময় নেই, আর আটপ্রহরের মাথায়।

তারপর মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বলল, যদি রানীগিরির লোভ থাকে রাজাকে নজরে রেখো।

মল্লিকা বলল, রানীগিরির লোভ না হোক দাসী রাখবার লোভে বোকা মানুষটাকে নজরবন্দী করে রাখবো, সর্দার, ভয় করো না।

খট্টাস বলল, আমি এখন চললাম, আমার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন।

পরদিন প্রভুদয়াল কুটিরের কাছে সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট ছিল, একটা টিলার উপরে তাদের বাস, অনেক নীচে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। তখনও অপরাহ্ন হয়নি।

তার মনটা বিষণ্ণ ছিল। কালকেই শুনতে পেয়েছিল যে হস্তিনা থেকে অর্জুন এসে পৌঁছেছেন, পরের দিন সকলকে নিয়ে ফিরে যাত্রা করবেন। সকালবেলায় উঠে রাজধানীতে গিয়েছিল, প্রবেশ করেই বুঝলো এ যে ভাঙা হাট। সেদিনের পরে সেই যেদিন জরার জন্য ছাড়পত্র আনবার আশায় গিয়েছিল, ক'দিনই বা, আর এখানে একা আসেনি। অথচ এই ক'দিনে কি বিপুল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে! চারদিকে সাজ সাজ রব। রথে গজে অশ্বে ও নানাশ্রেণীর শকটে রাজবাড়ির বিশাল চত্বর পূর্ণ। কোনরকমে ভিড় ঠেলে বসুদেবের গৃহে গিয়ে পৌঁছল, প্রথমেই চোখে পড়লো বাসুদেবের পায়ের কাছে আসীন অর্জুনকে। চিনতে পেরে চমকে উঠল, চিনতে পারলো বলেই চমকালো। কৃষ্ণের সঙ্গে যখন ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিল তখন পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল, সেই স্মৃতি আজকের চমকের আসল কারণ। তার মনে পড়লো পাঁচ ভাইয়ের চেহারা। যুধিষ্ঠির দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় শুভ্রবর্ণ; ভীমসেন তাঁর চেয়ে মাথায় কিছু খাটো তবে বহরে পুষিয়ে নিয়েছেন—যেন একটি মূর্তিমান গদা; নকুল সহদেব মাথায় সমান সমান, দুজনেই সুপুরুষ ও সুন্দর, তবে সে বিলাসীর সৌন্দর্য; আর অর্জুন! মাথায় প্রায় যুধিষ্ঠিরের সমান, আর একটু লম্বা হলে কৃশ দেখাতো। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে মধ্যে অনুপাতটি এমন যথাযথ যে কোন একটিকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে না, একসঙ্গে সমগ্রটা চোখে পড়ে যায়। রঙটি কচি কলাপাতার আর চোখ দুটি ধ্যানীর—সর্বদা যেন আর সকলের দৃষ্টিতে অদৃশ্য বস্তুকে দেখতে পাচ্ছে। অর্জুনের স্মৃতি মনে হওয়াতে অনেকবার সে ভেবেছে ভগবান যোগ্য আধারেই গীতামৃত রক্ষা করেছেন। সেদিনকার সেই স্মৃতি আজকের দৃশ্যকে যেন কশাঘাত করলো। এ কি সেই লোক! সেই লোক নিঃসন্দেহ, সমস্ত কেমন অপ্রসন্ন বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত, শিথিল জ্যা ধনুকের মতো দেহভাব। ভাবলো এমন পরিবর্তন, এত পরিবর্তন কেন? তখনই মনে পড়লো মাঝখানে আছে মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আর তারপরে অতিবাহিত হয়েছে ছত্রিশটি বৎসর। মহাযুদ্ধ জেতা বিজিত জীবিত মৃত সকলকেই অল্পবিস্তর কবলস্থ করেছে আর মহাকালও নিষ্ক্রিয় নন, করতলের ছাপ বসিয়ে দিয়েছেন সকলের দেহে। একসঙ্গে মহাযুদ্ধ ও মহাকালের অভিঘাতে মানুষের অস্তিত্বের ভারসাম্য বিচলিত।

এ যেন এক বিরাট মন্দির ভেঙে পড়বার মুখে।

প্রভুদয়াল আর অগ্রসর হয়ে দেখা করলো না। ভগ্নপ্রায় মন্দিরের কাছে ভরসা করে গিয়ে সে দাঁড়ায়। একজনকে শুধিয়ে জেনে নিল যে বসুদেব ঠিক মধ্যাহ্নে যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবেন। দেবকী, মদিরা, রোহিণী ও ভদ্রা তাঁর চিতায় আরোহণ করবেন। কৃষ্ণের পত্নী সত্যভামা হিমালয়ে প্রস্থান করবেন, আর সকলে তো আগেই চিতায় অনুমৃতা হয়েছেন।

প্রভুদয়াল শুধালো, অর্জুনের সঙ্গে যাবে কারা?

তার চেয়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করো, থাকবে কারা।

বেশ তাই বলো।

একটি জনপ্রাণীও নয়। সবাই যাবে।

কেন?

কেন কি ঠাকুর, যদুরমণীদের নিয়ে অর্জুন নগর পরিত্যাগ করবামাত্র সমুদ্র এসে যে এ পাপপুরী গ্রাস করবেন।

কে বলল?

এতদিনে কথাটা জ্যোতিষীদের নামে চলছিল তাই লোকে নিশ্চিন্ত ছিল কারণ তারা যা বলে ঠিক তার উল্টো হয়। আজ বসুদেব আর অর্জুন দুজনেই বলেছিলেন। আমি তো থাকবো ভেবেছিলাম এখন যাওয়াই স্থির করেছি। শোনো ঠাকুর, ভালো চাও তো তুমিও স'রে পড়ো।

প্রভুদয়াল নগর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছায় মথুরাদ্বারের দিকে গিয়ে দেখল আর অধিক অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, যাত্রীদের সূচিভেদ ভিড়। কাজেই উল্টো-দিকে সমুদ্রের মুখে যে সিন্ধুদ্বার সেই দরজা দিয়ে বের হল। সে নিতান্ত আত্মস্থ হয়ে চলছিল নতুবা দেখতে পেতো এদিকে প্রাচীরের বাইরে বেশ কিছু মানুষ সমবেত, তবে তাদের বেশভূষায় যাত্রার আয়োজন সূচিত নয়। এত লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার। সে সোজা বাড়ি চলে এলো, স্ত্রীকে সংক্ষেপে নগরের অবস্থা জানিয়ে আহারান্তে ধীরভাবে সমস্ত চিন্তা করে দেখবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের দিকে একখানি শিলাসনে উপবিষ্ট হল। পদতলে বেশ নিম্নে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র নিদ্রিত।

সমুদ্র অস্বাভাবিক শান্ত, বায়ুমণ্ডল অস্বাভাবিক স্তব্ধ; আকাশের নীল ও সমুদ্রের নীল পরস্পরের উপমাস্থল; গাছের পাতা নিস্পন্দ, সমুদ্রের ঢেউ নিদ্রিত; আর আকাশে বাতাসে সমুদ্রে অস্বাভাবিক তাপ, খুব লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় একটা অতি সূক্ষ্ম বাষ্প সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; কুয়াশা নয়, তপ্ত চরাচরের তাপ। স্বভাবচঞ্চলের অস্বাভাবিক শান্তভাব আসন্ন সঙ্কটসূচক। তবে এসব লক্ষ্য করিবে কে? সমুদ্রতীরে যতদূর চোখ চলে কোথাও জনপ্রাণী নাই, নাই সমুদ্র-জলে মুলিয়াদের নৌকা কিংবা কোন সমুদ্রচর নৌকার পাল। আর শিলাসনে উপবিষ্ট প্রভুদয়াল এমনই আত্মস্থ যে তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও এসব দৃশ্য সম্বন্ধে অসচেতন আর যদিবা কোন দৃশ্যের প্রতিফলন হইয়া থাকে তাহার অর্থ-গ্রহণে সাময়িকভাবে অক্ষম।

সে সজাগ সচেতন থাকিলে দেখিতে পাইত সমুদ্র ও আকাশের মিলিত দিগন্ত জুড়িয়া দক্ষিণতম হইতে উত্তরতম পর্যন্ত মেঘের মাথা ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেছে; দেখিতে পাইত সায়াহ্নের অনেক আগে সমুদ্রচারী বিহঙ্গেরা ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে; অন্য দিনের মতো বূহিবদ্ধ অবস্থায় নয়, ভগ্নব্যূহ দলে দলে, গতি তাহাদের শঙ্কাক্রন্ত।

সেই মেঘমালা এতক্ষণে অনেকটা উপরে উঠিয়াছে; এ তো মেঘ নয়, এ যে কষ্টিপাথরের গিরিশিখর, তেমনি ঘন কালো, তেমনি চিক্কণ; তেমনি নিরেট। মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের রঙে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল, ঘন নীলিমা ধাপে ধাপে ঘন কালিমার দিকে অগ্রসর হইতেছে তবে বায়ুমণ্ডলে তখনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই, সে তেমনি নিথর নিস্পন্দ নিস্তব্ধ। মেঘমালা এখন আকাশের তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে; সমুদ্রে এখন মহিষাসুরের গায়ের রং; মেঘমালা এবারে পূর্বদিগন্তের দিকে ক্রমে ঝুঁকিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল যদিচ পশ্চিম দিগন্তে তাহার সানুদেশ এখনও দৃশ্যমান নয়। এবারে সমুদ্রের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সে রঙের উপমাস্থল মানুষের ভাষায় নাই। সমুদ্র তখনো নিশ্চল, বায়ুমণ্ডল নির্জীব। মদোন্মত্ত সিংহী যেমন প্রথম কিছুক্ষণ সিংহকে এড়াইয়া এড়াইয়া চলে, আকাশের কাছে সমুদ্রের তেমনি ভাব। শেষে সিংহের আর্ত গর্জনে সংযম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধরা দেয়। সমুদ্র ধরা দিল, মেঘ আর্ত গর্জন করিয়া উঠিয়াছে। আকাশের উচ্চতম শিখর হইতে একটি আর্ত উৎকট কর্কশ কঠোর ক্রূর গর্জন ধ্বনিতমাত্র প্রতিধ্বনিত হইল, সেই ধ্বনির টুকরাগুলি সমুদ্রের সদ্যোত্থিত সহস্র ঢেউ লুফিয়া

লইয়া এ ওর দিকে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল, এক গর্জন সহস্র গর্জনে পরিণত হইয়া আকাশ বাতাস তোলপাড় করিতে লাগিল। আকাশে বায়ু জাগিয়াছে, সমুদ্রে ঢেউ জাগিয়াছে, চরাচরে পঞ্চভূত জাগিয়া উঠিয়াছে। এ যেন শব্দ নয়, এ যেন নিস্তব্ধতার বিকারের আক্ষেপ। এবারে প্রভুদয়ালের সম্বিৎ হইল।

অসম্ভবের অভিঘাতে কি করা উচিত বুঝিতে না পারিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বুঝিতে পারিল না সূর্য অস্তমিত কিংবা নয়, রাত্রি সমাগত কিংবা নয়, এ কি প্রলয়ের সূচনা কিংবা নয়। তাহার মনে হইল তবে হয়তো জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য, প্রলয় না হোক খণ্ডপ্রলয় নিঃসন্দেহ। সে বসিয়া পড়িল, দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব।

প্রভুদয়াল দেখিল হঠাৎ সমস্ত সমুদ্র জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল। প্রত্যেকটি তরঙ্গের শিখর, প্রত্যেক দুটি তরঙ্গের মধ্যস্থিত উপত্যকা, প্রত্যেক তরঙ্গের রেখা সমস্ত জ্যোতির্ময় দীপ্যমান। অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিল এ আলোক! প্রভুদয়াল ভাবিল একেই কি বাড়বানল বলে! অনল যদি তবে কোথায় তাহার দাহ! কী তাহার ইন্ধন! এ যে সমস্ত জলময়। অথচ সমস্ত আলোকময়। এ যেন অন্ধকারে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। আগুন কিন্তু তাপ নাই, অনল কিন্তু শীতল। এ যেন মৃত অগ্নির প্রেতাত্মা, কায়াহীন অবাস্তব, তাই আলো আছে তাপ নাই, দীপ্তি আছে দাহ নাই, দৃশ্য আছে দেহ নাই। হতবুদ্ধি হইয়া সে তাকাইয়া রহিল সেই দৃশ্যমান অন্ধকারের দিকে। কিছুক্ষণ আগেকার অন্ধকারের চেয়ে দৃশ্যমান এই পট আরও অধিক আতঙ্ককর। সে দেখিতে পাইল হাজার হাজার অগ্নিময় মৎস্য, নক্র কুম্ভীর, হাঙ্গর, শিশুমার, কূর্ম, কচ্ছপ, তিমি, তিমিঙ্গিল এবং নাম জানে না, কখনো কল্পনাও করে নাই এমন সব বিকৃতদর্শন জলচর জীব তীরভূমির দিকে সবেগে অভিযান করিতেছে। ইহারা বুঝি সমুদ্রের আক্রমণের অগ্রবর্তী বাহিনী! সমুদ্রের এই আলোকময় অভিযানের সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া আকাশে বিদ্যুদ্দাম বিকশিত হইতে লাগিল। সে কি বিদ্যুৎ-বিকাশ! কোন্ অতল নিতল শীতল ভূতল হইতে অনন্তনাগ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ফণা মেলিয়া তাহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র বিদীর্ণ বিকীর্ণ প্রকীর্ণ বিদ্যুতে তাহার লেলিহান জিহ্বা, আর ইতিমধ্যে যে দারুণ ঝঞ্ঝা আরম্ভ হইয়াছে তাহাই বুঝি তাহার হিংস্র হিস্ হিস্ শব্দ। এতক্ষণে সিংহিনী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে সিংহের কাছে।

আর এ কী বিভীষণ ঝঞ্ঝা! চরাচরের দশ দিকে যে বায়ু বিস্তারিত হইয়া সুপ্ত শান্ত স্তব্ধ মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহারা আজ জাগ্রত হইয়া একযোগে আক্রমণ

করিয়াছে। সুদূর উত্তর মেরুর দক্ষিণ মেরুর শীতল বায়ু, বিষুবরেখার অগ্নিময় বায়ু, মহেন্দ্র পর্বতের শীতোষ্ণ বায়ু, হিমাচলের দেবদারুসুগন্ধি বায়ু, মৎস্যদেশের বালুকাময় বায়ু, ব্রহ্মাবর্তের পবিত্র বায়ু, প্রাগ্‌জ্যোতিষের গন্ধময় বায়ু, দর্শানদেশের কঙ্করময় বায়ু, গান্ধারের গম্ভীরনাদী বায়ু, কম্বোজের কুঙ্কুমবাসিত বায়ু, লাক্ষাদ্বীপের এলাচসুরভি বায়ু, লঙ্কাদ্বীপের তালতমাল বীজিত বায়ু, চরাচরের সমস্ত বায়ু আজ প্রভঞ্জনরূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমাগত অক্ষৌহিণীসমূহের ন্যায় এই ভৌতিক কুরুক্ষেত্র মহাহবে যোগদান করিয়াছে। সমুদ্র আকাশ আজ একাকার। উভয়ের মল্লসঙ্গমে যে ধারণাতীত শব্দ উত্থিত তাহার সামান্য অংশই মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় যে-সব বস্তু ধারণার জন্য প্রদত্ত এ সমস্ত তাহার অনেক অতীত, অনেক অতিরিক্ত। মানুষের সৌভাগ্য যে পঞ্চভূত লীলার অধিকাংশই তাহার ধারণার অতীত নহিলে সে কি এক মুহূর্ত বাঁচিতে পারিত!

এমন সময়ে প্রভুদয়ালের চোখে পড়িল, সেই দৃশ্যমান অন্ধকারে দেখিবার বাধা ছিল না, সে দেখিল পাঁচ-সাতটি অতিকায় ডাকিনী মহোল্লাসে মহাবেগে নাচিতে নাচিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশ-সমুদ্রের যুগল খঞ্জনীর আঘাতে যে রুদ্র তাল ধ্বনিত, তাহার সঙ্গে তাল রক্ষা করিতে করিতে ধাবমান হইয়াছে, তাহাদের মস্তক আকাশে নিলীন, তাহাদের চরণ সমুদ্রগর্ভে নিহিত, তাহারা বুঝি আকাশকে ধারণ করিবার মহাস্তম্ভ! ধূসর ধূমল পিঙ্গল চঞ্চল বিহ্বল জলস্তম্ভ। সমুদ্র ভয়াল করাল উত্তাল উদ্বেল উল্লোল উচ্ছল। পৃথিবী মুহুর্মুহুঃ কম্পিত। প্রভুদয়াল আর সহ্য করিতে পারিল না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

প্রভাতের শীতল বায়ুতে যখন তাহার মূর্ছাভঙ্গ হইল চোখ মেলিয়া দেখিল, এ কি চারিদিক নিস্তব্ধ ও শান্ত! কাল প্রভাতে যেমন ছিল সমুদ্র আকাশ চরাচর তেমনি স্বাভাবিক। তবে কি সারা রাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল! উঠিয়া দাঁড়াইয়া নগরের দিকে তাকাইতেই বুঝিতে পারিল সমস্তই নিদারুণ ভাবে সত্য। রাজধানীর উচ্চতম অট্টালিকার তুঙ্গতম চূড়াটি অবধি জলতলে অদৃশ্য। যতদূর দেখা যায় সমুদ্রের হরিদ্রাভ বারি, কোথাও একটুকু ডাঙ্গা জাগিয়া নাই। কেবল পাহাড়ের উপরে বলিয়া তাহারা রক্ষা পাইয়াছে—আর অদূরে যে মহানিম-গাছতলায় বাসুদেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, একটা টিলার উপরে সন্নিহিত বলিয়া সেই মহানিম বৃক্ষটি এবং ঐ স্থানটুকু ডোবে নাই আর নগরের উত্তর দিকে জাগিয়া আছে লাট্টু পাহাড়ের চূড়াটি।

কুটিরে প্রত্যাবর্তন করিতে গিয়া দেখিল, দেখিয়া একবার হাসিল যে এই খণ্ডপ্রলয়ে তাহাদের কুটিরটি অক্ষত আছে। বুঝিল মহারথীগণ এই সামান্য

নিরস্ত্র নিরীহ পদাতিককে নিতান্ত অনুকম্পাভরেই স্পর্শ করে নাই।

॥ ১১ ॥

খট্টাসদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল, প্রাণটা যে গেল না সেটা উপস্থিত বুদ্ধির ফল। মথুরাদ্বার দিয়ে অর্জুনের অনুসরণে যদুবংশীয়গণ যখন বহির্গত হচ্ছে খট্টাস দলবল নিয়ে সমুদ্রতীরের দরজায় অপেক্ষা করছিল; সকলকে বলল, ওরা বের হয়ে যাক তারপর প্রবেশ করে নগর অধিকার করলেই হবে, খামোকা তাড়াহুড়োয় লোকক্ষয় করে কি লাভ?

যদুবংশীয় বাহিনী নিতান্ত কম নয়, সন্ধ্যা হয়ে এলো শেষ মানুষটি নগর পরিত্যাগ করতে। তারপর তারা জরাকে অগ্রবর্তী করে দিয়ে প্রবেশ করলো নগরে।

খট্টাস বলল, তোমরা লুটপাট করো না, তাহলে নিজস্ব লুট করা হবে— এখানে যা কিছু আছে এখন সবই তোমাদের।

লুব্ধ মানুষ এরকম যৌথ ধনলাভের আশ্বাসে সান্ত্বনা পায় না। মঘা নরক অসুর প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়া আর সকলেই লুণ্ঠনের আশায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো, কেউবা ঘরের দেয়াল মেঝে খুঁড়তে শুরু করলো, আবার কেউ কেউ অপরের আহৃত ধনে ভাগ বসাবার জন্যে কলহ আরম্ভ করে দিল।

জরাকে একস্থানে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, স্থাণুর মতো সেখানে বসে রইলো। প্রমাদ গনলো মল্লিকা। তার রানীত্ব স্বীকার, নগরাধিকার সমস্তই নির্লজ্জা যদুরমণীদের বিশেষভাবে রত্না ও কামনাকে লাঞ্ছিত করবার আগ্রহে। তারাই যদি হাতছাড়া হয়ে গেল কি হবে রাজত্বে, কি হবে নগরাধিকারে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

এমন সময় জনকতক অনুচর ছুটতে ছুটতে এসে শুধালো, সর্দার কোথায়?

কেন ভাই, কি হয়েছে? বক্তা মল্লিকা।

সর্বনাশ হয়েছে রানী, সমুদ্র ছুটে আসছে।

ও কিছু নয়, জোয়ারের জল।

জোয়ার কি আমরা দেখিনি রানী, এ জল জোয়ারের সীমা পেরিয়ে এসেছে, সঙ্গে মহা ঝড়।

নগরের প্রাচীরের আড়াল এবং লুটপাটে মনোযোগের দরুন বাইরে সমুদ্রে যে কাণ্ডটা ঘটছে জানতে পায়নি ওরা। এমন সময়ে সর্দার এসে পড়ে সব কথা শুনে

বলল, চলো তো দেখি গে।

প্রাচীরের উপরে সমুদ্রের চেহারা দেখে খট্টাস বুঝলো যে আজ খণ্ডপ্রলয় না হয়ে যায় না, ভাবলো তবে হয়তো জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা নয়। সে নেমে এসে সকলকে সম্বোধন করে বলল, প্রাণ বাঁচাতে চাও তো এখুনি সকলে লাটু পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাও, একেবারে চূড়ায় গিয়ে ওঠো।

সকলে প্রাণভয়ে লাটু পাহাড়ের দিকে ছুটলো, সকলের সঙ্গে মল্লিকা ও জরাও ছুটলো। কেবল অনন্ত বলে একটা লোক লুটের মালের লোভ সামলাতে না পেরে রয়ে গেল। তিনদিন পরে তার মৃতদেহ ভেসে উঠলো, তখনও তার দু হাত জড়িয়ে ধরে আছে অলঙ্কারের পেটিকাটি। মরেছে তবু মাল ছাড়েনি। লোভেও একপ্রকার আদর্শবাদ আছে।

পরদিন সকালবেলায় সকলে দেখতে পেলো যতদূর দেখা যায় জলময়—কেবল দূরে টিলার উপরে একটা বৃহৎ গাছ আর তারপর অদূরে পাহাড়তলী নামে পাহাড়টা, নগরের চিহ্নমাত্র নেই। খট্টাস সকলকে বোঝালো যে এ জল দীর্ঘকাল থাকবে না, নেমে গেলে নগর দখল করলেই হবে। সর্দার বোঝালো কাজেই সকলে বুঝলো, কেবল বুঝলো না মল্লিকা।

সে সর্দারকে বলল, সর্দার, নগর তো না হয় অধিকার করলে কিন্তু পাবে কি? ঝুড়ি ঝুড়ি শামুক ঝিনুক কড়ি আর গাদা গাদা পচা মাছ। আর দেখতে পাবে কাদায় বাড়িঘরের অর্ধেক ভরে গিয়েছে। এই সব আবর্জনা পরিষ্কার করা আমাদের এই পাঁচশো হাজার লোকের কম্ম নয়। তারপরে এত লোকের খাদ্য কোথায়? আর ইতিমধ্যে লেগে যাবে মহামারী। না খেতে পেয়ে আর রোগে অর্ধেক লোক নিঃশেষ হয়ে যাবে, বাকি পালাবে, তখন রাজত্ব করা মাথায় উঠবে।

তার কথা শুনে খট্টাস বলল, রানি, তুমি যা বলছ তা রানীর মতো কথা সন্দেহ নেই—তবে প্রতিকার তো ভেবে পাচ্ছি না।

প্রতিকার তো সহজ। যদুবংশের লোকেরা এক রাত্রির মধ্যে আর কতদূর যাবে? চলো আমরা সদলবলে গিয়ে কিছু লোক পাকড়াও করে আনি গে। তারাই সব পরিষ্কার করবে, আর বউগুলো দাসীগিরি করবে। দাসী আর সেবাদাসী দু'রকম কাজই হবে তাদের দিয়ে।

কিন্তু রানি, ওদের সঙ্গে রক্ষক মহাবীর ধনঞ্জয়, আমাদের মেরে দেন তো কতক্ষণ!

এখানেও মহাবীর মহামারী আছে, মেরে ফেলবার কাজে তারও হাত কম পাকা নয়।

তখন সর্দার প্রধান অনুচরদের ডেকে মল্লিকার বক্তব্য বুঝিয়ে দিল। সকলেরই মত হল এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে কিছু দাসদাসী সংগ্রহ করে নিয়ে আসা, শূন্য নগরে রাজত্ব করা চলে না।

সকলে যখন এ বিষয়ে আলোচনা করছিল, জরা একান্তে বসে জলময় প্রান্তরের মধ্যে মাথা জেগে থাকা নিঃসঙ্গ বৃক্ষটার দিকে স্তব্ধদৃষ্টি হয়ে নিস্তব্ধভাবে বসে ছিল।

মল্লিকা কাছে গিয়ে বলল, নাও, এখন ওঠো, হাঁ করে দেখছ কি?

জরা অঙ্গুলিনির্দেশে গাছটা দেখিয়ে দিল।

মল্লিকা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, অ, গাছ কি আর দেখনি!

না রানি, এ সেই গাছ।

বুঝেছি, যে গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে গিয়েছিলে। তা মরতে চাও গাছের অভাব হবে না, এখন চলো।

কোথায়?

কোথায় কি, গিলতে হবে না!

মল্লিকার কথায় ও আচরণে সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে, তবু বিবাহিত পত্নী নয়।

সৌভাগ্যক্রমে গুহায় জল ঢোকেনি, রাতের ভুক্তাবশেষ খাদ্য যথেষ্ট ছিল। যাত্রা করবার আগে তাই তাদের খাদ্যের অভাব হল না।

॥ ১২ ॥

প্রভুদয়ালকে ফিরতে দেখে কাশ্যপের মা ও জরতী আশ্বস্ত হল। সারারাত তাদের দুশ্চিন্তায় কেটেছে। অনেকবার তারা ঘর থেকে বের হয়ে খোঁজবার চেষ্টা করেছে, ঝড়ের বেগে এগোতে পারেনি, শেষে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়েছিল, বলা বাহুল্য অনিদ্রায় কেটেছে।

কাশ্যপের মা শুধালো, সারারাত কোথায় ছিলে, আমরা তো ভয়ে মরি।

প্রভু বলল, আগে তোমরা কেমন ছিলে বলো।

তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কোন অসুবিধা হয়নি। তোমার কথা বলো।

আমি সেই পাথরখানা জড়িয়ে ধরে কোনমতে আত্মরক্ষা করেছি।

এলে না কেন?

কাশ্যপের মা, যে দৃশ্য জীবনে একবার বই দেখতে পাবো না, তা ছেড়ে আসি কি করে!

প্রসঙ্গ পাল্টে অদিতি বলল, সব যে জলে জলময়, নগর পত্তন সব গেল কোথায় ?

যে সমুদ্র থেকে সমস্তর সৃষ্টি, সেই সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ঘরে যে একদানা গম কি চাল নেই, চলবে কি করে ?

চালাবার ভার যাঁর ওপরে ছেড়ে দিয়েছি, তিনিই চালাবেন, না চালান অচল হবে।

তাদের মধ্যে যখন এই সব কথা হচ্ছিল, জগন্নাথ নৌকো করে এসে উপস্থিত হল।

প্রভুদয়াল তাকে দেখে আনন্দিত হয়ে বলে উঠল, জগন্নাথ যে, সমস্ত কুশল তো ?

বাবার আশীর্বাদে একরকম কুশল।

সব তো ডুবে গিয়েছে, তোমাদের পাড়াটাও নিশ্চয় তলিয়ে গিয়েছে, তোমরা রক্ষা পেলে কি করে ?

বাবা, আমরা সমুদ্রের সন্তান। কালকে বাবার ভাবগতিক দেখে বুঝলাম বাবা বড় রাগ করেছেন, সমস্ত গ্রাস করবেন, তাই সকলকে নিয়ে নগরের পূবদিকে যে রৈবতক পাহাড় আছে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

বেশ বেশ, তা আজ এত সকালে কি মনে করে ?

ভাবলাম বাবাদের একবার খবর নিয়ে আসি।

তারপর কাশ্যপের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, কিছু চাল আটা আর ডাল এনেছি, নাও রাখো।

কিন্তু বাবা, আজ যে ঝিনুক কড়ি কুড়োতে পারিনি !

মা, কুড়োতে পারলেও ওসব নেবার লোক কোথায় ?

তবে বাবা তোমার ঋণ শুধবো কি করে ?

জগন্নাথ জিভ কেটে বলল, ও কি কথা মা, সন্তানের জিনিস কি ঋণ ? ছিঃ মা, বড় লজ্জা দিলে।

আচ্ছা বাবা দিয়ে যাও, ঘরে কিছুই ছিল না।

সে কি জানি নে মা, আমিই তো দিয়ে যাই। তাই ভোরে উঠেই তাড়াতাড়ি এলাম।

প্রভুদয়াল বলল, জগন্নাথ বসো, তুমি কতদূর কি দেখেছ বলো তো !

জগন্নাথ পায়ের কাছে বসে বলল, সমুদ্রের ভাবগতিক দেখে পাড়ার সকলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলাম, সেখানে তাদের থিতু করে দিয়ে

ফিরে এলাম রাজধানীতে। দেখলাম যে স্ত্রী-পুরুষ সারিবদ্ধ হয়ে মথুরাস্বার দিয়ে নগর ছেড়ে চলতে শুরু করেছে।

বাধা দিয়ে প্রভু শুধালো, আচ্ছা ঐ হতভাগিনীদের কি হল জানো?

জানি বইকি বাবা, সব জায়গায় মাছ বেচতে যাই কিনা। তাদের অনেকে আগেই যার যার দেশের দিকে চলে গিয়েছিল।

কেন বলো তো?

সে লজ্জার কথা আর কি বলবো। রাজবাড়ির বউ-ঝির অত্যাচারে।

হ্যাঁ শুনেছি। তারপর?

বাকি যারা ছিল, তারাও যাত্রা করলো রাজবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে। কাজেই তারা সবাই প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।

আর বাজারের লোকজন?

তাদের অনেকে অন্য নগরের দিকে গিয়েছে আর কতক লোক নিজ নিজ বেসাত নিয়ে যদুবংশের সঙ্গে চলল, ধনঞ্জয় ঠাকুর নাকি সেই রকম আদেশ করেছিলেন, পথে চাল ডাল দরকার হবে তো।

আর খট্টাসের দলবল?

বাবা, যমে যাদের ভয় করে তাদের জন্যে দুশ্চিন্তা করো না।

তবু শুনি না।

রাজধানী ফাঁকা হয়ে গেলে তারা ঢুকে লুঠপাট শুরু করে দিল। তারপরে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস দেখে সবাই দৌড়ল লাটুপাহাড়ের দিকে। ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই। তবে পৌঁছল কিনা জানি না, সমুদ্র এগোচ্ছেন দেখতে পেয়ে আমি পালিয়ে চলে এলাম রৈবতকে।

প্রভুদয়াল বলল, জগন্নাথ, একবার খোঁজ নিতে পারো ওদের কি হল?

এ আর কঠিন কাজ কি বাবা, আমি এখনই যাচ্ছি। আগে অনেক ঘুরে যেতে হত, এখন যেখান দিয়ে খুশি নৌকা চালিয়ে দিলেই হল।

এই বলে জগন্নাথ নৌকা ভাসিয়ে রওনা হয়ে গেল।

এই বন্যায় জরা ডুবে মরেছে ভেবে জরতী কাল রাত থেকে কাঁদছে, তাই জরার নিরাপদ সংবাদটা পাওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রহরখানেকের মধ্যেই জগন্নাথ ফিরে এসে বলল, বাবা, তারা কেউ পাহাড়ে নেই। দু-একজন লোক যাদের পেলাম, তারা বলল, খট্টাস ঠাকুরের দল খুব ভোরে রওনা হয়ে গিয়েছে। কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করায় নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারলো না, তবে খুব সম্ভব তারাও ধনঞ্জয় ঠাকুরের সঙ্গে হস্তিনার দিকেই গিয়ে থাকবে।

জগন্নাথ বিদায় হয়ে গেলে প্রভুদয়াল জয়তীকে ডেকে বোঝালো যে, জরার কোন ক্ষতি হয়নি, দলবলের সঙ্গে সে হস্তিনার দিকে যাত্রা করেছে। হস্তিনা মস্ত নগর, সেখানে সুখেই থাকবে, তুমি চিন্তা করো না, নাও এখন স্নানাহার করগে।

প্রভুজীর বাক্য জয়তীর কাছে গুরুবাক্য, তাই সে আশ্বস্ত হল, তবে নিজে সে আশ্বাস পেলো না। প্রভুজী বুঝে নিয়েছিল সমাজের অবিচারে ও শারীরিক বিকলতায় বিশ্ববিধানের মঙ্গলকারিতায় বিশ্বাস হারিয়েছে খট্টাস; তারপরে জ্ঞানের যে অগ্নি মানুষকে পুড়িয়ে খাঁটি করে তোলে, তাতে পুড়ে সে খাক হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান একাধারে প্রভু ও দাস। যে তাকে প্রভু বলে গ্রহণ করলো বেঁচে গেল সে; আর যার কাছে জ্ঞান দাস মাত্র, ঐ দাসের শক্তিকে স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করে। খট্টাসের এই শেষোক্তের অবস্থা। জাগ্রতকে জাগানো সম্ভব নয়, আর জ্ঞানের ফলে জাগ্রত ব্যক্তি অপরকে কপট নিদ্রার দীক্ষা দিয়ে থাকে। তার দলবল সেই দীক্ষাপ্রাপ্ত। খট্টাস ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিকে বিশ্ববিধানের উপরে আরোপ করে তার বিচার করতে বসে অবিচার করছে। সে যে যদুবংশবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হস্তিনায় যাবে না—একথা নিশ্চয় বুঝেছিল প্রভুদয়াল।

পরদিন জগন্নাথ এলে প্রভু বলল, বাবা জগন্নাথ, তোমাদের মধ্যে যারা ঘোড়ায় চড়তে পার, তাদের জন-দুইকে পাঠিয়ে দিয়ো না!, দ্রুত গিয়ে দেখে আসুক যদুবংশের নরনারীরা নিরাপদে পথ চলছে কিনা। আসল উদ্দেশ্য জরার সন্ধান করা। তবে জরা আর খট্টাসের দলবলের কথা আর বিশেষ করে উল্লেখ করলো না।

জগন্নাথ বলল, বাবা, আমি আজ কানাই আর বলাইকে পাঠিয়ে দেবো, ওরা ভালো ঘোড়সওয়ার। খবর পেলেই এসে জানিয়ে যাবো।

॥ ১৩ ॥

কয়েক ক্রোশ পথ অধিকার করে চলেছে যদুবংশবাহিনী। সবাই যে যদুবংশের নরনারী এমন নয়, তবে সবাই যদুবংশের রাজধানীর অধিবাসী বটে। সর্বাগ্রে রথে ধনঞ্জয়, তারপরে শিবিকায় সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ, তারপরে বহু হস্তীপৃষ্ঠে বাহিত বহুকালের সঞ্চিত ধনরত্নসম্ভার। তারপরে রথে ও শিবিকায় যদুবংশের কুলবধূগণ, সেই সঙ্গে অশক্ত বৃদ্ধ ও বালকবালিকা, আর সর্বশেষে অসংখ্য ভৃত্য, সেবক ও বাজে লোক।

এই বাহিনী দিনের বেলায় পথ চলে, সন্ধ্যার আগে কোন পত্তনে বিশ্রাম

করে। দ্বারকা থেকে হস্তিনা অনেক শত যোজন পথ। প্রথম দিকে জনপদ আছে, মাঝে মাঝে ছোট-বড়-মাঝারি পত্তন। সেখানকার বাজারে খাদ্যদ্রব্যাদি মেলে। রাজধানীর বাজার থেকে যে সব ব্যবসায়ী এসেছিল, তাদের অনেকেই পথে কোন না কোন পত্তনে বসে গেল, দূর দেশে যেতে তারা রাজী নয়। কয়েক দিন পরে তারা পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করল।

ইতিমধ্যে খট্টাস তার দলের হাজার দুই লোক নিয়ে মূল বাহিনী থেকে কিছু দূরত্ব রক্ষা করে পথ চলছিল, যেন তারাও রাহী লোক। তবে কেউ তাদের পরিচয় শুধালো না। কে পরিচয় শুধাবে? সমস্ত দেশ অরাজক, দেশে এখন মাত্র দুটি শ্রেণী—অত্যাচারী আর অত্যাচারিত।

খট্টাসের এখন প্রধান পরামর্শদাতা মল্লিকা। সে বুঝিয়েছিল যে এখনো তারা রাজধানীর কাছে আছে, এখানে রাহাজানি করলে লোক-জানাজানি হওয়ার আশঙ্কা, কারণ স্থানীয় লোকের কাছে যদুবংশ ও খট্টাসের দল পরিচিত। তাই এ অঞ্চল থেকে দূরে গিয়ে পড়বার আগে আক্রমণ করা উচিত হবে না। মল্লিকার যুক্তির মূল্য খট্টাস বুঝতে পারলো। তারপরে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করলে মল্লিকা বোঝাল, সর্দার, এবারে আক্রমণ করা যেতে পারে, আমরা দূরে এসে পড়েছি। খট্টাস মঘা অসুর নরক প্রভৃতি প্রধানদের ডেকে জানিয়ে দিল কাজ শুরু করবার সময় এসেছে। তারা যেন প্রস্তুত থাকে। কাজ বলতে রাজবাড়ির কতক বউ-ঝিকে ধরে নিয়ে যাওয়া, তারা দাসীগিরি করবে নূতন রাজা-রানীর প্রাসাদে।

জগন্নাথ প্রেরিত পাকা ঘোড়সওয়ার কানাই বলাই খট্টাসের দলের পিছনে পিছনে চলছিল, তাদের উপরে খবর সংগ্রহের নির্দেশ।

এই সময়ে এমন এক কাণ্ড ঘটলো যা ইতিহাস আর পুরাণের সামগ্রী, তাই কাহিনীকারের কাছে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর—তবু যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত না করলে চলবে না।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শিথিল হয়ে এলে রক্তের বেগ শরীরের প্রত্যন্ত অংশে পৌঁছতে চায় না, কিংবা পৌঁছলেও তার বেগ এমন মন্দ হয় যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বকীয় কার্যে আর সক্ষম হয় না। জীবদেহের এ নিয়ম রাজ্যদেহ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে আসে। সব দেশ ও সব রাজ্য সম্বন্ধে এ নিয়ম সত্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন শুধু দুর্বল নয়, একেবারে ভেঙে পড়েছিল, তাই সীমান্তের যে সব রাজ্য এতকাল ভয়ে-ভক্তিতে ইন্দ্রপ্রস্থের আজ্ঞাবাহী ছিল,

এবারে তারা মুক্তবন্ধ হতে চেষ্টা শুরু করলো। অবশ্য এখনো মুখে তারা ইন্দ্রপ্রস্থেশ্বরো বা জগদীশ্বরো মন্ত্র উচ্চারণ করে দিবসের কাজ আরম্ভ করে; এখনো তারা ইন্দ্রপ্রস্থের পতাকা যথারীতি অভিবাদন করে; এখনো তারা পাণ্ডবের নামে শপথ করে থাকে, বিপদে পড়লে পাণ্ডবের দোহাই দেয়; এ সমস্তই আগেকার মতো আছে, ঠাট যথারীতি বজায় আছে, নেই আগেকার আন্তরিকতা। আগে ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল চরম নির্ভর, এখন অবাঞ্ছিত বাধা। এ যদি সীমান্ত রাজ্যগুলির মনোভাব হয়, তবে সীমান্ত বহির্ভূত বিদেশী রাষ্ট্রগুলি উত্তর কুরু (তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমস্থ দেশ বা সাইবেরিয়া), বাহ্লীক (বাল্‌খ), গান্ধার (আফগানিস্তান), মেরু-সুমেরু (চীন তুর্কিস্তান সম্ভবত হিন্দুস্থান পর্বত) প্রভৃতি দেশ লোলুপ নেত্রে অপেক্ষমাণ। ঘন ঘন নাভিশ্বাসে রাষ্ট্রদেহের আসন্ন অবসান সূচিত। কেন্দ্রীয় শাসন সম্বন্ধে ভয় অপগত, সেই সঙ্গে ভক্তি, আছে শুধু জ্ঞানটুকু। এবারে সেটুকুও গেল।

একদল আভীর দস্যু এসে অর্জুনের পথরোধ করে দাঁড়ালো। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ নয়, সামান্য গাঁওয়ার লুঠেরা। অর্জুনের বীরত্বের পতন দেখানোর পক্ষে এই তো যথেষ্ট, তারপরে তিনি গাণ্ডীবে জ্যা আরোপণ করতে পারলেন কিনা, এতকালের পরিচিত অস্ত্রগুলি মনে পড়লো কিনা, সে বিবরণ বিস্তারিত বলা বাহুল্য। মহাকবির কাছে আমাদের সবিনয় অনুযোগ এই যে, সে-কথা না বললেও বুঝতে পারা যেতো যে, অর্জুনের এবং সেই সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজশক্তির পতন ঘটেছে।

আভীরদের লোভ ধনরত্নের প্রতি। তারা ধনরত্নবাহী হাতীগুলো তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল, কোন কোন হাতী ভীত হয়ে পিঠের বোঝা ফেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চলে গেল, সবসুদ্ধ মিলে মহা সোরগোল ও বিশৃঙ্খলা ঘটলো।

আগেই বলা হয়েছে যে, এই বাহিনীর শেষদিকে ছিল রাজবাড়ির বধূগণ। ঘটনাচক্রেই হোক আর ইচ্ছাক্রমেই হোক একখানি শিবিকায় রত্না ও কামনা নামে দুই বধূ ছিল, তারা আমাদের পূর্বপরিচিত। রত্না বলছিল, এ আবার কোথায় চললাম ভাই?

কামনা বলল, কেন, ইন্দ্রপ্রস্থে।

কি লাভ?

না গেলে যে ডুবে মরতে হতো, বলল কামনা।

তারা শুনেছিল যদুবংশের রাজধানী সমুদ্রে গ্রাস করবে। পিছনে যারা এসেছিল তাদের মুখে মহাপ্লাবনের ঘটনা শুনতে পেয়েছিল।

রত্না বলল, তাতে ক্ষতি কি ছিল?

ক্ষতি এই যে, প্রাণটা যেতো।

এই নিরন্তর জ্বলে-পুড়ে মরার চেয়ে সে কি ভালো ছিল না—এ যে বুক জ্বলে গেল।

কামনা বিদ্রূপ করে বলল, সে আশা মিথ্যা নয়, সমুদ্রের জল শীতল বটে।

রম্ভা ঠাট্টা বুঝলো না, বলে উঠল, আর শীতল থাকতো না, বুকের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো।

কামনা বলল, তা ভাই বুক ঠাণ্ডা করবার উপায় ইন্দ্রপ্রস্থে মিলবে।

সে গুড়ে বালি! ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো রম্ভা।

কেন?

কেন কি! যদুপুরীর চেয়ে পাণ্ডবপুরীর অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে পুরুষের মধ্যে অশক্ত বৃদ্ধ আর নাবালক। এ পোড়া যুদ্ধে কি আর কোন সমর্থ পুরুষ বেঁচেছে!

বাঁচবে কোন্ মুখে। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।

ঐ তোমার মস্ত একটা ভুল কামনা। এ যুদ্ধে কেবল ক্ষত্রিয় মরেনি, ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র জন্তু-জানোয়ার মায় রাক্ষস ঘটোৎকচ সবাই প্রাণ দিয়েছে। এর পরে মহাকবিরা এই ঘটনা নিয়ে কাব্য লিখবেন, বলবেন মরেছে শুধু ক্ষত্রিয়েরা—এই আমি বলে দিলাম, দেখে নিয়ো।

তা ভাই সেদিন আমিও থাকবো না, তুমিও থাকবে না।

কামনার কথা কানে তুলল না রম্ভা, আপন আবেগের তাড়নায় বলে চলল, অনাগত সেই কাব্যে অনেক গালভরা শ্লোক থাকবে, অনেক বীরত্ব, অনেক মহত্ত্ব, অনেক অলৌকিকত্ব—থাকবে না শুধু এই বুকের জ্বালা। আঠারো অক্ষৌহিণী পত্নীর বুকের আগুনে যে ভারতবর্ষ দাউ-দাউ করে জ্বলছে। একে ধারণ করতে পারে এমন মহাকাব্য কোথায়? এ আগুন হিমালয়ের মাথায় পড়লে অনাদি-কালের তুষার গলিয়ে বন্যায় ডুবিয়ে দেবে ভূভারত, সমুদ্রে পড়লে বাড়বানলে জ্বলে শুকিয়ে যাবে সপ্তসমুদ্র। কেবল শুকলো না আমার চোখের জল। বলতে বলতে একসঙ্গে তার চোখে জলের ধারা, মুখে হাসির হর্‌রা ছুটলো।

কামনা বুঝলো, রম্ভা ঘোর বিকারগ্রস্ত, সব বিকারের সেরা কামবিকার।

সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বলল, বহিন, অদৃষ্টকে মাঝে মাঝে মেনে নিতে হয়, মেনে নিলে শান্তি পাওয়া যায়।

তুমি পেয়েছ শান্তি? তুমি মেনে নিয়েছ অদৃষ্টকে? আমি কি দেখিনি রাতের পর রাত রাজবাড়ির শূন্য ঘরগুলোর মধ্যে উপচ্ছায়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে,

আমি কি দেখিনি রাতের পর রাত শূন্য শয্যার তপ্ত বাহুশয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে। আর কতবার যে দুজনে একসঙ্গে বারাঙ্গনা পল্লীতে গিয়ে ছুঁড়িগুলোর কোল থেকে মানুষ কেড়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে হতভাগা লোকটাকে মেরে ফেলেছি—কেউ কারো ভোগের জন্য ছেড়ে দিতে রাজী হইনি। আর আজ হঠাৎ গোসাঁইঠাকুর সাজলে। বাঃ বাঃ, চমৎকার! এই বলে সে উৎকট হাসি হেসে উঠল।

কামনা বলল, সবই যদি জানো তবে আসতে গেলে কেন? কোন দিকে পালালেই পারতে।

পালাবো বলেই এসেছি বহিন, বুড়ো-হাবড়ার ইন্দ্রপ্রস্থে পৌছবার আশায় যাত্রা করিনি।

চমকে গেল কামনা তার অভিসন্ধি শুনে, শুধালো, পালাবে কোথায়?

পথের যেখানে সমর্থ পুরুষ চোখে পড়বে সেখানে।

মনে রেখো রত্না, তুমি রাজবাড়ির বউ।

বারাঙ্গনা পল্লীতে গিয়ে পুরুষ লুঠ করবার সময়ে কি এ কথা মনে রেখেছিলে? শোনো কামনা তবে বলি, রাজপুরী, রাজত্ব, বধূপদ সমস্ত মানুষে গড়া সংস্কার। শুনেছি দ্রৌপদী উঠেছিল যজ্ঞাগ্নি-শিখা থেকে, ওটা নারী উদ্ভবের চিরন্তন রূপক। সমস্ত নারী উঠেছে প্রজ্জ্বলন্ত কামাগ্নির শিখা থেকে, তাই তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তন্তুতে তন্তুতে, শিরা ধমনী রক্তমজ্জায় কামানল তড়িৎবেগে নিত্য ধাবমান।

কামনা আর কিছু বলবার না পেয়ে বলে উঠল, চুপ, চুপ।

চুপ করেই আছি, তবে চোখ বুজে নেই, আমার দৃষ্টি শিকারসন্ধানে নিযুক্ত আছে।

এমন সময় সোরগোল উঠল, 'ধর ধর, মার মার, ওরে বাবারে, কে এলো' রবের চক্রবাত্যা। প্রথম সুযোগেই পাল্কী নামিয়ে রেখে পায়ের সদ্ব্যবহার করলো পাল্কীবাহকেরা। বিধাতা পা-দুখানা দিয়েছেন বিপদকালে পালাবার উদ্দেশ্যে।

মল্লিকার ইশারায় থট্টাসের আদেশে দলবল যদুরমণীদের আক্রমণ করেছে—এতক্ষণ তারা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সমান্তরাল শ্রেণীতে পাশে পাশে চলছিল।

থট্টাস যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, মল্লিকার অভিসন্ধি বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল রাজবাড়ির জন্যে দাসী সংগ্রহ করাই তার মতলব। ওদিকে মল্লিকা জানত দলের লোকেরা একবার রাজবাড়ির সুন্দরী বধূদের হাতে পেলে সহজে ছাড়বে না। সে ভেবেছিল ভালই হবে, উপযুক্ত শিক্ষা পাবে বউ-মাগীরা। ভেবেছিল তা যা খুশি হোক তাদের, রত্না আর কামনাকে তার চাই, তাদের

পেলে আর কার কি হল তাতে তার কি প্রয়োজন।

বধূদের রক্ষার জন্য কেউ এল না, কারণ যারা আসতে পারতো তারা আভীরদের আক্রমণে বিব্রত। এতটা সুযোগ হবে ভাবেনি থট্টাসের দল। তাছাড়া আরও কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটলো। রাজবাড়ির বধূগণের অধিকাংশই পালালো না কিংবা বাধা দিল না, তারা স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করলো আততায়ীদের কাছে।

একজন বলল, ও বহিন, এ যে দূরের গঙ্গা কাছে এল।

উত্তরে শুনলো, তবে আর কি ডুব দিয়ে নাও। ডুবে মরলে স্বর্গ, ভেসে উঠলে পুণ্য। এ তো আর যে-সে নদী নয়, একেবারে পতিতপাবনী।

না বহিন, ঠাট্টা নয়, ইন্দ্রপ্রস্থে এমন জোয়ান পুরুষ একটাও নেই, আমি তো চললাম লোকটার সঙ্গে, দেখেছ ওর হাতের পেশীগুলো কেমন পুষ্ট আর সবল।

তাই তো ভাবছি, এতকাল এরা ছিল কোথায় ?

কোন রমণী তখনো ধৃত না হওয়ায় এগিয়ে গিয়ে বলল, ওগো, আমাকে ধরছ না কেন ?

কেউ-বা বলল, আ মলো যা, আমাকে যেন চোখেই ধরছে না, ঐ চিমসে মেয়েটাকে নিয়ে আধিখ্যেতা কেন।

এই বলে দুর্বলাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান অধিকার করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দলের হাজার-দুই লোক হাজার-দুই মেয়েকে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হল, রত্না আর কামনা কোথায় গেল টের পেল না মল্লিকা। ইতিমধ্যে যদুবংশবাহিনী এগিয়ে চলে গিয়েছে। আর কানাই ও বলাই মারপিঠের আয়োজন দেখে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলো। জগন্নাথের প্রশংসায় অত্যুক্তি ছিল না, তারা সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার সন্দেহ নেই। প্রভুদয়ালের কাছে পৌঁছে তারা এক উপন্যাস বিবৃত করলো, হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার এসে মরুভূমির মধ্যে যদুবাহিনীকে আক্রমণ করলো, দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ, তারা দুজনেও অনেককে নিহত করেছে, তবে শত্রুদের ঘোড়া তেমন দ্রুতগামী নয় বলে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। বলল আমাদের আরও লড়াই করবার ইচ্ছা ছিল, তবে খবরটা শীঘ্র দেওয়া আবশ্যক মনে করে ফিরে এলাম, যুদ্ধের কথা কি জানি বলা যায় না, মরে গেলে তো খবরটা দিতে পারতাম না ঠাকুরকে।

তাদের বীরত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা করে প্রভুদয়াল শুধালো, থট্টাসের দলে জরা বলে কোন লোককে দেখেছ ?

কানাই বলল, লড়াইয়ে মন ছিল, তখন কি আর লোক চিনবার সময়।

বলাই বলল, ঠাকুরের যদি আদেশ হয়, না হয় আবার গিয়ে সন্ধান করে আসি।

প্রভুদয়াল সমস্তই বুঝেছিল, হেসে বলল, না, দরকার নেই, তোমরা এখন যাও।

কানাই-বলাইয়ের দোষ দেওয়া যায় না। একে অন্ধকার, তাতে হট্টগোল, তায় আবার তারা জরাকে চেনে না—এমন অবস্থায় ইচ্ছে থাকলেও জরাকে আবিষ্কার সম্ভব ছিল না।

সত্যই সম্ভব ছিল না। দলবল যখন যদুরমণীদের আক্রমণ করেছিল তখন খট্টাস ও জরা কিছু দূরে অন্ধকারের মধ্যে একখানা পাথরের উপরে উপবিষ্ট ছিল।

খট্টাস বলল, রাজা, তুমি যে গেলে না!

জরা বলল, বলো তো যাই।

না, দরকার নেই, ওরা এখুনি ফিরে আসবে।

তারপরে দুজনেই নীরব হল। খট্টাস ভাবছিল মেয়েদের নিয়ে এলে আজ রাতেই রাজধানীর দিকে ফিরতে হবে, দু-চারদিনের মধ্যেই জল নেমে যাবে, যদি না ইতিমধ্যেই নেমে গিয়ে থাকে। তার বহুদিনের বাঞ্ছা নতুন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, যে রাজ্যে পুরাতন সামাজিক সংস্কার ও মানুষে মানুষে উচ্চাবচতা থাকবে না। সমস্তই স্থির ছিল, অভাব ছিল রাজার, এতদিনে সে রাজাও মিলেছে, এখন কেবল সদলবলে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা।

জরার চিন্তাস্রোত অন্য খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, বস্তুত তাকে স্রোত বলাই উচিত নয়, সে যেন চিন্তার মস্ত একটা বিল—তাতে জল আছে, গতি নেই, তল আছে কূল নেই, ঘন শৈবালদামে পদে পদে পথ প্রতিহিত, নাবিকের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে নৌকা সেখানে বাতাসের খেয়ালে চলে। সে যেন একটা প্রকৃতির অরাজকতা। চিন্তার অরাজকতায় পতিত জরা।

সেদিনের সেই ঘটনা, বাসুদেবের মৃত্যুকে শব্দে উচ্চারণ করে না সে, বলে সেদিনের সেই ঘটনা। তারপর থেকে অতর্কিত অসম্ভব অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধাক্কা তাকে বিহ্বল বিমূঢ় করে ফেলেছে। জরা এখন জরাগ্রস্ত। দেহ তেমনি সবল পুষ্ট আছে, চিন্তায় জরাগ্রস্ত। যতই ঘুড়ি ওড়ায় সুতো ছিঁড়ে গিয়ে ঘুড়ি চলে যায় কোন্ শূন্যে। কতবার মৃত্যুর কথা ভেবেছে, খট্টাসের চোখে চোখে আছে, মৃত্যুর পথ বন্ধ। আহা যদি কেউ তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দিত। জরতীই সুখী। জরতীর কথা মনে পড়তেই দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো, সেই জলের ধারায় সমস্ত বুক সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। কে বলে চোখের জল উত্তপ্ত!

এমন সময়ে মল্লিকা এসে উপস্থিত, বলল, সর্দার, বড় বিপদ যে হল।

খট্টাস শুধালো, কেন, কি হয়েছে ?

তোমার দলের লোকেরা মেয়েগুলোকে নিয়ে যার যেদিকে চোখ যায় চলে গিয়েছে।

নির্বিকার ভাবে খট্টাস বললো, তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ?

ওরা কি আর ফিরবে ?

খিদে মিটে গেলেই ফিরবে, অনেককাল উপোশী আছে কিনা।

তারপরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, উপায় থাকলে একটাকে নিয়ে আমিও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতাম, কিন্তু ভগা শালা যে গোড়ায় মেরে রেখেছে।

সর্দার, ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা ভালো নয়।

কেন ভালো নয়, ভগবানের সঙ্গে যে আমার ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্ক। কতজনে তাকে কতরূপে ভজনা করে, আমি করছি শ্যালকরূপে। এই বলে হাসির করাতে অন্ধকারের আবলুস কাঠকে চিরতে লাগলো।

এ হাসি আগে শোনেনি মল্লিকা, তার সমস্ত অস্তিত্ব শিউরে উঠলো, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লো, একটি মুহূর্ত নষ্ট করবার উপায় নেই তার।

কোথায় গেল রত্না! সে যে পালায়নি, কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোথায় সে ? সমস্ত অন্ধকার প্রান্তর শত শত নরনারীমিথুনে ভরে গিয়েছে। কেউবা একটু ঝোপের বা একখণ্ড পাথরের আড়াল খুঁজে নিয়েছে, কারো বা তারও প্রয়োজন হয়নি। এ এক বিচিত্র দৃশ্য।

একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে সন্ধান করতে লাগলো। হঠাৎ আলোর চমকেও কারো সম্বিৎ হল না। মল্লিকারও যেন সম্বিৎ নেই, তার দৃষ্টি লক্ষ্যসন্ধানী। অবশেষে অনেক সন্ধানের পরে একখণ্ড পাথরের আড়ালে রত্নাকে দেখতে পেলো। পুরুষের গায়ে মশালের ছ্যাঁকা দিতেই বাপ্ বাপ্ করে পালালো, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখোমুখি হল রত্না ও মল্লিকা।

তুমি আমার পুরুষটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন ?

কোলের মানুষ কেড়ে নিলে কেমন লাগে তারই একটু স্বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ধীরভাবে উত্তর দিল মল্লিকা।

একদিকে আহত ব্যাঘ্র, অন্যদিকে নির্বিকার শিকারী।

আমি কে জানো ?

জানি বইকি, রাজবাড়ির কুলটা বধূ।

গর্জন করে উঠল রত্না, কুলটা!

আর কি বলে তা তো জানি নে।

তুমিও তো গোসাঁইঠাকরুন নও তবে হঠাৎ কেন? আমার যা খুশি করবো, বলে রত্না।

সত্যি কথাই বলেছ, আমি গোসাঁইঠাকরুনও নই আর আমার এ কাজ হঠাৎও নয়। আমার কোলের পুরুষ একদিন কেড়ে নিয়েছিলি, আজ তারই প্রতিশোধ দিলাম।

তোমার কোলের মানুষ! ভেবে পায় না রত্না, তোমার কোলের মানুষ! তারপর বলে ওঠে, দেখি দেখি, একবার আলোটা তুলে ধরো তো।

মল্লিকা মশাল তুলে ধরলো। আলোর পূর্ণ প্রতিফলন হল দুজনের মুখের উপরে। এবারে রত্নার স্মৃতি আলোড়িত হয়ে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ধিক্কারে ঘৃণায় অবজ্ঞায় লাঞ্ছনায় মিলিয়ে বলে উঠল, তাই বলো, এ যে আমাদের মল্লিকে!

অনুরূপ রসের মিশ্রণে মল্লিকা বলে উঠলো, হাঁ গো হাঁ, রত্নে।

রত্না সবলে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লো মল্লিকার উপর, হাতের মশাল ফেলে দিয়ে রত্নাকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরলো মল্লিকা। দুজনে মাটিতে পড়ে গেল।

পরদিন প্রাতে দেখতে পাওয়া গেল সহস্রধা ক্ষতবিক্ষত দষ্ট পিষ্ট শ্লিষ্ট দুটি নারীদেহের মাংসপিণ্ড পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। নারী করুণাময়ী।

পরদিন সকালে দলের লোক ফিরবে আশায় খট্টাস অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলো, কেউ ফেরে না দেখে খুঁজতে বার হল। বেশিদূর যেতে হল না, কাছাকাছিতেই সকলে ছিল, অনেকেই গত রাত্রের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, অনেকে রাতের সঙ্গিনীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত। যে সর্দারকে আগে তারা বাঘের মত ভয় করতো আজ তাকে দেখেও দেখল না, সর্দার ডাকলে অনেকেই উত্তর দিল না, অনেকে যে উত্তর দিল তা আরও নৈরাশ্যকর।

খট্টাস বলল, নরক, অনেক তো হল, এবারে দাসীদের নিয়ে রাজধানীতে ফেরবার উদ্যোগ করো।

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে নরক উত্তর দিল, রসো ঠাকুর, আগে ভালো করে রাজরানী বুঝে নিই, তারপরে রাজধানীর কথা ভাববো।

মঘা, অসুর, অঙ্কুর, পাতক প্রভৃতি প্রধান সকলেরই উত্তর প্রায় এই ধরনের— কেউ নবলব্ধ ঐশ্বর্য ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজী নয়। খট্টাস বিস্মিত হয়ে ভাবলো—

কি আশ্চর্য, এক রাত্রির মধ্যে তার সন্ত্রাসকর প্রভাব মন্ত্রবলে লুপ্ত হয়ে গেল! কিসের মন্ত্র? খট্টাস যদি স্বাভাবিক মানুষ হতো বুঝতে পারতো, যে মন্ত্রে চরাচরে প্রাণ-প্রবাহ স্পন্দিত হচ্ছে এ সেই মন্ত্র, যে মন্ত্র সব মন্ত্রের উপরে। মঘা, তার প্রধান চেলা, বলে দিল, এ রস গ্রহণের ক্ষমতা থাকলে তুমিও আমাদের মতো উত্তর দিতে। যাই হোক, তোমার রাজ্য তুমি স্থাপন করো গে, আমরা চললাম যেদিকে চোখ যায়। তারপরে দেখল, সত্য সত্যই সকলে জোড়ে জোড়ে যার যেদিকে ইচ্ছা চলে গেল। হতাশ হয়ে ফিরে এসে জরার পাশে পাথরখানার উপরে বসতেই জরা বলে উঠল, সর্দার, ঐ যে ওখানে রানীটা মরে পড়ে আছে। বালাই গিয়েছে বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলো।

তার মনে পড়ছিল প্রভুদয়ালের সেই সতর্কবাণী, কিঞ্জল্ক, পল্বলে বড়জোর চাঁদের ছায়া পড়তে পারে, জোয়ার-ভাটা খেলাতে গেলে চাই সমুদ্রের বিস্তার। তারপরে ব্যাখ্যা করে বলেছিল, তোমার অনুচরেরা ব্যক্তিগত অভিযোগের তাড়নায় এসেছে, এরা বিদ্রোহীর ধাতুতে গঠিত নয়।

কেন, এইসব ব্যক্তিগত অভিযোগের যোগফল কি বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারে না!

খট্টাসের মনে পড়লো প্রভুদয়াল বলেছিল, তা যদি সম্ভব হতো তবে পাঁচশো লোকের চক্ষু একত্র করলে সহস্র চক্ষুর দিব্যদৃষ্টি লাভ হতো, পাঁচশো লোকের বাহুতে কার্তবীর্যার্জুনের বলাধান হতো। না, কিঞ্জল্ক তা হয় না। তুমি পল্বলকে সমুদ্র মনে করে মনে মনে তাতে নৌবহর ভাসাচ্ছ।

খট্টাস দেখল প্রভুদয়ালের কথাই সত্য হল, একটা মেয়েমানুষ পেতেই সকলে ব্যক্তিগত অভিযোগ ভুলে গেল। তার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে গেল—হা ভগবান!

নিজের কথায় নিজে চমকে উঠে ভাবলো এ কি সর্বনাশ, আমারও দেখছি পতন হয়েছে, শেষে কি না আমার মুখ দিয়ে বের হল ঐ শব্দটা। অবশেষে তার মনে হল, না, এ তার সচেতন চিন্তার ফল নয়—বহু পূর্বজন্মের যে-সব সংস্কার তার মজ্জার মধ্যে জমে রয়েছে তারই একটা অতর্কিত প্রকাশ।

জরা আবার বলে উঠল, সর্দার, রানীটা যে মরলো।

কোন সাড়া পেল না। তাই আবার বলল, রাজধানীতে ফেরবার কি হল।

এবারে সাড়া পেলো, দুদিন অপেক্ষা করো, সবাই ফিরবো।

কিন্তু দুদিন অপেক্ষা করবার সময় পাওয়া গেল না, সেই মুহূর্তে দূরে মাঠের অপর প্রান্তে অশ্বক্ষুরধ্বনি উঠলো—অনেকগুলি অশ্ব। খট্টাস তাকাতেই দেখতে

পেলো একদল সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সারিবদ্ধ ভাবে দ্রুত এগিয়ে আসছে, সে বুঝলো এরা যাই হোক মিত্র নয়। জরা আর একবার তার গতপ্রাণ নারীকে দেখতে গিয়েছিল সত্যই মৃত কিনা, সেই সুযোগে খট্টাস সরে পড়ে নিকটবর্তী এক বিশাল মহীরুহের পত্রপুঞ্জের আড়ালে আত্মগোপন করে ব্যাপার কি দাঁড়ায় পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। ততক্ষণে অশ্বারোহী দল কাছে এসে পড়েছে।

খট্টাস দেখতে পেলো এরা আর যাই হোক গত রাতের গাঁওয়ার আভীর দস্যু নয়; এরা সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত, বর্ম-চর্ম-উষ্ণীষ ও ধনু-তূণীর-বল্লমে মণ্ডিত সেনানী। এমন চেহারার লোক আগে তার চোখে পড়েনি। কিশুল্কের যদি দিব্যদৃষ্টি থাকতো তবে দেখতে পারতো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেই নিয়মিত প্রবাহে যে-সব বিদেশী আততায়ী এদেশে প্রবেশ করেছে এই মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী তাদেরই প্রথম অগ্রবর্তী দল। লুণ্ঠন এদের উদ্দেশ্য, পরবর্তীকালে যারা আসবে তাদের উদ্দেশ্য নতুন রাজ্যস্থাপন।

খট্টাস দেখলো আততায়ীরা ঘোড়া থেকে নেমে তার অনুচরদের মধ্যে যে কয়েকজনকে হাতের কাছে পেলো বিনা ভূমিকায় তাদের বেঁধে নিয়ে ঘোড়ার পিঠের উপরে ফেলল, বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েও ছিল। যখন তারা ফিরতে উদ্যত দেখতে পেলো জরাকে, অমনি তাকেও বেঁধে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ফেলল। সে একবার নিরুদ্দেশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো, সর্দার, আমাকে যে বন্দী করে! খট্টাস মনে মনে বলল, রাজা হতে গেলে মাঝে মাঝে বন্দী হতে হয়। তারপরে প্রত্যেকে নিজ নিজ অশ্বে উঠে, প্রত্যেক অশ্বেই দু-একজন বন্দী— ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পিঠে চাবুক মারলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। খট্টাস বুঝলো এক পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটলো। তবে কিনা আপনি বেঁচে থাকলে সম্ভাবনার মধ্যে সমস্তই থাকলো। ভাবাবেগে প্রাণ বিসর্জন বীরের ধর্ম হতে পারে, তবে সে নির্বোধ বীর। খট্টাস আর যাই হোক নির্বোধ নয়।

॥ ১৪ ॥

কত কান্তার প্রান্তর নদনদী ছোট-বড় জনপদ পার হয়ে চলেছে তারা। দিনান্তে কোন নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম, আবার যাত্রা প্রাতঃকালে। কখনো খাদ্য ঝলসানো ভুট্টা, কখনো বাজরার রুটি, কখনো জুটলে আধপোড়া মাংস—আততায়ী ও বন্দী সকলেরই ঐ খাদ্য। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে বন্দীর সংখ্যা একশর উপরে।

এমন ভাবে কয়েকদিন চলবার পরে একটা বড় জনপদে পৌঁছে আততায়ীরা গোটা কুড়ি-পঁচিশ উট কিনে ফেলল, এবারে বন্দীদের চার-পাঁচজনকে চড়িয়ে দিল এক-একটা উটে, দু-পাশে চলল অশ্বারোহী। বন্দীদের বুঝিয়ে দিল পালাতে চেষ্টা করলে বেশি দূর যেতে হবে না, দেখেছ তো হাতে তীর-ধনুক। বন্দীদের হাত বাঁধা, পায়ে অবশ্য বাঁধন দেওয়া হয়নি।

জরার রাজবেশ আততায়ীরা কেড়ে নিয়েছিল তবে গলার কৌস্তুভমণিটা তাদের চোখে পড়েনি, আগেই সেটা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ফেলেছিল সে। সে দেখতে পেতো, দেখে আশ্চর্য হতো যে অন্য বন্দীদের মুখে বেশ প্রসন্ন ভাব, মনে কোন কষ্ট আছে বোধ হয় না। ঘটনাচক্রে তার উটের পিঠে নরক অসুর পাতক নামে তিনি প্রধান বন্দী। তাদের কাছে শুনেছিল যে মঘা পলাতক। সর্দারের খোঁজ তারা জানে না, বোধ করি সে-ও পালিয়েছে।

জরা শুধালো, আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে ?

ওদের একজন বলল, অনেকবার শুধিয়েছি।

কি উত্তর দিল ?

এই দেখ—বলে গায়ে চাবুকের দাগ দেখিয়ে দিল নরক।

ও বাবা ! এরা দেখছি কথা শুধালে মারে।

শুধু তাই নয়, কথায় কথায় মারে। অতএব ভাই, ওদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করো না।

জরা পরামর্শ গ্রহণ করে, কথা বলে না, না আততায়ীদের সঙ্গে না সাথীদের সঙ্গে। আপন মনে চুপ করে থাকে। কথা বলছিল তো একরকম ছিল, এখন কথা বন্ধ হতেই মনটা চলে গেল ভিতরে, যেখানে চলেছে অন্তহীন কেনর মালাজপ। কেন সে হঠাৎ হরিণ ভ্রমে বাসুদেবকে মারতে গেল, এমন তো কখনো হয়নি। যখন মানুষ মেরেছে জেনেশুনেই মেরেছে, আর তাতে না অনুভব করেছে গ্লানি, না দিয়েছে কেউ ধিক্কার। বাসুদেবকে হত্যার পরেই জরতীকে হত্যা, তখন তার মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে যাকে সম্মুখে পেতো মেরে ফেলতে পারতো। হঠাৎ ভূমিকম্প হতে গেল কেন, চাঁদে গ্রহণ লাগলো কেন, তারা খসে খসে পড়তে লাগলো কেন, তার পোষা জন্তুগুলো ক্ষেপে উঠে তাকে তাড়া করলো কেন আর সর্বোপরি পড়তে গেল কেন খট্টাসের হাতে। তারপর থেকে তো আর এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে বসবার সুযোগ পায়নি। এসব কেন কেন কেন ? কে দেবে এই অসংখ্য কেনর উত্তর।

এই রকম চিন্তার মালা জপ করতে করতে হঠাৎ উটগুলো থামে, নামবার

আদেশ হয়, সম্মুখে বিস্তৃত জলাশয়, স্নানপানের জন্যে সকলে নামে। তারপর মেলে খান দুই বাজরার রুটি। জরা ভাবে রুটিগুলো এমন পুড়ে যায় কেন, এমন শক্ত কেন? জরতী যে রুটি তৈরি করতো সে তো কথনো পুড়তো না, আর কেমন নরম। না, বেশ সুখে ছিল জরতী আর সে। মরলো মুখের দোষে, বাসুদেবকে ভগবান আর জরাকে পাপী বলতে গেল কেন? ভগবান না ছাই, আর মানুষ মারা কোন্ জন্মে পাপ! বেশ হয়েছে মরেছে। রুটিগুলো জিব দিয়ে ছিঁড়ে যায় আর সে রুটি মুখের মধ্যে ননীর মতো গলে যেতো। ও বলতো বাজরার আটা এক প্রহর আগে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বলেছিল মানুষের মন আর আটা এক রকম, জল দিয়ে বশ করে নিতে হয়—গায়ের জোরে কিছু হয় না। ওঃ আমার গুরুঠাকরুণ আর কি, দুখানা নরম রুটি খাওয়াবেন তাতে আবার কত উপদেশ। বেশ হয়েছে, বেটি মরেছে। বাপ রে, এ কি রুটি, এ যেন পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি! আবার চলবার হুকুম হয়।

অবশেষে পক্ষকাল পরে তারা এসে পৌঁছয় এক মস্ত নগরে, নাম শুনলো তক্ষশিলা। কত বড় নগর। রাস্তাগুলো কেমন চওড়া, বাড়িগুলো কেমন উঁচু। আর লোকের কি ভিড়! আর লোকগুলোই বা কত বিচিত্র ধরনের! কারো গায়ের রং কটা, কারো তুষারের মতো সাদা, কারো হলুদের আভা মেশানো,কারো তামাটে, কারো লালচে গৌর। কারো চুল খাটো আর খাড়া-খাড়া, কারো চুল বেণীবদ্ধ, কারো মাথা-ন্যাড়া। কারো চোখ ছোট, কারো নাক চ্যাপ্টা, কারো গালের হাড় উঁচু। আর পোশাকেরই বা কত বৈচিত্র্য! উট থেকে তাদের নামিয়ে প্রাচীরঘেরা এক চত্বরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রামের জন্যে ছেড়ে দিল। পালাবার উপায় নেই। সমস্তটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

পরদিন সকালবেলায় তারা সকলে সারিবদ্ধভাবে নীত হল, এক সারিতে পুরুষ, আর এক সারিতে মেয়েরা। অনেক অলি-গলি পার হয়ে হাটখোলার মতো এক প্রশস্ত জায়গায় এসে পৌঁছল। জরা দেখল যে হাটখোলা বটে তবে দোকানপাট নেই, তার বদলে রাস্তার দু-পাশে ছোট ছোট মাটির বেদী। সেই বেদীগুলোতে তারা সবাই বসলো, এখানেও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দুই সারি। জরার এক পাশে নরক অন্য পাশে অসুর। জরা শুধালো, এখানে আনলো কেন? আমাদের কি হবে?

নরক বলল, কেনাবেচা হবে।

জরা বুঝতে না পেরে বলল, কি কেনাবেচা?

আরে গাঁওয়ার, আমরা কেনাবেচা হব।

তাও নাকি হয়!

কেন হবে না। নিত্য হচ্ছে, আর তাও যদি বিশ্বাস না হয় এখুনি দেখতে পাবে।

কি করে জানলে?

নরক বলল, ভাই অসুর, এ লোকটা দেখি কিছুই জানে না। আর জানবেই বা কি করে? বনে বনে জন্তু-জানোয়ার মেরে বেড়ায়, সংসারের হালচাল জানবে কেমন ভাবে।

অসুর বলল, বুঝিয়ে দাও না।

নরক বলল, ওরে গাঁওয়ার শোন্, আমি তো এই নিয়ে তিনবার কেনাবেচা হতে যাচ্ছি, শেষবার সর্দার আমাকে আর অসুরকে কিনেছিল পুরুষ-পত্তনের হাট থেকে, তাইতেই তো দ্বারকায় গিয়ে পৌঁছলাম।

বলো কি! তা তোমাদের বাড়ি কোথায়? শুধায় জরা।

কেমন করে জানবো। পাঁচ বছর থেকে হস্তান্তর হচ্ছি।

তোমরা দুজনেই?

হ্যাঁ, আর সঙ্গে ছিল মঘা-ভাই। সে যে কোথায় গেল কে জানে!

অসুর বলল, বোধ হয় সেদিনের লড়াইয়ে মরেছে।

মরেছে না বেঁচেছে।

জরা শুধালো, দুবার কি করে কেনাবেচা হলো, কে কিনলো, কত দাম দিয়ে কিনলো বলো না ভাই।

আচ্ছা তবে শোনো—বলে আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু শুরু করবার আগেই তাদের বর্তমান প্রভুরা, সেই আততায়ীর দল চিৎকার করে বলে উঠলো, সব চুপ করে থাকো। নড়াচড়া করো না, খদ্দের আসছে।

জরা দেখতে পেলো দুই দিকে দীর্ঘ দুই সারি নরপণ্য—একদিকে পুরুষ, বিপরীতে স্ত্রী, রাজবাড়ির সেই বউ-ঝি। সারির অপর প্রান্তে দূরে একদল লোক, তারা মাঝখানের পথ দিয়ে দুই সারি নিরীক্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

এই বৃহৎ বাজারের অল্প অংশই জরার চোখে পড়েছিল, সব চোখে পড়লে দেখতে পেতো, নানা বয়সের পণ্য—দু-দশজন নয়, শত শত। চালান যখন বেশি আসে তখন হাজার হাজার হয়। চালানের কম-বেশি অনুসারে দামে তেজি-মন্দী ঘটে। আজ চালান তেমন বেশি নয় তাই দাম চড়া।

এই পণ্যের মধ্যে পাঁচ-ছ বছরের শিশু থেকে প্রৌঢ় বৃদ্ধ অবধি সব বয়সের নরনারী আছে। শিশু ও বালকদের দাম কম। অনেক দিন খাইয়ে-পরিয়ে

তাদের মানুষ করে তুলতে হবে কিনা! বৃদ্ধদেরও নামমাত্র মূল্য। যুবক-যুবতীদের চড়া দাম, স্বাস্থ্য ও রূপ ভেদে দাম আরও চড়া হয়ে থাকে। আজ রাজবাড়ির মেয়েরা রূপে আলো করে বসে আছে, খুব দাঁও মারবে মালিকেরা।

ও কি করছ ভাই? ওরা কি বুনো নাকি? ছিঃ ছিঃ!

নরক বলল, মাল কিনবে, তা একটু দেখেশুনে কিনবে না?

তাই বলে রাজবাড়ির বউদের, তাও আবার এক হাট লোকের মধ্যে!

শোন কথা একবার। ভগবান সৃষ্টি করেছেন স্ত্রী-পুরুষ, রাজা গরীব সৃষ্টি মানুষের। রাজবাড়ির বউ আর গরীবের বউয়ে ভেদ করলে চলবে কেন?

এসব অলক্ষুণে কথা শিখলে কোথায়?

সর্দারের কাছে। তুমিও শিখতে, তবে কিনা মাঝখান থেকে সব গোলমাল হয়ে গেল।

রাজবাড়ির বউরা কোন্ কাজে লাগবে? ওরা কি কখনো কাজ করেছে?

ভয় কি ভাই জরা, সকলের যোগ্য কাজ সৃষ্টি করে রেখেছেন ভগবান।

এমন সময় কয়েকজন সম্পন্ন চেহারার লোক এদিকে এসে পড়লো। একজন সুবেশ সুপুরুষ যুবক জরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে শুধালো, এই বুনো, তুই কি কাজ করতে পারিস?

সে উত্তর দেবার আগেই তার পিছনে যে মালিক দাঁড়িয়ে ছিল সে বলে উঠলো, ও সব কাজ জানে কর্তা, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, মায় চুরি ডাকাতি।

ওকে বলতে দাও, তুমি থামো, বলল ক্রেতাব্যক্তি।

শিকার করতে পারিস। কি শিকার?

জরা বলল, বাঘ ভালুক বরা সমস্ত।

বাপ রে, মস্ত বীর যে! আচ্ছা ঐ যে হাঁসটা উড়ে যাচ্ছে ওটাকে মারতে পারিস!

সোৎসাহে জরা বলল, খুব।

আচ্ছা, মার্ দেখি।

তীর-ধনুক দাও।

সঙ্গে সঙ্গে একজন তীর-ধনুক এনে দিল। একবার পরীক্ষা করে নিয়ে তীর ছুঁড়লো জরা, তার আগেই হাঁসটা আরও দূরে গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু হলে কি হয়, জরার অব্যর্থ তীর পেটে গিয়ে বিঁধলো আর মুহূর্তমাত্র শূন্যে স্থির হয়ে থেকে দুই পাখার ভারসাম্য রক্ষাহেতু ধীরে ধীরে মাটির দিকে নামতে লাগলো এবং কয়েক লহমার মধ্যে বাজারের প্রান্তে একটা গাছে পড়ে বেঁধে রইলো।

বাহবা বাহবা, বাহাদুর বটে। একজন ভাল তীরন্দাজের দরকার হয়ে পড়েছে আমার। কত দাম চাও হে?

আদর দেখে দর বাড়িয়ে দিয়ে মালিক বলল, আজ্ঞে কর্তা দশ মাষা আশা করি।

মাষা মাষকলাই পরিমাণ স্বর্ণ।

দশ মাষা তার হাতে গুনে দিয়ে ক্রেতা জরার উদ্দেশে বলল, চল। এখন তুই আমার দেহরক্ষী। কিন্তু খবরদার পালাতে চেষ্টা করো না, তাহলে দেখবে তীর-ধনুকে আমার হাতটাও কম সই নয়।

জরা একবার করুণ ভাবে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে নূতন মালিকের পিছু পিছু রওনা হল।

নরক বলল, জরার মালিককে দয়ালু বলেই তো মনে হচ্ছে।

অসুর বলল, মালিকেরা তো দয়ালু হয়, গোলমাল বাধায় অতিরিক্ত দয়ালু হয়ে মালিকের বউগুলো। আমার যত দুর্দশার মূলে আমার সেই মালিকের বউ—

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, নরক বাধা দিয়ে বলল, ওসব পুরনো গল্প থাক। ঐ দেখ জরা কেমন ঘোড়ায় চেপেছে! বাঃ বাঃ! ও তো পাকা ঘোড়সওয়ার দেখছি।

আরে এসব গুণ না দেখেই কি সর্দার রাজা করেছিল!

তারপরে সখেদে বলল, কি হল সর্দারের কে জানে।

আর যাই হোক মরবার লোক সে নয়। ও আবার দল গড়ে তুলবে দেখো।

ওদের মধ্যে যতক্ষণ এইসব কথা হচ্ছিল তখন নূতন প্রভুর পিছনে পিছনে জরা তক্ষশিলা ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথ ধরেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে সঙ্কীর্ণ পথ, পাশাপাশি দুটো ঘোড়াতেও সব জায়গায় যেতে পারে না। ক্রমে উঁচুতে উঠতে উঠতে অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছল, সেখানে পাথরের প্রাচীরঘেরা একটি নগর। দিনের বেলায় সিংহদ্বার খোলা থাকে, এখন খোলাই ছিল, প্রভুকে অনুসরণ করে জরা নগরে প্রবেশ করলো।

প্রভু বলল, এই আমার রাজধানী, এই নগরের নাম খপুর।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥

সংসারে দুঃখের মতো শিক্ষক বুঝি আর নেই। দুর্ভাগ্য রত্নাকর দস্যুর মতো অতর্কিতে লাঠি মেরে ধরাশায়ী করে ফেলে। আর দুঃখ যণ্ডমার্ক মুনি কানটি ধরে পাঠশালায় নিয়ে বসায়, তারপর শুরু হয় দুঃখের জীর্ণ পাঠদান। পাঠশালা ছাড়বার অনেক পরে কানমলার স্মৃতি যত ম্লান হয়ে আসে, উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিতে থাকে দুঃখের রত্নগুলো। এ পাঠশালায় কারো চল্লিশ বছর কাটে, কারো চারদিন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের চারদিনের পাঠেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছিল। জরা এ পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বাসুদেবকে হত্যা করবার পরে। এই সেদিন মাত্র তার হাতেখড়ি, এখনো অনেক পাঠ বাকি।

জরার সারাদিন এক রকম কাটে, দীর্ঘ রাত্রি আর কাটতে চায় না। যখন বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো নিদ্রার সাধনা করতে হয়নি, যথাসময়ে আপনি দেখা দিত, আজ বিলাসব্যসনের মধ্যে সাধ্যসাধনা করেও তার দেখা পাওয়া ভার। নিদ্রা কথনো সাধ্বীপত্নীর মতো স্বয়মাগতা, কখনো অভিমানিনী উপপত্নীর মতো সাধনার অতীত। রাতের সুখশয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে কত কথাই না মনে পড়ে। দিনের বেলায় এসব বৃথা চিন্তা করবার অবসর তার কোথায়, সে আর এক জীবন, জরা তখন আর এক লোক।

জরার বর্তমান প্রভুর নাম সুমন্তরাজ, যিনি তাকে তক্ষশিলার ক্রীতদাসের বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন। কখনো সকালের দিকে, কখনো দুপুরে আহারান্তে তিনি বেরিয়ে পড়েন জরাকে সঙ্গে নিয়ে। আগে সঙ্গে দশ-বারোজন অনুচর থাকতো, এখন একা জরাই যথেষ্ট—বলেন সুমন্তরাজ। সুমন্তরাজের যোদ্ধৃবেশ, অস্ত্রের মধ্যে তূণীর ধনুক ও অসি। ঘোড়াটি তেজী আর সাদা, সুমন্তরাজের রঙটাও গৌর। জরার পোশাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র অনুরূপ তবে তত মূল্যবান নয়। তার ঘোড়াটি মিশকালো, জরার গায়ের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। যেদিন তিনি জরাকে মাত্র সঙ্গী করে বের হতে উদ্যত হলেন সভাসদরা বলল, মহারাজ একেবারে একাকী চললেন!

সুমন্তরাজ বললেন, একা কোথায়, সঙ্গে জরা আছে, একাই ও একশ।

নবাগত জরার প্রতি রাজ-অনুগ্রহে তারা হাড়ে চটে গেল, বটে, বেটা উড়ে এসে জুড়ে বসলো।

তারা দুজনে প্রাসাদের চত্বর থেকে বের হয়ে রাজপথে পড়ছে সেই সময়ে প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজার সঙ্গে জরাকে দেখে রানী সীমন্তিনী নবাগতা পরিচারিকাকে শুধালেন, মহারাজের সঙ্গে ঐ লোকটা যেন নতুন! কে, চিনিস নাকি?

নবাগতা কি বলা উচিত স্থির করতে না পেরে বলল, রানীমা, আমি নতুন লোক, এখানকার সকলকে তো চিনি না।

সীমন্তিনী বললেন, এখানকার সকলকেই তো চিনি, এখানকার লোক বলে তো মনে হয় না।

পরিচারিকা উত্তর না দেওয়ায় প্রসঙ্গটা আপাতত এখানেই শেষ হয়ে গেল। রানী দেখতে পেলেন সানুচর সুমন্তরাজ নগরের উত্তর সিংহদ্বার দিয়ে বের হয়ে প্রাচীরের আড়ালে অন্তর্হিত হলেন।

সুমন্তরাজ একটা বড় রাজাগজা কিছু নয়। তবে সভাসদগণের কল্যাণে সকলেই রাজচক্রবর্তীর সম্রাট এবং সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। সুমন্তরাজ আসলে একটি দুর্গাধিপতি। ঐ দুর্গের বাইরে তাঁর রাজ্য বলে কিছু নেই; নেই, আবার আছেও। তাঁর ধনুর্নিক্ষিপ্ত তীর যত দূর যায় তত দূর তাঁর রাজ্যের সীমানা। সেই জন্যে জরার শরনিক্ষেপ পটুতায় খুশী হয়ে তাকে অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন।

তক্ষশিলার উত্তরে ও পশ্চিমে পার্বত্য প্রদেশ। প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গ ও দুর্গাধিপতি, তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই আছে। রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দিলে পার্শ্ববর্তী দুর্গ আক্রমণ করে লুণ্ঠন করে নিয়ে আসা হয়—এই হচ্ছে তাদের রাজগীর রহস্য। সুমন্তরাজের মতো অন্যান্য দুর্গাধিপতিও বার হয়, প্রত্যেকে অপরের রন্ধ্র সন্ধান করে ফেরে। পাহাড়ের নীচে উপত্যকায় গম অড়হর প্রভৃতি শস্যের চাষ। চাষীরা ফসলের অর্ধাংশ রাজধানীতে এনে জমা করে দিয়ে যায়—অন্য রাজার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার মূল্য স্বরূপ।

সুমন্তরাজ ও জরা দুজনে আগুপিছু চলছে, পথ পাহাড় কাটা, পাক খেয়ে খেয়ে নতুন নতুন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় মাঝে মাঝে প্রাচীরঘেরা নগর। জরা পাহাড় দেখেছে বটে—যেমন লাটু পাহাড়, যেমন রৈবতক পাহাড়, তবে সে-সব পাহাড়ে এখানকার পাহাড়ে অনেক প্রভেদ। তার দেখা ও দুটো পাহাড় যেন পৃথিবীর তোৎলা মুখের কথা, হঠাৎ এসে পড়ে আবার সমতল হয়ে গিয়েছে। আর এখানকার পাহাড় আদি-অন্তহীন, যতদূর দেখা যায় তরঙ্গের পরে তরঙ্গ, তরুলতাহীন দুর্ধর্ষ দুর্জয়, এ যেন গ্রীষ্মকালের

দুপুরে বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখতে পারা যায় না। পথে একটা মোড় ঘুরতেই অদূরে গিরিশিখরে একটা প্রাচীঘেরা নগর, নগরটা যেন পাহাড়ের চূড়ায় ঝুলে রয়েছে। এদিককার সবগুলো নগরই এই রকম।

সুমন্তরাজ বললেন, জরা, ঐ নগরটার নাম নরেন্দ্রনগর, এখানকার সমস্ত নগর রাজার নামে। ওখানকার রাজা নরেন্দ্ররাজ। আমার নামে আমার রাজধানী সুমন্তনগর।

জরা শুধায়, মহারাজ, (মনে মনে ভাবে কয়েকদিন আগেও লোকে তাকে মহারাজা বলতো, এখন সে আবার অন্যকে ঐ নামে ডাকছে) ঐ নগরে কখনো গিয়েছেন ?

যাইনি, তবে অনেকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

বাধা কি ? শুধায় জরা।

সুমন্তরাজ বলেন, নগরের সিংহদ্বার যথেষ্ট প্রশস্ত নয়।

বুঝতে পারে না জরা, অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারলে না ? নরেন্দ্রনগরের প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দিলে তবে আমার প্রবেশের যোগ্য দ্বার তৈরি হবে।

জরা বোঝে যে রাজারা সাধারণ লোকের মত দরজা দিয়ে ঢোকে না, প্রাচীর ভেঙে ঢোকে।

সুমন্তরাজ বলেন, নরেন্দ্রনারায়ণ সাক্ষাৎ কলি, এমন প্রজাপীড়ক রাজা কম দেখা যায়। দুর্যোধনের মতো বেটা হাঁটু ভেঙে পড়ে থাকে, তবে উচিত সাজা হয়।

জরা বোঝে ইতিমধ্যেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী এই এতদূরে এসে পৌঁছেছে। বলে, তবে অন্য সমস্ত রাজা মিলে তাকে পরাস্ত করে না কেন ?

মেলাবে কে বলো! কৌরবদের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজন্যগণকে মিলিয়ে ছিলেন বাসুদেব, তিনি যদি দয়া করে দেখা দেন তবে উপায় হতে পারে।

অতর্কিতে সুগভীর খাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে জরা। বোঝে যে বাসুদেবের দেহান্তের সংবাদ এখনো এসে পৌঁছয়নি। জরা ভাবে কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি বলতে কি বলবে, হয়তো পা ফসকে খাদে গিয়ে পড়বে।

তাকে কথা বলবার অবকাশ দেন না সুমন্তরাজ, বলেন, এক-একবার ভাবি আমার মিত্র রাজাদের নিয়ে বাসুদেবের পায়ে গিয়ে পড়ি। বলি যে, প্রভু, এখানে এসে আর একটা কুরুক্ষেত্র ঘটিয়ে দুরাত্মাদের দণ্ড দাও।

এ কি নরকযন্ত্রণা জরার!

হাঁ হে, তুমি তো সেদিন বলেছিলে যে তোমার বাড়ি দ্বারকার দিকে!

জেরার মুখে জরা বলেছিল বটে, বলবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু আর কোন দেশের নাম না জানায় ঐ নামটাই উচ্চারণ করে ফেলেছিল।

কথনো দেখেছ মহাপুরুষকে ?

এমন লোককে এমন প্রশ্ন ! জরা বলে, মহারাজ, আমরা সামান্য লোক।

আরে, সামান্যদের মিলিয়ে পাক দিয়ে রজ্জু তৈরি করাই তো অসামান্যের কাজ। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে আছে একবার তাঁকে দর্শন করবার। ভালই হল, তুমি এসেছ এবারে তোমাকে পথপ্রদর্শক করে ওখানে যাবো। কি হে, সঙ্গে যাবে তো ? দুজনেরই ভগবদ্দর্শন হবে। ঐ দেখো দেখো—

এই বলে অনূর্ধ্ব আকাশে উড্ডীয়মান একটা পাখীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

দেখেছ ?

জরা বেঁচে গেল শোচনীয় প্রসঙ্গ থেকে, বলল, হ্যাঁ মহারাজ।

ওটাকে মেরে নামাতে পারো ?

ওটা তো কারো পোষা পায়রা মনে হচ্ছে।

পোষা যদি হয় তবে নরেন্দ্রনগরেরই হবে, হয়তো বা স্বয়ং নগেন্দ্রনারায়ণেরই। চমৎকার, মারো।

কিন্তু মহারাজ, ওটা উড়ছে ঠিক নগরের উপরে, পড়লে পড়বে নগরের মধ্যে।

সে তো আরও চমৎকার হবে। একেবারে রাজার কোলের উপর ফেলতে পারো তবে তো বুঝি। পাষণ্ডটা গতবারে আমার প্রজাদের একশ বিঘে গম কেটে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি ভাবছ আমি থাকতে এমন হল কি করে ? আরে আমি থাকলে কি পারতো ! আমি গিয়েছিলাম গান্ধার রাজ্যের পাহাড়ে শিকারে। ফিরে এসে দেখি নগরের বাজারের প্রজারা মাথা চাপড়ে কাঁদছে। নাও, নামিয়ে ফেলো পাখিটাকে।

জরা তাক করে তীর ছুঁড়লো, পাখিটি পেটে বিদ্ধ হয়ে ছোট এক টুকরো পাথরের মতো পড়লো নগরের মধ্যে।

রাজা নগেন্দ্রনারায়ণ রাজবাড়ির প্রশস্ত আঙিনায় পোষা পায়রাগুলোকে গমের দানা ছড়িয়ে দিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। এমন সময়ে বিদ্ধশর পায়রাটা এসে পড়লো একেবারে তাঁর পায়ের কাছে। নরেন্দ্রনারায়ণ চমকে উঠলেন। তারপর চমকের ভাব কাটলে বলে উঠলেন, এ কি, এ যে আমার পোষা পায়রা ! মারলো কে ?

সভাসদরা অনেকেই বলে উঠলো, তাই তো, কার এমন সাহস যে মহারাজার পোষা পায়রার গায়ে হাত তোলে !

কেউ বলল, এ অমার্জনীয় অপরাধ !

কেউ বলল, কার ঘাড়ে কটা মাথা!

কেউ কেউ বলল, এর বিহিত ব্যবস্থা না হলে দেশে টেকা ভার হবে! আজ পায়রা গেল কাল মানুষের মাথা যেতে কতক্ষণ!

সেনাপতির তলব পড়লো। সে এসে নিরীক্ষণ করে বলল, মহারাজ, এ পাকা তীরন্দাজের কাজ। এ অঞ্চলে এমন তীরন্দাজ আছে বলে আমার জানা নেই।

রাজা ইশারায় সুমন্তনগর দেখিয়ে বলল, ওদিকে?

আগে তো ছিল না, তবে যদি নতুন এসে থাকে।

সভাসদে ও সেনাপতিতে বিবাদ চিরন্তন। সেনাপতির কথা শুনে একজন সভাসদ বলে উঠল, এ কি গাছ নাকি যে রাতারাতি গজিয়ে উঠবে!

সভাসদের মাথার দিকে তাকিয়ে সেনাপতি বলল, তেমন তেমন সার পেলে রাতারাতি গজায় বইকি।

তারপরে রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, মহারাজ, সুমন্তনগরের সৈন্যদের বিদ্যার দৌড় জানা আছে। বসে আছে এমন পাখি মারতে পারে না, আর এ তো উড়ন্ত পাখি! তাও আবার মেরেছে বহুদূর থেকে!

তবে হঠাৎ এমন তীরন্দাজ এলো কোথা থেকে?

আমার মনে হয় তক্ষশিলার বাজার থেকে নতুন কোন লোক কিনে আনা হয়েছে।

আমিও তো সেদিন কটাকে কিনে এনেছি, ডাকো তাদের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন ক্রীতদাস এসে দাঁড়ায়। নরেন্দ্রনারায়ণ তাদের দেখে বলে ওঠে, বাঃ, একেবারে যুগল মূর্তি। তা নাম কি গো? কানাই-বলাই, না কৃষ্ণার্জুন?

ওদের মধ্যে একজন বলে, আজ্ঞে আমার নাম নরক, ওর নাম অসুর।

বাঃ বাঃ, দুয়ে মিলে নরকাসুর, একেবারে দ্বন্দ্বসমাস। তা নাম দুটি কি বাপ-মায়ে রেখেছিল, না পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

অসুর বলে, মহারাজ, একরকম তাই।

আচ্ছা, তোমাদের নামের ইতিহাসে আমার প্রয়োজন নেই। কি কাজ করছ এখানে?

আজ্ঞে পাহাড়ের নীচে থেকে পাথর কেটে মাথায় করে গড়ের মধ্যে নিয়ে আসি।

বেশ, তা খেতে দেয় তো? এরা আবার ঘোরতর চোর, আমার ঘোড়ার

দানা চুরি করে খেয়ে খেয়ে দেখো না এক-একজন কেমন ফুলে উঠেছে। এই বলে তাকালেন সভাসদদের দিকে।

এবারে নরক মুখ খুলল, বলল, মহারাজ, মানুষে ঘোড়ায় মিলে গড়ে ওজন ঠিক আছে।

বেশ বলেছ! তোমার নাম নরক না। তা এই নারকীয় উক্তিটি মনে রাখবার মতো। এবারে কাজের কথায় আসা যাক—ঐ পাখিটা দেখছ?

দুজনে একসঙ্গে বলল, পাখির পেটে তীর বিঁধে রয়েছে।

ঐ তীরটার কথাই জিজ্ঞাসা করছি। উড়ন্ত পাখিকে তীর মেরে নামাতে পারে এমন কেউ আমার সৈন্যদলে নেই। সামনে একটা পাঁঠা বেঁধে দিলেও তারা মারতে পারে না। সুমন্তরাজের সৈন্যদলের বিস্তার দৌড়টাও আমার জানা আছে। এখন কথা হচ্ছে ওখানে এমন কেউ নতুন লোক এসেছে যে এই কাণ্ডটি করেছে। তক্ষশিলার বাজার থেকে যেদিন তোমাদের কিনে আনি সুমন্তরাজও সেখানে গিয়েছিল। আদৌ কিনেছিল কিনা, কটাকে কিনেছিল জানি না। তোমরা তো এক বাজারেই এসেছিলে, বলতে পারো কিছু?

নরক ও অসুর দুজনের মধ্যে নীচু স্বরে স্বগতোক্তি করে নিয়ে বলল, মহারাজ, যদি ছুটি দেন তবে ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করতে পারি। মনে হচ্ছে এ চেনা লোকের কাণ্ড।

নরেন্দ্রনারায়ণ তাদের কথা শুনে হেসে উঠে বললেন, তোমরা আমাকে কত বড় গর্দভ ঠাউরেছ! ছুটি দি আর তোমরা ছুটে চলে যাও দেশের দিকে।

নরক বলল, মহারাজ, আর যেদিকেই ছুটে যাই দেশের দিকে কখনো যাবো না।

কেন বাপু, খুনখারাপি করেছ নাকি?

সেটা তো সামান্য কথা মহারাজ, মোটে দু'চারটি, আর কিছু করতে পারলে লোকে বীরপুরুষ বলতো। তা নয়, আমাদের দেশ আগাগোড়া সমুদ্রের জলে ডুবে গিয়েছে।

আপদ গিয়েছে। এখন বলো, তীর যে মেরেছে তাকে চিনতে পারলে কিনা?

মহারাজ, সুমন্তপুরের রাজা জরা বলে একটা লোককে কিনেছিল, এ তার কাণ্ড মনে হয়। তীর-ধনুকে তার মতো হাতসই আর কারো দেখিনি।

এবারে নরেন্দ্রনারায়ণ সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলে আমার অনুমান সত্য কিনা।

সেনাপতি একসময় সভাসদ ছিল, বলল, মহারাজের অনুমান কবে মিথ্যা হয়েছে।

যাও, তুমি সৈন্যদের তৈরী করে নাও। স্যমন্তপুরের গড়ের একখানি পাথর আস্ত রাখবো না। এত বড় আস্পর্ধা, আমার পোষা পাখি হত্যা, আবার তাও কিনা পড়লো একেবারে আমার সম্মুখে। কূটবুদ্ধিতে এ যে শকুনিকে ছাড়িয়ে যায়—তার মতোই অবস্থা হবে। যাও। আর দেখো, এ দুটো যেন না পালায়। এরা আস্ত বাস্তুঘুঘু, সুযোগ পেলেই পালাবে, একটু নজর রেখো।

এই বলে পাখিটাকে হাতে নিয়ে বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে রইলেন। নরেন্দ্রনারায়ণের পাখি-প্রীতি সত্যই অনুকরণযোগ্য আদর্শ; একটা পাখির মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শত শত মানুষ মেরে ফেলতে কুণ্ঠা বোধ করে না। বুনো পায়রা হলে অবশ্য আপত্তি ছিল না, তীর-ধনুকের লক্ষ্যরূপেই তো বিধাতা ওদের সৃষ্টি করেছেন।

॥ ২ ॥

দুঃখের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই মাঝে মাঝে দুপুরের গরমে ঘুমে ঢুলে পড়েন, লম্বা বেতগাছা তাঁর হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে যায়, তখন পোড়োদের মহাস্ফূর্তি; চুপিসাড়ে সকলে বাইরে গিয়ে আমবাগানে হুটোপাটি শুরু করে দেয়। আবার কখনো কখনো বা আসে দীর্ঘ নাতিদীর্ঘ অনধ্যায়ের পালা, তখন স্ফূর্তিটা এমন একটানা হয় পাঠশালার ভীতিকর অভিজ্ঞতাকে নিতান্ত মায়া বলে মনে হয়, মনে হয় এই আনন্দটাই বুঝি ছাত্রজীবনের নিত্যরূপ।

জরার এখন সেই অবস্থা চলছে। বাসুদেবকে শরাহত করার পরেই আরম্ভ হয়েছিল দুঃখের পাশঠালার জীবন; গুরুমশায় চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল অন্য সব পোড়োদের সঙ্গে। জরা ভেবেছিল জীবনটা এইভাবেই যাবে। এমন সময়ে অভাবিতের ইঙ্গিতে এলো অনধ্যায়ের কাল, রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। অশনে-বসনে-ব্যসনে যখন সে রাজানুগৃহীত হয়ে উঠলো স্বভাবতই মনে করলো পাঠশালা, গুরুমশায়, পাঠশালার অভিজ্ঞতা একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন। সেই সঙ্গে আরও একটা পরিবর্তন ঘটলো। খট্টাসের উপদেশ ও মন্তব্য হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল তার মনে। কী এমন অপরাধ করেছে সে বাসুদেবকে হত্যা করে! ধরো বাসুদেব যদি সত্যই দেবতা হন (তা কথনোই সম্ভব নয়। মানুষ আবার দেবতা হবে কি করে?) তাতেই বা ক্ষতি কি! যদুবংশ ধ্বংসে

তিনিও তো যোগ দিয়েছিলেন, অনেক যাদব বীরকে স্বহস্তে বধ করেছেন, তাতে যদি দোষ না হয়ে থাকে তবে জরার ক্ষেত্রেই বা দোষ হবে কেন? এইভাবেই যদি যদুবংশের নাশ বিধিলিপি হয় তবে সে-ও না কোন্ বিধিনির্দিষ্ট কাজ করেছে! সে নিজেও তো যাদব বাসুদেবের বৈমাত্র ভাই। বরঞ্চ এতদিন যে একটা দুঃখের বিভ্রান্তির মধ্যে থেকে অকারণে পীড়িত হয়েছে সে কথা মনে হতেই সে হাসলো, হাসিটা বোধ করি একটু সশব্দে হয়ে থাকবে।

অত হাসি হচ্ছে কেন? হাসবার এমন কি পেলে?

চমকে ওঠে জরা। ঘর অন্ধকার, কাউকে দেখতে পায় না, ভয়ে ভয়ে শুধায়, তুমি কে?

অত জোরে কথা বলো না। এখন আর কি চিনতে পারবে, এখন রাজার পেয়ারের লোক। একদিন ছিল যখন দরজা খুলে দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে রাগ করে ফিরে চলে যেতে।

চেনা-চেনা গলা তবু বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না জরার, সে যে অনেক দূরের মানুষ! এখানে আসবে কি করে!

জরা বলে, দাঁড়াও, বাতিটা জ্বালি।

অমন কাজটি করো না, দুজনেই মরবো তাহলে।

অন্ধকার ঘর, অনেক রাত, একটা ঘুলঘুলি দিয়ে গোটা দুই তারা উঁকি মারছে, যে শীতল বাতাস ভোরের নিশানা দেয় এখনো তা জাগেনি।

তুমি যে-ই হও এত রাতে এলে কেন?

দিনে আসবার উপায় থাকলে দিনেই আসতাম, আর তাছাড়া কি জানো, কোন কোন লোক আছে রাতেই যাদের যাতায়াত।

সে তো চোর, বলে জরা।

কেন, মনোচোর হতে বাধা কি?

হঠাৎ সম্বিৎ হয় জরার, বলে ওঠে, ওহো, বুঝেছি, মদিরা!

তবু ভালো যে কাউকে দিয়ে সনাক্ত করাতে হয়নি। হ্যাঁ, মদিরাই বটে।

তুমি এখানে এলে কেমন করে?

তুমি যে-ভাবে এসেছ, বলে মদিরা।

আমাকে তো তক্ষশিলার বাজার থেকে কিনে এনেছে।

তবে আমাকেও তাই।

জরা বলে, গোড়া থেকে খুলে বলো।

এতই যদি আগ্রহ তবে শোনো। এই বলে আরম্ভ করে মদিরা। এখানে

মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে মদিরা যাদব রাজধানীর বারাঙ্গনা পল্লীর সেই মেয়েমানুষ, বাসুদেবকে হত্যার পরে যার ঘরে গিয়ে জরা আশ্রয় নিয়েছিল আর জরাকে নারীবেশ পরিয়ে বনের দিকে পালাতে পরামর্শ দিয়েছিল যে মেয়েটি।

মদিরা বলে, বড় বহিন এসে বললে যদুবংশীয়েরা ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করলেই সমস্ত রাজধানী সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে। শুনে আমরা তো ভয়ে মরি। যাদের গাঁয়ে বাড়িঘর ছিল তারা সেখানে চলে গেল। আমাদের কয়েকজনের ও বালাই অনেকদিন নেই—বড় বহিনেরও ছিল না। তার পরামর্শ অনুসারে স্থির করলাম যে আমরা যদুবংশীয়দের সঙ্গে যাত্রা করবো, তারপরে যা থাকে কপালে।

তারপরে নিজের মনেই বলে ওঠে, সেটা ঠিক জরাকে নয়—কপালে এতও ছিল!

তারপরে কি হল বলো?

তারপরে তো জানই, মারামারি কাটাকাটি, যদুবংশের মেয়েদের অনেককে লুটে নিয়ে গেল ডাকাতে। আমাকেও হাত ধরে টেনেছিল, পালিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকোলাম। ভোরের আলো হতেই দেখি, ও মা, সেই ঝোপটার আড়ালেই আমাদের মল্লিকা আর রাজবাড়ির বউ রম্ভা মরে পড়ে রয়েছে।

কে মারলো তাদের?

নিজেরাই মারামারি করে মরেছে।

হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, কারণ আছে, সে না হয় পরে শুনো। তারপরে দিনের বেলায় একদল ঘোড়সওয়ার এসে চোরের উপরে বাটপাড়ি করে আমাদের কেড়ে নিয়ে চলল। কয়েকদিন পরে এলাম তক্ষশিলার বাজারে। সুমন্তরাজ কিনে নিয়ে এসে রানীকে উপহার দিলেন। তাই না বলে উঠেছিলাম, এতও ছিল কপালে! কিন্তু জরা, তুমি এখানে এলে কেমন করে?

রাজধানী ডুবে যাওয়ার পরে আমরা যদুবংশীয়দের পিছনে পিছনে রওনা হয়েছিলাম।

তোমরা বলতে কারা?

আমরা অনেকে, তাদের তুমি চিনবে না, তবে আমরা সকলেই থট্টাস সর্দারের দল।

কি সর্বনাশ, তুমি কি থট্টাসের হাতে পড়েছ নাকি!

পড়েছিলাম, তবে এখন তো এখানকার মহারাজার অনুচর।

জরা, এইমাত্র আমার কপালের কথা তুলেছিলাম, এখন ভাবছি তোমার

মতো কপাল যেন পরম শত্রুরও না হয়।

কেন ?

কেন! দফায় দফায় শুনতে চাও! স্বয়ং ভগবান বাসুদেবকে হত্যা করলে; তারপরে স্বয়ং কলি খট্টাসের দলে ভিড়লে; এখন আবার পড়েছ সুমন্তরাজের কবলে।

কেন মদিরা, মহারাজ তো আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন।

আরে, তাতেই তো মরেছ। জরা, তোমার সম্মুখে আসন্ন বিপদ, সেই কথা জানাতেই আজ গোপনে এসেছি।

বিপদ কেন হতে যাবে! কদিন আগে মহারাজাকে খুব খুশী করে দিয়েছি। নরেন্দ্রনগরের রাজার একটা পোষা পায়রা উড়ছিল সেটাকে মেরে নামিয়ে দিয়েছি নরেন্দ্রনগরের মধ্যে।

মদিরা বলে ওঠে, তবে তো বিপদের সংখ্যা আরও বাড়িয়েছ দেখছি। যাই হোক, সে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে, উলুখড় তো মরবার জন্যেই আছে, সে কথা আর নতুন করে কি ভাববো!

তবে আর কি বিপদ ?

বিপদ একটা নয়, দুই দিক থেকে।

কিছুই তো বুঝতে পারছি না মদিরা।

কোনদিন কি বুঝতে পেরেছ ? একে আলাভোলা মানুষ তায় মদ-ভাঙে ভোর। চোখ কান খোলা থাকলে দেরি হতো না।

যদি তা জানো তবে খুলে বলো না কেন ?

তবে শোন, তুমি একই সঙ্গে মহারাজার পারিষদদের চোখে এবং স্বয়ং মহারানীর চোখে পড়েছ।

জরা বলে ওঠে, এই কথা। তবে শোনো, মহারাজার পারিষদদের কাউকে চিনি না আর মহারানীকে চক্ষেও দেখিনি।

তুমি না দেখো তিনি দেখেছেন।

কি করে দেখেছেন ?

তুমি সদাসর্বদা মহারাজার সঙ্গে ঘুরছ, শিকারে বের হচ্ছ, রাজ্যের সবাই দেখছে আর মহারাণী দেখবেন না!

বেশ তো দেখলেন, ক্ষতি কি ?

হতাশ হয়ে মদিরা বলে ওঠে, এই বোকা মানুষটাকে নিয়ে আমি কি করবো। চোখে দেখা আর চোখে পড়ায় তফাত জানে না!

আরে, আমিও তো তাই ভাবছি, চোখে না পড়লে আর চোখে দেখবে কি করে?

নাঃ, এমন বোকাও তো দেখিনি!

এবার জরা বললো, আচ্ছা, ওটা না হয় পরে বুঝবো। পারিষদদের ব্যাপারটা আগে বুঝিয়ে দাও।

সেটা তেমন জটিল নয়, তোমার প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ দেখে তারা তোমার উপর হাড়ে চটে গিয়েছে। তোমাকে খুন করবার মতলব করছে।

তুমি জানলে কি করে?

চোখ-কান খোলা রেখে চললে অনেক কিছুই জানতে পারা যায়। বিশেষ তারা তো জানে না তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, সহজেই অনেক কথার টুকরো আমার কানে ভেসে আসে।

পারিষদদের মনের কথা তো বুঝলাম, মহারানীও কি খুন করতে চান নাকি?

না, তিনি যা করতে চান জানতে পারলে মহারাজা তোমাকে খুন করবেন।

জরা বলে উঠল, এতক্ষণে বুঝলাম।

তবু ভালো যে মুখের কথাতেই বুঝেছ, হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয়নি।

জরা মদিরাকে টেনে কোলের মধ্যে নিল।

মদিরা বলল, এখন তুমি মহারানীর পেয়ারের লোক, আমার মতো দাসী-বাঁদীতে কি আর মন ভরবে?

সোনার পাত্রেই হোক আর মাটির ভাঁড়েই হোক মদ সমান নেশা ধরায়।

আরে, জরার মুখেও যে কথা ফুটেছে, বলে মদিরা চুমো খায় তার গালে।

বিদায় নেবার সময়ে মদিরা বলে, যা বলছি মনে রেখো, তোমায় আমায় যে পরিচয় আছে যেন প্রকাশ না পায়, তাতে দুজনেরই বিপদ। এখন আমি মহারানীর বিশ্বাসভাজন অনুচরী, এর পরে হয়তো তাঁর দূতী হয়ে আসতে হবে, পুরনো লোককে দিয়ে সব সময়ে এসব কাজ হয় না। চোখ-কান খুলে রাখবে। নাও এখন ঘুমোও—এই বলে তার গালে চুমো খেয়ে বিদায় হয়ে যায়।

জরার ঘুম আসে না।

জরার ঘুম আসে না, তাই চিন্তা আসে। ঘুমে আর চিন্তায় চিরন্তন আড়াআড়ি। মনের মধ্যে এমন একটা প্রসন্নতা অনুভব করতে লাগলো যার অনুরূপ কখনো অনুভূত হয়নি তার জীবনে। শুধু জীবনটা নয়, দেহটাও হাল্কা হয়ে গিয়েছে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যেন নাগপাশের মতো স্খলিত হয়ে পড়ে গিয়েছে, ইচ্ছা করলেই সে যেন অনায়াসে ঐ পাহাড়গুলো এক লাফে ডিঙিয়ে যেতে পারে; পা বাড়ালেই ঐ পূর্ণিমার চাঁদে গিয়ে উপস্থিত হতে তার বাধা নেই। দুটো অদৃশ্য পাখা যেন ধড়ফড় করছে, উড়লেই হল। তার মনে হল সদ্যলব্ধ রাজানুগ্রহই এর কারণ কিংবা অনেককাল পরে স্ত্রী-সঙ্গ লাভ বুঝি এর কারণ। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবার ক্ষমতা তার নেই, থাকলে বুঝতে পারতো এ দুটোর একটাও প্রকৃত কারণ নয়। এতকাল শুনে এসেছে সে একটা চোয়াড় ব্যাধ, নিতান্ত বুনো, আর আজ জানল কিনা স্বয়ং রাজরানীর কাম্য পাত্র। এই অপ্রত্যাশিত কাম্যতাই তাকে এক দিব্যসত্তা দিয়েছে, এতকাল যা তার স্থূল আবরণটার মতো লুক্কায়িত ছিল। খনির অমূল্য মণি মাটি-কাদায় আচ্ছন্ন থাকায় সামান্য লোষ্ট্রখণ্ড বলে বোধ হচ্ছিল, রানীর প্রসাদে ধুয়ে যেতেই প্রকাশ হয়ে পড়লো তার স্বরূপ। জরা ব্যাধ নয়, চোয়াড় নয়, বুনো নয়, চিরন্তন পুরুষ, চিরন্তন নারীর কাম্য। সে আর শুয়ে থাকতে পারলো না, গবাক্ষের ধারে এসে দাঁড়ালো। কেন এমন করলো জানে না, কখনো এমনভাবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়নি, চিরটা কাল শুয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে, পাতার বিছানা হোক কিংবা জরতীর পেতে দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা হোক। আজ এই প্রথম তার বিনিদ্র রজনী।

তাকিয়ে দেখল আকাশে জ্যোৎস্নায় ফুল ছড়াচ্ছে, অজস্র অসংখ্য অগণিত সাদা সাদা ফুলের রাশি; আর চাঁদের ভরা নৌকোটাকে টেনে নিয়ে চলেছে চকোরের একটানা তারস্বরের গুণের টানে; দূর-দূরান্তের পাহাড়গুলো শ্বেতকলাপ মেলে দিয়ে স্থির হয়ে অপেক্ষমাণ, ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র এখনই শুরু করে দেবে নৃত্য। হঠাৎ তার কানে এলো মধুর করুণ বিহ্বল একটা গানের সুর। এত রাতে কে গান করে! এ তো রাগরাগিণী সমন্বিত সঙ্গীত নয়, এ যে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা-চোঁয়ানো মধুর নির্যাস। কার এত ব্যথা! গানের কথাগুলো বুঝতে পারলো না, ভাষাটা তার পরিচিত নয়, কিন্তু সুর! পশুতেও গানের সুর বুঝতে পারে আর জরা পারবে না—সে কি হয়! গানের কথাগুলোর অদৃশ্য শুষ্ক খুঁটি বেয়ে আকাশের পানে উঠে গিয়েছে সুরের আলোকলতা। কিন্তু এত রাতে কে গায়! কার

এত ব্যথা? আকাশের চাঁদটাকে সুদ্ধ উন্মনা করে দিয়েছে, চকোরের গুণের টানেও নড়ছে না! কে গায়!

কৌতূহলের তাড়নায় পাশের আর একটা গবাক্ষে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো রাজ-অন্তঃপুরের ছাদের অলিন্দের পাশে তম্বুরার তারে অঙ্গুলি-সঞ্চালনরত রাজমহিষী সীমন্তিনী। তন্ময় ভাবে তার চোখ বাইরের দিকে কি মনের মধ্যে বুঝবার উপায় নেই, গান গেয়ে চলেছে দুপুর রাত্রের বিরহিণী। গায়ক তো আছে, শ্রোতা কই! অবোধ জরা কি করে জানবে গায়ক যখন আপনাকে গান শোনায় তখন বাইরের শ্রোতার প্রয়োজন হয় না; শ্রোতা মনকে বাধা দেয় নদীর স্রোতে প্রস্তরখণ্ডের মতো। মূঢ় জরা সিদ্ধান্ত করলো এ গান তারই উদ্দেশ্যে। কিন্তু সত্যই কি সে মূঢ়! এ গান চিরন্তন পুরুষের উদ্দেশ্যে চিরন্তন নারীর। তবে জরার চোখে সে আজ চিরন্তন পুরুষ আর ঐ অদূরে শ্বেত-মর্মরের অলিন্দে উপবিষ্টা রাজরানী চিরন্তন নারী। অবস্থাবিশেষে দুটি মাত্র নর-নারীতেই চরাচর পূর্ণ হয়ে যায়—তৃতীয়ের তখন স্থানাভাব। জরা মুগ্ধভাবে সেই গান শুনতে লাগলো, জরা আর পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদটা।

হঠাৎ তার মনে হল একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবে! যদি মাথার উপরে ছাদটা না থাকতো, তবে পাখা মেলে উড়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না; যদি ঘরের দেয়ালগুলো না থাকতো, তবে দশকুশি ধাপ ফেলে তেপান্তরের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না; যদি রাজবাড়ির অন্তঃপুরের পথ জানা থাকতো, তবে গায়িকার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। তখন তার এমন সম্বিৎহীন অবস্থা যে সব কথা তার জ্ঞানগম্যের অগোচরে কিভাবে তার মনের মধ্যে এলো জানে না সে। প্রেমে যে অকবিকে কবি করে, মূঢ়কে ভাবুক করে, স্থূলকে সূক্ষ্মগ্রাহী করে, কিভাবে জানবে সে!

হঠাৎ তার নিদারুণ ঘৃণা বোধ হল মদিরার উপরে। যদি উপায় থাকতো তবে তার সদ্যপ্রাপ্ত সংসর্গ সুখটাকে ছিন্ন পরিচ্ছদের মতো খুলে ফেলে দিত অঙ্গ থেকে। না, আরও দুঃখ স্বীকার করতে সে রাজী। গায়ের চামড়াখানা অবধি টেনে তুলে ফেলতে পারে সে। রাজেন্দ্রাণীর যে কাম্য তার দেহ কিনা একটা সামান্য পণ্য-মেয়ের সংসর্গে কলুষিত হল! কি করছে ভালো করে বুঝবার আগেই সে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল পাহাড়ের যে-ঝরনাটায় নিত্য স্নান করতো, সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দণ্ডখানেক ধরে স্নান ও অঙ্গক্ষালন করে মনটা কতক শান্ত হলে ফিরে এসে বস্ত্র বদলে মেঝের উপর শুয়ে পড়লো—ও শয্যায় আর নয়। মুহূর্তমধ্যে দেহমনে শীতল জরা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালবেলা জেগে রাতের অভিজ্ঞতাকে স্বপ্ন বলে মনে হল জরার, শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই সিদ্ধান্তই বহাল থাকতো যদি না ঘরের ভিজে কাপড়গুলো উল্টে সাক্ষী দিত। অনেকক্ষণ সে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো, তবে সে বিলাস বেশিক্ষণ করবার উপায় ছিল না, রাজসভাতে যথাসময় যাওয়া অপরিহার্য প্রথা। যথোচিত বেশভূষা করতে লেগে গেল।

একটা পাহাড়ের মাথা কেটে সমতল করে নিয়ে সুমন্তনগর গঠিত, এ অঞ্চলের সমস্ত নগর এইভাবেই গঠিত। নগর আগাগোড়া প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত, অবস্থাবিশেষে কোথাও তিনটে সিংহদ্বার, কখনো চারটে। সুমন্তনগরের সিংহদ্বার তিনটে, অন্য দিকটা এমন খাড়া যে সেদিকে দ্বার গঠন সম্ভব নয়। সেদিকটাতেই রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের প্রান্তে যেখানে পাহাড় খাড়া নেমে গিয়েছে উপত্যকায়, সেখানে রাজান্তঃপুর। রাজপ্রাসাদের দু'দিকে ছোট ছোট বাড়ি, প্রধান অমাত্য, সেনাপতি ও রাজার প্রিয় পাত্রগণের বাসস্থান। এরই একটা বাড়িতে স্থান পেয়েছে জরা। বলা বাহুল্য, রাজা ছাড়া আর কেউ খুশী হয়নি (রানী যে হয়েছে কে জানবে)। সবাই জরার উপরে বিরূপ; তবে রাজার ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। আর সবচেয়ে বিরূপ আহ্লীক ও বাহ্লীক নামে দুজন পারিষদ, তারা সর্বদা গোপনে গোপনে ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত।

রাজসভায় প্রবেশ করে অভিবাদনান্তে দাঁড়াতেই সুমন্তরাজ বলে উঠলেন, ওহে জরা, তোমার সেদিনকার পায়রা মারার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে।

আহ্লীক ব্যাপারটার কিছুই জানতো না, ভাবলো রাজা অখুশী, তাই বলে উঠল, পায়রা লক্ষ্মীর পাখি, মারা অন্যায়।

রাজা বলে উঠলেন, আমিই আদেশ করেছিলাম।

আহ্লীকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাহ্লীক বলল, তবে না মারাই অন্যায়।

তোমরা তো আগাগোড়া না শুনেই সিদ্ধান্ত করলে, আগে কি হয়েছিল শুনে নাও—এই বলে তিনি সেদিনকার ঘটনা বিবৃত করে বললেন, শুনলাম নরেন্দ্রনারায়ণ সৈন্য যোগাড় করবার আদেশ করেছেন।

আহ্লীক ও বাহ্লীক সমস্বরে বলে উঠল, নরেন্দ্রনগর আবার লড়াই করবে!

না করতেও পারে, তোমরা আছ জানে কিনা!

রাজরসিকতায় সকলে হেসে উঠল, মায় আহ্লীক-বাহ্লীক অবধি।

এমন সময়ে একজন রাজানুচর এসে বলল, মহারাজ, নরেন্দ্রনগরের লোক এসে আমাদের প্রজাদের খরস্রুতি উপত্যকার গম কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

তুমি নিজে দেখেছ?

না মহারাজ, প্রজাদের মুখে শুনে দৌড়ে চলে এলাম।

দৌড়ে এদিকে না এসে ওদিকে গিয়ে দেখে এলেই পারতে ঘটনা সত্য কিনা।

রাজানুচর বলল, মহারাজ, আমার গুরুদেব দীক্ষা দেবার সময়ে বলেছিলেন, বৎস,সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ, তাই মন্ত্র দেওয়া হয় কানে। কানের সাক্ষ্য কখনো অবিশ্বাস করবে না—এই বলে সে অনুপস্থিত বা অলীক গুরুর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকালো।

আহ্লীক ও বাহ্লীক, তোমরা তো দীক্ষা নাওনি, একবার চোখে দেখে এসো তো ব্যাপারটা কি।

আহ্লীক বললে, অমনি দু-চারজন সৈন্য নিয়ে যাই, তেমন দেখি তো ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আসবো।

বাহ্লীক বলল, অমনি জয়াকেও নিয়ে যাই, দেখে নিক সুমন্তনগরের লোকে কেমন লড়াই করে।

রাজা বললেন, তোমাদের যেমন আদেশ করলাম তাই করো। আর যদি ভয় পেয়ে থাকো তবে—

দুজনে বিকম্পিত দেহে বলে উঠল, ভয়! ভয়! বলতে বলতে প্রস্থান করলো।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে ফিরে এসে এক উপন্যাস বানিয়ে আবৃত্তি করলো।

কি রকম কি দেখলে হে? শুধালেন সুমন্তরাজ।

আহ্লীক বলল, মহারাজ, সে এক বিষম কাণ্ড! আমরা গিয়ে দেখি শ'দুই লোক গমের গাছ উপড়োচ্ছে। তখন আমি বললাম—

বাহ্লীক বাধা দিয়ো বলল, না মহারাজ, আমি বললাম—

আহ্লীক স্বীকার করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ মহারাজ, ও-ই বলল বটে তবে কথাটা আমার মনেও ছিল।

বাহ্লীক বলল, তোমরা গমের ক্ষেতে এসেছ কেন? তারা বলল, ঝড়ে আমাদের এখানে এনে ফেলেছে। তখন আমি শুধোলাম, তা না হয় এনেই ফেলল, যদিচ ঝড়ের কোন চিহ্ন নেই কিন্তু গাছগুলো উপড়োচ্ছ কেন? তখন তারা বলল কি—

আহ্লীক বাধা দিয়ে বলল, তুমি থামো তো, এর পরে তো কথা হল আমার সঙ্গে।

হ্যাঁ তোমার সঙ্গেই হয়েছিল বটে, তা না হয় তুমিই বলো।

রাজা দেখলেন এরা দুটি মানিকজোড়, মুহূর্তে বিরোধ, মুহূর্তে মিলন।

তারা বলল, কি মহারাজ, পাছে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তাই গাছগুলো আঁকড়ে ধরছি, আর যেটা ধরছি সেটাই উপড়ে আসছে।

তখন বাহ্লীক বলল, কিন্তু আঁটি বাঁধছো কেন ?

এটাই ভাই ভুল হয়ে গিয়েছে।

রাজা দেখেন উতোরে চাপানে এরা বেশ চালাচ্ছে—তখন তোমরা কি করলে ?

রাজার কথায় উৎসাহিত হয়ে দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, তখন আমরা দুজনে একসঙ্গে গর্জন করে উঠে বললাম, জানো, আমরা মহারাজাধিরাজ সুমন্ত-রাজের সভাসদ, এখুনি তোমাদের গর্দান নেবো।

বলা বাহুল্য, গর্জন বাক্যগুলো সভাগৃহ ধ্বনিত করে গর্জন রবেই উচ্চারণ করলো।

তখন ?

তখন আর কি বলবো, মহারাজের নাম শুনবামাত্র তারা একযোগে দৌড়ল নরেন্দ্রনগরের দিকে—আমরাও দৌড়তাম তাদের পিছনে কিন্তু ভাবলাম, না, আগে মহারাজকে সংবাদটা দেওয়া আবশ্যক। তারপরে না হয় দরকার হলে ওদের পিছু নিলেই হবে।

বাহ্লীক বলল, ভাই, ওটা তো আমি বলেছিলাম।

হ্যাঁ, তুমিই বলেছিলে সত্য তবে আমি তো প্রতিবাদ করিনি। মহারাজ, আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা একবার না হয় লোক পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করুন।

সুমন্তরাজ বললেন. তোমাদের কথা আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে ? কিন্তু গমের আঁটিগুলো কি নিয়ে গিয়েছে ?

আহ্লীক বলল, সে সাধ্য কি আর তাদের ছিল !

তবে সেগুলো ওখানেই আছে। লোক পাঠিয়ে দিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে হয়।

বাহ্লীক বলল, সে পণ্ডশ্রম করবার প্রয়োজন নেই মহারাজ, আমরা আবার সেগুলো যথাযথ পুঁতে দিয়ে এসেছি।

আহ্লীক বলল, ক্ষেতে যে লোক এসেছিল তার এতটুকু চিহ্ন রাখিনি।

বাঃ বাঃ, বেশ করেছ, বীরপুরুষ তোমরা বটে, তোমাদের কি পুরস্কার দেবো ভাবছি।

রাজবাক্যে উৎসাহিত হয়ে দুজনে যুগপৎ ছুটে গিয়ে প্রণত হয়ে রাজকীয়

পদধূলি সংগ্রহ করলো।

রাজা বললেন, ওহে সেনাপতি, এরকম দুজন বীরপুরুষ থাকতে সৈন্যদল রাখা অনাবশ্যক। কি বলো?

সেনাপতি ও অন্যান্য পারিষদবর্গ হেসে উঠল।

আহ্লীক ও বাহ্লীক নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করলো। ওরা চতুর, না নির্বোধ! অনেক সময়ে এ-দুয়ের বাহ্য লক্ষণ অভিন্ন।

জরার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল, তাছাড়া আজ তার মনটাও নাকি ছিল অন্যত্র।

রাজা সভাভঙ্গ করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে সিংহদ্বারের বাইরে দুন্দুভি বেজে উঠল। আবার কি হল! কেউ একজন গিয়ে দেখে এসো তো, বললেন সুমন্তরাজ।

রাজ-অনুচর ফিরে এসে জানালো যে নরেন্দ্রনগর থেকে রাজদূত এসেছে, তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কিনা জিজ্ঞাসা করছে দ্বারপাল।

অবশ্যই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। যাও, একজন গিয়ে নিয়ে এসো, দেখা যাক কি সংবাদ এনেছে রাজদূত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নরেন্দ্রনগরের রাজদূত ও একজন নরেন্দ্র-নাগরিক সৈন্য এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালো।

কি সংবাদ দূত?

সে বিনীতভাবে কুণ্ডলীকৃত একখানা ভূর্জপত্র রাজার হাতে দিল। রাজা দেখলেন নরেন্দ্রনগররাজের পত্র। তিনি পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে উঠল। পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন, সভাস্থল সমান স্তব্ধ, অবশেষে তিনি মন্ত্রীর হাতে পত্রখানা দিয়ে বললেন, পড়ো, সবাই শুনুক, আগাগোড়া প্রতিটি শব্দ পড়বে, একটি অক্ষরও বাদ দেবে না।

মন্ত্রী পড়তে আরম্ভ করলো, রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনতে লাগলো সকলে, নরেন্দ্রনগরের রাজদূত অবধি, সে জানতো না পত্রে কি আছে।

মন্ত্রী রাজপত্র পাঠ করছে—

"সুমন্তনগর অধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত সুমান্তরাজ সমীপেষু—

সুমন্তপুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনগরের কলহ ও বিবাদ বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ইহার যে শীঘ্র অবসান হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতেও উভয় রাজপরিবারের সন্তান-সন্ততিক্রমে ইহা চলিবার সম্ভাবনা। যুদ্ধের কি শোচনীয় পরিণাম কুরুক্ষেত্রের মহাহব তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। পাণ্ডব

ও কৌরবের তুলনায় নরেন্দ্রনগর ও সুমন্তপুর সামান্য রাজ্য ইহা বোধ করি সুমন্ত-রাজ স্বীকার করিবেন। কাজেই যুদ্ধবিগ্রহ সর্বথা পরিত্যাজ্য। অথচ এ দুই রাজ্যের মধ্যে একটা আশু মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। এরকম অবস্থায় এ-পক্ষের প্রস্তাব দুই রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে শত-সহস্র নিরপরাধ সৈন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া প্রকৃত প্রজারঞ্জক রাজার কর্তব্য নয়। কুরু-পাণ্ডবে যে দ্যুতপণ হইয়াছিল, যুদ্ধের তুলনায় তাহা নির্দোষ। এই দুই রাজ্যের মধ্যে সেরকম ব্যবস্থা করিলে মীমাংসাও হয়, আবার লোকক্ষয়ও নিবারিত থাকে। অতএব আসুন আমরা সেই মহাদৃষ্টান্ত অনুসরণ করি। এ দ্যুতক্রীড়ায় যে-পক্ষ পরাজিত হইবেন, রাজ্য-রাজধানী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সে-পক্ষ প্রব্রজ্যা করিবেন। এখন সমস্যা এ দ্যুতক্রীড়ায় পণ কি হইবে? বলা বাহুল্য, পুরুষের কাছে পত্নীর অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। অতএব এ-পক্ষের প্রস্তাব সুমন্তপুর রাজমহিষী পণ্যা হইবেন। ইহাতে সঙ্কোচের কারণ থাকিতে পারে না, যেহেতু মহামাননীয় পাণ্ডবগণও দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া দ্যুতক্রীড়ায় মাতিয়াছিলেন। আর এরূপ অনুসরণের প্রমাণস্বরূপ স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'। ইহার উপরে আর কি কথা! নরেন্দ্রনগররাজ ও সুমন্তনগররাজ উভয় পক্ষই ভগবান বাসুদেবের পরম ভক্ত। নিশ্চয় মহারাজার স্মরণে আছে কোন পাষণ্ড কর্তৃক বাসুদেব হত্যার সংবাদে উভয় রাজ্যে বিষাদের কি ঢেউ উঠিয়াছিল। উভয় রাজ্যের রাজরানী, পরিবারবর্গ ও প-রিষদগণ অষ্টপ্রহর উপবাস করিয়াছিলেন। কাজেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অনুসরণ করিবার ভাগবত-উপদেশ এক্ষেত্রে এ-পক্ষের প্রস্তাবের প্রমাণ। অবশ্য এ-পক্ষের পত্নীকেও পণ রাখা চলিত, তবে দুঃখের বিষয় এই যে কয়েক বৎসর হইল তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার অভাবে এ-পক্ষ একেবারে নিঃসঙ্গ হয় নাই, শতাধিক সুন্দরী ও যুবতী উপপত্নী নিত্য সঙ্গ-দান করিয়া থাকে। তাহাদের যে কোন একজনকে অথবা দশ-বিশজনকে পণ রাখিলেও চলিত। কিন্তু মহারাজা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন পত্নী ও উপপত্নীর সমান মূল্য হইতে পারে না। কাজেই এ-পক্ষের প্রস্তাব সুমন্তরাজমহিষী সীমন্তিনী দেবী পণরূপে রক্ষিতা হইয়া লোকক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণে সাহায্য করিতে নিশ্চিত অস্বীকৃতা হইবেন না। মহারাজা জয়লাভ করিলে সমস্তই তাঁহার থাকিবে, আর লাভের মধ্যে নরেন্দ্রনগরের রাজ্য-রাজধানী ও শতাধিক উপপত্নী পাইবেন। আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাজার পরাজয় ঘটে, তবে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। সে অবস্থায় পত্নী থাকা না থাকা সমান, কারণ শাস্ত্র-কারগণের মতে পত্নী সাধন পন্থার অন্তরায়। তবে, মহারাজ, সর্ব বিষয়ে কৌরব-

গণের অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। রজঃস্বলা রাজমহিষীকে দ্যূতসভায় নাই আনিলেন! মহারানীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দ্যূতক্রীড়ার দিন ধার্য করিবার স্বাধীনতা মহারাজের থাকিল। আরও বলিয়া রাখি, পাষণ্ড দুর্যোধনের মতো দ্যূতজিতা রাজমহিষীকে উরু প্রদর্শনের বাসনা অন্ততঃ সর্বসমক্ষে রাজসভায় এ-পক্ষের নাই। যথোচিত স্থানকালে যথাসময়ে ধীরে-সুস্থে তাহা করিলেই চলিবে। আশা করি মহারাজা স্বাভাবিক ঔদার্যবশতঃ অকারণ যুদ্ধে লোকক্ষয় নিবারক এই পরার্থপর প্রস্তাবের সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হইবেন। সুনিবিড় আলিঙ্গন ও সময়োচিত প্রীতি সম্ভাষণাদি অন্তে, ইতি

নরেন্দ্রনগরাধিপতি।"

মন্ত্রী নেহাত মন্ত্রী বলেই অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি বহুতর তিক্ত অভিজ্ঞতা নিত্য গলাধঃকরণজনিত অভ্যাসে যার মন অসাড় হয়ে গিয়েছে বলেই পত্রখানা আগাগোড়া পাঠ করতে সমর্থ হল। পত্র শেষ হয়ে গেল, সভাগৃহ রুদ্ধশ্বাস, উপস্থিত ব্যক্তিদের শ্বাসপ্রশ্বাস পতনের শব্দও বুঝি শোনা যাচ্ছে না। কে প্রথম কথা বলবে, কি প্রথম কথা বলবে। যখন সবাই হতবুদ্ধি হয়ে চিন্তা করছে, দুই প্রগল্ভ ব্যক্তি হঠাৎ সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিল।

আহ্লীক ও বাহ্লীক একযোগ চিৎকার করে উঠল, লোকটার শির নাও।

সুমন্তরাজ ইঙ্গিতে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, দূত অবধ্য।

তবে?

রাজা নিজেই মীমাংসা করে দিলেন, দূত, তুমি উত্তর নিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছ?

বিনীতভাবে সে বলল, হাঁ, মহারাজ।

তোমার উষ্ণীষটি রেখে যেতে হবে। ওতেই আমার উত্তর বুঝবেন নরেন্দ্র-নগরাধিপতি।

তার চেয়ে যে মস্তক রেখে যাওয়া ভালো মহারাজ।

দূত না হলে তো তাও রেখে যেতে হতো।

মহারাজ, আমার নিবেদন এই যে স্বহস্তে উষ্ণীষ খুলে দিতে পারবো না।

না, তার প্রয়োজন হবে না। তুমি ঐ দূরে সিংদরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও, পালাবার চেষ্টা করো না

দূত যথাদিষ্ট সিংদরজার কাছে গিয়ে রাজসভার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। তখন সুমন্তরাজ জরাকে আদেশ করলেন তোমার তীর-ধনুক নিয়ে এসো।

জরা তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হল।

এবারে তীর মেরে ওর মাথার উষ্ণীষটা খসিয়ে ফেলো। পারবে তো?

জরা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে ধনুকে তীর যোজনা করলো।

রাজদূত চিৎকার করলো, ভাই, উষ্ণীষটার সঙ্গে মাথাটা খসিয়ে ফেলতে পারলে বাসুদেব তোমায় কৃপা করবেন।

সভাসদদের অনেকেই মনে মনে আশা করছিল আস্ত মানুষটা মারা পড়বে, তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। মানুষ মারা পড়ার আনন্দ আর জরার ব্যর্থতা দুটোই সমান আনন্দকর তাদের পক্ষে।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। জরা অভ্রান্ত লক্ষ্যে রাজদূতের মাথার পাগড়ি খসিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

সভাসদগণ সুমন্তরাজের জয়ধ্বনি করে উঠল আর নরেন্দ্রনগরের দূত খালি মাথায় মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে সিংদরজা দিয়ে বের হয়ে নরেন্দ্রনগরের দিকে দৌড়ে প্রস্থান করলো। তখন সবাই এসে পুনরায় সভাগৃহে অধিষ্ঠিত হল, সুমন্ত-রাজ প্রসন্ন হাস্যে জরাকে পুরস্কৃত করলেন।

সেদিনকার মত রাজসভা ভঙ্গ হবে এমন সময়ে রানীর অনুচরী মদিরা একখানি সোনার থালায় একটি মুক্তার মালা নিয়ে এসে রাজাকে অভিবাদন করে দণ্ডায়মান হল।

রাজা শুধালেন, কি সংবাদ?

মদিরা বলল, মহারাজ, মহারানী এই মুক্তাহারটি মহারাজার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা যে বীরপুরুষ আজ রানীমার সম্মান রক্ষা করলেন মহারাজ তাঁকে এটি দিয়ে যেন পুরস্কৃত করেন।

রাজা আদেশ করলেন, জরা, এগিয়ে এস।

জরা তাঁর কাছে গিয়ে নতজানু হলে রাজা স্বহস্তে তার কণ্ঠে মালাটি পরিয়ে দিলেন। জরা নত হয়ে অভিবাদন জানালো রাজাকে।

বলা বাহুল্য, জরার সম্মানে সভাসদগণ আনন্দিত হওয়ার বদলে তার উপরে অধিকতর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলো। আহ্লীক ও বাহ্লীক তো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, এ আবার বীরত্ব—তার আবার পুরস্কার! এ আমরাও পারতাম। রাজারা সবাই একচোখো! যত সব—

রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে উঠলেন, উঠবার আগে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, যুদ্ধ অনিবার্য, সৈন্যসামন্ত যেন ঠিক থাকে।

সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ হল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায় দেশের যত্রতত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সংস্করণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছে। মহা আদর্শ অনুসরণ করবার লোকের অভাব কখনোই হয় না।

॥ ৪ ॥

জয়া আগের রাতের মতো গবাক্ষের ধারে এসে দাঁড়ালো যদি গান কানে এসে পৌঁছয়। না, আজ আর কেউ গান করছে না, সমস্ত রাজপুরী নিষুতি, কেবল মাঝে মাঝে প্রহর হাঁকবার তন্দ্রাজড়িত হুঙ্কার ; আর দূরে, কতদূরে কে জানে, রাতে দূরত্ব বুঝে ওঠা যায় না, যাম ঘোষের শব্দের দিগন্তব্যাপী জাল ফেলা আর জাল টেনে আনা। আকাশের অসংখ্য তারার মধ্যে মাত্র দুটি তারা জয়ার পরিচিত—সন্ধ্যাতারা আর শুকতারা। সন্ধ্যাতারা মনে করিয়ে দেয় ঘরে ফিরবার সময় হল, শুকতারা মনে করায় শিকারে বের হওয়ার সময়। সে দুটির একটিও নেই আকাশে, এখন মধ্যরাত্রি।

তবু দুর্মর আশা পোষণ করে দাঁড়িয়ে রইল জয়া। মানুষ বড় অবুঝ জীব, ভাবে গতদিনের সুখের প্রত্যাবর্তন ঘটবে পরদিনে, ভাবে গতদিনের দুঃখের প্রত্যাবর্তন ঘটবে পরদিনে। সে কেবল ভাবনা মাত্র, সুখ দুঃখ আপন নিয়মে চলে, দিবারাত্রির চক্রাবর্তনের সঙ্গে তার মিল নেই। তাই আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গবাক্ষ ধরে জয়া। দাঁড়িয়ে থাকে আর প্রশস্ত বক্ষের উপরে মাঝে মাঝে নিবিড়-ভাবে চেপে ধরে সেই মুক্তোর মালাটা। এই মালাটা একমুহূর্ত কণ্ঠছাড়া করেনি ; দিনের আলোয় বাতির আলোয় বারে বারে দুলিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছে, দেখেছে ক্ষণে ক্ষণে কত নূতন নূতন রঙের আভাস মুক্তোর দানাগুলোতে ; সে-সব রঙের নাম জানে না. সে-সব রঙ আদৌ যে আছে জানত না, তুলি আর রঙের মঞ্জুষা পেলেও সে-সব রঙ ফোটাতে পারবে এমন তার সাধ্য নেই।

কালকে রাতে মদিরা বলে গিয়েছিল রানীর চোখ পড়েছে তার উপরে, আজ তার প্রমাণ হাতে হাতে তো পাওয়া গেল। মদিরা তবে মিথ্যা বলেনি, আর অকারণে এত বড় মিথ্যা কথাটা বলতে যাবেই বা কেন ? ঐ মালাটা সারা অঙ্গে আজ মাখিয়ে দিয়েছে রানীর স্পর্শ। সে আর একবার মালাটা মুখের কাছে তুলে চুম্বন করলো, শব্দটা একটু জোরেই হল।

কি গো, কাকে এমন সশব্দে চুম্বন করলে ? প্রেয়সীটি কে শুনতে পাই কি ?

মুখ ফিরিয়ে জয়া দেখলো মদিরা। তার স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ায় রাগ হল মদিরার উপরে, মুখের উপর দিয়ে আশাভঙ্গের ক্ষীণ মেঘের ছায়া চলে গেল। কিন্তু

পরমুহূর্তেই মনে হল সে হয়তো এসেছে রানীর দূতীরূপে। অমনি ছায়াপসারিত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রেমব্যবসায়িনী মদিরার চোখ এড়াতে পারল না এই ভাবের বিবর্ত।

জরা শুধালো, রানী কিছু বলেছেন?

মদিরা আদৌ সুখী হয়নি জরার প্রতি রানীর আসক্তিতে, আর জরা যে সেই আসক্তির জালে ধরা দিয়েছে তাতে রীতিমতো বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে ভাবলো নির্বোধটাকে নিয়ে একটু মজা করা যাক না কেন?

কি মদিরা, চুপ করে রইলে কেন?

কোথা থেকে আরম্ভ করব তাই ভাবছি।

গোড়া থেকেই আরম্ভ করো না কেন?

তা হলে যে সমস্ত রাত লাগবে।

লাগলেই বা, বলল জরা।

ঘুমোতে হবে না?

কত রাত তো জেগে কাটিয়েছ।

সে জেগেছি নিজের প্রেমের খাতিরে।

আমি কি তোমার পর? আমার জন্যে না হয় জাগলে আজকের রাতটা।

এতদিন তো পর ছিলে না জরা, কিন্তু রানীর প্রণয়ী কি আর আমার আপন!

এ কি বলছ মদিরা—এবারে তার কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা ছিল।

সেটুকু বুঝতে পেরে বলল, তবে এসো, শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক।

অতদূর যেতে জরা রাজী নয়, নূতন প্রেম ব্যবধান ঘটিয়ে দিয়েছে পুরাতন প্রেমের মধ্যে। বলল, তার চেয়ে এসো, এই গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে গল্প করি।

চাঁদ দেখছ না চাঁদবদন দেখছ, ঠিক করে বলো তো?

মদিরার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, সেই জরা কি এই! যে ছিল নিরক্ষর বুনো বর্বর, হঠাৎ তার এ পরিবর্তন হল কি করে! কি করে কেমনভাবে জানবে মদিরা! সে প্রেমব্যবসায়িনী, প্রেমিক নয়। প্রেমে যে মুহূর্তে লোহাকে সোনা করে দেয় এ তার ধারণার মধ্যে নয়।

জরা বিছানার কাছে আসবে না, তাই সে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

জরা শুধায়, রানী আমাকে মুক্তাহার পাঠাতে গেলেন কেন?

তোমার বীরত্ব দেখে।

শুধুই বীরত্ব দেখে ?

না, সেই সঙ্গে বীরপুরুষকেও দেখেছেন। তা ছাড়া নরেন্দ্রনগরাধিপতির পত্রের মর্মটাও জানতে পেরেছেন।

বিস্মিত জরা বলে ওঠে, রাজসভার কথা সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে পৌছলো রাণীর কানে ?

বলো কি, বাইরের কথা বাতাসে যায় অন্দরে। চিঠির ব্যাপার জানতে পেরে যেমন রুষ্ট হয়েছিলেন তোমার বীরত্ব দেখে তেমনি খুশি হলেন। বললেন, যা মদিরা, এখনই এই মুক্তোহার পরিয়ে দিয়ে আয় বীরপুরুষকে।

তবে তুমি মহারাজার হাতে দিলে কেন ?

সেটাই তো রাজসভার রীতি।

জরা বলল, মদিরা, আমার ইচ্ছে রানীকে কিছু দিই।

তোমার এমন কী আছে যা দিতে পারো ?

আছে। এই বলে সে কুলুঙ্গি থেকে বের করে আনে সোনার সুতোয় গাঁথা সেই কৌস্তভমণিটা।

সেটা দেখে মদিরা চমকে ওঠে, বলে, এ যে বাসুদেবের কণ্ঠহার।

বটেই তো।

মদিরার মুখ দিয়ে বের হয়, পেলে কি করে ?

জরা মুখ খুলবার আগেই সে বলে ওঠে, বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

মদিরার আর যাই দোষ থাক চিন্তায় ও পথনির্ধারণে সে অত্যন্ত ক্ষিপ্র, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি এক চমকে দেখতে পেলো। বেশ হবে, দাও দাও—বলে সেটা তাড়াতাড়ি হস্তগত করে নেয় আর মনে মনে বলে, এই রইলো তোমার মারণাস্ত্র আমার হাতে, আর একটু বেয়াড়াপনা করবে কি নিক্ষেপ করবো, বেরিয়ে যাবে প্রেম করা।

কবে দেবে রানীকে ?

দেখো জরা, এ সব রাজারানী নিয়ে ব্যাপার, তড়িঘড়ি করলে চলবে কেন ? সময় বুঝে মর্জি বুঝে তবে তো দিতে হবে।

একবার রানীর সঙ্গে দেখা হয় না ?

এ কি খেঁদি না পাঁচি যে ইচ্ছে করলেই দেখা হবে।

রানী তোমার হাতে, তুমি ইচ্ছে করলেই তো পার।

মদিরা মনে মনে বলে, ইচ্ছে করলে পারি সত্যি কিন্তু ইচ্ছে হতে যাবে কেন ? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার ইচ্ছে তোমার হয়েছে, তা ঘোড়া রাজী হবে কেন

বলতে পারো! মুখে বলে, দেখো জরা, এ হচ্ছে তলোয়ারের উপর দিয়ে হাঁটা, পা যতক্ষণ বরাবর ফেলছ ঠিক আছে, বেতালা হলেই বিপদ, তোমার আমার দুজনেরই।

তবে উপায়?

উপায় একটা বের করতেই হবে।

কবে আবার আসবে?

মনে মনে হেসে মদিরা বলে, খুব যে গরজ!

হারটা কবে দেবে?

সে-ও একটু সময় বুঝে দিতে হবে।

এতে আবার সময় বোঝাবুঝি কেন?

হার দেখে মহারাজা যখন জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় পেলে তখন রানী কী উত্তর দেবেন বলো দেখি?

হতাশ হয়ে জরা বলে, তাহলে তো কোনকালেই দেওয়া হবে না।

হবে, হবে, মহারাজা তো মাঝে মাঝে শিকারে বের হয়ে দু-চারদিন স্থানান্তরে কাটান তখন দেবো।

তখন যদি আমাকে নিয়ে যেতে চান?

তুমি যাবে, হারটা তো দেবো আমি।

কি বলেন আমাকে জানাবে।

অবশ্যই। না জানালে চলবে কেন?

কালকে রাতে আবার আসবে?

দেখি, সুযোগ পাই কিনা। প্রতি রাতে যাতায়াত করলে জানাজানি হয়ে যেতে কতক্ষণ! তাতে দুজনেরই বিপদ!

আচ্ছা, সাবধানেই এসো, তবে এসো নিশ্চয়।

মদিরা যেতে উদ্যত হলে জরা তাকে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে বারে বারে চুম্বন করলো। মদিরা বুঝলো এ আদরের উদ্দিষ্ট সে নয়। বলল, এ কি আমার বকলমে রানীকে নাকি?

জরা উত্তর দিল না। কী উত্তর দেবে! নরনারীর চুম্বন বিনিময় কখন যে লক্ষ্যকে অতিক্রম করে উপলক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয় সে কি সব সময়ে তারাও জানতে পারে!

মদিরা আজ রানীর দূতী হিসাবে আসেনি যদিচ জরা সেইরূপ ধারণা করেছিল। মদিরা নিজের টানে এসেছিল। দেখল টান শিথিল হয়ে গিয়েছে,

বুঝলো অকৃতজ্ঞ জরার চোখে সে এখন নগণ্য। বঞ্চিতা নারীর ক্রোধ অত্যল্পকাল মধ্যে বিদ্বেষে পরিণত হল। ঐ বুনো বর্বরটাকে যদি সে জব্দ করতে না পারে তবে তার নাম মদিরা নয়। বটে! এখন তার নিজস্ব মূল্য বলতে আর কিছু নেই, যা মূল্য ঐ রানীর দূতীরূপে। ভাবলো, আর বলিহারি যাই রানীকে, দেবতুল্য স্বামী থাকতে কিনা! স্থির করলো, রইলো তো হাতে মারণাস্ত্র ঐ কৌস্তুভমণির হার। এ হারের খ্যাতি ভারতে না শুনেছে কে। তার উপরে এ রাজ্যে আবার সকলেই বাসুদেবের ভক্ত। রাজারানী তো বাসুদেবের পূজা না করে জলগ্রহণ করেন না।* সে সঙ্কল্প করলো কালকে রাতেই আবার আসবে, তবে সে আর এক ভূমিকায়। দেখা যাক কার বুদ্ধি বেশি—জরার, না তার!

॥ ৫ ॥

সাপের জীর্ণ খোলসখানার মতো পুরাতন সংস্কার খুলে ফেলে দিয়ে জরা এখন নূতন জীবন লাভ করেছে। রাজভোগ, রাজাপ্যায়ন, সর্বোপরি রানীর প্রণয় তাকে যেন নূতন মানুষে পরিণত করেছে। বাসুদেবকে হত্যা করবার পর থেকে পাপের ভারে পীড়িত ছিল; চাঁদের দিকে তাকালে দেখতো অত বড় চাঁদখানা গ্রহণের ছায়ায় ম্লান, ক্ষণে ক্ষণে পায়ের তলায় পৃথিবী কেঁপে উঠে ভূমিকম্পের মত বোধ হতো, সমস্ত মানুষ যেন ঘৃণার চোখে তাকে দেখতো, শয়নে স্বপনে জাগরণে মুহূর্তের জন্য শান্তি ছিল না, প্রত্যেক মুহূর্তে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হতো, একবার তো গাছে উঠে ফাঁস লাগিয়েছিল। খট্টাসের লোক এসে টেনে নামালো। আর এ সমস্তর মূলে ছিল ঐ হতভাগা মাগী জরতী। পাপ করেছে, ভগবানকে হত্যা করেছে, জীবনে শান্তি পাবে না, মরলে নরকে যাবে এই রকম কত শাস্তর আউড়ে তাকে পাগল করে তুলেছিল। মাগী মরেছে উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, যেমন তার চেহারা তেমনি ব্যাভার। আর ঐ বজ্জাত খট্টাস। তার হাতে পড়ে কত শাস্তিই তার হয়েছে, না জানি আরও কত কী হতো। ও বেটাও নিশ্চয় মরেছে, আপদ গিয়েছে। একদল চোয়াড়ের রাজা করে দিয়ে তাকে কৃতার্থ করেছিল আর কি! এখন এই নূতন পরিবেশে এসে বুঝতে পারছে কী আতান্তরেই না পড়েছিল! খুব রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। অবস্থান্তরে কেউ পাপী, কেউ পুণ্যাত্মা, কেউ রাজা, কেউ ফকির। মানুষ অবস্থার ক্রীড়নক।

* মহাভারতের আমলেই বাসুদেব অবতাররূপে স্বীকৃত ও পূজিত হতে আরম্ভ করেছিলেন। মহাভারতের সমাজ—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ।

এই অবিমিশ্র সুখের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র ঐ মদিরা। সে যখনি আসে দ্বারকার স্মৃতি বহন করে আনে, সে জানে জরা বাসুদেবের হত্যাকারী। তার কাছেই সব আগে স্বীকার করেছিল অপরাধ। মদিরা ইচ্ছা করলে তার সুখের প্রাসাদ একটি ফুৎকারে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। কিন্তু জরার সৌভাগ্যচক্র আজ এমনি অনুকূলে আবর্তিত যে সেই রন্ধ্রপথেও একখণ্ড স্বর্গ দৃশ্যমান।

জরা দেখে এদেশের সকলেই বাসুদেবের ভক্ত, জানে বাসুদেবের মৃত্যু হয়েছে। কই, তারা তো দিবারাত্রি হায় হায় করে বুক চাপড়ে মরছে না! তাদের কাণ্ড-জ্ঞান আছে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার সময় হলে মারা যায়। বাসুদেব জন্মেছিলেন, আয়ু ফুরোলে মারা গিয়েছেন। বাস্, চুকে গেল। তার জন্যে শোক, তাপ, বুক চাপড়ানো, নরকের ভয় দেখানো কেন! বিচিত্র যুক্তির বলে জরা স্থির করে যে বাসুদেবকে হত্যার দায়িত্ব তার নয়। সত্য বটে তার নিক্ষিপ্ত তীর তার মৃত্যুর কারণ, কিন্তু তার দায়িত্ব কতখানি? জঙ্গলের মধ্যে এসে মানুষ অযথা শুয়ে থাকবে কেন—বিশেষ যে মানুষ বুনো নয়, জংলী নয়, সে কেন আগাছার মধ্যে শুয়ে থাকতে যাবে! হরিণ ভেবেই তীর ছুঁড়েছিল, তা যদি মানুষের গায়ে লাগে তবে সে দায়ী হতে যাবে কেন! এ সমস্তই পুরানো যুক্তি, তবে যে নূতন দীপ্তিতে দেখা দিল সে অবস্থার মাহাত্ম্যে। অবস্থান্তরে জীর্ণ খোলসখানা খসিয়ে ফেলে নূতন জীবন লাভ করেছে জরা।

সুমন্তরাজের পিছু পিছু চলেছে জরা। রাজা আজকাল তাকে সঙ্গে নিয়ে বের হন, বলেন, এরকম দেহরক্ষী আর কোথায় পাবো। দেখো তো, এক বাণের ঘায়ে নরেন্দ্রনগরকে বেসামাল করে দিল!

আহ্লীক বাহ্লীক মনে মনে বলে, ভারী তো বীরপুরুষ! মারলো তো একটা নিরীহ পোষা পায়রা, তাতে কিনা নরেন্দ্রনগর বেসামাল! হাঁ আহ্লীক, ছেলেবেলা আমরা কত তীর ছুঁড়েছি পায়রার দিকে?

আহ্লীক বলে, মরেনি একটাও।

আরে, তাতে কি হল! মরতে তো পারতো।

না ভাই বাহ্লীক, যাই বলো, লোকটার হাতসই আছে।

সই না ছাই, হঠাৎ লেগে গিয়েছে।

তা বললে চলবে কেন? সেদিন যে লোকটার মাথার পাগড়িটা উড়িয়ে দিল!

আহ্লীক, তুমিও যেমন—রাজার ইচ্ছে ছিল মাথাটা সুদ্ধ উড়িয়ে দেয়।

আর মহারানীমা যে কণ্ঠহার দিয়ে ওকে পুরস্কৃত করলেন!

বাহ্লীক গলা খাটো করে বলল, ওর মধ্যে অনেক কথা আছে।

তাই নাকি! শুনি না ভাই কি কথা?

সবাই জানে আর তুমি জানো না এ কি হতে পারে আহ্লীক! এখন নয়, নিরিবিলি একসময় বলবো। রাজবাড়ির লোকগুলোর আবার আড়ি পেতে থাকার অভ্যাস আছে।

তখন কৃষ্ণদ্বিতীয়ার কলামাত্র খণ্ডিত ম্লান চন্দ্র দিগন্তের গিরিশিখরে লগ্ন, রোদের তেজ আর একটু বাড়লেই গলে মিলিয়ে যাবে। সুমন্তরাজের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই বললেন, জরা, কখনো চন্দ্রগ্রহণ দেখেছ?

ঐ প্রশ্নে জরার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল, আবার এ প্রসঙ্গ ওঠে কেন! সে পর্যায় তো চুকে গিয়েছে। বলল, না মহারাজ, আমরা বুনো লোক, গেরণ দেখবো কি করে?

রাজা হেসে উঠলেন, সে কি কথা! চাঁদ কি কেবল নগরের আকাশেই ওঠে? বন কি চন্দ্র-সূর্যের অধিকারের বাইরে?

তা নয় মহারাজ, হয়তো আমার বয়সে গেরণ কখনো লাগেনি।

বলো কি হে, চন্দ্রগ্রহণ প্রায় প্রতি বছরেই হয়, কোন কোন বছরে একাধিক-বার, তবে সূর্যগ্রহণ কালেভদ্রে। তোমার বয়স কত হল?

সে হিসাব তো কেউ রাখেনি মহারাজ।

আচ্ছা দাঁড়াও, আমি অনুমান করি।

এবারে সুমন্তরাজ তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, বছর তিরিশ, কি বলো?

তা হতে পারে মহারাজ।

তবে তোমার বয়সে অন্তত তিরিশবার চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে, অবশ্য সব গ্রহণ সর্বত্র দৃষ্ট হয় না।

তারপর বললেন, চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় জানো?

আমাদের গ্রামে যে টোল আছে তার পণ্ডিতমশায়ের কাছে শুনেছিলাম রাহুতে নাকি গ্রাস করে।

ভুল শোননি। কিন্তু হঠাৎ রাহুতে গ্রাস করে কেন জানো? কোন একটা নিদারুণ অশুভ আসন্ন হলে।

তা হবে।

রাজা বললেন, মাস দুই আগে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, তারপরেই বাসুদেব গেলেন।

জরা ভাবে, এ কি শোচনীয় প্রসঙ্গ! যে খোলসটা সে পরিত্যাগ করে নূতন কলেবর লাভ করেছে সেই খোলসটা হঠাৎ বাতাসে উড়ে যেন তার পায়ের কাছে এসে পড়লো। সাপের খোলস সাপ নয় সত্য, তবু তো ভীতি জাগায় মনে।

এ প্রসঙ্গ আর কতদূর গড়াতো জানি না, কী তার প্রতিক্রিয়া হতো কে বলতে পারে! এমন সময়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দে দুজনেই চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখল সুমন্তনগরের দিক থেকে দ্রুত ছুটে আসছে এক ঘোড়সওয়ার। অচিরকালের মধ্যে অশ্বারোহী কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে যথোচিত অভিবাদন করে একখানা চিঠি দিল রাজার হাতে। লোকটি বলল, মন্ত্রীর চিঠি।

একনজরে চিঠিখানা পড়ে নিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ছুটলেন রাজপুরীর দিকে, পিছনে পিছনে ছুটলো জরা আর ঘোড়সওয়ারটি।

জরা শুধালো, ব্যাপার কি হে?

কেমন করে জানবো! মন্ত্রীকে তো জানো তিনি ট্যাঁক খোলেন তবু মুখ খোলেন না। প্যাঁটরা থেকে দুটো নিষ্ক বের করবেন তবু পেট থেকে একটা কথা! বাপ রে! যেন মুদ্রার চেয়ে কথার দাম বেশি।

জরা বলল, ভাই, মন্ত্রী বলেই তাঁর কথার দাম বেশি।

তাই বলে ভোরবেলায় এমন করে হয়রান করবেন! চারদিকে মহারাজার সন্ধানে ঘোড়সওয়ার বেরিয়েছে, আমার ভাগ্যে ছিল দেখা পেলাম নইলে আরও ছুটে মরতে হতো।

জরা বুঝলো সংবাদ গুরুতর।

সুমন্তরাজ এসে পৌঁছলে মন্ত্রী নিভৃতে নিবেদন করলো, মহারাজ, নরেন্দ্রনগরের গুপ্তচর ধরা পড়েছে।

রাজা বললেন, এখানে তো বাইরের লোক চোখে পড়ে না!

আজ্ঞে না, ভিতরের লোক দিয়েই কাজ করাচ্ছে।

কারা?

মহারাজ, আহ্লীক ও বাহ্লীক।

বিস্মিত হয়ে রাজা বললেন, আহ্লীক ও বাহ্লিক! বলো কি! ও দুটো তো আহাম্মুখ। প্রমাণ পেয়েছ কিছু?

হাতে হাতে প্রমাণ। ওদের হাতে লেখা চিঠি ধরা পড়েছে।

আচ্ছা, ওদের ডাকো তো।

আহ্লীক ও বাহ্লীক এসে খাড়া হলে রাজা বললেন, তোমরা পুরনো লোক তায় ভিতরের লোক, তোমাদের এই কাজ!

আহ্লীক ও বাহ্লীক অপ্রতিভ হওয়ার লোক নয়, বলল, মহারাজ, এ তো অতি সহজ ব্যাপার। ভিতরের লোক দিয়েই সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়, বাইরের লোক হলে তো চোখে পড়বে।

রাজা গম্ভীরভাবে বললেন, এর দণ্ড কি জানো?

জানি মহারাজ, তবে আমাদের যে চিঠিখানা ধরা পড়েছে তা পড়লেই বুঝতে পারবেন আমরা মহারাজের উপকারী না অপকারী।

মন্ত্রী, কী আছে চিঠিতে?

অনেক কথা মহারাজ।

আহ্লীক বলল, মন্ত্রীমশায়, অনেক কথা আছে, আসল কথা কিছু আছে কি?

পড়ো দেখি, বললেন সুমন্তরাজ।

মন্ত্রী বলল, সমস্তই সংক্ষিপ্ত।

বাহ্লীক বলল, মন্ত্রীমশায়, গুপ্তচরের পত্র তো প্রেমপত্র নয়, ওটা সংক্ষেপেই সারতে হয়।

কী আছে মন্ত্রী?

ওরা লিখছে মহারাজার পায়রা যে লোকটা মেরেছিল আজ কদিন হল সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। আর আছে যে সুমন্তরাজ আক্রমণের আশঙ্কা করেন না, তাই সৈন্য-সংগ্রহে বিরত আছেন।

রাজা বললেন, এ দুটোই তো মিথ্যা সংবাদ।

আহ্লীক বলল, মহারাজ, এই সব মিথ্যা সংবাদ দিয়েই ওদের ভুলিয়ে রেখেছি। আর কেউ হলে ভুল করে হয়তো সত্য সংবাদ দিয়ে বসতো।

তা যেন বুঝলাম, যে সব চিঠি ধরা পড়েনি তাতে কী ছিল জানবো কী করে?

নরেন্দ্রনগর জয় করলে সে-সব হাতে পড়বে, দেখতে পাবেন প্রত্যেক চিঠিতে সত্যের মুণ্ডপাত করেছি।

রাজা শুধালেন, কি রকম?

অনেক রকম মহারাজ।

যথা—

যথা, সুমন্তরাজ পীড়িত, সেনাপতি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন, মন্ত্রীমশায় দাঁতের ব্যথায় কাতর।

মন্ত্রী বলল, এটা তো সত্য।

বাহ্লীক বলল, তাতে যুদ্ধফলের এমন কি ইতরবিশেষ হতো।

তোমরা এমন কেন করতে গেলে?

পাছে আর কেউ স্বর্ণমুদ্রার লোভে সত্য সংবাদ দেয়—তাই আগবাড়িয়ে আমরা রাজী হলাম।

রাজা বললেন, আচ্ছা যাও, এমন কাজ আর করো না।

তখন তারা বলল, মহারাজ, আমাদের আর কিছু নিবেদন আছে—এই বলে উত্তরীয়প্রান্ত থেকে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা তাঁর পায়ের কাছে রাখলো, বলল, পারিতোষিকের এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি মহারাজার যুদ্ধভাণ্ডারের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছি।

রাজা বললেন, ওগুলো তোমরা রাখো।

দুজনে আধ হাত করে জিভ কেটে বলল, পাপের ধন রাখতে নেই মহারাজ—শাস্ত্রে বলেছে।

রাজা হেসে বললেন, আবার শাস্ত্রও পড়েছ দেখছি!

না হলে এ বুদ্ধি যোগালো কেমন করে? বেদে বলেছে—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

মন্ত্রী বলল, বেদ নয় একেবারে বেদান্ত—

তাও পড়া আছে মন্ত্রীমশায়, অন্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ।

সকলে হেসে উঠল। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

তারপরে সেনাপতির ডাক পড়লো।

রাজা বললেন, কেমন, সব তৈরি তো?

হ্যাঁ মহারাজ, আদেশ পেলেই আক্রমণ করি।

না, আমরা আগবাড়িয়ে আক্রমণ করবো না। ওরাই আক্রমণ করুক। আর বোধ করি তার বিলম্ব নেই। সেনাপতি, জরাকে বলবে সে যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে—আমার দেহরক্ষার ভার তার উপরে।

যে আজ্ঞা মহারাজ।

পরামর্শ-সভা ভঙ্গ হওয়ার আগে জরাকে ডাকিয়ে এনে রাজা বললেন, যুদ্ধ বেধে গেল, এখন তোমার প্রধান কর্তব্য হবে আমাকে রক্ষা করা।

॥ ৬ ॥

দু'তিন রাত মদিরা আসেনি। জরার শয্যাকক্ষে জরা অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে, ভেবে পায়নি কেন মদিরা আসছে না। সে দিনও অনেকক্ষণ জেগে থাকবার পরে কেবলই ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় ঠেলা-

ঠেলিতে জেগে উঠলো, শুধালো, কে, মদিরা নাকি ?

মদিরা বলল, এর মধ্যেই ভুলে গেলে ! তবু তো এখনো রানীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি !

জরা সাগ্রহে বলল, এ ক'রাত তোমার জন্যে জেগে কাটিয়েছি, আসনি কেন ?

মদিরা বলল, থাকি রাজার অন্তঃপুরে, ইচ্ছে করলেই কি রাতের বেলায় বেরিয়ে আসা সম্ভব ?

রানীকে দিয়েছিলে সেই হারটা ?

তুমি পাগল হলে জরা ! তোমাকে তো আগেই বলেছি যে বাসুদেবের কৌস্তুভমণির কথা সর্বজনবিদিত। যখন রানী জিজ্ঞাসা করবেন এ হার পেলে কোথায়—কি উত্তর দেব বলো তো ?

তবে নিয়ে গেলে কেন ?

সাবধানে রাখবার জন্যে। তাছাড়া এখানে থাকলে লোকের চোখে পড়তে কতক্ষণ ? আর বেহাত হলেই বা সামলায় কে ?

তবে কি রানীকে দেবে না ?

দেব সময় বুঝে।

সময় বলতে কি বোঝায় ?

বোঝায় এই যে, যখন দেখবো তোমার প্রতি রানীর আসক্তি এত প্রবল হয়েছে যে, আর জিজ্ঞাসা করাবর মত অবস্থা নেই, তখন।

কি করে বুঝবে ?

বোঝা যায় জরা, বোঝা যায়। কি করে প্রথম বুঝেছিলাম যে তুমি আমার উপরে আসক্ত। যার কাছেই যাও না কেন ফিরে আসতেই হবে আমার কাছে। আগে রানীর অবস্থা সেই রকমটি হোক। ওসব বোঝা যে আমাদের ব্যবসায়ের অঙ্গ।

মদিরা যাই বলুক না কেন, যতই বুঝুক না কেন, এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। সংসারে সর্বজ্ঞ বলে কেউ নেই। রাজার দেহরক্ষীরূপে জরাকে প্রথম দেখে মদিরাকে রানী শুধিয়েছিল, লোকটা কে ? তারপরে তার সম্বন্ধে আরও দু-একবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তার সেই কৌতূহলকে প্রণয়ের প্রথম সূচনা মনে করেছিল মদিরা। কামব্যবসায়িনীর চোখ একদিকে যত সজাগ অন্যদিকে তত অন্ধ। নরনারীর মধ্যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না। সেই ধারণার বশেই জরাকে জানিয়েছিল রানীর

প্রণয়ের কথা। তাতে দেখল উল্টো ফল হল—জয়ার মন মদিরার স্থল থেকে সরে গেল রানীর স্থলে। তবে আরও দু-চারদিনের মধ্যে মদিরার ভুল ভাঙলো, প্রণয় বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা গেল না রানীর মনে। তবে যে সেদিন কণ্ঠহার পুরস্কারস্বরূপ পাঠিয়েছিল সেটা রাজকীয় রীতি। মদিরা নিশ্চিন্ত হল, তবে কথাটা ভাঙলে না জরার কাছে, আশাভঙ্গে ক্ষেপে যেতে পারে। আরও ভাবলো, ঐ ভাঁওতা দিয়ে লোকটাকে বানর নাচানো যাক না কেন! মেয়েরা পুরুষকে অকারণ আশার হাতছানি দিয়ে নাচাতে বড় আনন্দ পায়।

এমন সময় কৌস্তুভমণির হারটা বার করলো জরা। এটা আগে দেখেনি মদিরা, এই পর্যন্ত জানতো যে ঘটনাক্রমে বাসুদেবকে হত্যা করে ফেলেছে সে। এখন হারটা হস্তগত করে নিয়ে ভাবলো, বেশ হলো বোকাটা হাতে রইলো। রানীকে দেওয়া যে সম্ভব নয়, দিলে যে জরা আর তার দুজনেরই মহাসঙ্কট বুঝলো, যদিচ জরাকে বোঝালো সময় হলেই রানীর গলায় দুলিয়ে দেবে। জরা সেই আশাতেই আছে, থাকুক; বিধাতা যদি তাকে নির্বোধ করে গড়ে থাকেন সে দায় কি মদিরার!

সম্প্রতি মদিরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো, জরা যেন ক্রমেই তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়ছে, কাছে এলে দূরে সরে যায়, রাজপুরীতে দেখা হলে আগের মত তেমন করে আর চোখে ভাষা চমকে ওঠে না, ঠোঁট কেমন যেন শক্ত। এ সব তো ভাল নয়। মদিরার বুঝতে দেরি হল না যে রানীর প্রণয়ের আশাতেই দাসীর প্রতি অনাগ্রহ। মদিরা প্রেমব্যবসায়িনী হলেও জরাকে সত্যই ভালবাসতো, সে ভালবাসা আবার গাঢ়তর হয়েছিল এই বিদেশে। মহাসমুদ্রে ভাসমান কষ্ঠখণ্ডে উপবিষ্ট মহাশত্রুদ্বয়ও মহামিত্রে পরিণত হয়, বিদেশে দুই প্রণয়ী যে নিকটতর হবে এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার উল্টো হতে চলল। গোড়ায় সে দোষ মদিরার, রানীর প্রণয় সম্বন্ধে ভুল খবর দিয়েছিল। কৌতূহলকে প্রণয় বলে বর্ণনা করেছিল। তারপর বানর নাচানোর অভিপ্রায়ে নিত্যনূতন মিথ্যা সংবাদ দিয়ে যেত। ফল হল এই যে এখন মদিরাই নাচতে শুরু করলো—সে নাচ আর যাই হোক অনাদর নয়। সে স্থির করলো, দাঁড়াও বোকা, এর প্রতিষেধক আমার জানা আছে। সেই ঔষধ নিয়েই আজ এসেছিল।

জরা, বড়ই বিপদ হল দেখছি!

আবার কি বিপদ মদিরা, এখন তুমি রানীর অনুগৃহীতা।

তাই তো ছিলাম, এখন বুঝি রাজারও অনুগৃহীতা হতে হয়।

কিছুই বুঝতে পারলো না জরা, শুধালো, সে আবার কি রকম?

রকম বড় ভাল নয়। রাজার বুঝি চোখ পড়েছে আমার দিকে।

কেন বল তো?

মদিরা দেখল লোকটা একেবারে নিরেট। বলল, পুরুষের চোখ যখন নারীর দিকে পড়ে তখন আবার কেন জিজ্ঞাসা করতে হয়!

রাজা হয়তো তোমাকে অনুগ্রহ করেন।

মদিরা বলে, তার চেয়েও বেশী, আমাকে অনুগৃহীতা করতে চান।

রানী জানেন?

এখনো জানেন না তবে ক্রমে জানবেন।

রাজা মুখে কিছু বলেছেন?

মুখে যা বলেছেন, চোখে বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রেমের যুগল দূত মানুষের চোখ দুটো।

তবু মুখে তো কিছু বলবেন।

বলবেন বই কি। একদিন আড়ালে পেয়ে বলেছিলেন, মদিরা, তুমি খুব সুন্দর।

আর কিছু?

বলেছিলেন, তোমাকে দেখলে নেশা ধরে যায়।

রানী টের পান না?

কেমন করে পাবেন! রানীর সম্মুখে তিনি অন্য লোক, আমাকে দেখেও দেখেন না, চিনেও চেনেন না।

তুমি কিছু বলেছ?

কী বলবো, আমি তো ভয়ে মরি।

কেন?

কেন কি! রানী শুনলে কি করবেন! আর—

থামলে কেন? আর কি?

তুমি শুনলে কি ভাববে!

হুঁ! আর কিছু বলে না জরা, চুপ করে থাকে।

মদিরা বুঝলো, ওষুধ ধরতে শুরু করেছে, এই সময়ে আর দু-এক মাত্রা দেওয়া দরকার। বলল, আজ সন্ধ্যায় নিরিবিলিতে পেয়ে বললেন, মদিরে, আজ মাঝরাতে আমার উপবন বাটিকায় যেয়ো।

চাপা গর্জন করে উঠে জরা বলে গিয়েছিলে?

যাচ্ছি, ভাবলাম যাওয়ার পথে একবার তোমাকে জানিয়ে যাই, বিপদ-আপদ হলে—

তার মুখের কথা শেষ হতে পারলো না, জরা লাফিয়ে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, কখনো যেতে পারবে না।

আমার কি যেতে সাধ, কিন্তু রাজার আদেশ যে!

রাজা নয়, তোমার গুপ্ত প্রণয়ী।

জরা, রাগ করো না, তুমিও তো গুপ্ত প্রণয় চালাচ্ছ রানীর সঙ্গে, অন্ততঃ মনে মনে।

সে আরেক কথা, বলল জরা।

মদিরা মনে মনে ভাবলো পুরুষ বিচিত্র জীব, গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। পারলে রানীর সঙ্গে প্রণয় করে, আবার আমাকেও হাতছাড়া করতে রাজী নয়। মুখে বলল, পাগলামি করো না জরা। রাজা জানতে পারলে তোমার আমার দুজনেরই গর্দান যাবে।

জরা বলল, তুমিও দেখছি যদুবংশের বউগুলোর মত হলে।

কিছু প্রভেদ আছে।

কি প্রভেদ শুনি।

ওদের ওটা বনভোজন, আর আমাদের নিত্যকার ভোজন।

তবে যাও বনভোজন করো গিয়ে। বলে দরজা খুলে মদিরাকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, আর আমার কাছে মুখ দেখিয়ো না।

বাইরে এসে মদিরা হাসিতে ভেঙে পড়লো। একে তো ওষুধ ধরেছে সেই আনন্দে তার উপরে বোকাটার মন এখনো সম্পূর্ণ বিরূপ হয়নি সেই আনন্দে। উল্লাসে বিজয়ে আত্মগৌরবে সমস্ত দেহ তরঙ্গিত করে নিজ কক্ষে এসে শয়ন করলো মদিরা। গবাক্ষপথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। গবাক্ষটা আরও একটু খুলে দিল সে। চাঁদ হাসছে।

গবাক্ষপথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে জরার মুখে। সে চাঁদ কত যুগের কান্নায় মলিন। উঠে গবাক্ষটা বন্ধ করে দিল জরা। চাঁদ কাঁদছে। একই চাঁদ অবস্থাভেদে হাসে কাঁদে।

জরার ঘুম এলো না, সে গবাক্ষপথে আকাশে চাঁদের সংক্রমণ দেখতে দেখতে ভাবছিল। ভাবছিল স্ত্রীলোক জাতটাই অসার। শেষে কিনা মদিরা রাজার সেবাদাসী হয়ে তার বাগানবাড়িতে যেতে শুরু করলো। অথচ তার একবারও মনে পড়লো না যে মদিরা সতীসাধ্বী নয়, সরাসরি পণ্যানারী। একথা জরার চেয়ে বেশী আর কে জানে। মদিরা যদি আজ রাম শ্যাম যদু মধুকে ঘরে আশ্রয় না দিয়ে স্যমন্তনগরের রাজাকে ঘরে আমন্ত্রণ করে কিংবা রাজার বাগানবাড়িতে

আমন্ত্রিত হয় তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, এসব অতি সহজ কথা কিন্তু মানুষের মন সময়বিশেষে এমনই একবগ্‌গা যে আশেপাশের প্রশস্ত পথগুলো দেখতে পায় না সমুখের সংকীর্ণ জটিল পথটা ছাড়া। সে মদিরাকে দোষ দিচ্ছে অথচ মদিরার কথার উপরে বিশ্বাস করেই রানী সীমন্তিনীকে প্রণয়িনীরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। সতী-শিরোমণি সীমন্তিনী রাজপত্নী রাজপ্রেয়সী, তাঁর পক্ষে জরার মতো একটা বিদেশী চোয়াড়কে প্রণয়ীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা যে একেবারেই অসম্ভব একথা বোঝবার মতো বুদ্ধি হতভাগ্য জরার ছিল না। মদিরা তাকে ঐ মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নাচিয়েছিল, সেও নেচেছিল। জরার এই আকাঙ্ক্ষা যদি দোষাবহ না হয়ে থাকে (অন্তত জরার চোখে তাই), তবে মদিরার মতো একটা মেয়ে রাজার ইঙ্গিতে বাগানবাড়িতে গিয়ে যে নিজেকে ধন্য মনে করবে তা অসম্ভব মনে করলে চলবে কেন! অথচ জরার এ কথাটাও মিথ্যা। সুমন্তরাজের রানী ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্তি ছিল না, তিনি যে পত্নীগতপ্রাণ একথা রাজ্যের সবাই জানতো। অনেকে এতটা পত্নী-প্রাণতাকে রাজার পক্ষে বাড়াবাড়ি মনে করতো। সে যাই হোক রাজা ও রানী দুজনেই নিষ্কলুষ কিন্তু মূর্খ জরাকে খেলাবার জন্যে তাদেরই দুজনকে ব্যবহার করেছিল মদিরা, মদিরার অভিসন্ধি নিষ্ফল হয়নি।

মানুষের সুখ-দুঃখ যতই তীব্র হোক অনুভূতির শিখর বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না। জরার দুঃখ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো, অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়লো। যে চাঁদের কৌতুক-অঙ্গুলি মদিরাকে জাগিয়ে রেখেছিল সেই চাঁদেরই সান্ত্বনা-অঙ্গুলি ঘুম পাড়িয়ে দিল জরাকে। এমনি ভাবে দু-তিন রাত ঘুমে জাগরণে গেল। জরা ভেবেছিল যে ইতিমধ্যে মদিরার দেখা পাওয়া যাবে। সে বিস্মিত হয়ে গেল যে রাতের বেলায় দূরে যাক দিনের বেলাতেও মদিরার দেখা মেলেনি। এদিকে রাজবাড়ির লোকে জানতো না যে তাদের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় আছে। কাজেই কারও কাছে মদিরার সন্ধান করতে সাহস হয়নি, বিশেষ সে যখন বর্তমানে রাজার প্রণয়িনী। সে ভেবে পায় না তার ক্রোধের প্রধান লক্ষ্য কে, রাজা, না মদিরা, না সীমন্তিনী। তার ধারণা হলো এই তিনজনে জড়িয়েই তার ক্রোধের লক্ষ্য। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারতো ক্রোধের লক্ষ্য তার আত্মম্ভরিতা। দ্বারকায় থাকতে মদিরার সঙ্গে তার একটু অতিরিক্ত রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিদেশে এসে সেই ক্ষীণ সূত্রটা দৃঢ়তর হয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল সেই দৃঢ় সূত্রে মদিরা চিরকাল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে, আর অবশেষে সে কিনা গেল রাজার বাগানবাড়িতে! ক্রমে তার মনের অবস্থা এমন হলো

যে, সুযোগ পেলে এক বাণে তিনজনকে বিদ্ধ করে ফেলে সমস্ত জ্বালার অবসান ঘটায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যুদ্ধ আসন্ন দেখে রাজা বিশেষ করে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন থেকে জরা যেন সতর্ক হয়ে চলে। কারণ দেহরক্ষী হিসেবে তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। রাজার এই আদেশ মনে পড়ায় সে খুব একচোট হেসে নিল। দেহরক্ষীই বটে! দেহরক্ষায় কাজ উপযুক্ত ভাবেই সে করবে।

দিনের বেলায় রাজসভায় সে যথাস্থানে নীরবে উপস্থিত থাকে, তবে চোখ কান দুই তার এখন সজাগ। সে দেখতে পায় রাজপুরী নিত্যনূতন সৈন্য-সমাগমে পূর্ণতর হয়ে উঠছে; প্রাকারে উঠলে চোখে পড়ে, উপত্যকায় যে সব চাষীর বাড়িঘর, তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে কতক রাজপুরীতে চলে আসছে, কতক দূরতর গ্রামের দিকে চলতে শুরু করেছে। আর রাজার পাশে সর্বদা থাকে বলে অনেক খবর তার কানে আসে। নরেন্দ্রনগরে কত সৈন্য সংগ্রহ হল, তারা কবে নাগাদ আক্রমণ করতে পারে সমস্তই জানতে পায় জরা। ইতিমধ্যে একদিন বিকেলবেলায় অবসরক্ষণে লোকের কাছে সন্ধান করতে করতে রাজার বাগান-বাড়ির দিকে গিয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল যে ছোট্ট একটা ব্যাপার। রাজার যোগ্য তো নয়ই, কোন সাধারণ নাগরিকও যে তাকে আপন বাগান-বাড়ি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করবে না। তাছাড়া দেখে মনে হল বাড়িটা দীর্ঘ-কাল বন্ধ রয়েছে, দরজা-জানলায় মাকড়সা জাল বুনেছে। ভাবল, এ কি! রাতের বেলায় যদি মদিরাকে নিয়ে রাজা এখানে আসে, তবে কি দিনের বেলার মধ্যে মাকড়সা সমস্ত দরজা জানলায় জাল বুনে ফেলে! কিছুই স্থির করতে না পেরে মানুষ অনেক সময়ে যেমন অসম্ভবটাকেই একমাত্র উপায় মনে করে থাকে, জরাও তেমনি করলো। ভাবলো এখানে লুকিয়ে থাকা যাক। রাতের বেলায় যখন ওরা আসবে, দুজনকে এক বাণে বিদ্ধ করে তাদের আলিঙ্গনটাকে চিরস্থায়ী করে দিলেই উচিত দণ্ড হবে। অনেকক্ষণ সে একটা গাছের গুঁড়ির উপরে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো। আরও কতক্ষণ এমনভাবে থাকতো জানি না হঠাৎ রাজবাড়ির দিক থেকে তুরী ভেরী দুন্দুভি একসঙ্গে বেজে উঠে তাকে সজাগ করে দিল। আক্রমণ আসন্ন মনে করে ছুটলো সে রাজবাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে শুনলো আক্রমণ নয়, তবে আক্রমণের সময়ই যাতে সবাইকে সজাগ পাওয়া যায় তারই জন্য এই মহড়া। তখন রাত হয়ে এসেছে। আহারান্তে সে নিজের কক্ষে এসে প্রবেশ করলো।

জরা কেবলই শুয়েছে এমন সময় দরজায় কে টোকা মারলো। জরা উঠে

গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখল সম্মুখে মদিরা। ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠল, কি গো রাজরানী, পথ ভুলে নাকি?

মদিরা বলল, আমাকে ছোট করে দেখো না জরা। রাজার উপপত্নী পত্নীর চেয়েও আদরের।

জরা গর্জন করে উঠল, একথা বলতে লজ্জা করলো না?

অন্ধকারে লজ্জার স্থান আছে কোথায়?

সেদিন চাঁদ আকাশে অনেক উপরে উঠে যাওয়ায় ভিতরে আলো এসে পড়েনি, ঘরটা অন্ধকার ছিল বটে।

তবে না হয় আলো জ্বেলে একবার রাজরানীর মুখখানা দেখি. এই বলে সে বাতি জ্বালালো। বাতি জ্বলবামাত্র ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মদিরা।

কেন, নেভালে কেন?

মদিরা বলল, রাজপ্রেয়সীর মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখতে না পেলেও রাজার আদরের চিহ্ন দেখতে পেতে। সেটা অলঙ্কারের চেয়েও আদরের বস্তু, সকলকে দেখাতে নেই।

জরা অধিকতর ক্রোধে গর্জন করে বলল, জানো, ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি।

নির্বিকার কণ্ঠে মদিরা বলল, তা আর জানি না! তুমি স্বয়ং বাসুদেবকে মেরেছো, আমি তো সামান্য জীব!

তুমি সামান্য জীব! এত বড় রাজার সেবাদাসী! তুমি সামান্য হলে তো সংসারে অসামান্য কেউ থাকে না!

থাকে বৈকি! স্বয়ং বাসুদেবের ভক্ত থাকেন। রাজা ও রানী বাসুদেবের পরম ভক্ত। তোমার কীর্তি প্রকাশ করলে এখনই কি দণ্ড হবে বুঝতে পারো?

আমি যে মেরেছি তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ রাজপ্রেয়সীর বাক্য আর সেই বাসুদেবের কণ্ঠহার কৌস্তুভমণি।

ওঃ শয়তানী! এই মতলব করে তুমি সেটাকে হস্তগত করে রেখেছো!

তবে কি তুমি ভেবেছিলে ওটা আমি রানীকে তোমার হয়ে উপহার দেব?

ক্ষণকালের জন্য দুজনেই নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে জরা শুধালো, রাজার বাগানবাড়িটা তো তেমন সুরম্য অট্টালিকা নয়, ওখানে কি তোমার মতো সুন্দরীকে মানায়?

সেটা দেখে আসা হয়েছে বুঝি? তবে খুলে বলি শোনো। সত্যি আমাকে মানায় না, তাই রাজা আর আমাকে বাগানবাড়িতে না নিয়ে গিয়ে খাস রাজ-

বাড়িতেই উপভোগ করেন।

জরা বিস্ময়ে শুধালো, রানী জানেন ?

আরে মূর্খ! রাজবাড়িতে তো একটা মাত্র ঘর নয়! কত কক্ষ, কত অলিন্দ, কত বলভি আছে, কত দেহলি আছে। একটা মেয়ের সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে তার যে কোন একটা ব্যবহার করলেই হলো, রানী জানবেন কি করে!

বটে! বলে গর্জন করে জরা লাফিয়ে তার হাত ধরতে গেল।

মদিরা চট্ করে সরে দরজার বাইরে এসে বলল, তোমার এত বড় আস্পর্ধা যে রাজপ্রেয়সীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চাও! এমন ভাবে চললে কদিন তোমার মাথাটা থাকবে ভাবছি! এই বলে হাসিতে ও কটাক্ষে বিদ্যুৎস্ফুরণ করে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হল।

জরা কিছুক্ষণ জড়বৎ দাঁড়িয়ে থেকে শয্যায় এসে বসে পড়লো।

মদিরা স্বস্থানে যেতে যেতে ভাবলো, মূর্খটার উপরে ওষুধ ধরেছে। এবারে কাজ আদায় করা সহজ হবে।

মদিরার সমস্তটাই অভিনয়। রাজপ্রেয়সী হওয়া জরার প্রতি রানীর অনুরাগ সমস্তই বানানো কথা। অভিনয়টাই ওর এমন সহজ হয়ে পড়েছে যে কখন সত্য কথা বলে, কখন মুখস্থ-করা ভূমিকা বলে তা কেউ বুঝতে পারে না, অনেক সময় ওর নিজেরই ধাঁধা লাগে। ওর আসল উদ্দেশ্য জরার সহায়তায় জরাকে নিয়ে রাজপুরী পরিত্যাগ করে পলায়ন। পালাবে অবশ্য দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই, তবে এ কাজ তো একক মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সঙ্গী আবশ্যক। এ কাজে জরা আদর্শ সঙ্গী, দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী এবং নির্বোধ। কিন্তু প্রস্তাবটা ওকে খুলে বলতে সাহস হয়নি। জরা এখন রাজভোগে এবং রাজপ্রাসাদে এমনি বিহ্বল যে মদিরার প্রস্তাব তার পক্ষে অসম্ভব। কি করে জরাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা যায় অনেকদিন ভেবেছে মদিরা। অবশেষে স্থির করেছে যে দ্বারকার পুরাতন পরিচয়, প্রেমের গাঢ়তা দিয়ে তাকে এমনি সবশে আনবে যে, বশংবদ জরার দ্বিরুক্তি করার উপায় থাকবে না। প্রেমব্যবসায়িনী মদিরা ভালভাবেই জানে যে পুরুষের প্রেমকে জাগ্রত করতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বীর আবশ্যক হয়। সে প্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তবে না মিললে কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীতেও চলে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী আধা-বাস্তব, আধা-কল্পনা। রাজা বাস্তব তবে তার সঙ্গে জরার সম্পর্ক সম্পূর্ণ কল্পনা। আর রাজা এমনই অসম প্রতিদ্বন্দ্বী যে জরার সাধ্য নেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে টুঁ শব্দটি করে। সমস্ত ব্যাপারটা নীরবে তাকে গুমে গুমে সহ্য করতে হবে। সেই অন্তর্দাহ যখন

চরমে উঠবে তখন এসে উপস্থিত হয়ে আরেক দফা উল্টো প্রেমাভিনয় করে মূঢ়কে কব্জাগত করে নেবে আর দুজনেই সেই রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ করে প্রস্থান করবে। রাজার খাস দেহরক্ষীর পক্ষে নগরের সমস্ত দ্বার দিবারাত্রি অবারিত। মদিরা স্থির করলো লড়াই বেধে উঠবার আগেই আগামীকাল রাত্রেই দুজনে পালাবে।

সে স্থির করলো বটে, কিন্তু স্থির করবার আসল মালিক ঘটনাচক্র। সেই চাকা মদিরা যখন নিজের অনুকূলে ঘোরাবার চেষ্টা করছিল, নিয়তির বিধানে হঠাৎ সে প্রতিকূলে আবর্তিত হয়ে অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিয়ে দিল।

॥ ৭ ॥

সকলেই বুঝতে পারলো যে সুমন্তনগর ও নরেন্দ্রনগরের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে। সুমন্তনগরের সাধারণ লোকে এমন কি ছোটখাটো দোকানীরা পর্যন্ত বোঁচকা-বুঁচকি মাথায় নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে নগর ছেড়ে চললো। সকলেরই মুখে এক কথা—আরে, গাঁও মে চলো। এ হচ্ছে ভারতের চিরাচরিত নীতি। যখনই কোন স্থানে লড়াই শুরু হতে চলেছে, যে পেরেছে আর না পেরেছে সকলেই 'আরে, গাঁও মে চলো' নীতি অনুসারে প্রস্থান করেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আশেপাশের সমস্ত প্রজাসাধারণ 'আরে, গাঁও মে চলো' করেছে। সেই আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত এই নীতি অনুসরণ করতে ভুল করেনি, এখনও করলো না, সুমন্তনগর ছেড়ে সবাই যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করলো।

একদিকে যেমন লোক পালাতে শুরু করলো, তেমনি আবার আসতে শুরু করলো নূতন লোক—এরা সাময়িক ভাবে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনকারী। রাজার বেতনভুক সৈন্যসামান্য, তবে যুদ্ধকালে সৈন্যের কখনো অভাব হত না। সৈন্যের অভাবে যুদ্ধে পরাজয় অল্পই ঘটে থাকে। সারা বছর যারা খেতি বা মজুরী করে, যুদ্ধের আওয়াজ পাওয়া মাত্র মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঢাল সড়কি নিয়ে এসে উপস্থিত হল, বেতন লুঠতরাজের মাল। আর নিতান্তই পালাতে না পেরে যদি মারাই যায় তবে সে সোজা স্বর্গে চলে যাবে, যুদ্ধবাজ শাস্ত্রীরা এই রূপ পাঁতি দিয়েছেন। কাজেই এখন সুমন্তনগরের অবস্থা হল অনেকটা চৌবাচ্চার জলের সমস্যার মতো—দুই নালা দিয়ে জল বেরুচ্ছে, আর দুই নালা দিয়ে প্রবেশ করছে, হরণে-পূরণে সমান।

মদিরা জানত যে এই রকমটি হবে, কারণ মহাপ্লাবনের আশঙ্কায় রাজধানী ছেড়ে লোকে 'গাঁও মে চল' করেছিল। তাছাড়া এ নীতিটা ভারতীয় রক্তের মধ্যে বিধাতা যেন সংক্রামিত করে দিয়েছেন। মদিরা স্থির করেছিল যে এই মওকায় জরাকে সঙ্গী করে 'গাঁও মে চলো' করবে। অর্থাৎ আপাতত সুমন্ত-নগর ছেড়ে যাবে তক্ষশিলায় এবং তারপরে চেষ্টা করবে দ্বারকায় ফিরে যেতে। অবশ্য এ কয়দিন কথায় ও ব্যবহারে তার মনটা বিষাক্ত করে দিয়েছে সত্য, কিন্তু ছলনাময়ী মদিরা জানে যে মেয়েদের কাছে পুরুষ ক্রীড়াকন্দুক, একটু কৌশল অবলম্বন করলে যথেচ্ছ লোফালুফি করা চলে। কৌশলের অভাব কখনো ঘটেনি মদিরার। কিন্তু কোথায় সে গোঁয়ারটা!

গোঁয়ার তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধের আভাসে জরা খুশি হয়ে উঠেছিল, রক্তপাতের লোভ তার রক্তের মধ্যে। এত দিন লুকিয়ে-চুরিয়ে মানুষ মেরেছে, এবারে রাজার হুকুমে প্রকাশ্যে মানুষ মারা। বীরত্বের পরাকাষ্ঠা আর কাকে বলে। যদিচ তার মনটা রাজার উপরে প্রসন্ন ছিল না, তবু যুদ্ধের আয়োজন অপ্রসন্ন মনকে অনেক পরিমাণে প্রসন্ন না করলেও অনুগত করে তুললো। সে মনে মনে স্থির করলো যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাই হোক মদিরাকে উপযুক্ত সাজা দিয়ে, রাজা তার শাসনের অনেক ঊর্ধ্বে, যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাবে, এ রাজ্যে আর নয়। সৈন্যদলের প্রধানরা যেখানে শলা-পরামর্শ করছে তারই কাছাকাছি রইলো সে, তাদের কথা দেখে বুঝতে পারলো আগামীকাল অতি প্রত্যুষে সুমন্ত-নগর আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। গুপ্তচরেরা নরেন্দ্রনগরে গিয়ে যুদ্ধের আয়োজন যে অবস্থায় দেখে এসেছে তাতে তার আগে আক্রমণ সম্ভব নয়। কাজেই সুমন্ত-নগরের রাজা ও সৈন্যপ্রধানগণ সেই ভাবেই প্রস্তুত হতে লাগলেন। এদিকে মদিরা ঘরে-বাইরে জরার সন্ধান করছে, জরা যেখানে মদিরার যাওয়ার উপায় ছিল না সে জায়গায়।

মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রিতে পরিণত হলো, নরেন্দ্রনগর ও সুমন্তনগরের আকাশ ভরে গেল কৌতূহলী তারার দলে, মাঝখানে আসর জমিয়ে খণ্ডিত চাঁদ। চাঁদের আলো এমন নিস্তেজ যে, মানুষ দেখা যায় অথচ চেনা যায় না, অস্ত্র চালানো যায় তবে তার পরিমাণ বুঝতে পারা যায় না, হাত খুব সই থাকলে বাণ দিয়ে লক্ষ্যবিদ্ধ করা অসম্ভব নয়। জরার কর্তব্য গোড়া থেকেই নির্দিষ্ট ছিল, রাজার মহল ঘিরে যে প্রাকার সেখানে তাকে পাহারা দিয়ে সারা রাত জাগতে হবে। ধনুর্বাণ এবং অসি ও বর্মে সজ্জিত হয়ে প্রাকারের উপর টহল দিচ্ছে সে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে, তার সংক্রমণের

আর অন্ত নেই। সুমন্তনগরের উত্তর-পশ্চিমে নরেন্দ্রনগর, সেদিকটায় সতর্ক দৃষ্টি রাখবার আদেশ ছিল তার উপরে। আক্রমণের আভাস মাত্র পেলে তুরিধ্বনি করবে, একটি তুরী তার কোমরে ঝোলানো ছিল। কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না, প্রহরান্তে যামঘোষ তারাও আজ যেন নিস্তব্ধ, কেবল খণ্ড চাঁদ গাছপালা বাড়িঘরে ছায়া দীর্ঘতর করতে করতে পায়ে পায়ে পশ্চিমের দিকে চলেছে। এমন সময় সমস্ত নৈশ নীরবতাকে বহুধাবিভক্ত করে রাজবাড়ির দেউড়ীতে দ্বিপ্রহর বাজলো। সেই শব্দ থামবামাত্র রাজপ্রাসাদের উচ্চতম চূড়ার কোন গর্ত থেকে কালপেঁচা বিকট রবে ডেকে উঠল, কাঁটা দিয়ে উঠলো সমস্ত নীরবতার অঙ্গে। কোথা থেকে কালপেঁচা ডাকলো দেখবার উদ্দেশ্যে কৌতূহলী জরার চোখ পড়লো রাজার অন্দরমহলের ত্রিতলের অলিন্দে। অলিন্দটা অট্টালিকার একেবারে শেষপ্রান্তে, জরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার দূরত্ব দূরতম। জরা দেখতে পেল সেই আলো-আঁধারির মধ্যে বিশাল উন্নতদেহী এক পুরুষ পিছন ফিরে দণ্ডায়মান, বুঝতে পারলো স্বয়ং সুমন্তরাজ। তাঁর ঠিক সম্মুখে আর একজন কেউ দণ্ডায়মান, দুজনে মুখোমুখি, তার বেশী বুঝবার উপায় ছিল না। কে সেই নারী এই উদ্বেগে জরার সমস্ত রক্ত বুকের মধ্যে চনবন করে উঠলো। নিশ্চয় মদিরা।

নিশ্চয় মদিরা নয়, রানী সীমন্তিনী। রাজা ও রানী নিদারুণ যুদ্ধের প্রাক্কালে পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করছে।

রাজা বলছে, সীমন্তী, কালকে যুদ্ধ বড় নিদারুণ হবে বলে আশঙ্কা।

আশঙ্কা কেন মহারাজ? যুদ্ধ করে নিঃশঙ্ক আর শঙ্কার কথা তো কখনো আপনার মুখে শুনিনি।

সত্যি সীমন্তী, আমি কখনো শঙ্কিত হইনি, এবারে কেন যে শঙ্কাতুর বোধ করছি জানি নে!

রানী বললেন, নরেন্দ্রনগরের সঙ্গেই তো কতবার লড়াই হয়েছে, সকল বারেই পরাজয় ঘটেছে তাদের।

যুদ্ধ যে নিদারুণ হবে সেটাও একটা কারণ। বারে বারে যে হারে, একবার জিতবার জন্যে তো সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, তাছাড়া কি জানো, এর আগে যতবার লড়াই হয়েছে, প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা ছিল তার প্রেরণা।

রানী শুধালেন, এবারে?

এবারে প্রেরণা নরেন্দ্ররাজের আত্মাভিমান। তার শখের পোষা পায়রা

আমার অনুচরের বাণে বিদ্ধ হয়ে সভাসদদের সম্মুখে ঠিক তার পায়ের গোড়ায় এসে পড়েছে—এ সহ্য করতে পারে কজন রাজা।

রানী বললেন, সত্যি মহারাজ, রাজারা অদ্ভুত জীব!

সুমন্তরাজ আদরে তার চিবুক স্পর্শ করলেন, রানীরা নয় কি?

না মহারাজ, এ বিষয়ে রাজাদের জিত। তাঁরা একটা পোষা পায়রার প্রাণের জন্যে শত শত প্রজাকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

সুমন্তরাজ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, একটা পোষা পায়রার প্রাণের মূল্য কি কম! শোননি কি যে পুরাকালে শিবিরাজা একটি পাখির বিনিময়ে বুকের মাংস কেটে দিয়েছিলেন!

তিনি নিজের বুকের মাংস কেটে দিয়েছিলেন, নিরীহ প্রজাদের বুকের মাংসে থাবা বসাননি।

রাজা এ কথার উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে রানীর কপোল স্পর্শ করে বললেন, এখন এসব কথা থাক। রাত্রি শেষ হয়ে এলো, এবারে প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দাও।

বিদায় কেন মহারাজ? কতবার তো যুদ্ধে গিয়েছেন। বিদায় শব্দটা তো আপনার মুখ দিয়ে বের হয়নি।

রাজা বললেন, আগেই তো বলেছি এবারে যুদ্ধ বড় নিদারুণ হবে, কে বাঁচবে, কে ফিরবে না, কেমন করে বলবো!

মহারাজ, আপনি কি ভাবেন আপনার বিপদ হলে তার পরেও আমি বেঁচে থাকবো?

রাজা মৃদু হাস্যে বললেন, তুমিও কি যুদ্ধে যাবে নাকি?

না মহারাজ; বিবাহের আগে আমাদের রাজজ্যোতিষী আমার পিতাকে শুনিয়েছিলেন যে আপনার কন্যা স্বয়ংমৃতা হবেন। শুনে পিতা তাঁকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়েছিলেন।

আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেলে আর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতাম।

রাজা সীমন্তিনীকে বাহুপাশে আকৃষ্ট করে চুম্বন করবার জন্যে মুখ নীচু করলেন, রানী সাগ্রহে সানন্দে ওষ্ঠাধর এগিয়ে দিলেন। কিন্তু দুজনের ওষ্ঠাধরের মধ্যে যখন কেশমাত্র ব্যবধান, ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে এক নিদারুণ শর এসে দুজনকে বিদ্ধ করলো, মৃত্যুর স্পর্শে ঘুচে গেল সেই কেশমাত্র ব্যবধান। সমস্বরে বিদ্ধ রাজা-রানীর দেহ একবার মাত্র বিচলিত হয়ে ভূপতিত হল। মৃত্যুতে তাঁদের শেষ আলিঙ্গন চিরন্তন হয়ে থাকলো।

ভোর রাতে সুমন্তনগর আক্রান্ত হল। সুমন্তনগর অবশ্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল যে অপ্রস্তুতের চরম। সুমন্তরাজ কোথায় সকলেরই মুখে এ প্রশ্ন। সেনাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি প্রধানগণ কেউ জানেন না সুমন্তরাজ কোথায় গেলেন। মোট কথা এই যে তিনি অনুপস্থিত। এদেশে রাজা আহত, নিহত বা নিরুদ্দিষ্ট হলে যুদ্ধ তখনই শেষ হয়ে যায়। সৈন্যদল তখনই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে চলে যায় আর প্রজাসাধারণ তো যুদ্ধের আভাস পাওয়া-মাত্র 'গাঁও মে চলো' নীতি অনুসরণ করেছে। কাজেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? বন্দী পুরুরাজ যখন সেকেন্দার শাহর শিবিরে নীত হয়েছিলেন, সৈন্য ও প্রজাদের মধ্যে একজনও তাঁর অনুকূলে একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করেনি। আর ভগ্নউরু দুর্যোধন যখন দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত ছিল, কোথায় ছিল তার প্রজাসাধারণ! যুগে যুগে এদেশে হিন্দু পাঠান মোগল ইংরেজ রাজত্ব করেছে, এ নীতির ব্যতিক্রম হয়নি, এখনও হল না।

রাজ্যের প্রধানদের কেউ ভাবলো রাজা ও রানী নিরুদ্দিষ্ট, কেউ ভাবলো তাঁরা পালিয়েছেন, আবার কারো বা ধারণা হল রাতের বেলায় তাঁরা শত্রু কর্তৃক নিহত হয়েছেন। কারো এ বুদ্ধি হল না যে, একবার অন্দরমহলে ঢুকে দেখে আসি কি হয়েছে, সকলেই পালাবার তালে আছে। রাজাই যখন নেই তখন আর কার জন্য যুদ্ধ করা! যিনি রাজা হন তাঁকেই খাজনা দিতে হবে এবং তিনি রাজোচিত পীড়ন করবেন, কাজেই ভাল-মন্দ বাছাই চেষ্টা নিরর্থক।

ওদিকে নরেন্দ্রনগরের সৈন্যবাহিনী প্রাচীর লঙ্ঘন করে পুরীর মধ্যে ঢুকল, ঢুকে সিংহদরজাগুলি খুলে দিল। তখন আর জনস্রোত প্রবেশে বাধা থাকল না, তারা দেখল যুদ্ধ বলে কিছু হচ্ছে না, সবাই পালাবার তালে আছে। কাজেই তারা তলোয়ার কোষবদ্ধ ও ঢাল পিঠে ন্যস্ত করে আঙরাখার মধ্যে থেকে থলি বের করল। প্রত্যেক সৈন্যের হাতে একটি থলি। এই থলির টানেই তাদের যুদ্ধে আসা, ভাল-মন্দ, ছোট-বড় যার যা চোখে পড়ল ওই থলিতে ভরল। মাঝে মাঝে লুটের মালের ভাগাভাগি নিয়ে দুজনে মারামারি হয় আবার তখনই মিটে যায়, দেখতে দেখতে থলি ভরে ওঠে। তখন সুমন্তনগরের পলায়ন পর সৈনিকদের কাছ থেকে থলি কেড়ে নেয়। তারাও লুটের আশায় থলি সংগ্রহ করে রেখেছিল। এইভাবে অপরাহ্ণ পর্যন্ত একতরফা লুট চলল, সুমন্তনগরে শুধুই এখন নরেন্দ্রনগরের সৈন্যবাহিনী।

পাঠকের বোধ করি আহ্লীক ও বাহ্লীককে মনে আছে। নরেন্দ্রনগরের

প্রধান সেনাপতি তাদের বলে দিয়েছিল যে তারা নরেন্দ্রনগরের অনুকূলে গুপ্তচর-বৃত্তি করেছে, তাদের যেন সমাদর করে নিয়ে আসা হয়। সমাদরের আভাস পাওয়ামাত্র তারা দুজনে পায়ে কাপড় জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল, ভাই, তোমাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে পা দুটোর হেনস্তা হয়েছে। নরেন্দ্রনগর রাজকে অভিবাদন করতে যাওয়ার তো ইচ্ছে, কিন্তু যাই কি করে!

প্রধান সেনাপতি বলল, এর জন্যে আর ভাবনা কি, তোমাদের রথে চাপিয়ে নিয়ে যাব।

ওরা বলল, সেনাপতি মহারাজ, দু-একবার রাজার সঙ্গে রথে চেপেছিলাম, দেখলাম মাথাটা বড্ড ঘোরে। তবে বুঝি আর নরেন্দ্রনগর-রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

সেনাপতি বলল, রথে না চাপো, ঝুড়ি তো আছে।

তখন তার হুকুমে দুজন বলবান সৈন্য দুটো ঝুড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হল, আহ্লীক ও বাহ্লীক ঝুড়ি দুটোয় সমাসীন হয়ে মাথায় চড়ে চলল নরেন্দ্রনগরের দিকে। মাঝখানে এক জায়গায় জলপানের উদ্দেশ্যে সৈন্যরা যেই ঝুড়ি দুটো নামিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার খোঁজে একটু দূরে গিয়েছে, অমনি আহ্লীক ও বাহ্লীক ঝুড়ি থেকে নেমে নিরুদ্দিষ্ট হল। সৈন্য দুজন ফিরে এসে দেখল কোথাও কেউ নেই। তখন তারা নরেন্দ্রনগরে ফিরে গিয়ে এক উপন্যাস রচনা করে জানাল যে, হঠাৎ একদল সুমন্তনগরের সৈন্য এসে তাদের কেড়ে নিয়ে গেল। ওরা দুজন খুব লড়েছিল। কিন্তু হলে কি হয়, অন্যদিকে প্রায় শ' দুই লোক। এই বলে লুটের মাল কাড়াকাড়ি করবার সময় দুজনে গায়ে যে চোট পেয়েছিল সে দাগগুলি দেখিয়ে দিল।

জয়ার কি হল? গতরাত্রে সেই মারাত্মক শরনিক্ষেপের পরে মনে একপ্রকার স্বস্তি অনুভব করেছিল, ভেবেছিল যে অপরাধীর যথোচিত দণ্ড দেওয়া হল। তখন সে ঘরে ফিরে এসে সৈনিকের পরিচ্ছদ খুলে একটু জিরিয়ে নেবার আশায় বিছানায় শোবা মাত্র গত কয়েক রাত্রের অনিদ্রায় ক্ষতিপূরণের তাগিদে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ তার জাগরণ ঘটল প্রচণ্ড এক চপেটাঘাতে। চোখ খুলে দেখে, জন-দুই শত্রুপক্ষের সৈন্য তলোয়ার উঁচিয়ে দণ্ডায়মান।

একজন সৈনিক জিজ্ঞাসা করল, এই বেটা, ঘুমোচ্ছিস কেন?

জয়া কিছু উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, রাতের বেলা তো লোকে ঘুমিয়েই থাকে।

তখন সৈন্যদের আর একজন বলল, তবে এখন ওঠ্। অনেক বেলা হয়েছে।

সৈন্যদের মধ্যে একজন তার গলায় রানীর প্রদত্ত সেই মুক্তোর মালাটি দেখতে পেয়ে 'এ যে বানরের গলায় মুক্তোর মালা' বলে সজোরে টান দিল। অনেকগুলো মুক্তো তার হাতে এল, বাকিগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা যখন সেই মুক্তোগুলি কুড়োচ্ছে, জরা পালিয়ে চলে এলো বাইরের চত্বরে। দেখল, যুদ্ধ অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন লুটের মাল ভাগাভাগির পালা। সে স্থির করল এখানে থেকে আর লাভ নেই। এখন পালানো উচিত। এই উদ্দেশ্যে পূব দিকের সিংহদরজার দিকে যাচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেল, পিছন থেকে কে একজন বলছে, ধর, ধর, ওকে পাকড়াও। জরা পিছন ফিরে দেখল নরেন্দ্রনগরের সেই রাজদূত—যার পাগড়ী সে উড়িয়ে দিয়েছিল।

জরা বলল, আমাকে ধরছ কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

বটে! পাগড়ীটা উড়িয়ে দিয়েছিল কে?

মাথাটাও তো উড়িয়ে দিতে পারতাম।

তাহলে আর ধরবার হুকুম দিতাম না নিশ্চয়।

ইতিমধ্যে জনকয়েক সৈন্য এসে জরাকে বেঁধে ফেলেছে। রাজদূত বলল, একে মেরো না, একেবারে মহারাজের পায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেবে। এ সেই তীরন্দাজ, মহারাজের পোষা পায়রা মেরেছিল যে।

জরা বন্দী হয়ে নরেন্দ্রনগরে নীত হল।

সুমন্তনগর আক্রান্ত হওয়া মাত্র মদিরা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে জরার সন্ধান আরম্ভ করেছিল। না, কোথাও জরা নেই। তার ইচ্ছে ছিল বিপদের সম্মুখে জরা তার পরামর্শ শুনবে এবং দুজনে একত্র পালাবে। কিন্তু জরার বদলে সে একেবারে পড়ল গিয়ে নরেন্দ্রনগরের প্রধান সেনাপতির সম্মুখে। তার আদেশে দুজন সৈন্য গিয়ে মদিরাকে দাঁড় করাল। সেনাপতি জানালেন লুটের মাল হিসেবে সে তার ভাগে পড়েছে। একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে তাকে তক্ষশিলার বাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের সর্ববৃহৎ বাজার তক্ষশিলা। ভারতের বাইরে ও ভারতের মধ্যে নানা দেশ থেকে বিক্রয়ার্থ নরনারী এখানে আনীত হয়। লুটের মালরূপে একবার সে এখানে এসেছিল, আবার এলো। মথুরার এক বণিক তাকে কিনে নিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করলো। তখনো মদিরার কাছে ছিল সেই কৌস্তভমণির হার।

রাত্রি সমাগত হলে নিস্তব্ধ নির্জন সুমন্তনগরে কেবল আহত শৃগাল ও নৈশ পক্ষীর চিৎকার। কয়েক প্রহরের মধ্যে একটা সমৃদ্ধ রাজপুরী যে এমন শ্রীহীন

হয়ে পড়তে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আকাশে খণ্ড চাঁদ ও তারার জ্যোতি ছাড়া কোথাও একবিন্দু আলোকরশ্মি নেই। সকালবেলায় যে স্থান জনবহুল নগরী ছিল, এখন তা প্রেতপুরী। প্রেতপুরীও বোধ করি এমন ভয়াবহ নয়। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের এই যে, এই সর্বাঙ্গীণ ওলটপালটের মধ্যে রাজা ও রানীর কি হল এ প্রশ্ন কারো মনে দেখা দিল না। সকলেই প্রাণ-ভয়ে ভীত, সকলেই পলায়নপর, কে খোঁজ করে রাজা-রানীর! হয় তাঁরা নিরুদ্দিষ্ট, নয় নিহত, নয় আহত এবং হৃতরাজ্য যে সন্দেহ নেই। তাঁদের কাছ থেকে তো আর প্রসাদ পাওয়া যাবে না। অতএব কেন তাঁদের সন্ধান করা।

অন্দরমহলে তেতলার ছাদে জরার শরে বিদ্ধ রাজা-রানীর দেহ তেমনি অসাড় ভাবে পড়েছিল। এতক্ষণ যুদ্ধের হলাহল ছিল তাই আমিষলোভী পশু-পাখিরা সেদিকে অগ্রসর হয়নি। এখন সন্ধ্যাবেলা সমস্ত কোলাহল শান্ত হতেই নিশাচর মাংসভুক পাখি ও শিবা কুকুর প্রভৃতি মাংসভুক পশু সন্তর্পণে সেখানে এসে সমবেত হল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। রাজারানীর দেহের কাছে এগোবার সাহস তাদের হল না। সুমন্তনগরের ভূগর্ভস্থ বিবর থেকে কখন সকলের অজ্ঞাত-সারে বেরিয়ে এসেছে সুমন্তনগরের বাস্তুসাপ। কত তার বয়স কেউ জানে না। কেউ তাকে দেখেনি। তবে সবাই জানে যে সুমন্তনগরের গড় রক্ষা করে সেই বাস্তুদেবতা আছেন। পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘটা করে তাঁর পূজো দেওয়া হয়। এখন সেই মহাসর্প বিবর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এসে ফণাবিস্তারে রাজছত্র উন্মোচিত করে রক্ষা করছে সেই মৃতদেহ দুটি। পশুপাখি কার সাধ্য সেদিকে এগোবে।

॥ ৯ ॥

নরেন্দ্রনগর রাজবাড়ির বিশাল চত্বর লুটের মালে ভর্তি হয়ে গেল। একটা রাজবাড়িতে যেসব মূল্যবান জিনিস থাকা উচিত তার প্রায় সমস্তই আর একটা রাজবাড়িতে এসে পৌঁছেছে, সোনা রূপা হীরে জহরৎ প্রভৃতি ধাতু ও পাথর থেকে আরম্ভ করে তৈজস হাতীর দাঁতের ও নানারকম কাঠের তৈরী শিল্পদ্রব্য; সুতী রেশমী বস্ত্রাদি আছে। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ঢাল তলোয়ার বর্ম চর্ম ইত্যাদি। তাছাড়া বাইরের মহল হাতী ঘোড়া উট ও গাভীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সকলে বিশিষ্ট আওয়াজ তুলে স্বকীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। আরেকটা মহল

ভরে গিয়েছে বন্দীতে। এইসব বন্দীদের কতক রাখা হবে রাজবাড়িতে সাধারণ মজুর রূপে আর অবশিষ্ট তক্ষশিলার বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে বিক্রীত হবে, মুনাফা পৌঁছবে রাজতহবিলে। লুঠতরাজের এটিই প্রকাশ্য বিবরণ। আর অপ্রকাশ্য অংশের কিছু উদাহরণ আগেই দেখা গিয়েছে। মদিরাকে তক্ষশিলার বাজারে বিক্রয় করে যে মোটা মুনাফা লুটেছিল সেটা প্রধান সেনাপতি আত্মসাৎ করেছিল। আর তাছাড়া ছোট বড় সৈনিক এক বা একাধিক থলি পূর্ণ করে যা নিয়েছে তার হিসেব নরেন্দ্রনগরে পৌঁছয়নি।

ওদিকে সুমন্তনগর রাজপুরী ও রাজধানী কঙ্কালটি মাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। সৈন্যরা চলে যেতেই চারদিকের গাঁওয়ার লোক এসে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল লুটে নিয়ে গিয়েছে মায় দরজা-জানলার পাল্লাগুলো অব্দি। এ মূর্তিকে কঙ্কালসার ছাড়া আর কি বলবো জানি না।

অপরপক্ষে নরেন্দ্রনগর রাজপুরী অপ্রত্যাশিত মেদবৃদ্ধিতে এমন স্ফীত হয়ে উঠেছে যে, তার মাংসপেশী দেহের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে খসে পড়ে আর কি। একস্থানে হরণ না হলে আর একস্থানে পূরণ হয় না, হরণে-পূরণে সংসার মোটের উপরে তালরক্ষা করে চলেছে।

নরেন্দ্রনগররাজ বলে উঠলেন, সেই বর্বরটা কোথায় ?

প্রধান সেনাপতি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, মহারাজ, এই যে আপনার পায়ের কাছেই।

রাজা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, সুগঠিত সুঠাম দেহ কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

রাজা বললেন, লোকটা এমন নির্জীব কেন, মারা যাবে নাকি ?

সেনাপতি বলল, এমন আশঙ্কা করবেন না মশাই। ও আসল কলির চর, ভিরকুটি মেরে পড়ে আছে, ছেড়ে দিলেই উঠে পালাবে। তাই না হাত-পা শক্ত করে বেঁধেছি।

রাজা বললেন, কলির চর হোক আর যাই হোক লোকের তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে আগে ওকে কিছু খাইয়ে আনো।

রাজার আদেশে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল লোকটার গর্দান যাবে, তার বদলে কিনা বরযাত্রীর সমাদর ! ভাবলো রাজাগজার মতিগতি আলাদা !

সেনাপতি সাহস সঞ্চয় করে বলল, মহারাজ, লোকটার গর্দান নেওয়ার হুকুম হওয়া উচিত।

রাজা হেসে বললেন, সে হুকুম খাওয়ার পরেও হতে পারে, গর্দান গেলে বোধ করি খাওয়া সম্ভব নয়।

রাজার আদেশ, কাজেই জরার বাঁধন খুলে তাকে পানাহারের জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল।

ইতিমধ্যে রাজা দাঁড়িয়ে সেনাপতি ও অন্যান্য প্রধানদের মুখে যুদ্ধের বিবরণ শুনতে লাগলেন। সমস্ত শুনে রাজা বললেন, সবই তো বুঝলাম কিন্তু সুমন্তরাজা ও রানীর সংবাদ কি, তাদের কথা তো তোমরা কিছু বলছো না!

বলবে কি, তারা কেউ রাজারানীকে চোখে দেখেনি, অথচ কিছু একটা না বললে রাজসম্মান রক্ষিত হয় না তাই প্রধান সেনাপতি বলল, মহারাজ, যুদ্ধ-সূচনার আগেই তাঁরা গোপন সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গিয়েছেন।

তোমাদের উচিত ছিল আগে থেকেই সুড়ঙ্গের মুখে লোক রেখে দেওয়া।

কেমন করে জানবো মহারাজ! মহারাজার হয়ে কত লড়াই করেছি, কখনো কোন রাজাকে যুদ্ধের সূচনাতেই পালিয়ে যেতে দেখিনি।

রাজা বললেন, এর পরিণাম কি জানো? যুদ্ধ শেষ হয়েও শেষ হল না। সুমন্তরাজ যুদ্ধের জের টেনে আবার ফিরে আসবেন।

সে কি কথা মহারাজ! রাজপুরী গেল, রাজধানী গেল, যুদ্ধ করবেন কি নিয়ে?

তুমি বলছো অনেক লড়াই করেছো, কিন্তু লড়াইয়ের কিছুই শেখোনি। যে দেশে রাজার জীবনমরণের উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় হয়ে থাকে, সে দেশে পরাজিত রাজা যদি একটা দেওদার গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, অমনি কাতারে কাতারে প্রজা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। জল অত্যন্ত কোমল, কিন্তু সেই জলের ধারাতেই কালক্রমে পাহাড় ভিন্ন হয়ে যায়। এদেশের রাজ্যব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল বলেই অত্যন্ত দৃঢ়। যাক, অনেক লড়াই ফতে করেও যখন এসব কথা বোঝনি এখনও বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না।

উপস্থিত সকলে অনুমোদনসূচক মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল মহারাজা যখন বলছেন তখন অবশ্যই বুঝতে পারবো না। রাজার কাছে চিরনাবালক সেজে থাকলে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়।

এমন সময়ে দুজন সৈনিক জরাকে নিয়ে প্রবেশ করলো।

কি হে, তোমাকে খেতে দিয়েছে, না তোমার নাম করে ভাঁড়ার থেকে খাদ্য নিয়ে এসে নিজেরাই খেয়েছে! এরা সব পারে।

জরা জানালো, মহারাজের কৃপায় পানাহারের ত্রুটি হয়নি।

এবারে রাজার সঙ্গে জরার কথোপকথন শুরু হল।

তুমিই সেদিন আমার পোষা পায়রাটাকে তীর দিয়ে মেরে আমার পায়ের কাছে ফেলেছিলে?

হ্যাঁ মহারাজ, সে অপরাধ স্বীকার করছি। এর আগে কখনো পোষা পশুপাখি মারিনি।

তবে সেদিন কেন মারতে গেলে?

জরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

নরেন্দ্রনগররাজ বুঝলেন যে সুমন্তনগররাজার হুকুমেই কাজটা করেছিল। প্রভুর উপরে দোষ দিতে চায় না তাই নীরবতা অবলম্বন করেছে। মনে মনে খুশী হলেন। বুঝলেন যে লোকটা পাথরের চাঙড়ের মধ্যে সোনা, নিষ্কাশিত করে নিতে পারলে খাঁটিরূপে দেখতে পাওয়া যাবে। আপাততঃ সেই ইচ্ছা স্থগিত রেখে শুধালেন, তীরধনুকে তোমার হাত এমন সই হল কি করে?

মহারাজ, বাল্যকাল থেকে তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে ঘুরছি। জন্তু-জানোয়ার মারতে মারতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

জন্তু-জানোয়ার তো মেরেছো স্বীকার করলে, সবাই অমন মেরে থাকে। ওটা তীরধনুকের স্বভাব। হাতে পড়লে কাউকে না কাউকে মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাপু, সত্যি কথা বলো দেখি, সব সেরা জন্তু কটা মেরেছো?

ইঙ্গিতটা বুঝতে না পেরে জরা রাজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বলি, কটা মানুষ মেরেছো?

ওই একটি ছোট্ট প্রশ্নে জরার মেরুদণ্ডের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে গেল। যে কথা আজ মাসখানেক সুমন্তনগরে থাকাকালে রাজভোগের তলে চাপা পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ শুষ্ক উত্তুরে হাওয়ায় তা বেরিয়ে পড়ে তার অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করলো জরার দিকে।

জরার মুখ শুকিয়ে গেল। তার গা কাঁপতে লাগল। সে প্রায় অবসন্ন হয়ে বসে পড়বার মত হল। রাজা বুঝলেন লোকটা নিতান্তই শিকারে শিক্ষানবীশী, কখনও মানুষ মারেনি তাই এই ইঙ্গিতে এমন হতবুদ্ধি হয়েছে। আরও বুঝলেন যে লোকটার দীর্ঘ বিশ্রাম আবশ্যক। একজন অনুচরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

সে যখন অনুচরের সঙ্গে যেতে উদ্যত রাজা বললেন, হ্যাঁ হে বাপু, তোমার নামটা কি?

নির্বোধ জরা এতক্ষণ পরে একটা বুদ্ধির কাজ করলো, স্বনামের স্থানে

জানালো, মহারাজ, আমার নাম রাজা।

নিতান্ত মিথ্যা ও জানায়নি, কারণ খট্টাস তাকে রাজা পদবী দান করেছিল।

রাজা হেসে বললেন, এই ত্যাখো মন্ত্রী, কার কি রকম ভাগ্য! তুমি পঞ্চাশ বছর রাজার পাশে থেকেও মন্ত্রীর বেশী হতে পারলে না, আর আমি কত যুদ্ধ-হাঙ্গামা কত নররক্তপাত করে তবে রাজা। আর এই নিরীহ লোকটা যে সেরা জন্তু মারার ইঙ্গিতেই কাঁপতে শুরু করেছিল, সে হল কিনা রাজা। ভাগ্য আর কাকে বলে! যাও রাজা, এখন বিশ্রাম করোগে। এখন এক রাজ্যে দুই রাজা হল, শেষ পর্যন্ত রানীর ভাগাভাগির ব্যাপারে রাজপণ্ডিতের শ্বারস্থ না হতে হয়!

এই বলে তিনি হেসে উঠলেন, হাসলে রাজার বয়স দশ-বিশ বৎসর কমে যায়। হাসলে যার বয়স বেশি বলে মনে হয়, সেই লোককে কেউ যেন কখনো বিশ্বাস না করে।

ওই একটুখানি রাজ-অনুগ্রহ লাভ করলো জরা, তাতেই তার কাল হল। রাজঅনুচরগণ পছন্দ করে না যে তারা ছাড়া আর কেউ রাজানুগ্রহের ভাগী হয়। তারা মনে মনে স্থির করলো মহারাজার তো শুধু দুটি চোখ, আমাদের সকলে মিলে হাজার চোখ—সহস্রাক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ তো হুকুম দিয়েই খালাস, তারপরে ও হুকুমের কি অর্থ হয় সে দেখবার ভার আমাদের উপরে। অতএব 'রাজা'র রাজগী ভাল করেই চালাবো। জরাকে আহার ও বিশ্রামের নামে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে জানালো, দেখো বাপু, আমরা যা দিই তাই খাবে, যা বলি তাই করবে, যেখানে থাকতে বলি সেখানে থাকবে। কোন সুযোগে এসব কথা যদি রাজার কানে তোল তবে প্রাণ বাঁচাতে পারবে না, এই কথা বেশ করে মনে রেখো। প্রাণে বেঁচে গিয়েছে এই আনন্দে জরা বলল, আপনারাই এখন আমার কাছে রাজা-মহারাজা, আপনাদের ইচ্ছাই আদেশ, আমি দিনান্তে দুটি খেতে পেলেই মনে করবো যথেষ্ট হল।

তারা বলল, এই তো ভালোমানুষের মতো কথা। মনে থাকে যেন।

তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিল এবং আহারান্তে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে বলল, এখন বিশ্রাম করো। অতঃপর কি করতে হবে তাও স্থির করে ফেলেছিল রাজ-অনুচরগণ।

এখানে নরেন্দ্রনগর রাজধানীর একটু ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

একটা উঁচু পাহাড়ের মাথা চেঁচে সমতল করে ফেলে মস্ত জায়গাটা পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিয়ে নরেন্দ্রনগর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত। সমতল জমি থেকে

রাজধানীতে পৌঁছবার একটিমাত্র আঁকাবাঁকা পথ, যেমন পাহাড়ে হয়ে থাকে আর কি। সে পথ সঙ্কীর্ণ আর খাড়া, আর তার উপরে আবার মাঝে মাঝে তোরণ তুলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। শত্রুসৈন্যকে আসতে হলে পাহাড়ের গা বেয়ে আসতে হবে, এ পথ বেয়ে আসবার উপায় নেই। এ পথে কেবল রাজবাড়ির লোকেরা চলাচল করে। পাহাড়টার নিচে চারদিকে সমতল জমি, সেখানে গম ও ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। দূরে-অদূরে ছোট-বড় অনেকগুলো পাহাড় আছে, মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি ফসলের পরিণতি অনুসারে রং বদলায়। যে উপত্যকাটা একটু বিস্তৃত তাতে ছোট একটি পাহাড়ী নদী খরস্রুতি, বর্ষায় জল নামলে নদীটার দুই কূলের অনেকটা জায়গা অধিকার করে নেয়, অন্য সময়ে নদীগর্ভে বালুতে জলে ভাগাভাগি, বালুর ভাগটা বেশী। খরস্রুতির ধারে ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম আছে, স্থানীয় লোকেরা বলে পাথরভাঙ্গা গ্রাম। এই নামকরণ মিথ্যা নয় কারণ পাথর ভেঙে গ্রামটা তৈরী। বাড়ি-ঘরেও পাহাড়ের দেওয়াল, পাতলা পাথরের টালির ছাদ। অধিবাসীরাও পাহাড়ের সন্তান, পাথুরে তাদের গায়ের রং।

রাজধানীতে একটা নূতন মন্দির তৈরী হচ্ছে। ঐ অত নীচে থেকে পাথর কেটে বয়ে নিয়ে আসে মজুরের দল। এই সব মজুর স্বাধীন, বেতনভুক নয়। মাঝে মাঝে লড়াই হয়ে যেসব লোককে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়, তাদের উপরেই এই শ্রমসাধ্য কার্যের ভার। তা নইলে দৈনিক একটা-দুটো পয়সা বা একমুঠো গমের জন্যে কে আসবে খাড়া পাহাড়ে ভারী পাথর মাথায় করে বয়ে আনবার জন্যে! এইসব মজুর দিনে বার-দুই খেতে পায় আর সন্ধ্যা হলে লম্বা একটা পাথরের ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে তাদের বন্ধ করে রাখা হয়। তাদের পরনে একটুকরো কাপড়, সারা অঙ্গে আর কোন আবরণ নেই, কেবল গলায় সুতো দিয়ে একটা লোহার তক্তি ঝুলানো, তার উপরে একটা সংখ্যা খোদাই করা আছে। ওটাই তার একমাত্র পরিচয়। কেউ মরলে সংখ্যাটা শূন্য হয়। নূতন লোক এসে আবার তা পূর্ণ করে তোলে। আর তাদের প্রত্যেকের পায়ে ঢিলে করে বেড়ি পরানো, হাঁটতে পারে তবে দূরপাল্লায় পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই রকম চার-পাঁচশো মজুর সকালে উঠে কাজ আরম্ভ করে, তাদের তদারকিতে থাকে বিশ-পঁচিশজন বেতনভুক রাজপেয়াদা, যাদের প্রত্যেকের হাতে লম্বা একখানা করে চাবুক। এই চাবুকের সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগ ঘটেনি এমন মজুর বিরল। রাজ-অনুচররা স্থির করলো জয়াকে এই মজুরের দলে ভর্তি করে দিতে হবে।

পরদিন প্রত্যুষে জরাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পাহাড়তলীতে নিয়ে যাওয়া হল, পরিয়ে দেওয়া হল মজুরের পোশাক, গলায় তক্তি, পায়ে বেড়ি আর হুকুম হল সবাই যেমন কাজ করছে তেমনি করতে থাকো। বিস্তারিত বলার আবশ্যক ছিল না। জরা দেখল সবাই শাবল দিয়ে পাথর ভাঙছে আর মাথায় তুলে নিয়ে রাজধানীর দিকে চলেছে। জরা নিঃশব্দে সেই কাজে প্রবৃত্ত হল। কোন মজুর পাহাড়তলী থেকে রাজধানী পর্যন্ত পাথর বয়ে নিয়ে যেত না, কারণ খাড়া পাহাড় বেয়ে কোন একজনের পক্ষে রাজধানীতে পৌঁছনো সম্ভব নয়, পাথরখানা দু-তিন মাথা বদল হয়ে উপরে এসে পৌঁছতো। জরা নীচের দিকেই রইলো, কাজেই কোনরকমে যে রাজার চোখে পড়বেই এমন সম্ভাবনা থাকলো না। 'রাজা'র নূতন রাজগী দেখে রাজানুচরগণ খুশী হয়ে নগরে ফিরে এল। তার আগে জরার উপরে তদারকির ভার চালু করে তাকে ইশারায় জানিয়ে দিল একটু চোখ রেখো। সুমন্তনগরে এসেছিল রাজার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী, নরেন্দ্রনগরে হল পাথর-ভাঙা মজুর। জরার কপাল বড় মন্দ নয়।

দুঃখের পাঠশালায় মধ্যাহ্ন তন্দ্রা ভেঙে জীবনপণ্ডিত আবার জেগে উঠেছে, খোঁজ করছে সেই লিকলিকে লম্বা বেতগাছা গেল কোথায়। না, হাতের কাছেই আছে। কিন্তু পড়ুয়ারা এই সুযোগে পাঠশালা ছেড়ে বের হয়ে আমবাগানের ছায়ায় হুটোপুটি খেলা আরম্ভ করেছিল। হঠাৎ গুরুমশায়ের নাসিকা গর্জন নিস্তব্ধ হতে তারা ভালোমানুষের মতো ফিরে এসে যে যার জায়গায় বসে পুঁথিতে গভীর মনোযোগের ভান করতে শুরু করেছে। কিন্তু জীবনপণ্ডিতকে ভোলানো অত সহজ নয়। সারাটা জন্ম তার কেটে গেল দুঃখের পাঠশালায় ছাত্র পড়াতে।

এই রূপকের অর্থ আর কিছুই নয় জীবনপণ্ডিতের অকালনিদ্রার সুযোগে জরা মনে করেছিল বুঝি তার দুঃখের পাঠশালার পালা শেষ হল। মাস দুই কাল ছিল সে সুমন্তনগরে। সেখানকার সাময়িক রাজভোগকেই তখন মনে হয়েছিল চিরন্তন। বাসুদেবকে হত্যার পর থেকে ক'মাসের দুঃখ আর তারও আগে ব্যাধজীবনের দীর্ঘায়িত অভাব ও কষ্ট সমস্তই স্বভাবের ব্যতিক্রম বলে তার মনে হয়েছিল। ভেবেছিল সুমন্তনগরের পর্বটাই সত্য আর স্থায়ী, ভবিষ্যৎ বলে যে একটা কাল আছে আর সে কাল যে এমন সুখদায়ক না হতেও পারে ক্ষণেকের জন্যেও এমন মনে হয়নি। বর্তমান যখন ভূত-ভবিষ্যৎকে ভুলিয়ে দেয় বুঝতে হবে তখন মতিচ্ছন্ন হতে আর বাকি নেই। বর্তমান একটি কাল্পনিক রেখামাত্র। সমস্তটাই হয় অতীত, নয় ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ বর্তমানের মুখোশ পরে আসে বলে তাকে

সব সময়ে বুঝতে পারা যায় না। জরাও বুঝতে পারেনি। আরম্ভ হল আবার জরার দুঃখের জীবন। জরা বনে বনে শিকার করে বেড়াত, সেটাও সুখের জীবন নয় তবে তাতে স্বাধীনতা ছিল আর এমন শিরদাঁড়া টনটন করতো না। পাথরের চাঙড়গুলো যখন মাথায় চাপিয়ে দেয় আর তদ্বিরকারকের ইঙ্গিতে সর্বদা বেশী ভারীখানাই চাপিয়ে দেয়, টন্‌টন্ করে ওঠে সমস্ত শিরদাঁড়াটা। তার উপরে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠবার অভ্যাস তার কোথায়। সমতলভূমির অধিবাসী সে। পাথরের চাঙড় মাথায় করে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে প্রথম প্রথম তার মাথা ঘুরে যেত, পা টলতো, ঠিক সেই মুহূর্তে কড়া চাবুকখানা পড়তো এসে পিঠের উপরে। রাগ হত, দুঃখ হত, নিজের প্রতি ধিক্কার হত, আর রাগে দুঃখে ধিক্কারে জল দেখা দিত দুই চোখে। সে জল তদ্বিরকারকের চোখে পড়লে কঠিন ব্যঙ্গস্বরে শুনতে পেত—আবার কান্না হচ্ছে! আহা মহারাজ রাজার চোখের জলটি দেখতে পেলেন না। জরা টাল সামলে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। কখনো বা শুনতে পায়—মহারাজ দুটো মিষ্টি কথা বলেছিলেন আর ভেবেছিল আকাশের চাঁদ হাতে মিললো। নে ওঠ্, পাথরখানা পড়ে যদি ভাঙে তবে আর মাথা আস্ত থাকবে না।

জীবনপণ্ডিত জেগে উঠে জরার শাস্তিবিধানে মনোযোগ দিয়েছেন।

একদিন নরেন্দ্রনগররাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে, সেই রাজাকে তো দেখছি নে। তাকে নিয়ে এসো, লোকটার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে, দেশবিদেশের খবর রাখে।

অমাত্যদের একজন বললো, মহারাজ, সে লোকটা আস্ত কলির চর ছিল।

রাজা বললেন, বাসুদেবের মৃত্যুর পরে কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে, এখন আমরা সকলেই কলির চর।

অমাত্য বলল, মহারাজ যথার্থ বলেছেন, কিন্তু লোকটা পালিয়েছে।

পালাবে কেমন করে? রাজপুরী থেকে পালানো তো সহজ নয়!

তবে আর কলির চর বলছি কেন মহারাজ! আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো লোকটা।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, হয় তোমরা সবাই অন্ধ, নয় চোখ বুজে ছিলে।

অমাত্য রাজাকে খুশী করবার উদ্দেশ্যে বলল, সে কি কথা মহারাজ। মহারাজই আমাদের চোখ কান নাক মুখ পঞ্চেন্দ্রিয়।

তাই যদি হয় তবে তোমাদের টাকা দিয়ে রাখাটাই বৃথা। হয় লোকটাকে এনে হাজির করো, নয় কার দোষে পালালো আমাকে জানাও।

অমাত্য ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বলল, যে আজ্ঞে মহাশয়, এখনই আসামীকে হাজির করে দিচ্ছি। এই বলে সে দ্রুত প্রস্থান করল।

নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ না হলে কেউ নিখুঁত রাজামাত্য হতে পারে না। এ লোকটি মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ছিল, সে জানতো যে আর দশটা জরুরী কাজের মধ্যে রাজা এমন ব্যস্ত থাকবেন যে কিছুকাল আর জরার কথা তাঁর মনে পড়বে না। তারপর যখন মনে পড়বে তখন ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। যাহোক একটা কিছু বোঝালে চলবে। আপাততঃ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করা যাকগে।

॥ ১০ ॥

সংসার যদি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় হত তবে একরকম মন্দ ছিল না কারণ দুঃখের অনুভূতিই হত না। সুখ সম্বন্ধেও সেই কথা। সুখ-দুঃখের যুগলতন্তুতে সংসারটা বোনা বলেই খেলা এমন হয়ে ওঠে। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বুক চাপড়ায় আর এই দোরোখা বসনটি যিনি বুনেছেন তিনি উপর থেকে নির্বিকার ভাবে দেখেন।

জরার পরিশ্রম ও দুঃখ একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ছিল বললে ভুল হবে। রাজার জন্মদিন, রানীর জন্মদিন, নানারকম তিথিপার্বণ প্রভৃতি উপলক্ষে মজুরদের কাজ বন্ধ থাকত। সেদিন তাদের ছুটি, তবে ছুটে পালাবার উপায় নেই। কেননা পায়ের বেড়ি কোন উপলক্ষেই খোলা হত না, তবে লাভের মধ্যে এই যে হাড়-ভাঙা খাটুনিতে বিরাম আর কাছেভিতে ঘোরাফেরা করবার আরাম। এই রকম একটা ছুটি উপলক্ষে জরা ঘুরতে ঘুরতে পাথরভাঙা গ্রামটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সমতল দেশের অধিবাসীর চোখে এ রকম ঘরবাড়ি আগে পড়েনি। দেয়ালগুলো পাথরের আবার ছাদের ছাউনিটাও পাতলা করে কাটা পাথরের টালির, গবাক্ষ বলতে কিছু নেই, দরজা সরল গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী। এই রকম গায়ে গায়ে বাড়ি চলেছে এমন বিশ-পঁচিশখানি বাড়ি নিয়ে এই পাথর-ভাঙা গ্রাম। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ছোট একটুকরো আঙিনা।

হাঁটুজল খরস্রুতি নদী পার হয়ে জরা এই রকম একটা বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, দেখতে পেল বাড়ির উঠোনে পাথরের উদূখলে কাঠের মুষল দিয়ে গম ভাঙছে একটি অল্প বয়সের মেয়ে। আর বছর দুই-তিনেকের একটি ছেলে আঙিনার মধ্যে টলমল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লান্ত হলে এসে উদূখলটা ধরে সামলে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে—যেন একটা মস্ত বাহাদুরি

করা হল। মা তার মুখে গোটাকয়েক ভুট্টার খই পুরে দিচ্ছে, ছেলেটা খুশী হয়ে আবার টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে অন্য দিকে যাচ্ছে।

একখণ্ড পাথরের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে জরা এই দৃশ্যটি দেখল। হঠাৎ তার বুকের ভিতর থেকে অনেক কালের চাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আর সেই সঙ্গে হাঁটুর উপরে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল চোখ থেকে। চমকে উঠল জরা। অনেক—অনেক কাল সে কাঁদেনি। অনেক—অনেক কাল সে এমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেনি। হঠাৎ এমন হতে গেল কেন বুঝতে পারল না। নিজের মন বিশ্লেষণ করবার শক্তি যদি থাকত তবে বুঝত সম্মুখের এই দৃশ্যের মধ্যে চমক মেরে যাচ্ছে আর এক দৃশ্য, অবশ্য ছেলেটির অস্তিত্ব সম্ভাবনার মধ্যে। তারও একটি এই রকম বাড়ি ছিল, এমন পাহাড়ের পারে নয় বটে, তবে তার চেয়েও ভাল, সমুদ্রের ধারে। পাহাড় চিরকাল একরকম, নিত্যনূতন সমুদ্র। ওই বধূটির মত তারও পত্নী ছিল। সে এমনি ভাবেই গৃহস্থালীর কার্য করত জরা যখন বনে বনে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় বরা কিংবা হরিণ মেরে নিয়ে এসে ধপ করে উঠোনের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলত, দেখ জরতী কি এনেছি। জরতী মনে মনে খুশী হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করত না। বলত, বেশ করেছ, এখন স্নান করে এসে খাও। যেদিন সময় থাকত সমুদ্রে গিয়ে স্নান করে আসত, নইলে বাড়ির কাছের একটা খাড়িতে।

এক দিনের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে। জরতী বলেছিল, প্রত্যেক দিন হরিণ আর বরা ভাল লাগে না, একটা নতুন কিছু খাওয়াতে পার?

জরা বলেছিল, দাঁড়া, তোকে একদিন রাজমাংস খাওয়াব।

জরতী বলল, রাজহাঁস পর্যন্ত জানি, রাজমাংস আবার কি গো? তুমি কি শেষে রাজাকে মারবে নাকি?

যদিই বা মারি, ক্ষতি কি?

ক্ষতি আর কি? শূলে যাবে।

এবারে জরা বলল, আরে না না, তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা নয় গো। তুমি কোনদিন শিকারে গিয়ে রাজাগজা হত্যা করে ফেলবে, আর সবসুদ্ধ আমাদের মরতে হবে শূলের উপরে।

জরা বলল, দূর পাগলী! বনের মধ্যে রাজাগজা আসতে যাবে কেন?

তা কি বলা যায়? রাজাগজাদের মতিগতিই আলাদা।

তা যদি রাজবাড়ি ছেড়ে তারা বনের মধ্যে এসে শুয়ে থাকে, তবে মরবে।

নদীর স্রোতে অসহায় নৌকোখানার মত তার মন চিন্তাস্রোতে হঠাৎ

চোরাপাহাড়ে এসে গুঁতো মারল। প্রথমেই মনে হল বিপদটা গুরুতর নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, গলগল করে জল উঠছে, বেশীক্ষণ আর সামাল দেওয়া যাবে না নৌকোটাকে। নৌকোয় চাপা, রশি খোলা, স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেওয়া এ সমস্তই কখন তার অগোচরে ঘটে গিয়েছে। চোখে যখন দেখছিল সম্মুখের এই শিশু ও জননীকে, মন তখন ভিতরে ভিতরে আর একটি দৃশ্যকে অনুসরণ করছিল। সেই দৃশ্যের জের ঠেলতে ঠেলতে ফেলল এনে তাকে চোরাপাথরের উপরে। এখন নৌকো সামলায় কে! মানুষের মন চলে দাবার ছকের ঘোড়ার মত। এও সেই সংসারের সুখ-দুঃখে বুননের আর একটি নমুনা। সুখের দৃশ্য হঠাৎ তাকে এনে ফেলল দুঃখের ডুবজলের মধ্যে। জরা যদি বিশ্লেষণপরায়ণ হত তবে বুঝত জীবনপণ্ডিতের দুঃখের পাঠশালায় এও একরকম দণ্ড। কাউকে দণ্ড লাঠি দিয়ে, কাউকে দণ্ড ভালো ছেলেদের দেখিয়ে তুলনায় নিজের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়ে দিয়ে। কাউকে দণ্ড স্মৃতির চাবুকে, কাউকে দণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে। এতরকম ভাবে সাজা দিতেও জানে জীবনপণ্ডিত।

এবারে শিশুটি টলতে টলতে জরার কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল, ভেবেছিল, বাবা, এ যে নূতন লোক। তার কান্নায় মায়ের চোখ পড়ল জরার দিকে, শুধালো, তুমি বুঝি রাজবাড়ির মজুর?

কি করে বুঝলে? শুধালো জরা।

মেয়েটি নীরবে তার পায়ের বেড়ির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

পরিচিত বেড়িজোড়া নতুন করে দেখে জরা লজ্জিত হল।

মেয়েটি বলল, নিত্য দেখি কিনা, বেড়ি পায়ে মজুররা পাথর কাটছে। কখনও আবার এদিকেও আসে। তোমাকে নতুন দেখছি।

জরা বলল, হ্যাঁ, আমি অল্পদিন হল এখানে এসেছি।

বুঝেছি, তোমাকে সুমন্তনগর থেকে বন্দী করে এনেছে, তাই না?

জরা বলল, তাই বটে।

কিন্তু, তোমাকে তো আমাদের এদেশী লোক বলে মনে হয় না।

কি করে জানলে?

এদেশী লোকের মুখ-চোখ, আচার-ব্যাভার সব জানি কিনা।

জরা বলল, না, সত্যিই আমি এদেশের লোক নই।

কোথায় তোমার বাড়ি গা?

সে অনেক দূরদেশে। নাম বললে চিনতে পারবে না।

মেয়েটি তক্ষশিলার হাটে বারকয়েক গিয়েছে। অনেক দূরদেশে শুনে বলল, তক্ষশিলায় নাকি?

না। আরও অনেক অনেক দক্ষিণে। একেবারে সমুদ্রের ধারে।

ও মা, সে যে অনেকদূর! বলে হাতের মূষল রেখে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ চালাচ্ছিল।

হ্যাঁ, অনেক দূরই বটে।

তবে এখানে এলে কি করে?

জরা অনেকটা আপনমনেই বলল, পাপ করেছিলাম, তার সাজা পেতে হবে তো।

মেয়েটি এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শোনেনি। পাপই বা কি, আর তার সাজাই বা কেন, কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাল জরার মুখের দিকে। জরা বুঝল মেয়েটিকে আবার বলা দরকার। সে বলল, পাপের সাজা ভোগ করছি।

সে শুধালো, পাপ কাকে বলে?

এবারে মেয়েটির প্রশ্ন শুনে জরার অবাক হবার পালা। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। জরার দোষ দেওয়া যায় না। যে প্রশ্নের সদুত্তর সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করলে পাওয়া যায় না অবোধ জরা তার কি উত্তর দেবে? তবু একবার বোঝাতে চেষ্টা করা উচিত, তাই সে বলল, ধর কেউ কাউকে মারল, সেটাই পাপ।

কেন, পাপ হতে যাবে কেন? আমি আমার ছেলেটাকে দরকার হলে মারি, আবার লোকটা কখনও কখনও মাতাল হয়ে এসে আমাকে মারে, আবার গাঁয়ের লোকেরা পরবের দিনে মদ খেয়ে মারামারি করে মাথা ফাটায়। এ তো নিত্যিকার ব্যাপার। একে বুঝি তোমাদের দেশে পাপ বলে?

জরা দেখল, না, মারামারির উদাহরণ দিয়ে সুবিধে হবে না। তাই এবারে নতুন দৃষ্টান্ত গ্রহণ করল, বলল, ধর কেউ এমন কাজ করল যাতে তোমার মনে কষ্ট হল। তাকে কি পাপ বলবে না?

ও মা, পাপ বলব কেন? কষ্ট বলব।

জরা হতাশ হয়ে পাপের মর্ম বোঝাবার আশা ছেড়ে দিল। জরা বলল, আচ্ছা, আর একদিন এসে তোমার সঙ্গে গল্প করব, আজকে সন্ধ্যা হল, উঠি।

মেয়েটি বলে উঠল, সে কি, কিছু না খেয়ে যাবে? এই বলে পাতার ঠোঙায় ভুট্টার খই এনে দিল, আর পাথরের বাটিতে পানীয় জল। রাজবাড়ির মজুর

হিসাবে যে খাদ্য সে পেত তার তুলনায় এই শুকনো খই অমৃত বলে মনে হল জরার মুখে। সাগ্রহে সমস্ত খইগুলি খুঁটে খেল, তারপরে এক নিশ্বাসে সেই শীতল নির্মল জল পান করে আরামের 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করল। তারপর বলল, পাপ কাকে বলে তোমাকে বোঝাতে পারলাম না, তবে এটা জেনো, পাপের উল্টো পুণ্য। এ শব্দটা আরও অদ্ভুত লাগল মেয়েটির কানে। বলল, সেটা আবার কি?

এই যে আমাকে খেতে দিলে, পান করতে জল দিলে, এই তো পুণ্য।

পুণ্যের এই ব্যাখ্যা শুনে মেয়েটি হেসে কুটিকুটি হল, তাহলে তো আমি রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি পুণ্য করি।

জরা বলল, তেমনি নিশ্চয় রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি পাপও কর। ছেলেটাকে মারো, স্বামীর মনে কষ্ট দাও।

মেয়েটি পুনরায় গম ভাঙতে ভাঙতে বলল, না বাপু, তোমাদের পাপ পুণ্য বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। তার চেয়ে অনেক সহজ ক্ষেতি করা, গম ভাঙা, আর—

তার বাক্য শেষ হতে পারল না, দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে শুনল ঘোড়ার ক্ষুরের তড়বড়ি শব্দ। দুজনেই তাকাল, তবে কোন্ দিকে তাকাতে হবে জানত মেয়েটি। সে বলে উঠল, ওই যে মহারাজ শিকার করে ফিরছেন।

এক লহমার মধ্যে নরেন্দ্রনগররাজের ঘোড়া মেয়েটির বাড়ির কাছে এসে পৌছলো। রাজা ঘোড়া থামিয়ে কুটীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুবালা, সব খবর ভাল তো?

সে ছোট্ট একটি অভিবাদন করে বলল, মহারাজার অধীনে আমরা সুখেই আছি।

এমন সময়ে রাজার চোখ পড়ল জরার দিকে, চমকে শুধালেন, এ কি, 'রাজা' যে, তোমার এ অবস্থা কে করল?

জরা রাজানুচরদের কৌশল কিছুই জানতো না। সে নীরবে কপালে হাত ঠেকিয়ে বোঝাতে চাইল, এ অবস্থা করেছে অদৃষ্ট।

রাজা বললেন, এবারে সব বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি সব ব্যবস্থা করছি। বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন রাজধানীর দিকে। জরা কিছুই বুঝতে পারল না, ধীরে ধীরে পায়ের বেড়ি বাজিয়ে কয়েদখানার দিকে চলল।

॥ ১১ ॥

নরেন্দ্রনগররাজ ভোরবেলাতে জরাকে সঙ্গে নিয়ে নির্মীয়মান মন্দিরটি দেখছিলেন। জরার বেশভূষায় আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। মাথায় তার সাদা হালকা কাপড়ের

উষ্ণীষ, গায়ে বুটিদার আঙরাখা, পরনে সৌম বস্ত্র, পায়ে শুঁড়তোলা পাটকিলে রঙের পাদুকা, আর কণ্ঠে ও বাহুতে স্থানোচিত অলঙ্কার। কদিন আগে যার পায়ে ছিল বেড়ি, কটিতে সামান্য জীর্ণ আচ্ছাদন আর গায়ে চাবুকের দাগ—এ কি সেই জরা! এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল জরা নিজে। কি জন্যে, কেন এই পরিবর্তন হল বুঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে—অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় অপ্রত্যাশিত রাজপ্রসাদলাভ।

পাথরভাঙা গ্রামে সুবালার কুটিরের কাছে হঠাৎ রাজার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে সে আতঙ্কে চমকে উঠেছিল নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে আসবার ফলে না জানি কি দণ্ড পেতে হবে। রাজা তো চলে গেলেন, ভয়ে ভয়ে সে আবাসে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ পরেই রাজার প্রেরিত লোক এসে বলল, চলো।

শঙ্কিতভাবে শুধালো, কোথায়?

মহারাজার কাছে।

কেন?

কেন আমরা কি করে জানবো, তবে মনে হচ্ছে মহারাজা তোমার উপরে খুশী হয়েছেন।

খুশী হয়েছেন! জড়বৎ অনুবৃত্তি করে জরা।

রাজভৃত্য বিনীতভাবে অভিবাদন করে একটি অশ্ব দেখিয়ে দেয়।

নীরবে জরা দেখিয়ে দেয় পায়ের বেড়ি।

রাজভৃত্যের ইঙ্গিতে কামার এসে খুলে ফেলে দেয় সে বেড়ি। তখন জরা ঘোড়ায় চেপে বসে; রাজভৃত্য সসম্ভ্রমে রাজপুরীর পথটা দেখায়। অবশেষে জরা রাজপুরীতে পৌঁছে মহারাজার সমীপে উপনীত হয়, ঘোড়া থেকে নামে, রাজাকে নত হয়ে অভিবাদন করে।

রাজা বলেন, এসো রাজা, তোমার উপরে অনুচরগণ অন্যায় আচরণ করেছিল, তারা তিরস্কৃত হয়েছে।

জরা কিছুই বুঝতে না পেরে আর একবার অভিবাদন করে।

ব্যাপারটা এই।

নরেন্দ্রনগররাজ অনুচরদের আদেশ করেছিলেন রাজাকে (জরা নাম তাঁর অজ্ঞাত) যেন আরামে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরও বলেছিলেন, লোকটা গুণী, ভবিষ্যতে ওকে দিয়ে কাজ হবে। আগেই বলা হয়েছে যে এই সামান্য রাজানুগ্রহই জরার কাল হল, তার পায়ে বেড়ি এবং পিঠে চাবুক পড়লো। হঠাৎ রাজার চোখে না পড়ে গেলে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে খাটতে এবং চাবুক

খেতে খেতেই ওর জীবনাবসান হত। ওকে পাথরভাঙা গ্রামে দেখবামাত্র রাজা এক লহমায় প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন। রাজানুচরদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে রাজার পরিচয় অপ্রত্যাশিত নয়।

একজন অমাত্যকে ডেকে বললেন, ওহে, রাজার এ দশা কেন?

সে বলল, মহারাজ কি বলবো, ওকে তো আরামেই রাখবার ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু ওর ভাগ্যে আরাম নেই। লোকটা কলির চর। পালিয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে ধরে নিয়ে এসে বললাম, বাবা, তুমি পালালে যে আমাদের শির যাবে। তুমি দয়া করে রাজসমাদরে বাস করো।

রাজা শুধালেন, তারপর?

মহারাজ, বলবো কি লোকটা তো বুনো, আসল জংলি, পরমান্ন মিষ্টান্ন দেখলে বমি করে, গোটা আটার রুটি ছাড়া আর কিছু রোচে না তার মুখে। তাও না হয় সহ্য করেছিলাম। যার যা খাদ্য তাই খাক। কিন্তু আবার পালালো। তখন বাধ্য হয়ে ওর পায়ে বেড়ি পরালাম, অবশ্য কাজকর্ম ওকে কিছু দেওয়া হয়নি, আর যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতেও বাধা ছিল না। তাই তো পাথরভাঙ্গা গ্রামে মহারাজার চোখে পড়লো লোকটা।

রাজকর্মচারীদের স্বভাব রাজাকে নির্বোধ ভাবা, তা নইলে তাদের জীবনযাত্রা দুঃসহ হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে রাজাদের স্বভাব রাজকর্মচারীদের বিশ্বস্ত ভাবা, নচেৎ কাজকর্ম চলে না। দুজনেই জানে প্রকৃত ব্যাপার ঠিক বিপরীত। এই ভাবে আপসে চোখ-ঠারাঠারি করে চলে রাজসংসারের কাজ। মানব-সংসারের বললেও বোধ করি ভুল হয় না, এখানেও একের সম্বন্ধে অপরের এই রকম ধারণা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলে সংসারের মতো এমন বিচিত্র প্রহসন আর কোথায়।

রাজা জানতেন লোকটা গুণী, কিন্তু তারপরে তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যা জানতে পেলেন তাতে তাঁর চোখে জরার নতুনতরো তাৎপর্য প্রকাশ পেলো।

রাজা শুধালেন, তোমার দেশ কোথায় হে রাজা?

জরা বলল, ভারতবর্ষে মহারাজ।

আহা ভারতবর্ষে তো আমরাও বাস করি, এ অঞ্চল তো ভারতের বাইরে নয়, এ অঞ্চলের আমরা সবাই মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সামন্ত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি ভারতের কোথায়? মৎস্য, পাঞ্চাল, মদ্র, কোশী, কোশল নানা প্রদেশ আছে—কোথায়?

জরা বলল, তা তো জানি নে মহারাজ, আমি থাকতাম দ্বারকায়।

দ্বারকায়! চমকে উঠলেন রাজা। কানকে বিশ্বাস হল না, পুনরপি শুধালেন, কি বললে?

দ্বারকায়।

দ্বারকায়! বাসুদেবের দেশে!

না জেনে জরা কি পিছল পথে পদক্ষেপ করলো নাকি! কিন্তু আর তো ফিরবার উপায় নেই—বলল, হ্যাঁ মহারাজ।

তুমি বাসুদেবের দেশের লোক! কি আশ্চর্য, এতদিন বলোনি কেন?

মহারাজা না শুধোলে বলি কি উপায়ে।

এতে আর শুধানো অশুধানো কি! এতবড় সৌভাগ্য কি লুকিয়ে রাখতে হয়! এই যে মন্দিরটা তৈরি করছি, চলো দেখে আসি, এখানে বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

জরার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভাবে এই এত দূরদেশে, কত রাজ্য, পাহাড়-পর্বত, নদী মরুভূমি পার হয়ে এখানেও পৌঁছেছে বাসুদেবের নাম। তখন মনে পড়ে জরতীর কথা। তবে হয়তো লোকটা সত্যি কেউকেটা ছিল। তবে জরতী যে বলেছিল ভগবান তা হতেই পারে না। ভগবানের যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে কি ত্রিভুবনে এখন ভগবান নেই! এ হতেই পারে না। ভগবান যদি না থাকে তবে চন্দ্র সূর্য উঠছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস বইছে কি করে? মায়ের কাছে ছেলেবেলায় শুনেছিল যে এই যে চন্দ্র-সূর্য উঠছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস বইছে, সবই ভগবান আছেন বলে। এখনও তো এ সমস্ত ঠিক আগের মতই হচ্ছে। কাজেই ভগবান আগের মতই আছেন। আর তা যদি থাকেন, তবে বাসুদেব কখনোই ভগবান হতে পারেন না।

এত কথা এত চিন্তা আর এমন যুক্তির সূত্র জরার পক্ষে নূতন। ক'মাস আগে, যখন সে বনে বনে পশু শিকার করে বেড়াত, তখন এমন চিন্তাধারা ও যুক্তি তার ধারণার অতীত ছিল। এই ক'মাসে ভিতরে ভিতরে তার যে পরিণতি ঘটেছে তারই চিহ্ন এই চিন্তাধারায়। বাসুদেবকে হত্যা করবার মুহূর্তে জরার অজ্ঞাতসারে জীবনপণ্ডিত তাকে ভর্তি করে নিয়েছিল নিজের পাঠশালায়। এ পাঠশালা বড় আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। এখানে কে পড়ায়, কারা পড়ে, পড়বার রীতি বা কি রকম কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। পড়ুয়াদের প্রশ্ন করলে তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে, তারা আবার পাঠশালার ছাত্র। আর এই পাঠশালায় যে বিচিত্র ধরনের দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তার কিছু কিছু বিবরণ আগে দিয়েছি। এখানে দুঃখ দিয়ে শেখানো হয়, সুখ দিয়ে শেখানো হয়, আর সবচেয়ে বেশী

শেখানো হয় সুখের ছদ্মবেশে যখন দণ্ড আসে।

বাসুদেবকে হত্যার পরেই জরার আরম্ভ হল দুঃখের শিক্ষা। সেই পাঠ চলল সুমন্তনগরে পৌঁছানো অবধি। সুমন্তনগরে যে মাসাধিককাল সে ছিল, তখন সুখের পাঠ চলেছিল। নরেন্দ্রনগরে পৌঁছানোর পর ক'দিন আবার দুঃখের পাঠ। তারপরে এখন আরম্ভ হল সব দণ্ডের সেরা সুখের ছদ্মবেশে দুঃখের দণ্ড।

জরা এখন রাজার প্রিয়পাত্র, সারাদিন তিনি জরাকে সঙ্গে রাখেন, কারিগররা মন্দির তৈরী করছে, জরাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন, কোথায় কোন্ বেদীর উপরে বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে বুঝিয়ে দেন। রাজা বলেন, আমার ইচ্ছে বাসুদেব দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন, কারণ ওই দিকেই দ্বারকা। আর রাজপুরোহিত বলেন, না মহারাজ, সবদিকের শ্রেষ্ঠ পূর্বদিক, যেদিকে সূর্য ওঠে, বাসুদেব পূর্বাস্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবেন। তুমি কি বল রাজা?

জরা অবাক হয়ে বলে, মহারাজ, আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি বলব?

রাজা বলেন, সে কি কথা, তুমি বাসুদেবের দেশের লোক, তোমার উপরে কার কথা?

তারপরে রাজা বলেন, দেখ, বাসুদেবের মূর্তি পরিকল্পনা নিয়ে আমরা সঙ্কটে পড়েছি। এদেশের কেউ তাকে চোখে দেখেনি। এমন কি যে শিল্পী মূর্তি গড়বে সেও দেখেনি, সকলেরই শোনা কথার উপরে নির্ভর।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেন, তুমি কি কখনও তাঁকে চোখে দেখেছ?

এই নিদারুণ প্রশ্নে জরার সমস্ত অস্তিত্ব মোচড় খেয়ে ওঠে, এ কি নিদারুণ সঙ্কটের মুখে পায়ে পায়ে সে এগিয়ে চলেছে, এর চেয়ে যে মাথায় করে পাথর বওয়া সহজ ছিল। সে কেবল কায়িক কষ্ট। নিতান্ত অসহ হলে, মাথা থেকে নামিয়ে জিরিয়ে নেওয়া চলে। আর এ বোঝা যে মানসিক, এ তো নামাবার উপায় নেই। জরা হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারে না।

রাজা শুধান, কি হে, তাঁকে কখনও চোখে দেখনি এ কি হতে পারে?

জরা বলে, মহারাজ, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

রাজা বলেন, ভগবানের কাছে কি মূর্খ-পণ্ডিত ভেদ আছে। তিনি যে স্বয়ং ভগবান।

জরা কোন উত্তর দেয় না।

এবারে রাজা অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, কি ভাবে তাঁর লীলাবসান ঘটল জান? নানা লোকে নানা কথা বলে।

জরার সেই এক উত্তর, মহারাজ, আমি মুখ্য-সুখ্যু মানুষ।

রাজা বলেন, আমরা এতদূর থেকে শুনলাম, আর তুমি সে রাজ্যে থেকেও শুনতে পেলে না, এ কি হয়!

তারপর কিছুক্ষণ দুজনে ঘুরে ঘুরে মন্দিরটি দেখে। রাজা বলেন, মন্দিরটি উচ্চতায় একশো বিশ হাত হবে। কেননা, ওই বয়সেই বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন। তারপরে অনেকটা যেন নিজের মনেই বলে যান, কতজনে কত পরামর্শ দিল। কেউ বলে, মহারাজ শ্বেতপাথর দিয়ে মন্দির তৈরী করান, কেউ বলে লালচে পাথর দিয়ে গড়ুন, দেখতে খুব সুন্দর হবে। কিন্তু কালো পাথরের কাছে কেউ নয়। বুঝলে রাজা, লাল বল, সাদা বল, সমস্ত কালক্রমে ম্লান হয়ে আসে। কেবল কালোর মহিমাই দিনে দিনে গভীর হতে থাকে। তাছাড়া বাসুদেবের রং কালো ছিল। ইচ্ছে করেই কালোর মহিমা বোঝাবার জন্য ওই বর্ণ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মন্দিরটা ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে বসেন, শুনেছি একটা ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর লীলাবসান ঘটেছিল।

জরা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার মত হয়।

সাবধানে পা ফেলো, পাথরের টুকরো ছড়ানো রয়েছে।

রাতে সুখশয্যায় শয়ান জরার ঘুম আসে না। এর চেয়ে যে মজুরদের কয়েদখানা অনেক ভাল ছিল। গবাক্ষপথে আকাশের দিকে তাকায়, তারাগুলো তার অচেনা নয়, বনে-জঙ্গলে মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো যার অভ্যাস, তারা না চিনে তার উপায় কি? দেশ ছাড়বার পরে এমন করে তারাগুলোর দিকে তাকাবার অবকাশ পায়নি সে। দেখতে পায় কালপুরুষের তলোয়ারখানা ঝুঁকে পড়েছে। তার দিকেই নাকি? আর আকাশের ওই যে কোণে একটা তারা রাজার হাতের আংটির লাল পাথরটার মতো চোখ পাকিয়ে রয়েছে, সে কি তার দিকে তাকিয়ে? এই তারাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে দ্বারকার বন-বাদাড়ের কথা মনে পড়ে যায়, সমুদ্রের শব্দ রাতের বেলায় যেন দ্বিগুণ প্রবল হয়ে ওঠে, গরমের দিনে রাতের বেলা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হাজার জোনাক জ্বলতে থাকে। সেই সূত্রে মনে পড়ে যায় জরতীকে। জরতী শুধাতো, ওগুলো কি রে জরা?

ও সম্বন্ধে জ্ঞান দুজনেরই সমান। জরা বলে, সাপের মাথায় মণি থাকে শুনেছিস তো? সেই মণি।

এত সাপ এলো কোথা থেকে?

কোথা থেকে কি রে? সমস্ত সাপেরই তো বাস সমুদ্রে।

তবে দিনের বেলায় দেখতে পাই নে কেন রে ?

এর সদুত্তর জানে না জরা। তাই সে চুপ করে থাকে।

কতক্ষণ দেশের কথা, জরতীর কথা চিন্তা করেছে তার হুঁশ ছিল না। যখন আবার আকাশর দিকে চোখ পড়ল, দেখতে পেলো কালপুরুষের তলোয়ারখানা আরও অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে তার দিকে। জরার ভয় হল এমনি ভাবে ঝুঁকে পড়তে থাকলে কখন এক সময় তার বুকে এসে বিঁধবে। মনে হল, তাহলে বড় অন্যায় হয় না। এমনি ভাবেই তো তার শর গিয়ে বিঁধেছিল বাসুদেবের পায়ে। বাসুদেবের কথা মনে হতেই ভাবল তাঁকে হত্যা করে যদি পাপ করেই থাকি, তবে রাজার কাছে এত সমাদর পাচ্ছি কেন ? তখনই মনে হল, রাজা তো জানেন না। ভগবান জানেন। তবে তিনি কেন এত সমাদর দিচ্ছেন রাজার হাত দিয়ে। বিশেষ যে সমাদর তার প্রাপ্য নয়, সেই সমাদর যখন সে পাচ্ছে, বুঝতে হবে বাসুদেবকে হত্যা করায় পাপ হয়নি। তবে কালপুরুষের তলোয়ালখানা আরও ঝুঁকে পড়েছে কেন তার দিকে ? পাপ, পুণ্য, ভগবান, বাসুদেব সবসুদ্ধ মিলিয়ে তখন তালগোল পাকিয়ে যায় তার মনের মধ্যে। সে না পারে ঘুমোতে, না পারে জেগে থাকতে। তাকালে কালপুরুষের তলোয়ার, চোখ বুজলে জটিল চিন্তার গোলকধাঁধা। সুখশয্যা তার পক্ষে অসহ্য হয়। সে উঠে বসে সজোরে কপাল চাপড়াতে থাকে।

দিনের বেলায় রাজবাড়ির সমাদর, রাতের বেলায় সুখশয্যার যন্ত্রণা জরার আর সহ্য হয় না। সেই যে সেদিন বাসুদেবের মৃতদেহ দেখে জরতী বলে উঠেছিল, ওরে জরা, তোর নরকেও স্থান হবে না। সেই কথার অর্থ এতদিনে বুঝি বুঝতে পারছে। তবে নরক বুঝি সমাদর ও যন্ত্রণায় সমভাগে মিশিয়ে তৈরি, তাই এমন দুঃসহ। কিংবা যে সমাদর প্রাপ্য নয়, সেই সমাদরের মুখোশ পরে যন্ত্রণা আসে বলেই বুঝি তাকে নরকযন্ত্রণা বলে।

রাতের বেলায় সুখশয্যার তপ্ত বালুখোলায় বসে সঙ্কল্প করে কালকেই সব কথা রাজসমীপে নিবেদন করে এই দ্বৈতাবস্থার অবসান ঘটাবে—একদিন যে শূলদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল সেই দণ্ড আবার যেচে নিয়ে সব যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যকালে দিনের বেলায় সাহসে কুলোয় না।

এক-একদিন যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হয় পাথরভাঙায় সুবালার বাড়িতে যায়, এখন আর কোথাও যাওয়ার বাধা ছিল না। সেদিন সুবালার বাড়িতে গিয়ে দেখে শুকনো কুসুম ফুলের গুঁড়ো জলে গুলে কাপড় রাঙাচ্ছে।

ও কি হচ্ছে সুবালা ?

শাড়ি রাঙাচ্ছি, কাপড় রাঙাচ্ছি, ছেলেটার আংরাখা রাঙাচ্ছি।

সবই তো দেখছি রাঙিয়ে ফেললে, তবে আর বাড়িঘরগুলো বাদ থাকে কেন?

সুবালা হঠবার পাত্র নয়—বলল তাও রাঙাবো।

কি, এই রং দিয়ে নাকি?

সে হেসে ওঠে। হাসবার সময়ে অনেকগুলো দাঁত দেখা যায়, স্ফটিকের মতো সাদা আর ঝকঝকে। হেসে উঠে বলে, তুমি কেমন লোক গা! কুসুম ফুল দিয়ে কি বাড়িঘর রাঙায়!

তবে কি দিয়ে?

কেন গেরি-মাটি আর গোবর মিশিয়ে। তোমাদের দেশে কি করে?

সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে ছেলেটা এসে জরার হাঁটু ধরে দাঁড়ায়। এই ক'দিনের যাতায়াতে জরাকে চিনেছে। ছেলেটা কোলে উঠে তার পাগড়ি ধরে টানাটানি করে।

সুবালা বলে, নামিয়ে দাও, খুলে ফেলবে।

ফেলুক না, বলে জরা। তার মনে পড়ে তার একটি ছেলে হয়েছিল, বেশিদিন ছিল না, বছর দুই হতেই মারা গিয়েছিল। সে-ও এমনি ভাবে তার পাগড়ি ধরে টানাটানি করতো। গলার পুঁতির মালা কতবার ছিঁড়ে ফেলেছে। জরা পাগড়ি খুলে তার মাথায় জড়িয়ে দেয়। তার মুখ অবধি ডুবে যায় পাগড়িতে, টান দিয়ে খুলে ফেলে দেয়। হো-হো করে হেসে ওঠে জরা। তারপরে সুবালার উদ্দেশে বলে, তা হঠাৎ এত কাপড়চোপড় বাড়িঘর রাঙাবার ধুম পড়ে গেল কেন?

সুবালা বলে, পরব আসছে যে।

কি পরব আবার!

বাঃ, তুমি রাজবাড়িতে থাক আর জানো না!

বাস্তবিক কিছুই জানে না জরা।

সুবালা বুঝতে পারে, বলে, বাসুদেবের মূর্তি বসবে যে মন্দিরে!

এখানেও বাসুদেব! জরা চমকে ওঠে। এখানেও লোকটা পিছু পিছু এসেছে দেখছি। কোথায় সেই সমুদ্রতীরের দ্বারকা আর কোথায় এই পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের পার্বত্য অঞ্চল, তায় কিনা আবার পাহাড়ীদের জীর্ণ কুটির! এমন শত্রুও তো দেখিনি, সে ভাবে সুযোগ পেলে আবার তাকে তীর মারে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, বাসুদেব কে?

শাড়িখানা নিংড়াতে নিংড়াতে সুবালা বলে, বাসুদেব যে ভগবান।

তারপরে আবার আর একখানা শাড়ি নিয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস চূড়ান্ত উত্তর দিয়েছে, অধিক বিস্তার সাধন অনাবশ্যক। কিন্তু জরাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে শুধায়, বাসুদেব তোমাদের কি করেছে?

কি আবার করবে। ভগবান ভগবান। তিনি কি বোঝা বইবেন, না ঝরনা থেকে জল এনে দেবেন!

ভগবান কি মানুষের হাতে মরে?

ভগবানের ইচ্ছা কেমন করে জানবো। ও জানবার চেষ্টা করতে নেই। তবে সেই মানুষটাকে পেলে একবার দেখে নিই।

কি করতে তাকে নিয়ে?

ঐ পাথরখানা দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দিতাম।

মনে করো যদি আমিই মেরে থাকি?

সুবালা খিলখিল করে হেসে ওঠে, এমন অসম্ভব কথার হাসি ছাড়া আর কী উত্তর হতে পারে।

সেদিন রাতে তার সুখ হরণ করে সুবালার সরল বিশ্বাস। তখনি মনে পড়ে জরতীকে, তারও এমনি সরল বিশ্বাস ছিল। মূর্খ জরা জানে না যে মেয়েরা সরল বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে নির্ভয়ে পথ চলে, পুরুষে জ্ঞানের উপরে নির্ভর করবার ফলে পথ হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাস পাহাড়ী ঝরনা, জ্ঞান কাটা খাল। তার মনে পড়ে, একদিন এই রকম সরল বিশ্বাস তো তারও ছিল। জীবনের পথ ছিল মসৃণ, সমতল। তারপরে কি কুক্ষণেই ঐ শর নিক্ষেপ করলো। সব কেমন উল্টে-পাল্টে গেল।

হঠাৎ দারুণ ক্রোধ হয় খট্টাসের উপরে, কেন বাঁচাতে গেল তাকে। মৃত্যুদণ্ডই তো তার প্রাপ্য ছিল। আর বাঁচালোই যদি বা এমন নির্মোচ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেললো কেন? সেই শরাঘাতের মুহূর্ত থেকে তার সরল জীবনে গ্রন্থির পরে গ্রন্থি পড়ে চলেছে। কোথায় কিভাবে এর বিরাম কে জানে। যেভাবেই হোক, যত শীঘ্র হয় সে বেঁচে যায়—এভাবে আর চলে না।

রাজা বলছিলেন, ওহে মিতে রাজা, ভাস্কর কাকে বলে জানো তো, যারা মূর্তি গড়ে এই আর কি, কাল রাতে এসে পড়েছে। কালো পাথরে বাসুদেবের মূর্তি গড়বে। চলো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে বাসুদেবের মূর্তি সম্বন্ধে কিছু ধারণা তাকে দিতে পারবে।

রাজার জেরার দায়ে ঠেকে একদিন জরা স্বীকার করে ফেলেছিল যে দূর থেকে তাঁকে দু-একবার দেখেছে।

রাজা বলেছিলেন, তা হলেই হল, যে লোক একবারও দেখেনি সে যখন মূর্তি গড়তে সাহস করছে, তোমার পক্ষে তাকে সাহায্য করা অসম্ভব নয়।

অগত্যা রাজী হতে হয় জরাকে।

জরা শিল্পীর সঙ্গে কথা বলছে এমন সময়ে একজন অমাত্য এসে নিবেদন করলো, মহারাজ, সেই যে দুজন বন্দী পালিয়েছিল তারা ধরা পড়েছে।

কোথায় ধরা পড়লো ?

মহারাজ, ওরা বিদেশী লোক, এদেশের পথঘাট জানে না ; এ পাহাড় সে পাহাড় করে ঘুরে ঘুরে অনাহারে শুকিয়ে গিয়ে দেউতলি গাঁয়ে ভিক্ষার সন্ধানে গিয়েছিল। সে গাঁয়ে মহারাজার অনুচরদের অনেকের বাস, তাদেরই একজন চিনতে পেরে রাজবাড়িতে সংবাদ দেয়। তখন রাজবাড়ি থেকে সৈন্য গিয়ে বন্দী করে আনে।

তাদের বোধ করি পালাবার সামর্থ্য ছিল না।

মহারাজার অনুমান যথার্থ। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ধরা পড়ে তারা যেন কৃতার্থ হল।

যাক, যখন ধরা পড়েছে খুব জুলুম যেন না হয় ওদের উপরে। আগে খাইয়ে-দাইয়ে চাঙ্গা করে তোল তারপরে অন্য কথা। হ্যাঁ শোনো, লোক দুটো যুদ্ধের বন্দী, না বাজার থেকে কেনা ?

এদের দু'জনকে তক্ষশিলার বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল।

ওখানে তো চড়া দাম নেয়।

হ্যাঁ মহারাজ, আর লোক দুটোরও প্রকৃতি নামের অনুরূপ।

কৌতূহলী রাজা শুধান, নামের অনুরূপ! তার মানে ?

একজনের নাম নরক, একজনের নাম অসুর।

নাম দুটো তপ্ত লৌহশূলের মতো জরার কানে প্রবেশ করে—এতক্ষণ শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন ছিল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। রাজা ও অমাত্য ওদের ইতিহাস আলোচনায় নিযুক্ত থাকায় জরার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলো না।

নরক ও অসুর। জরার সেই মহা অপরাধের সাক্ষী, তার সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী। তারা মুখ খুলবামাত্র তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাদের অপরাধের তুলনায় জরার অপরাধ পর্বতপ্রমাণ। সে কিনা আজ রাজপ্রসাদ-ভোগী, আর ওরা দুজনে কড়া চাবুকের আসামী। জরা আর মনঃস্থির করতে পারছিল না কোনরকমে দায়সারা করে আপসে ফিরে এলো। সে বুঝলো তার

জীবনের আর একটা সঙ্কট ঘনীভূত। সে এসব নিরিবিলিতে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করতে চায়। হয় নিষ্কৃতি নয় নিয়তি। নিয়তির স্রোত দুর্নিবার।

॥ ১২ ॥

দুদিন পরে।

এই দুদিন ভয়ে ভয়ে কেটেছে জরার, ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায়। সে ভেবেছে দুর্ভাগ্য তার পিছু নিয়েছে, নতুবা কে জানতো নরক আর অসুর এখানে। তারা তার সব কীর্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সহকর্মী। সুমন্তনগরে ও নরেন্দ্রনগরে রাজসমাদর পাওয়ায় তার ধারণা হয়েছিল পশ্চাৎধাবমান দুর্ভাগ্যকে এড়াতে পেরেছে। এখন দেখল সে ধারণা ভ্রান্ত। পাকা শিকারী জরার এমন ঘটনা অজ্ঞাত নয়। পোষা কুকুর নিয়েছে হরিণের পিছু, দুজনে আগু-পিছু বেশ ছুটছে, হঠাৎ কুকুর থমকে দাঁড়ায়, হরিণের গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই বলে হরিণ যে রক্ষা পায় তা নয়, আবার গন্ধের নিশানা পেয়ে হরিণের পিছু নেয়। এক্ষেত্রেও সেই রকম। মানুষ দুর্ভাগ্যের শিকার।

দুদিনেও যখন অশুভ প্রতিক্রিয়া ঘটল না, জরার বিশ্বাস হল ওরা জানে না যে জরা এখানে আছে। জানবেই বা কি প্রকারে, জানবার কারণ নেই। এক নিতান্ত কাকতালীয়বৎ যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আপাতত তাদের উপরে না বসতে বদ্ধপরিকর।

জরা কেমন করে জানবে যে তারাই প্রথম অনুমান করেছিল ঐ পায়রা মারা জরার কীর্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তারপরে যখন যুদ্ধ বেধে উঠল তারা পালালো, তাই যুদ্ধের পরিণাম ও জরার বন্দীরূপে আগমন তাদের অজ্ঞাত রয়ে গেল তবে দীর্ঘকালের জন্য নয়।

সেদিন জরা গিয়েছিল পাথরভাঙা গ্রামে সুবালাদের বাড়িতে। হঠাৎ সুবালা প্রশ্ন করে বসলো, আগে যখন আসতে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে কথা তুলতে, দামী কাপড় পরবার ফলে ওসব বুঝি ভুলে গিয়েছ?

এমন প্রশ্ন আশা করেনি জরা, তাই উত্তর যোগালো না মুখে। তাকে নীরব দেখে সুবালা বলল, তবেই বুঝতে পারছ পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই, মানুষের যখন অবস্থা কিংবা মন খারাপ হয় তখনই ওসব আগাছা গজায় মাথায়।

এবারে কথা যোগালো জরার মুখে, বলল, তাহলে রাজাদের বেলায় বুঝি পাপ-পুণ্য নেই!

কেন, রাজবাড়ির ছাদে কি কখনো অশ্বত্থ গাছ গজায় না! বিশেষ মন খারাপ তো রাজা-গজাদেরও হতে পারে!

তা তোমার মতটা কি শুনি না?

কতবার তো বলেছি। সোজা পথে যারা চলে না তাদেরই মাথায় ওসব আগাছা দেখা দেয়।

কিন্তু সুবালা, পথ দীর্ঘ হলে তো সবটা সোজা না হওয়াই স্বাভাবিক।

কি জানি বাপু! আমাদের এ গাঁয়ে যে কয় ঘর লোক বাস করি কারো মাথায় ওসব বালাই নেই।

তোমরা তাহলে সুখী?

দুঃখ হতে যাবে কেন?

না সুবালা, দুঃখ আছে, পাপ আছে, নেই বলে এ সাপের বিষ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তুমি যদি পাপ করে থাকো তবে এমন সুখে আছ কি করে?

আজ আছি কালকে না থাকতেও পারি। বলে জরা বিদায় নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠতে লাগলো। পাশের শুঁড়ি পথ বেয়ে পাথরের চাপড়া মাথায় বন্দী মজুররা উঠছে। জরা নিতান্ত আপন মনে না চললে দেখলে দেখতে পারতো সেই দলের দুজন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। এবং জরাকে ইশারায় দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে চোখোচোখি করলো। শিকারীর নাকে আবার এসেছে শিকারের হারানো গন্ধ।

চিন্তার সমুদ্রে চৈতন্যের ভেলা এই কিছুক্ষণ মাত্র ডুবেছে, জরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময়ে দুজন মানুষ এসে দাঁড়ালো তার শিয়রে, আলো-আঁধারিতে তাদের চেহারার খসড়ার বেশি দেখা যাচ্ছিল না। গবাক্ষপথে আকাশের যে আলোটুকু আসছিল তাতে একবার চকচক করে উঠল একখানা অস্ত্র। কিরিচ হতে পারে। তারা ইশারায় পরস্পরে কী বলাবলি করলো, হয়তো বা মারতেই চায়। এমন সময়ে ঘুম ভেঙে গিয়ে জরা উঠে বসলো।

কে তোমরা, কি চাও, এত রাত্রে কেন?

অতগুলো প্রশ্নের উত্তর কি একসঙ্গে দেওয়া যায়!

এ যে চেনা গলা।

গলাটা যখন চিনেছ তখন মানুষ দুটো তো অচেনা থাকবে না।

কে, নরক আর অসুর নাকি?

হাঁ রাজা, একসঙ্গে নরকাসুর, দ্বন্দ্ব সমাস বলে নরেন্দ্রনগররাজ।

অপরজন বলল, এখন আমাদের দুজন রাজা—নরেন্দ্রনগররাজ আর আমাদের দলের রাজা। কাকে মেনে চলবো তাই জানতে এসেছি। এবারে জানলে কি চাই?

নরক বলল, রাতে কেন এসেছি বুঝতে কষ্ট হবে না। দিনের বেলায় দশজনের সম্মুখে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেলে কি তোমার পক্ষে গৌরবের হতো।

অগৌরব কেন?

তুমি এখন রাজামাত্য, আর আমরা দাগী আসামী।

অসুর বলল, যাই বলো, রাজা আমরাই বেশি গৌরব দিয়েছিলাম। ছিলে রাজা, হলে রাজামাত্য।

এত রাতে এখন ঠাট্টা রাখো, কি চাও বলো?

কয়েদী কী চায়—মুক্তি।

আমি তার কি করবো?

বলো কি রাজা, এখন তুমি নরেন্দ্রনগররাজের নয়নের মণি! রাজার রানী নেই, নইলে তো তারও ঐ রকম কিছু হতে। তুমি একটু ইঙ্গিত করলেই রাজা খুশী হয়ে আমাদের ছুটি দেবেন।

একবার তো ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে, ফিরলে কেন?

ভাগ্যে রাজদর্শন লেখা ছিল তাই।

কিন্তু আমি কেন তোমাদের মুক্তির জন্য ইঙ্গিত করতে যাবো?

নিজের মঙ্গলের জন্য।

নইলে অমঙ্গল।

অমঙ্গল কি?

মৃত্যু হতে পারে।

রাজার আদেশে?

আমাদের হাতে হতেই বা বাধা কি? এই বলে দেখালো কিরিচখানা।

জরা বলল, মরলে তোমাদের মুক্তির জন্যে ইঙ্গিত করবো কি ভাবে?

এই তো, পথে এসো রাজা। আমাদের ছুটি করে দাও, আমরা দেশে চলে যাই, কেউ জানতে পারবে না যে তুমি বাসুদেবের হত্যাকারী।

এখানে বসে বসে বাসুদেবের মূর্তি গড়তে সাহায্য করো, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করো, চাই কি তার পাশে নিজেরও একটা মূর্তি দাঁড় করিয়ে দাও।

এই বলে নরক হেসে উঠল।

জরা ভাবে, উঃ, কি নারকীয় হাসি! এ যেন থট্টাসকেও হার মানায়!

আর, যদি রাজার কাছে দরবার না করি!

তবে বাধ্য হয়ে আমাদের করতে হবে। বাসুদেব-ভক্ত রাজা নিশ্চয় বাসুদেব-হত্যাকারীকে ক্ষমা করবেন না।

দাগী আসামীর কথা রাজা বিশ্বাস করবেন কেন?

সেই কৌস্তুভমণির হারটা কোথায় রাখলে?

জরার মনে পড়লো সীমন্তিনীর স্মৃতি। বলল, সেটা আর যেখানেই থাকুক আমার কাছে নেই।

বাসুদেব-হত্যার ওটাই প্রধান চিহ্ন, সেটা না থাকায় ওরা কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হল।

এবারে জরা বলল, আমি যদি ঐ অপরাধে তোমাদের অভিযুক্ত করি!

তবু রাজা আমাদের বিশ্বাস করবেন।

কেন?

একজন সাক্ষীর চেয়ে দুজন সাক্ষীর গুরুত্ব বেশি।

এবারে অসুর বলল, রাত শেষ হয় রাজা, আর পীরিত চটিও না। রাজাকে বলে আমাদের মুক্তি দাও, নইলে চলো তিনজনেই পালিয়ে চলে যাই।

আমি এ দুয়ের একটাতেও রাজী নই। দৃঢ়ভাবে বলল জরা।

তবে এই নাও—বলে হঠাৎ আক্রমণ করলো নরক। কিরিচখানা তার হাতেই ছিল। জরা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেওয়ালে ঝোলানো তলোয়ারখানা টেনে নিল। নরকাসুরের ধারণা ছিল শয়নগৃহে রাতের বেলায় জরাকে নিরস্ত্র পাওয়া যাবে। এ রকম ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জরা কখনো নিরস্ত্র থাকতো না। তার প্রতি রাজপুরীর লোকদের মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনগররাজ। তাঁর পরামর্শেই জরা সর্বদা সশস্ত্র থাকতো।

জরা যে অসি চালনায় এমন নিপুণ নরক বা অসুর জানতো না। তাদের ধারণা ছিল ব্যাধের ছেলে শুধু তীর ধনুক চালাতেই জানে। এখন তার অসিতে পটুতা দেখে ভড়কে গেল—কিন্তু আর পিছোবার উপায় নেই।

সেই গভীর রাতের আলো-আঁধারির মধ্যে নরক ও জরা মৃত্যুপণ করে লড়তে লাগলো। অসুর দেখলো নরক এক পা এক পা করে পিছু হটছে, গতিক ভাল নয়। তার উপরে আর এক মস্ত অসুবিধা এই যে এ ঘরটা তাদের পরিচিত নয়—প্রস্থ-দৈর্ঘ্য উচ্চ-নীচতা কিছুই তাদের জ্ঞাত নয়। সেদিন জরাকে দেখবার পরে নিভৃতে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার ইচ্ছা তাদের হয়েছিল; সুযোগের

সন্ধানে ছিল, আজ বিকেলে মাত্র জরার শয়নঘরটা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল। গভীর রাতে রাজপুরী নিস্তব্ধ হলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

জরা বুঝে নিয়েছিল যে অস্ত্রধারী মাত্র একজন—তাই নির্ভয়ে লড়ছিল। নরক নিতান্ত অনিপুণ নয়, তবে জরার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দ্বৈরথ শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল, নরকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার বুকে অসিখানা আমূল বিদ্ধ করে দিল জরা। অস্ফুট আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ে গিয়ে বার দুই-চার আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো, তারপরে স্থির হয়ে গেল।

অসুর তার হস্তচ্যুত তলোয়ারখানা কুড়িয়ে নিতেই জরা তাকে আঘাত করলো। দক্ষিণ হাত সুদ্ধ তলোয়ারখানা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। সে চিৎকার করতে করতে গৃহত্যাগ করলো। জরা কি করবে ভাবছে এমন সময় তার কানে গেল অসুরের চিৎকার। সে তারস্বরে ঘোষণা করছে—ওগো, তোমরা সবাই এসো, ভগবান বাসুদেবের হত্যাকারীকে ধরো—শীগগির এসো, আর এক লহমা বিলম্ব হলেই সে পালাবে।

এই ঘোষণার জন্যে জরা প্রস্তুত ছিল না ; সে বুঝলো এই মুহূর্তেই তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে ; লোকজন এসে পড়লে আর রক্ষা নেই। কর্মপন্থা একটিই ছিল—পলায়ন। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পুরীর দেয়াল টপকে বাইরে লাফিয়ে পড়লো, তারপরে অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল সে। এসব এক নিমেষে ঘটে গেল, তখনও অসুরের নিদারুণ ঘোষণার ক্ষীণ রেশ তার কানে আসছিল।

পাহাড়ের পথঘাট জরার জানা হয়ে গিয়েছিল, পাহাড় থেকে নেমে থরস্রুতি পেরিয়ে, পাথরভাঙা গ্রামের কোণ ঘেঁষে সে ছুটছে। একবার যেন সুবালাদের কুটিরখানার অস্পষ্ট খসড়া তার চোখে পড়লো। সে অবিরাম ছুটছে, অন্ধকারে দিকজ্ঞান সম্ভব নয়, সে-সব দিনের বেলায় স্থির করলেই চলবে। এখন নরেন্দ্রনগর ও তার মধ্যে ব্যবধান যত বাড়বে তত বেশি তার নিরাপত্তা। মন্ত্রতাড়িত প্রেতাত্মার মতো ছুটে চলেছে সে।

জীবনপণ্ডিতের পাঠশালায় পণ্ডিতমশাই হঠাৎ জেগে উঠে বেতগাছা টেনে নিয়ে পড়োদের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ড

॥ ১ ॥

ছুট ছুট ছুট—খরস্রুতির উপত্যকা পার হয়ে সুবালাদের পাথরভাঙা গ্রামখানি ডাইনে রেখে পাহাড়টার উপরে উঠে দে ছুট ছুট ছুট। পথেরও শেষ নেই আর। মানুষের হৃৎপিণ্ড ও মাংসপেশী কে জানতো তার শক্তি এমন অমিত!

আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর প্রকাণ্ড একখানা চাঁদ পণ করে বসেছে আকাশ ও পৃথিবীর কোন স্থান কোন রন্ধ্র কোন গুহাগহ্বর আজ অনালোকিত রাখবে না, সমস্ত দিবাভাগের মত স্পষ্ট আর উজ্জ্বল। সম্মুখে পথটা মৃত অজগরের মত নিশ্চল ভাবে শায়িত। সেই পথ ধরে আত্মপলায়িত জরা ছুটছে। পা ছড়ে গিয়েছে, কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, মাথার পাগড়িটা কখন কোন্ গাছের ডালে আটকে গিয়েছে কে জানে! বুকের পাঁজরের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা দমাদম হাতুড়ি পিটছে, যে কোন মুহূর্তে হাড়-পাঁজরা ভেঙে যাবে। আর চলে না, একবার দম নেবার জন্যে থামলো, ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। বসতে সাহস হয় না, আর যদি উঠতে না পারে! আর কিছু নয়, নরেন্দ্রনগরের সঙ্গে ব্যবধানটা দীর্ঘতর করতে এই তার প্রতিজ্ঞা।

কত দূর এলো দেখবার জন্যে পিছনে ফিরে তাকালো। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম। তাকিয়েই শিউরে উঠল আতঙ্কে, এ কি! ঐ তো নরেন্দ্রনগর—হাত বাড়ালেই যেন স্পর্শ করতে পারা যাবে। তবে সে কি এতক্ষণ একস্থানেই ছুটে মরেছে, না নরেন্দ্রনগর রাজপুরীটা তার পিছু ধাওয়া করে ছুটছে! পাহাড় অচল, নগর অচল, তারা আজ সচল হল কোন্ মন্ত্রে! জরার সম্বিৎ থাকলে বুঝতে পারতো যেখানকার পাহাড়, যেখানকার রাজপুরী সেখানেই আছে। একে পার্বত্য প্রদেশের আবহাওয়া স্বচ্ছ, তার উপরে পরিপূর্ণ চাঁদের আলো, তাই দূরকে এমন নিকট মনে হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল কিসের যেন কোলাহল, কারা যেন তার পিছু নিয়েছে! না, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, আবার সে আরম্ভ করলো ছুটতে।

কোলাহল বটে তবে তা মনুষ্যকৃত নয়। পাহাড়টার বাঁ দিকে গভীর খাদ, সেই খাদের মধ্যে প্রবাহিত ঝরনা—এই ঝরনাটাই উপত্যকায় নেমে খরস্রুতি নাম ধারণ করেছে। রাতের নিস্তব্ধতায় সেই ঝরনার স্পষ্টতর শব্দ জরার আতঙ্কিত কানে তার পশ্চাদ্ধাবমান রাজপুরীর লোকজনের কোলাহল। আবার ও কারা চাপা গলায় কথা বলে! গাছের পাতায় পল্লবে ফিসফাস শব্দ! কিন্তু কে বুঝবে, কার বুঝবার মত এখন মনোভাব!

হঠাৎ তার কানে এলো নিহত নয়কের আর্তনাদ, অসুর ভাই, রাজবাড়িতে খবর দাও গে। আর সঙ্গে সঙ্গে অসুরের তারস্বরে ঘোষণা: ওগো তোমরা জাগো—শীগগির ওঠো, বাসুদেব-হত্যাকারী পালালো। এ মনের বিকার নয়, কানের ভুল নয়, স্পষ্ট সজীব সত্য। হায় জরা, কান আর মন কি আলাদা! মন যা শোনায় কান তাই শোনে। কিন্তু মনের মধ্যে এলো কি ভাবে! আরে, মনের মধ্যেই যে ব্রহ্মাণ্ড! প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও এ বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না জরার, এখন সে তো পরিপূর্ণ বিকারগ্রস্ত।

জরা ভাবলো নগর তার পিছু পিছু ছুটবে, থামবে, এ সম্ভব নয়। তবে রাজবাড়ির লোকজনের তার পিছু নেওয়া অসম্ভব নয়। না, তাই ঘটেছে। তার মনে পড়লো আগামীকাল পূর্ণিমায় নতুন মন্দিরে বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ঠিক তার আগের দিনটিতে যদি জানতে পাওয়া যায় বাসুদেব-হত্যাকারী রাজপুরীর মধ্যে আছে, আর শুধু তাই নয়, সে রাজার প্রিয়পাত্র, বাসুদেবের দেশের লোক বলে, বাসুদেবকে স্বচক্ষে দেখেছে বলে বিশেষ অনুগ্রহ করে—

এখন সেই যদি নরাধম প্রতিপন্ন হয় তবে রাজার মনে দেখা দেবে উৎকট প্রতিক্রিয়া। পলাতক অপরাধীকে পাকড়াও করতে কোন চেষ্টার ত্রুটি হবে না তার দিক থেকে। এই সব যুক্তি জরাকে বোঝালো দারুণ কোলাহল করতে করতে ছুটে আসা রাজবাড়ির লোকজন। সে আবার ছুটলো।

কতক্ষণ ছুটেছে, কত দূরে এসেছে ছুটে! দেশকালের জ্ঞান নেই তার, এমন অবস্থাতে কারোরই থাকে না। তাড়া-খাওয়া শিকার যেমন মাঝে মাঝে পিছন ফিরে শিকারীর সান্নিধ্য অনুমান করতে চেষ্টা করে, তেমনি ভাবে পিছন ফিরে তাকালো জরা। কি আশ্চর্য! কোথায় নরেন্দ্রনগর, কোথায় কোলাহল! নিষুত রাত নির্জন নিঃশব্দ নিদ্রিত! এ কি হল! কোথায় গেল রাজবাড়ির লোকজন, কোথায় গেল তাদের কোলাহল! সমস্তই মায়া নাকি! আসল কথা, ছুটতে ছুটতে জরা অজ্ঞাতে মোড় ঘুরেছে, আর ঝরনাটাও খাদ বদলে অন্য খাদে গিয়েছে—তাছাড়া এদিককার পাহাড়ে গাছপালাও বিরল। কাজেই নরেন্দ্রনগর, লোকজনের কোলাহল, চাপা কণ্ঠের ফিসফাস সমস্তই লোপ পেয়েছে। এতক্ষণে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একখানা পাথরের উপরে বসলো, আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো কিছুই টের পেলো না।

জরার যখন ঘুম ভাঙলো, অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গিয়েছে। সূর্য প্রথম প্রহরের আকাশে, আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জন-দুই লোক—যাদের মুখটা চেনা-চেনা, তাদের চোখেও পরিচয়ের আভা। উভয়পক্ষ কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবার

পরে লোক দুটোই প্রথমে কথা বলল, তা আপনি এখানে এ অবস্থায় কেন?

জরা দিনের আলোয় এই প্রথম নিজের অবস্থা দেখল। পায়ে পাদুকা নেই, গায়ে আঙরাখা নেই, মাথায় উষ্ণীষ নেই, দেহে এখানে ওখানে ছড়ে গিয়েছে—সবসুদ্ধ মিলে যতদূর লক্ষ্মীছাড়া বেশভূষা হতে হয় তাই। জরা বলল, তোমাদের তো চিনলাম না।

আমরা আপনাকে খুব চিনি, আপনি মহারাজার পার্ষদ। তা এখানে কেন?

জরার চোখ প্রশ্ন করলো, তোমাদের তো চিনলাম না?

চোখের প্রশ্নের উত্তর মুখ দিল, বলল, আমরা রাজবাড়িতে কাজ করি। কাছেই আমাদের গাঁ ভিখনটুলি, সেখান থেকে রাজবাড়িতে যাতায়াত করি।

যতক্ষণ ওরা কথা বলছিল, সময়োচিত উত্তর ভেবে নিচ্ছিল জরা। এবারে সে বলল, আর বলো না বাপু, কালকে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত দেখে মনে ইচ্ছে হল শিকারে বের হলে মন্দ হয় না। বের তো হলাম, তারপরেই গোলযোগের সূত্রপাত হল। একে রাত্রিবেলা, তাতে এদিকটায় আগে আসিনি—পথ ভুল হল। কোন্ দিকে চলেছি বুঝতে না পারায় ঘোড়াটাকে বেঁধে যেমনি কতকটা অগ্রসর হয়েছি একসঙ্গে তিনজন দস্যুতে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো। অনেকক্ষণ লড়লাম। তারা তিনজন, আমি একা। এই দেখো না, কি অবস্থা হয়েছে—

বলে গায়ের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখিয়ে দিল। তারপরে বলল, উষ্ণীষ আঙরাখা অস্ত্রশস্ত্র তো গেলই, বেটারা ঘোড়াটা সুদ্ধ দক্ষিণাস্বরূপ নিয়ে গেল। একটু বিশ্রাম করবার জন্যে বসেছি কি ঘুমিয়ে পড়েছি।

লোক দুটো সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলল, তা আর কি করবেন, আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুন।

ওদের একজন বলল, এই পাহাড়গুলোয় চোর-ডাকাতের আস্তানা, কত নিরীহ লোক যে রাহাজানিতে প্রাণে মারা পড়েছে তার স্থির নেই। যাই হোক, বাসুদেবের কৃপায় আপনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন—এই ঢের!

জরা সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ বাপু, তাই।

তারা বলল, আর বসে থেকে লাভ নেই, চলুন আমাদের সঙ্গে।

জরা বলল, তোমরা এগোও, আর একটু জিরিয়ে নিয়ে আমি আসছি।

ওরা যেতে যেতে বলল, তবে আমরা রাজবাড়িতে খবর দিই গে—একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দেবে।

শঙ্কিত জরা নিষেধ করতে যাবে, দেখল, তারা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে

গিয়েছে। জরা বুঝলো আর একমুহূর্ত এখানে নয়। তাছাড়া এ পথেও অগ্রসর হওয়া চলবে না। সে নিশ্চয় জানতো বাসুদেব-হত্যাকারীকে পাকড়াও করতে রাজা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

যে পাহাড়টার কোণে বসেছিল জরা তার মাথায় উঠে দাঁড়াতেই এমন দৃশ্য তার চোখে উদ্‌ঘাটিত হল যার অনুরূপ দেখা দূরে থাক কল্পনাও করেনি। উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে বলে দেখা যায় অনেক দূর, কেবল পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়, ছোট বড় মাঝারি ঢেউ খেলে চলে গিয়েছে। ঢেউগুলোর মাঝখানে চাষের জমি, ক্ষীণ-স্রোতা ঝরণা, এক-আধখানা গ্রাম। বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে তির্যকভাবে ঐ যে গ্রামখানা ঝুলে আছে—খুব সম্ভব ঐ হচ্ছে ভিখনটুলি।

জরা পাহাড়ের দেশের লোক না হলেও ইতিমধ্যে পাহাড়ের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় হয়েছে, বুঝেছে পলাতকের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে তবে এই পাহাড়ের অরণ্যের মধ্যে তাকে পাকড়াও করা অসম্ভব না হলেও নিতান্ত কঠিন। পাহাড়ী পথে সর্বত্র ঘোড়া চলে না, কাজেই অনুসরণকারীকে পায়ের উপর ভরসা করতে হবে। তাতে দুজনেই সমান-সমান। আর বেগতিক দেখলে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে কতক্ষণ, আর লুকোবার মত গুহা-গহ্বরের তো মোটেই অভাব নেই। সে ভাবলো আসুক রাজবাড়ির লোক। আসবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না।

ভোরের আলোয় কতকটা সাহস পেয়েছিল জরা তবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাদের দাবি ছাড়বে কেন! অদূরে একটা ঝরনা দেখতে পেয়ে পেটভরে জল পান করলো, সেই সঙ্গে শীতল নির্মল জলে স্নান। সুযোগ পেয়ে ক্ষুধা নিজমূর্তি ধারণ করলো। কিন্তু কী খাবে!

অনেকের ধারণা প্রাচীনকালে মুনিঋষিগণ অরণ্যে বনজ ফলমূল খেয়ে জীবন-ধারণ করতেন। এর চেয়ে ভুল আর কিছুই হতে পারে না। বনে হরতকি আমলকি বহেড়া বুনো কুল খেজুর প্রভৃতি কয়েকটা ফল জন্মায় বটে, তবে সেসব খেয়ে কারো পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। পশুমাংস সুলভ, আর এক বনের পশু ফুরিয়ে গেলে বনান্তরে গেলেই চলে। যত কিছু সুস্বাদু ও সুখাদ্য ফলমূল এবং শস্য সমস্তই মনুষ্যের দীর্ঘকালের কৃষিচর্চার ফলে লব্ধ। তপোবনের একমাত্র শস্য নীবার ধান্যজাত তণ্ডুল অবিলাসী মুনিঋষিদের যোগ্য খাদ্য হলেও গৃহীর পাতে চলবে না, এমন কি রেশনের দোকানেও নয়। মোট কথা এই সেকালের তপোবনের জীবন বড় সুখের ছিল না, অন্তত খাদ্যের বিচারে, একথা বনচারী

জরার চেয়ে কেউ বেশি জানতো না। তাই সে অসম্ভবের আশা না করে হাতের কাছে দু-চারটে কটু কষায় ফল যা পেলো তাই কোনমতে গলাধঃকরণ করে একটা ঝোপের ছায়ায় উপবেশন করলো। আবার সর্বদুঃখহরা নিদ্রা।

পূর্ণ চৈতন্য ও গভীর সুষুপ্তির মাঝখানে একফালি চওড়া জমি আছে, তাকে স্বপ্নলোক বলা যেতে পারে। জরার মন তখন সেখানে বিচরণ করছিল। সে শপথ করে বলতে পারবে না স্বপ্ন দেখছিল, না বাস্তব ঘটনা দেখছিল! তবে অভিজ্ঞতা মিথ্যা নয়। একদল সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার সবেগে ছুটে আসছে, সঙ্গে কয়েকটা শিকারী কুকুর। একবার মনে হয় সত্য, একবার মনে হয় স্বপ্ন; শোনা যায় তাদের হলহলা ধ্বনি, শোনা যায় ঘোড়ার ক্ষুরের দড়বড়ি! অতি স্পষ্ট। স্বপ্ন কি এমন প্রত্যক্ষ হয়! ক্রমে তারা কাছে এসে পড়ে, জরা যেখানে শায়িত তার সিকি ক্রোশের মধ্যে। এবারে হঠাৎ তার তন্দ্রা ছুটে যায়—ঐ তো তারা! তবে তো স্বপ্ন নয়। জরা দেখতে পায় আট-দশজন অশ্বারোহী, কাঁধে তাদের তূণীর ও ধনুক, হাতে কারো বল্লম কারো অসি। বিদ্যুৎবৎ তার মাথায় খেলে যায় এ ঐ রাজবাড়ির লোক দুটোর কীর্তি। তারা গিয়ে সংবাদ দিয়েছে, পাকড়াও করতে ছুটে আসছে রাজপুরীর সৈনিকেরা। ও কে! অসুর না! ঐ যে সবার আগে! তবে আর সন্দেহের কী আছে! তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে ছোটে জরা।

পাহাড়ী দেশের লোক না হলেও এ কয়মাসে পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে, পাহাড়ের প্রকৃতি বুঝতে শিখেছে সে। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠা সহজসাধ্য নয়, তার চেয়ে দ্রুত ছুটবে সে। পাহাড়ের উপরে উঠতেই রাজানুচরদের চোখে পড়ে যায় জরা, ঐ যে, ঐ যে, ঐ যে পালায়! একসঙ্গে কয়েকটা তীর এসে পড়ে আশেপাশে। সাবধান, মেরো না, মহারাজা ওকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে বলেছিল।

এ কার গলা! কার আবার—অসুরের। এ গলা বেশ পরিচিত তার। জরা স্থির করে জীবিত তাকে কেউ ধরতে পারবে না। আক্ষেপ করে যে তীর-ধনুক হাতে নেই, থাকলে একলাই এ কটাকে নিকেশ করে দিতে পারতো।

ছুট ছুট ছুট। এবারে আর সরল পথে নয়—পাহাড়ের গা বেয়ে, বড় বড় পাথরের পিণ্ডগুলোর পাশ কাটিয়ে, কখনো লাফিয়ে কখনো মাথা নীচু করে, কখনো হঠাৎ মোড় ঘুরে, পাহাড়ী ছাগলের চেয়েও দ্রুততর, নিশ্চিততর, অধিকতর অশিক্ষিত পদক্ষেপে জরা ছুটছে। এক-একবার পিছন ফিরে দেখে লোকগুলো কতদূরে। না, দূরত্ব ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, এমন ভাবে চললে

ঘাড়ের উপরে এসে পড়তে আর বিলম্ব নেই। আবার ঐ যে কুকুরগুলো কান খাড়া করে জিব বার করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে ছুটে আসছে। জরা বোঝে এবারে আর রক্ষা নেই। তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, কোন দেবদেবীকে বা পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নয়—যাকে স্বহস্তে বধ করে ফেলেছে সেই জয়তীকে। জয়তী রে, এবার যে মরি। একখানি উঁচু পাথরের উপর থেকে তাকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ে, অসুর অবাক হয়ে যায়—এ কি, কোথায় গেল লোকটা! দশ হাতের মধ্যে ছিল, আর একেবারে অদৃশ্য! এ কি ভোজবাজি না ইন্দ্রজাল! মাটির মধ্যে তলিয়ে গেল, না বাতাসে গেল মিশিয়ে! না, কোথাও জরার চিহ্নমাত্র নেই।

অন্য সকলে অসুরের পাশে এসে দাঁড়ায়, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে, এ কি হল, কোথায় গেল! বাতাসে মিশে গেল, না মাটিতে তলিয়ে গেল! সবচেয়ে বেশি অসুর, কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে, শুধু বলে, তাই তো!

কালকে রাতে তারস্বরে রাজপুরীর লোকজনকে জাগিয়ে তুলিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিয়েছিল, বলেছিল, শোনো—বাসুদেবের ভক্ত রাজা ও রাজপুরী, ঐ লোকটা তাঁকে হত্যা করেছে। এই হত্যার গুরুত্বে নরকের মৃত্যু এতই তুচ্ছ ব্যাপার যে সেটা কেউ দেখেও দেখল না।

ভোরবেলা নরেন্দ্রনগররাজ সমস্ত শুনলেন, বললেন, যেমন করে পারো তাকে ধরে নিয়ে এসো, পালাতে দিলে চলবে না।

কিন্তু কোথায় সে! কোন্ দিকে গিয়েছে! এমন সময়ে ভিথনটুলির সেই রাজ-ভৃত্যরা এসে সংবাদ দিলে তাদের গাঁয়ের কাছে দেখেছে জরাকে।

রাজা আদেশ করলেন, শীগগির যাও, ধরে আনা চাই। অসুর, সেই লোক দুটো আরও জনসাতেক ছুটলো জরার সন্ধানে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকটা সময় গিয়েছে, জরা আরও দূরে এসে পড়েছে। জরার আকস্মিক অন্তর্ধানে ওরা যখন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তখন বেলা অপরাহ্ণ। পাহাড়ে ভোরের আলো এবং সন্ধ্যার অন্ধকার দুই ত্বরান্বিত আসে। ওরা যখন কিংকর্তব্য চিন্তা করছে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ওদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

॥ ২ ॥

জরা ওদের চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়, ভাবে, ব্যাপারটা কি হল! হঠাৎ কি মাটির তলায় তলিয়ে গেল, না কোন গুহার মধ্যে এসে পড়লো! মাটির তলায় যদি, তবে নিশ্বাস নিচ্ছে কিভাবে! গুহার মধ্যে যদি তবে ঢুকলো কি ভাবে! মাটির তলা হোক কিংবা গুহার মধ্যে হোক দুয়ে একটা মিল আছে—ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এলো কিভাবে! অবশ্য তখন তার এসব খুঁটিয়ে বিচার করবার মত মনের অবস্থা নয়। পড়ি কি মরি করে প্রাণের দায়ে ছুটছে। তবু মনে পড়লো, এই নিরেট অন্ধকারের মধ্যে বসে মনে পড়লো আততায়ীদের হাত এড়াবার আশায় যখন হঠাৎ মোড় ফিরতে উদ্যত তখন পিছন থেকে একটা হেঁচকা টান যেন অনুভব করেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেবেছিল গাছের ডাল-পালা হবে। তারপর কিছুক্ষণ সম্বিৎ ছিল না, তারপরে ঘোরান্ধকার। মাটির তলায়, না গুহার মধ্যে!

মাটিতে বসে যখন সে জিরোচ্ছে আর সেই সঙ্গে বিস্ময়টাকে পরিপাক করবার চেষ্টা করছে, অদূরে অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার কানে এলো একটা অস্ফুট অদ্ভুত শব্দ। হুঁ-হুঁ, হুঁ-হুঁ, হুঁ-হুঁ! এ আবার কি! মানুষ নয় নিশ্চয়! মানুষে এমন শব্দ করে না। জন্তু-জানোয়ার হবে। খুব সম্ভব বুড়ো বুনো ছাগল, কাছেই কোথাও পড়ে ধুঁকছে। বনের মধ্যেই এমন দেখেছে। ক্রমে ঐ শব্দটা কাছে আসতে আসতে একেবারে হাতখানেকের ব্যবধানে এসে পড়লো।

হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ হুঁ—বলি কি ভাবছ?

এ যে মানুষের কণ্ঠস্বর! সাহস পেয়ে জরা শুধায়, প্রভু, আপনি কে?

তুমি কি ভেবেছিলে বলো তো?

জরা উত্তর দেয় না।

বলই না, লজ্জা কিসের? বুড়ো ছাগল ভেবেছিলে নিশ্চয়!

জরা সত্যি তাই ভেবেছিল, তবে মুখের উপরে তা তো আর বলা যায় না। চুপ করে থাকে।

আরে বলোই না, ক্ষতি কি।

জরা বলে, কি করে জানলেন প্রভু?

পাঁচজনে বলে তাই জানলাম।

এবারে সাহস পেয়ে জরা শুধালো, প্রভু, এখন তো মানুষের মতো কথা বলছেন, তবে আবার ও-রকম অদ্ভুত শব্দ করেন কেন?

কেন? আমার চেহারাখানির সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে। একবার আমার চেহারাখানি দেখলে বুঝতে পারবে ঐ রকম অদ্ভুত শব্দটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তবে যে মানুষের মতো কথা বলি সেটা পূর্বসংস্কারবশতঃ।

কিছুই বুঝতে পারে না জরা। তবে এটুকু বোঝে, কিছু বলা আবশ্যক। বলে, প্রভু, কখন আপনার দেখা পাবো?

বুঝেছি, আমার মুখখানি দেখে সন্দেহভঞ্জন করতে চাও। তা এখুনি পাবে। একটু অপেক্ষা করো, আরো ওরা দূরে যাক, এখনো কাছাকাছি আছে। ভাবছে তুমি নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছো। আর তাদের রাজার বাবার সাধ্যি নেই তোমাকে খুঁজে বের করে—একেবারে গর্ভগৃহে লুকিয়ে রেখেছি না!

কি করে জানলেন প্রভু?

প্রভু কোন উত্তর দেয় না, তার বদলে সেই রহস্যময় শব্দ করে—হুঁ-হুঁ, হুঁ-হুঁ-হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে সেই রহস্যময় লোকটি বলে, নাও, এবারে চন্দ্রালোকে আমার মুখচন্দ্র দর্শন করো। বলে পাথরের দেয়ালে ঠেলা দেয়—একখানি পাথর সরে যায়। পাথরখানা সরে যেতেই অনেকখানি চাঁদের আলো এক ঝলকে ঢুকে পড়ে লোকটির মুখের উপরে পড়ে। সে মুখ দেখে অবাক হয়ে যায় জরা।

ভীষণ মুখ বটে খট্টাসের। সে মুখ দেখলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে—কতক্ষণে ছুটে পালাবে ভাবে দর্শক। এ মুখের ছাঁদ স্বতন্ত্র। রহস্যময় বললে যথার্থ হয়। মুখখানি যেন দর্শকের দিকে তাকিয়ে রহস্য করছে; দেখলে হাসিও পায়, আবার করুণাও হয়। মুখমণ্ডল শুকিয়ে একটি শুষ্ক হরিতকীর মত শীর্ণ-জীর্ণ, চিবুকে একগোছা কাঁচা-পাকা দাড়ি। আর চোখ দুটি ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল। জরার মনে হল মনুষ্য হওয়া সত্ত্বেও কোথাও যেন বুনো ছাগলের সঙ্গে মিল আছে সে-মুখে।

কি, দেখলে তো?

জরা শুধালো, প্রভু, আপনাকে কি বলে ডাকবো?

সবাই যা বলে ডাকে—ছাগর্ষি।

বুঝতে পারে না জরা। তার অবস্থা বুঝতে পেরে বলে, পেটে বুঝি ঢু-ঢু, টোল চতুষ্পাঠীর সঙ্গে বুঝি জন্ম থেকেই আড়ি!

অপ্রস্তুত জরা বলে, প্রভু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া শিখবো কি করে!

তা বেশ করেছ। লেখাপড়া শিখে যারা মূর্খ হয় তাদের তুলনা নেই। তা বাড়ি কোথায়? এ-দেশী লোক যে নও চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।

জরা বলে, দক্ষিণ দেশে।

ব্যবসা কি ?

জরা আবার বলে, ব্যাধ।

চমকে উঠে লোকটি বলে, দক্ষিণ দেশে বাড়ি, ব্যবসা ব্যাধগিরি ! বাহা বাহা ! শুনেই পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

জরা তো অবাক, মূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

আরে, এটা বুঝলে না, তোমাদেরই জ্ঞাত-গোত্রের কারো শরাঘাতে সেই কালান্তক বেটা সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছে।

জরা ভাবে, এ কি, এই সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গুহার মধ্যেও সে সংবাদ প্রবেশ করেছে !

বুঝতে পারছ না ? আমি বসুদেবের বেটা বাসুদেবের মৃত্যুর কথা বলছি। দেখলে না, কেমন ঘোঁট পাকিয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে আর আঠারো অক্ষৌহিণী নিরীহ প্রাণী মারা পড়লো ! এ নাটের গুরু তো সেই বেটা। তেমনি আক্কেলও হয়েছে। বেঘোরে মারা পড়লো এক ব্যাটা ব্যাধের তীরের আঘাতে।

প্রভু, এ কি বলছেন, তিনি যে ভগবান ! আজ নরেন্দ্রনগরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

খুবই স্বাভাবিক। রাজা বেটাদের কাজই হচ্ছে মানুষ মারা। সেই মানুষ মারার সর্দারের প্রতি তাদের ভক্তি হবে না তো কার উপরে হবে ! থাক, এসব কথা বুঝবে না, তোমার বিদ্যার দৌড় বুঝে নিয়েছি কিনা।

প্রসঙ্গান্তরে খুশী হয়ে জরা শুধালো, কি বলে ডাকবো প্রভু আপনাকে ?

কেন, ঐ যে বললাম ছাগর্ষি। ছাগ ঋষি সন্ধি করলে দাঁড়ায় ছাগর্ষি। আর সমাস করলে—আচ্ছা ওটা না হয় থাক, সমাস বোঝাতে ছ মাস লাগবে।…হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ, হুঁ-হু।

জরা সঙ্কোচে নিবেদন করে, ও নামে কি ডাকা যায় আপনাকে !

আরে, এ তো তবু সংস্কৃত ভাষা। দেবভাষার মাহাত্ম্যে কত কদন্ন পার হয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের লোক আমাকে সোজাসুজি ছাগলা, ছাগলা ঋষি, বুনো ছাগল, পাহাড়ী ছাগল কত নামেই না ডাকে।

আপনি অপ্রসন্ন হন না ?

অপ্রসন্ন হলে চলবে কেন ? ওরা যে আমার অন্ন যোগায়, তা একটু রহস্য করবে বইকি।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে ! কখন খেয়েছিলে ?

এতক্ষণ উত্তেজনাবশে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল জরা, এবারে খাদ্যের নামে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, বলল, কালকে রাতে।

তবে তো ক্ষিদে না পেয়ে যায় না, দেখি কিছু আছে কিনা। এসো আমার সঙ্গে।

দু-চার পা চলতেই মোড় ঘুরতে হল, সেখানে ঘোর অন্ধকার।

প্রভু, কিছু যে দেখতে পাই না।

আমার হাত ধরো। আমার আবার কি জানো, অন্ধকারে যেমন দেখতে পাই আলোতে তেমন নয়। বুঝলে না, চল্লিশ বছর এই গুহার মধ্যে আছি। বের হইনি, অন্ধকার বেশ সড়গড় হয়ে গিয়েছে।

বের না হলে আমাকে রক্ষা করলেন কি করে ?

তাতে বের হওয়ার প্রয়োজন হবে কেন ? ঐ যে পাথরখানা ঠেলে সরাতে চন্দ্রালোক এসে ঢুকলো, মাঝে মাঝে ঐ পাথরখানা ঠেলে সরিয়ে মানুষের রঙ্গ-রহস্য দেখি। তখন ঘোড়ার ক্ষুরের দড়বড়ি শুনে পাথর ঠেলে দেখি যে তোমাকে ধরলো বলে—তখন এক টানে তোমাকে ভিতরে টেনে নিয়ে আবার পাথরখানা ঠেলে দিলাম। বেটারা খানিকটা এদিক-ওদিক করে ফিরে গেল। নিশ্চয় নরেন্দ্রনগরের লোক, কি বলো ?

হ্যাঁ প্রভু।

তা তোমার উপরে এমন সদয় কেন ? নাও খেতে খেতে বলো শুনি।

এই বলে খানকতক বাজরার রুটি আর একটু শাক ও চাটনি দিল, সেই সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে জল।

জরা গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করলো, তার মুখে সেই শুকনো রুটি অমৃতের স্বাদ দেয়। ক্ষুধার অন্ন অমৃত, বিলাসের অন্ন গরল।

জরা বলল, প্রভু, আমি রাজরোষে পড়েছি।

সে তো বাপু বুঝতেই পারছি। ঘোড়সওয়ার দিয়ে তাড়া করে যে বিয়ের বর সন্ধান করে না, এ তো সকলেই জানে। হঠাৎ রাজার রোষটা হল কেন তাই শুধোচ্ছি।

হঠাৎ রাজার প্রসাদ লাভ করেছিলাম, তারই পাল্টা হল হঠাৎ রাজার রোষ।

বেশ, এও সহজবোধ্য। এবারে হঠাৎ প্রসাদ ও হঠাৎ রোষের কারণটা বলো দেখি।

জরা বলে, রাজা বাসুদেবের ভক্ত।

তা শুনেছি।

আমি বাসুদেবের দেশের লোক শুনে আমার প্রতি প্রসন্ন হলেন।

তুমি বাসুদেবের দেশের লোক! চমকে ওঠে ছাগর্ষি, কই, একথা তো বলোনি?

ঐ যে বললাম—দক্ষিণ দেশের লোক।

হ্যাঁ, এখান থেকে দ্বারকা দক্ষিণে বটে, তবে আরও অনেক দেশ তো দক্ষিণে, কেমন করে বুঝবো যে তুমি দ্বারকার লোক!

আপনি বাসুদেবের প্রতি অপ্রসন্ন তাই বলিনি।

এখন তর্কের মুখে বলতে বাধ্য হলে, কি বলো?

জরা চুপ করে থাকে।

তারপরে, রোষের কারণ?

রাজার একজন প্রিয় পাত্রকে হত্যা করে ফেলেছি।

কেন বলো তো?

সে আমাকে আক্রমণ করেছিল।

আততায়ীকে হত্যা তো অপরাধ নয়।

সে-কথা বলবার অবকাশ পেলাম কই?

প্রকৃত ঘটনা বলতে ভরসা পায় না জরা।

ছাগর্ষি বলে, ওসব কথা থাক, এখন খেয়ে নাও।

জরার আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ছাগর্ষি বলল, এই গুহার শেষের দিকে একটা ঝরণা আছে, সেখান থেকে আমি জল সংগ্রহ করি।

আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আপনি দেখছেন কি করে?

আমি যে আজ চল্লিশ বছর এই গুহার মধ্যে বাস করছি। অন্ধকারে চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে অনায়াসে দেখতে পাই, বরঞ্চ আলোতেই এখন কষ্ট হয়। তাই সারাদিন পাথরখানা দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে রাখি। বাতাস আসে, আবার চাঁদের আলোও আসে। তবে আজ বেশিক্ষণ আলো পাওয়া যাবে না। আজ চন্দ্রগ্রহণ—একেবারে পূর্ণগ্রাস।

গ্রহণ শব্দটি শুনবামাত্র জরার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে ওঠে। শীতান্তে সর্পের মত জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি। সে মূঢ়ের মত আবৃত্তি করে চলে—গেরণ, গেরণ, তাই তো!

গ্রহণ শুনে অবাক হলে কেন, কখনও কি গ্রহণ দেখনি?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জরা শুধায়, ভূমিকম্পও হয় নাকি?

প্রায়ই, পাহাড়ে দেশের রীতিই এই।

আচ্ছা প্রভু, সমুদ্র তেড়ে আসে না?

সমুদ্র এখানে কোথায়? পাগল হয়ে গেলে নাকি? হ্যাঁ বাপু, কৌশলে আমার নামটি তো জেনে নিলে, এবারে তোমার নামটি বলো তো শুনি। কতক্ষণ আর সর্বনাম দিয়ে চালানো যায়!

প্রভু, আমার নাম জরা ব্যাধ।

বেশ নামটি তো! জরা ব্যাধ। কে দিয়েছিল এ নামটা? তোমার বাপ-মা দেখছি তত্ত্বদর্শী ছিলেন। জরা ব্যাধ! জরা তো ব্যাধই বটে, তার বাণে সকলকেই নিহত হতে হবে।

ছাগর্ষির এসব কথা জরার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা নিজের উদ্দেশ্যে। জীবন-রহস্যকে সে যেন লাভ করলো একটা সূত্রাকারে। জরা ব্যাধ কিনা জরাব্যাধি।

জরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কি জানি কোন্ স্মৃতির টানে কোন্ গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে! তাই সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার আশায় শুধোয়, প্রভু, আপনি এই গুহায় একাকী চল্লিশ বৎসর বাস করছেন কেন?

হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ! সে অনেক কথা, তুমি বুঝবে না। পেটে বিদ্যা না থাকলে সে কথা বোঝা যায় না।

বুঝিয়ে দিলে অবশ্যই বুঝবো।

না, তাও বুঝবে না। বাতিতে তেল থাকলে তবে আলো জ্বালানো যায়। সে তেলটুকুই যে নেই তোমার ঘটে।

ছাগর্ষি বুঝাতে পারে, জরা বুঝতে পারলো না।

তবে শোনো বলি, অনেক বিষয় আছে যা বোঝবার জন্যে গোড়ায় একটু জ্ঞান থাকা দরকার। তোমার সেই গোড়ার জ্ঞানটুকুর অভাব। তবে এই পর্যন্ত শুনে রাখো যে মানুষের সঙ্গে আমার বনলো না।

কেন প্রভু?

ঘটনাটা শুনে নাও, তত্ত্বটা বুঝতে চেষ্টা করো না। আমি অমরাবতী রাজ্যের রাজা ছিলাম। ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, সৈন্যসামন্ত, রূপ, যৌবন কিছুরই অভাব ছিল না আমার, সকলেই আমার জয়ধ্বনি করতো, ভাবতাম তারা আমাকেই চায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম যে তারা আমার ধন, রূপ, যৌবন, শক্তির জয়ধ্বনি করছে, সে জয়ধ্বনি আমার উদ্দেশ্যে নয়। আমার ধারণা যে অমূলক

নয় প্রমাণ হতে দেরি হল না। দারুপত্তনের রাজা আমার রাজ্য জয় করে নিয়ে আমাকে বিতাড়িত করে দিল। রাজ্য ছেড়ে পালাবার সময়ে শুনতে পেলাম তেমনি জয়ধ্বনি উঠছে, তবে এবারে তা বিজয়ীর উদ্দেশ্যে। ভাবলাম, তাহলে বিত্ত, রাজ্য, রূপ, যৌবন, শক্তির এই মূল্য, এই প্রকৃতি, এই পরিণাম। তখন হু-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ! কি করলাম বলতে পারো?

জরার নিরুত্তরতা প্রমাণ করে সে বুঝতে পারেনি।

রাজ্য ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরী হলাম। স্ত্রী-পুত্র কেউ এলো না সঙ্গে, কাজেই নিঃসঙ্গ। সে ভালই হল, কারো কাছে দায়িত্ব নেই। আমারও কোন দায় নেই। লোকে দরিদ্রকে ভিক্ষা দেয়, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেয়। রাজ্যচ্যুত রাজাকে ভিক্ষা দেবে কে? বরঞ্চ সকলেই যেন খুশী। ভাবটা এই যে, কেমন এখন হয়েছে তো! খুব যে রাজা সেজে সকলের মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাতে। এখন নাও, পথে পথে হা-অন্ন হা-অন্ন করে ঘুরে মরো! দু'চারদিনে মানুষের মনোভাব বুঝতে পেরে জনপদ ছেড়ে দিয়ে বনে চলে এলাম। তখন খাদ্য-পানীয় গাছের ফল আর নদীর জল। ক্রমে এসে উপস্থিত হলাম এই পাহাড়ী দেশে। এখানে দূরে দূরে পাহাড়ীদের ছোট ছোট গ্রাম। নীচু জমিতে চাষ আর পাহাড়ময় ছাগলের পাল। ছাগল হচ্ছে পাহাড়ীদের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। ওরা দুধ যোগায়, মাংস যোগায়, মাল বহন করে, ওদের চামড়া দিয়ে পাদুকা তৈরী করে, যা নইলে পাহাড়ে চলাফেরা করা দায়। কি, শুনছ, না ঘুমিয়ে পড়লে?

না বাবা, শুনছি।

বেশ মন দিয়ে শোনো। একদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এই পাহাড়ের কাছে একটা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম পাতলা হয়ে আসতেই অনুভব করলাম পেটের মধ্যে ক্ষুধায় করাত চালাচ্ছে। ভাবছি কোথায় যাই, কী খাই, না হয় পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেই সব জ্বালা জুড়াই। চোখ খোলবার বড় ইচ্ছে আর ছিল না, কিন্তু চোখ বুজেই বা কতক্ষণ পড়ে থাকা যায়। তাকিয়ে দেখি আমার কাছে একটি ছাগী দাঁড়িয়ে আছে, দুধের ভারে তার বাঁট ঝুলে পড়ে টনটন করছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে সে এগিয়ে গেল, তার বাঁট-দুটো আমার মুখের কাছে। মনে হল সে আমার কোন জন্মের মা, সন্তানের ক্ষুধা টের পেয়ে এগিয়ে এসেছে। আমি সেখানে শুয়ে শুয়ে পেট ভরে তার দুধ পান করলাম। আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে ছাগলটা গাঁয়ের দিকে চলে গেল। সেই মাতৃদুগ্ধ পান করে নূতন জীবন লাভ করলাম। শুনছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেখো কেমন গল্প ফেঁদেছি। ইচ্ছে আছে, কোনদিন যদি লোকালয়ে যাই তবে এই কাহিনী নিয়ে ছাগপুরাণ রচনা করে অষ্টাদশ পুরাণের সঙ্গে যোগ করে দেবো। তবে তা আর হয়ে উঠবে না।

কেন প্রভু?

থামোকা প্রশ্ন করো না। মন দিয়ে শুনে যাও। আমার মনে হল ছাগলটা আবার আসবে আমাকে স্তন্যপান করাতে। তাই সেখানেই রয়ে গেলাম। দেখি, হ্যাঁ, সকালবেলাতে সে এসে উপস্থিত হয়েছে। মাতৃকোলে শুয়ে পেট ভরে দুধ পান করলাম, মায়ের দুধের স্বাদ তো বড় হলে মনে থাকে না। ভাবলাম এই-রকমই অমৃতময় হবে। তার পর থেকে রোজ দুবেলা আমার ছাগমাতা এসে মানবসন্তানকে দুধপান করিয়ে যায়। ভাবতাম আমি কেন ওর ছোট্ট বাচ্চাটি হলাম না, মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম, উপত্যকার সবুজ ঘাস খেতাম, ক্ষিদে পেলে পেট ভরে দুধ খেতাম। তা না হয়ে, হায়, আমি মরতে কেন মানুষ হতে গেলাম, তায় আবার রাজা! পূর্বজন্মে অনেক ব্রহ্মহত্যা নর-হত্যা করলে তবে রাজা হয়ে জন্মায়। যাক গে ওসব বাজে কথা, এবারে কাজের কথা শোনো। ক্রমাগত ছাগলের দুধ পান করবার ফলে দেখি আমার কণ্ঠস্বরে বেশ ছাগলের ডাকের গিটকিরি খেলতে শুরু করেছে। হুঁ-হুঁ, হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ! কেমন না? আর একদিন পল্বলে জলপান করতে গিয়ে দেখি, বা বা বা! চেহারাটি বেশ ছাগভাবযুক্ত হয়ে উঠেছে। ছাগলা দাড়ি, ছাগলা মুখ, ছাগলা চোখ—কণ্ঠটি তো অবিকল। ইতিমধ্যে হয়েছে কি জানো, পাহাড়ীরা লক্ষ্য করেছে যে রোজ ছাগলে এসে আমাকে দুধ খাইয়ে যায়, তার উপরে আমার মুখের চেহারা আর কণ্ঠস্বর! সরল পাহাড়ীদের ধারণা হল আমি ছাগজাতির দেবতা, দয়া করে দেখা দিয়েছি। তারা ভাবলো এখানে যতদিন থাকবো তাদের ছাগপালের মঙ্গল হবে, তারা মড়কে মরবে না, শ্বাপদের হাতে মরবে না। আমাকে এখানে স্থায়ী করবার আশায় নিত্য বাজরার রুটি, শাক, চাটনি, লাড্ডু প্রভৃতির ভোগ যোগাতে লাগলো, অন্নাভাব আমার ঘুচে গেল।

এতক্ষণ জরা নীরবে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনছিল। এবারে বলল, প্রভু, তবেই তো দেখলেন মানুষের মনে দয়ামায়া আছে।

রামচন্দ্র! আমাকে মানুষ মনে করলে কি ভোগ যোগাতো। তাছাড়া স্বার্থ যে! স্বার্থের দান তো বেতন, তাকে দয়ামায়া বলছ কেন? ওরাই আমাকে এই গুহাটা দেখিয়ে দিল। এখন এখানে বেশ স্থায়ী হয়ে বসেছি, দুবেলা ভোগ খাই, মাঝে মাঝে মুখখানা বের করে দর্শন দিই, হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করে

ছাগলাত্ম জ্ঞান ছাড়ি। এখানেই আছি, এখানেই থাকবো, এখানেই মরবো। আর পরজন্মে ছাগশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে এই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফালাফি করে বেড়াবো।

প্রভু, মার্জনা করবেন, কথকতার আসরে শুনেছি যে যিনি ছাগ সৃষ্টি করেছেন মানবও তাঁর সৃষ্টি।

ঐ সব ছেঁদো কথা রাখ তো। বিধাতারও ভুল হয়ে থাকে। ঐ ছাগ পর্যন্ত এসে থামলেই যথার্থ হত। আবার মানুষ কেন?

শুনেছি মানুষ সব সৃষ্টির সার।

বটে বটে! সার তবে সমস্ত দোষের সার। ছাগলের রিরংসা, কুকুরের স্বজাতি বিদ্বেষ, ছাগলের শঠতা, মেষের ভীরুতা, বানরের অনুকরণপ্রিয়তা, সর্পের প্রতিহিংসা স্পৃহার ঘনীভূত মূর্তি মানুষ। আর কোন প্রাণী কি উপকারীর অপকার করে? আর কোন প্রাণী কি খাদ্যদাতার হস্ত দংশন করে? আর কোন প্রাণী কি নখদন্তকে যথেষ্ট না মনে করে নরমেধী অস্ত্র উদ্ভাবন করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে? তবে কি জানো, আর বেশিদিন নয়, বিধাতার ভ্রম সংশোধন করবার ভার মানুষ নিজেই গ্রহণ করেছে। ঐ যদুবংশের ইতিহাসটাই সমগ্র মানুষজাতির অনতিদূরবর্তী ইতিহাস। বিধাতা যখন মারতে চান, নিজে কষ্ট স্বীকার করেন না, মুমূর্ষুর হাতে অস্ত্র যুগিয়ে দেন। বাসুদেবের উপর আমার রাগের কারণ মুমূর্ষুর হাতে অস্ত্র যুগিয়ে দেন। বাসুদেবের উপর আমার রাগের কারণ কৌরব পাণ্ডব যদুবংশ যদি নাশ করলেন, বাকি কটাকে রাখতে গেলেন কেন। মোট কথা এই যে মানুষের সঙ্গে আমার বনলো না তাই মানুষকে একঘরে করেছি। বুঝলে কিছু? হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ।

জরা বলে, প্রভু, মানুষের উপরে আপনার যদি এতই রাগ তবে আমার উপরে এই অনুগ্রহ কেন?

তাই তো ভাবছি ভিতরে হয়তো কোথাও কাঁচা রয়ে গিয়েছে। তবে আর বেশীক্ষণ নয়, কাল সকালেই তুমি বিদায় নাও। নাও, এখন ঘুমোও, রাত অনেক হয়েছে।

তারপরে বলে, ঐ পাথরখানা খোলা রয়েছে, রাতের বেলা খোলাই থাকে, ঐ ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি ঐ কোণায় ঘুমোচ্ছি, আমার আবার আলো সহ্য হয় না।

এই বলে ছাগর্ষি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হল।

জরা ঐ ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না

তার চোখে, তার বদলে নানারকম চিন্তা মাকড়সার মত জটিল জাল বুনতে লাগলো সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন করে। চরাচর নিঃশব্দ, কেবল গুহার কোন্ অন্ধকার কোণ থেকে মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগলো হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ শব্দ।

পাথরখানার ফাঁক দিয়ে চন্দ্রগোলকের কতকটা দেখতে পাওয়া যায়, সেই দিকে তাকিয়ে থাকে জরা। মাঝে মাঝে কানে আসে নিশাচর পাখির কলরব, নিদ্রিত পাখির পাখা ঝটপটানি আর শ্বাপদের গর্জন। এই শেষের রবটার সঙ্গে সে খুব পরিচিত, একসময় ওদের সন্ধানেই ফিরতো, হরিণের আর্তনাদ, বাঘের হুঙ্কার, ভালুকের হাসির ন্যায় চিৎকার, বুনো কুকুরের তারস্বর সমস্তই তার চেনা। এত প্রাণীও আছে পাহাড়টায়—অথচ দিনের বেলায় কিছুই বুঝতে পারেনি—কোথায় থাকে তারা সারা দিনমান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা আবার ফিরে আসে কোটরে। ও যেন একটা পাখি, কিন্তু কোটরে তো শান্তি নেই, মনটা থেকে থেকে পাখা ঝটপটিয়ে ওঠে। তার চোখ দুটো আকাশের দিকে, মনটা কোটরস্থ।

দুঃখের লোষ্ট্রখানা পড়েছে মনের মধ্যে, চিন্তার তরঙ্গবলয় ক্রমবর্ধিত পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, তার গতির আর সীমা নেই। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা সেই তরঙ্গতাড়নে পাতার ভেলার মত কাঁপতে থাকে। সেই নিদারুণ শরাঘাত, জরতীর মৃত্যু, মদিরার কুটিরে আগমন, বনের দিকে প্রস্থান, খট্টাসের হাতে আত্মসমর্পণ, ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার প্রয়াস, রাজ্যাভিষেক, যদুবংশীয়দের অনুসরণ, আক্রমণ ও বন্দীদশা, তক্ষশিলার বাজার, সুমন্তনগর, নরেন্দ্রনগর, নরককে হত্যা ও পলায়ন, অবশেষে ছাগঋষির গুহায়। এদের যে কোন একটি ঘটনা নৌকো বানচাল করবার পক্ষে যথেষ্ট, আর এতগুলো তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করেও সে যে এখনো জীবিত, তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সুমন্তনগর ও নরেন্দ্রনগরের রাজপ্রাসাদ মনে ধারণা জন্মে দিয়েছিল যে পাপটা অলীক, কেননা পাপের পরিণাম তো সুখ হতে পারে না। তবে সে এত সুখী কেন, এত সুখ কেন তার ভাগ্যে। তবে তো খট্টাস মিথ্যা বোঝায়নি যে, হত্যা করে পাপ করেনি, হত্যায় পাপ নেই। আর হত্যাও তো সে অল্প করেনি। বাসুদেব, জরতী, নরেন্দ্ররাজ ও মদিরা, তারপরে নরক। এ যে অনেকগুলি। তখনি মনে পড়ে জরার এ কথা যদি সত্য তবে আবার দুঃখের মধ্যে পড়লো কেন। কিছুই বুঝতে পারে না। তখন মনে পড়ে যায় পাথরভাঙা গ্রামের সুবালার সরল প্রশ্ন। পাপ কাকে বলে? পাপ বলে কিছু তো জানে না তারা। বেশ সুখে আছে তারা। ভাবে সেই বা দুঃখে পড়বে কেন? এ কেনর সদুত্তর নেই। আসল

কথা এই যে এর সদুত্তর দেওয়ার সাধ্য নেই জরার, ঘটনাক্রমের ক্রীড়নক সে, ঘটনাক্রমে বিচারক নয়।

জরা তাত্ত্বিক নয় যে জীবনের সমস্ত ছিন্নসূত্র জোড়া দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে, যেমন পৌঁছেছে ছাগর্ষি, তা যতই ভ্রান্ত হোক না কেন। সে হালভাঙা পাল-ছেঁড়া কর্ণধারহীন জল-হাওয়ার ষড়যন্ত্রের অধীন অসহায় নৌকোমাত্র। যখন দুঃখের খাদে পড়ে ভাবে দুঃখটাই জীবনের নিয়ম, আবার যখন সুখের তরঙ্গশীর্ষে ওঠে ভাবে দুঃখটা অলীক, জীবন সুখময়। তৎসত্ত্বেও একটা স্থূল বিষয় বোঝে, সেই অসতর্ক শরাঘাতে বাসুদেবকে হত্যার পর থেকেই এই দুর্গতির, সুখদুঃখের ওঠাপড়ার সূত্রপাত হয়েছে তার জীবনে। না জানি আরও কী আছে ভবিষ্যতের জন্যে। এখন কোথায় যাবে, কী করবে জানে না। এইটুকু জানে যে এই বর্তমান মুহূর্তটি মাত্র তার হাতে আছে। এইটুকু মাত্র যার সম্বল তার মত হতভাগ্য আর কে আছে।

কতবার সে স্থির করেছে সেই মূল ঘটনাটিকে সে বিস্মৃত হবে, কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দেবে না মনের মধ্যে। কিন্তু যখনি ধীর ভাবে মনের মধ্যে তাকায় চোখে পড়ে বাম চরণ ভেদ করে একটি পদ্মরাগবর্ণ রক্তরেখা নির্গত হচ্ছে, কচি দূর্বাতৃণের মত কান্তিময় দিব্যদেহ নিশ্চল হয়ে রয়েছে, একবার দক্ষিণ পানি উত্তোলন করে কী জানালো—অভয়, না সান্ত্বনা, না কী। সেই রক্ত ওষ্ঠাধর পুট, সেই নিমীল নেত্র, সেই প্রশস্ত ললাট। না, এসব কিছুতেই মনে আনবে না। কিন্তু সাধ্য কি? মনের মধ্যে পাথরে গাঁথা হয়ে গিয়েছে—সে ঐ চন্দ্রগোলকের মধ্যে শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য। কিন্তু এ কি, চাঁদটা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কেন? আলো এমন ক্ষীণ হয়ে এলো কেন? ও কিসের ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে চন্দ্রলোকের গায়ে? আবার ও কি অনুভব করছে সে, পিঠের তলাকার পাথরখানা নড়ছে কেন? আর ঐ চাপা গুরু গুরু শব্দ কিসের! সে চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠে—গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্রের কোলাহল! ক্রমাগত এই তিনটি শব্দ আর্তনাদ করে বলতে থাকে। গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্র!

হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ! কি হল আবার এত রাতে।

প্রভু, গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্র! সেই সেদিনকার মত।

কোন্ দিনকার মত আবার?

সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বলে, প্রভু, ঐ দেখুন আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, পৃথিবী আড়মোড়া ভাঙছে, সমুদ্র হাঁ করে ছুটে আসছে। ঠিক সেইদিনকার মত।

কোন্ দিনকার মত বলছ জানি না, তবে তিথি অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ যথাসময়ে হয়েই থাকে আর পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমিকম্প প্রায় নিত্যকার ব্যাপার, কিন্তু সমুদ্র কোথায় ? সে তোমার ঐ দক্ষিণ দেশে, এখান থেকে পাঁচশো যোজন দূরে।

জরার মনে বাস্তব ও কল্পনায় বিভ্রম ঘটে গিয়েছে। সেদিন আতঙ্কিত কল্পনায় যা দেখেছিল, যা অনুভব করেছিল, আজ বাস্তবে তার অনুরূপ দেখছে, অনুভব করছে। হঠাৎ এই ঘটনার আঘাতে মাঝখানকার কয়েক মাস, মাঝখানকার সমস্ত ঘটনা লোপ পেয়ে গিয়েছে। সে আবার এসে দাঁড়িয়েছে বাসুদেব-হত্যার মুহূর্তে। তার ইচ্ছে হল এখান থেকে ছুটে পালাবে সেদিন যেমন পালিয়েছিল, কিন্তু পালাবে কোথা দিয়ে, গুহা থেকে বের হওয়ার পথ তার অজ্ঞাত। তাই সে ক্রমাগত আর্ত চিৎকার করতে লাগলো, প্রভু, ঐ যে আবার ফিরে এসেছে, আমাকে গ্রাস করবে!

ছাগর্ষি বলল, সবাই আমাকে দেখে অবাক হয়, তুমি যে আমাকেও অবাক করলে হে। কি হয়েছিলো শুনি বলো তো। সেদিন সেদিন করছ, কোন্‌দিন, কি করেছিল ?

প্রভু, আমি মহাপাপী।

আরে বাপু মানুষ হয়ে যখন জন্মেছ পাপী হতেই হবে, জন্মগ্রহণটাই তো পাপ। খুলে বলো।

বাবা, আমি মহাদুঃখী।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সুখী হলে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে কেন ? এই দেখো না কেন আমার দশা।

বাবা, আপনি তো পাপী নন।

কে বলল পাপী নই। মানুষের সঙ্গে যার বনলো না, মানুষ যার দু-চক্ষের বিষ সে যদি পাপী না হয় তবে পাপী আর কে ?

কিন্তু বাবা, আমি যে মহাপাতক করেছি।

বড়ই বিরক্ত করলে তো। পাপও যাকে বলে পাতকও তাকেই বলে। কিন্তু পাতকটা কি ? ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা না কি খুলে বলো।

সেদিনও গেরণে আকাশ এমনি অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, সমুদ্র ছুটে চলে এসেছিল।

সবই তো বুঝলাম। সেদিন কি হয়েছিল ?

কিছুতেই কৃতকর্মটা জরার মুখ দিয়ে বের হতে চায় না। পাপ যে ঘৃণ্য তার প্রধান প্রমাণ মহাপাপীও কৃতকর্মকে আভাসে ইঙ্গিতে বলে। চোর চুরিকে বলে

বড় কর্ম, খুনী হত্যাকে বলে কণ্ঠচ্ছেদ। নামান্তরে যেন রূপান্তর হয়ে যায়।

জরা কিছু বলে না, শরাহত মৃগের ন্যায় শুয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে—কেবল বলে, হত্যা করেছি, তাকে আমি হত্যা করেছি।

আরে বাপু, ভূ-ভারতে আজ এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যাকে হত্যা করলে এমন আত্মগ্লানি হয় বুঝতে পারি না। অনেকে যাকে ভগবান মনে করে, আমি যদি সেই বাসুদেবকে হত্যা করতাম তবু এমন আত্মগ্লানিতে ভুগতাম মনে হয় না।

ছাগর্ষির কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো জরা, বলল, প্রভু, আমি তাকেই হত্যা করেছি—মৃগভ্রমে শরাঘাতে তাকে হত্যা করেছি। এই বলে সে পাথরের উপরে মাথা কুটতে লাগলো।

তার স্বীকারোক্তি শুনে ছাগর্ষি স্তম্ভিত হয়ে গেল, বাসুদেব-হত্যাকারী এই লোকটা বলে কি? কারো প্রতি তার যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তা নয়, সাধারণ ভাবে সে মানব-বিদ্বেষী, তবে বাসুদেব সম্বন্ধে মনঃস্থির করতে পারেনি সে। কখনো মনে করে যে কালান্তক, কুরু পাঞ্চাল যদুবংশ প্রভৃতি ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই জন্ম। আবার কখনো বা ভাবে এতই যদি করলো তবে বাকি কটাকে রেখে গেল কেন? পরশুরাম করেছিল নিঃক্ষত্রিয়, এ না হয় করতো নির্মানব। কখনো ভাবে অবতার, কখনো ভাবে মহা ধড়িবাজ; কখনো ভাবে কৃষ্ণস্তু ভগবান, কখনো ভাবে শঠ কপট লম্পট। যাই ভাবুক লোকটা যে অসামান্য তাতে সন্দেহ ছিল না ছাগর্ষির। জনশ্রুতিতে তার কানে এসে পৌঁছেছিল বাসুদেব দেহ-রক্ষা করেছেন। কিন্তু সে যে এই লোকটার শরাঘাতে কথনো কল্পনাও করতে পারেনি। চেয়ে দেখল পায়ের কাছে তখনও মুমূর্ষু পশুর মত আকুলি-বিকুলি করছে। ছাগর্ষির বিস্ময় এতই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে ক্ষণকালের জন্য ছাগভাষার মুদ্রাদোষ হুঁ-হুঁ শব্দ করতেও ভুলে গেল।

ছাগর্ষির মুখে হুঁ-হুঁ শব্দ না শুনে জরা শঙ্কিত হয়ে উঠল, না জানি তার প্রতি কি আদেশ হয়। তার মনে হল মানুষ মাত্রেই এখন তার বিচারক। তার পা জড়িয়ে ধরে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা, এখন আমার কি গতি হবে?

কি জানি বাপু, বুঝতে পারছি না। তুমি মহাপাপী না মহাপুণ্যবান, নরকের কীট না স্বর্গের দেবতা, ভারতের কলঙ্ক না উদ্ধারকর্তা, তোমাকে অভিসম্পাত দেবো না মাথায় করে নাচবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

জরার মুখে ঐ এক কথা, কি আমার গতি হবে বাবা, কি আমার গতি হবে।

ছাগর্ষি বলল, এগিয়ে দেখ হাত জোড়া।

কিছু বুঝতে না পেরে অবোধ পশু যেমন প্রভুর দিকে মুখ তুলে তাকায় তেমনি

ভাবে তাকালো তার মুখের দিকে, গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, তবে তা চোখে পড়লো না ছাগর্ষির, আর চোখে পড়লেও অর্থ বুঝতে পারতো কি ? আজ চল্লিশ বছরের মধ্যে চোখের জল চোখে পড়েনি নিঃসঙ্গ গুহাবাসীর।

কোথায় এগোবা বাবা, কার হাত জোড়া!

আরে কথাটার অর্থ বুঝলে না। ভিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে বা সামর্থ্য না থাকলে গেরস্ত ভিখারীকে বলে এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। আমারও সেই ভাব। তোমার সমস্যা মীমাংসা করবার সামর্থ্য আমার নেই—তাই বলছি এগিয়ে দেখো।

কোন্ দিকে এগোবো ? শুধায় জরা।

সে কি, দিকের অভাব কি ? এই পাহাড়টা ঠিক হিমালয় নয় তবে হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা বলতে পারো, উত্তর-পূর্বে যতদূর খুশি চলে যাও সেই লৌহিত্য অবধি সহস্র যোজনা পথ হিমালয় পর্বত। আর যদি পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামো তবে হাজার হাজার যোজনব্যাপী পড়ে রয়েছে ভারতবর্ষ। দেখো বিধাতা যত ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন তার ঔষধ। কেবল খুঁজে বের করবার অপেক্ষা। পাপ সম্বন্ধেও সেই কথা। পাপ থেকে মুক্তির রহস্যও নিহিত আছে এই মহাদেশে এই মহাপর্বতমালায়। কত মুনি-ঋষি জ্ঞানী-গুণী যোগী-তপস্বী আছেন কেউ তাঁদের সংখ্যা জানে না। যাও এগিয়ে যাও, সকলেরই যে হাত জোড়া থাকবে এমন নয়, কেউ না কেউ জানবেন তোমার মুক্তির পথ।

জরা বলে, পথ যে অন্তহীন।

আরে সেই তো সুবিধা, অন্তহীন বলেই কখনো অন্ত হবে না, কোথাও না কোথাও সন্ধান মিলে যাবে।

জরা প্রবোধ মানে না, মাথা কুটতেই থাকে।

ও কি করছ ?

মরতে চেষ্টা করছি।

মূঢ়, মরে কেউ কখনো মুক্তি পায় না, বৃথা মাথা কুটলেও মুক্তির সন্ধান মিলবে না।

প্রভু, এত বড় পাপ কেউ কখনো করেছে ?

ঐ তো আগে বলেছি, তুমি পাপী কি পুণ্যবান সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই।

আমাকেও পুণ্যবান বলবে এমন কি সম্ভব!

জরা এ বড় আশ্চর্য জগৎ, এখানে বোধ করি তাও সম্ভব। এই দেখো না কেন আমারই তো সন্দেহ ঘুচছে না।

এই সময়ে বাইরে হুঁ-হু হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ শব্দ শোনা গেল। ছাগর্ষি বলে উঠল, ঐ আমার ছাগমাতা এসেছে দুধ পান করাতে। তুমি থাকলে ভয় পাবে, তুমি এবারে পালাও।

তারপরে কিঞ্চিৎ রুক্ষভাবে বলল, চল্লিশ বছর পরে মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ বাস করলাম, কেন করলাম জানি না ; ভিতরে এখনো কোথাও কাঁচা আছে। যাও যাও তুমি, এখুনি যাও।

আবার বাইরে শব্দ উঠল হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ। ছাগর্ষি ভিতর থেকে শব্দ করলো হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ। অমনি পাথরের ফাঁক দিয়ে একটি বুনো ছাগল তুড়ুপ করে লাফিয়ে প্রবেশ করলো ; শুয়ে পড়লো ছাগর্ষি, আর ছাগলটা তার মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো, বাঁটে মুখ লাগিয়ে সে দুধ পান করতে করতে হাত দিয়ে বার বার ইশারা করতে লাগলো জরাকে চলে যেতে। অগত্যা জরা গুহা থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো।

॥ ৪ ॥

জরা চলতে শুরু করলো। পথ, পথ, পথ। এ সংসারে আর সকলেরই অন্ত আছে, কেবল পথ অন্তহীন, অনাদিও বটে। পথ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়, নিজে কোথাও পৌঁছয় না। অরণ্য পর্বত প্রান্তর কান্তার নগর জনপদ কিছুই বাধা দিতে পারে না, নদ নদী ঝরনা হ্রদ কিছুই তার কাছে বাধা নয়। কোথাও সরু ফিতের মত, কোথাও সূক্ষ্ম সুতোর মত, কোথাও কেবল ছোট বড় উপলখণ্ডের দ্বারা চিহ্নিত দীর্ঘ দীর্ঘ অন্তহীন। পৌরাণিকগণ যে অনন্ত সর্পের কল্পনা করেছে এ বুঝি তারই কেউ হবে। আর সবচেয়ে রহস্যময় পাহাড়ী পথ। দূর থেকে মনে হয় ঐখানে শেষ হয়ে গিয়ে শূন্যে মিশে গিয়েছে, কাছে যেতেই দেখা যায় পাহাড়টাকে বেষ্টন করে আবার সেই পথ। উপত্যকার যে নিম্নতম অংশে ঝরণা প্রবাহিত তারই ধার ঘেঁষে চলেছে, পথে আর ঝরনায় অন্তহীন প্রতিযোগিতা। অবশেষে দেখতে পাওয়া যায় ঝরনাও শেষ হয়েছে আর একটা ঝরনায় মিশে, পথ চলতেই থাকে। নদী? তার উপরেও পথের জিত। নদীর শিখর আছে সঙ্গম আছে, কিন্তু পথের? নদীতে নৌ-চলাচলের চিহ্ন থাকে না, পথেও কি থাকে? দিনের বেলায় হাজার পথিকের পদাবলী ধুলোয় উড়ে কোথায় বিলীন

হয়ে যায়, ভোরবেলা আবার সন্তজাত অকলঙ্ক অচিহ্নিত। তোমার শোকতাপ থাকে পথে এসে দাঁড়াও, সমস্ত ভুলিয়ে দেবে, সুখে আনন্দে তুমি অধীর, পথে এসে দাঁড়াও, দেখবে তাদের আর সে মূল্য নেই। তুমি যদি নিঃসঙ্গ হও পথ তোমাকে সঙ্গদান করবে, তুমি যদি সসঙ্গ হও পথ তোমাকে নির্জনতা দেবে। তুমি যদি পুণ্যবান হও পথের কাছে সেই শান্তি পাবে যা সমস্ত পুণ্যের লক্ষ্য। আর তুমি যদি পাপী হও, নদীস্রোত যেমন সঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে মুছে নিষ্কলুষ করে দেয়, পথচলা তেমনি তোমার পাপের ভার নষ্ট করে দিয়ে মুক্তির দিকে তোমাকে চালনা করবে। পায়ে পায়ে পথের জপমালা আবর্তিত করতে করতে চলো। জরা চলেছে।

এতদিন পর্যন্ত জরা মনুষ্য সমাজের অন্তর্গত ছিল, এবারে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার নিদারুণ মূর্তি দেখেছে নির্বাসিত অন্ধকার গুহাবাসী ছাগর্ষির মধ্যে। নিঃসঙ্গতাকে আর তার ভয় নেই। দিনে পথে চলে, রাতে পথে ঘুমোয়, কোন-দিন একটা গুহা পেলে ধন্য মনে করে। খাদ্য? মাঝে মাঝে পাহাড়ীদের গ্রাম, রাহী আদমিকে দুখানা রুটি একটু শাক দেওয়াকে তারা পুণ্য মনে করে। যে দিন পথে গ্রাম না পড়ে গাছে ফল তো আছেই। তাও যে দিন মেলে না, সে দিন অনাহার। আর সমস্ত অভাব পূর্ণ করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ঝরনার ধারা। সেই অমৃত বারি থেকে তাকে বঞ্চিত করবে কে।

ছাগর্ষির পরামর্শ নিরন্তর বাজছে তার মনের মধ্যে—এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। কিন্তু কি করে সে বুঝবে কার হাত পূর্ণ, কে দান করতে পারে তার কাম্য বস্তু। নিরন্তর মনে মনে জপতে থাকে আমি পাপী, কি গতি হবে আমার। কই এমন তো কাউকে চোখে পড়ে না যার কাছে হাত পাতা যায়, সকলকেই তার মত প্রার্থী মনে হয়। একদিন সে দেখতে পেলো পথের পাশে বিশ্রাম করছে একজন প্রবীণ ব্যক্তি, ভাবলো সাধু-সন্ন্যাসী হবে। তার কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল, বাবা আমি মহাপাপী, আমার কি গতি হবে?

লোকটি হেসে বলল, আমার চেহারা দেখে বুঝি সাধু-সন্ন্যাসী মনে হয়েছে। না বাপু, আমি ব্যবসায়ী, কালকে রাতে লুঠেরা আমার সমস্ত মালপত্তর লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। এখানে বসে বিশ্রাম করছি। আমি কি উত্তর দেবো তোমার জিজ্ঞাসার।

জরা অবাক হয়ে ভাবে এই পাহাড়ের মধ্যেও ব্যবসায়ী আছে, লুঠেরা আছে! অবাক হয়ে আবার চলতে থাকে।

আর একদিনের অভিজ্ঞতা মনে পড়লে তার হাসি পায় যদিচ ব্যাপারটা শেষ

পর্যন্ত মারাত্মক হতে পারতো। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে চোখে পড়লো পথের পাশে গাছের ছায়ায় একদল লোক কালো কম্বল গায়ে চক্রাকারে বসে আছে। তার ধারণা হল তীর্থযাত্রী সাধুর দল হবে, রাতের মত আড্ডা গেড়েছে। ভাবলো ভালোই হল, এদের কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে, আর সাধুসঙ্গে একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে তার জিজ্ঞাসার। পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে সেই দিকে চলল, যখন খুব কাছে এসে পড়েছে, পায়ে হয়তো শব্দ হয়ে থাকবে, তখন সেই সাধুদের একজন মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল, সে-ও দেখল আর তখনি এক দৌড়ে পথের উপরে এসে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলো। সাধু নয়—একপাল ভালুক। ভাবলো আর একটু হলেই চরম গতি হয়ে যেতো। পরে এ কথা মনে করে হেসেছে কিন্তু তখনো কাঁপুনি থামতে চায়নি।

জরার পথ চলার আর বিরাম নেই। সকালবেলা সূর্য দেখে দিক স্থির করে নেয়, পূর্ব দিকে হিমবন্ত, দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এই দুই দিক তার গন্তব্য আপাততঃ। শাখা-প্রশাখা ছেড়ে নিজ হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। ছাগর্ষির কাছে শুনেছিল সেখানেই নাকি জীবনের সব জিজ্ঞাসার মীমাংসা সঞ্চিত। সেই খনি থেকে রত্ন উদ্ধারের আশাতেই আবহমানকাল মুনি ঋষি যোগী তপস্বীদের সেখানে ভিড়। মনে পড়লো দ্বারকায় থাকতে কার কাছে যেন শুনেছিল শীঘ্রই পণ্ডিবগণ মহাপ্রস্থান করবেন—সেও তো এই হিমালয়ের দিকে। সকলের সব প্রশ্নের উত্তর জানে এই আদি বৃদ্ধ, তার প্রশ্নের উত্তরটাই কি তার অজানা? আমি পাপী, কি গতি হবে আমার।

কালের মাত্রা ভুল হয়ে গিয়েছে জরার। সূর্যোদয়ে দিন, সূর্যাস্তে রাত্রি—এইটুকু মাত্র জানে। সপ্তাহ মাস বৎসর আর সব মাত্রা হারিয়ে গিয়েছে তার মন থেকে। একদিন এক পল্বলে স্নান করতে নেমে ছায়া দেখে চমকে উঠল, এত লম্বা চুল দাড়ি কার? তবে তো অনেক বছর পার হয়ে গিয়েছে। হয়তো চার-পাঁচ বছর হবে, এতদিন গেল তবু মিললো না তার প্রশ্নের উত্তর। এত-দিনেও এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না যার হাত পূর্ণ। সংসারে কি তবে সকলেরই হাত জোড়া। হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ে।

জরা পথে পথে চলছেই, কখনো উপত্যকা কখনো অধিত্যকা, কখনো প্রান্তর, কখনো কান্তার। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই, কখনো জনপদ, কখনো নির্জন, এমন কত কি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। বেহুঁশ ভাবে আপন মনে চলেছে তো চলেইছে। তবে দৃশ্যপট যেমনি হোক মুখে তার এক বুলি, আমি পাপী, আমার কি গতি হবে, পাপীর কি মুক্তি নেই! পথে যার সঙ্গে দেখা হোক রাজা কি

রাখাল, বাসুদেব তো দু-ই ছিল, শুধায়, আমার কি গতি হবে। তারা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে দেখে চলে যায়। পথে যার সঙ্গে দেখা হয় সাধু কি ভণ্ড, শুধায়, পাপীর কি মুক্তি নেই? কেউ স্নেহের চোখে দেখে, কেউ সন্দেহের চোখে দেখে চলে যায়। কেউ বলে বাউরা, কেউ বলে পাগলা, কেউ বলে লৌণ্ডা, কেউ বলে মহাত্মা আদমি কিন্তু আসল কথার উত্তর দেয় না।

একদিন জরা গিয়ে উপস্থিত হল এক পাহাড়ী গাঁয়ে, সেখানে কি একটা পরব চলছিল। জটাজুট শ্মশ্রুসমন্বিত জরাকে তারা সমাদর করে বসালো। খেতে দিল এমন খাদ্য অনেককাল যা সে পায়নি, তারপরে বিদায়ের সময়ে একখানি ধুতি আর পশমী গায়ের কাপড় দিল। এ দুটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তার পরিধেয় ও গায়ের কাপড় লজ্জা ও শীতাতপ নিবারণের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। তবে এ তিনের কোনটারই বোধ ছিল না তার। বিদায়ের সময় একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে শুধালো, বাবা, আমি পাপী, আমার কি গতি হবে?

সে ব্যক্তি বলল, সাধুজি, আপনার মত সাধু যদি পাপী হন, তবে আমাদের গৃহীদের কি আর পাপের অন্ত আছে। আপনার নৌকোয় ফুটো হয়ে গিয়েছে আর আমাদের নৌকো তো অনেকদিন বানচাল।

তবে চলছে কি করে?

একে কি আর চলা বলে। এ যে তলিয়ে যাওয়া।

তবে এত হাসি গান পরব কিসের।

সাধুজি। কি আর বলবো, এসব মুমূর্ষুর বিকার।

জরা ব্যাকুল ভাবে শুধায়, তবে আমার প্রশ্নের মীমাংসা কার কাছে পাবো?

কেমন করে বলবো বাবা, তবে কি জানেন, পরমাত্মা কৃপা করলে নিশ্চয় মীমাংসা হবে, আপনি এগিয়ে দেখুন।

জরা শোনে সেই পুরাতন উত্তর, এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। ভাবে হাত জোড়া হবে না কেন? হাত যে সুখের উপাদানে পূর্ণ। সে আবার এগিয়ে চলে।

সেদিন ভোরে যখন পথ চলতে শুরু করেছে তখনো কুয়াশার ঘোর কাটেনি। এসব স্থানে ভোরের কুয়াশা একটা নিত্যকার ব্যাপার। সেই প্রায়ান্ধকারে কার সঙ্গে লাগলো ধাক্কা। জরা বলে উঠল, বাবা, আমি পাপী, আমার কি গতি হবে। অন্য সময় দেখেছে প্রশ্ন শুনে লোকে পাশ কাটিয়ে যায়। এবারে পাশ কাটালো না। জরা ও সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। বাবা, পাপীর কি মুক্তি নেই? কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে এলে দেখতে পেলো একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা

খেয়েছিল। ভাবলো, ক্ষতি কি? এককালে পাথর ভেদ করেই তো নৃসিংহ-মূর্তিতে নারায়ণ প্রকাশ পেয়েছিলেন। আমার কি সে সৌভাগ্য হবে না! আমি কি হিরণ্যকশিপুর চেয়েও নরাধম! জরার আবার শুরু হয় চলা।

একদিন দেখতে পেলো নদীর তীরে, ঝরনা সেখানে হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে গিয়ে নদীর বিস্তার লাভ করেছে, এক সাধু উপবিষ্ট। তাকে প্রণাম করে সেই চিরন্তন প্রশ্ন শুধালো, বাবা, পাপীর কি মুক্তি নেই? সাধু তাকে নিরীক্ষণ করে বলল, বসো। জরার আশা হল। এ পর্যন্ত কেউ তো বসতে বলেনি। দেখল সাধুজী একটা ছোট কল্কে যথারীতি সাজিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বেটা, পিও, তেরা মুক্তি মিল যায়গা।

জরা বলে, আগে বাবা প্রসাদ করে দিন।

সাধু একটান দিয়ে তার হাতে কল্কে দিল।

জরা বাল্যকাল থেকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি যাবতীয় নেশায় পারঙ্গম, কিন্তু এ কি পাহাড়ী গাঁজা বাপ, একটান দিয়েই তিন দিন অচৈতন্য! তিন দিন তিন রাত পরে যখন সে প্রথম চোখ মেলল, সাধু শুধালো, কি বেটা, শান্তি মিলল?

জরা বলল, অচৈতন্য অবস্থায় শান্তি পেয়েছিলাম, এখন আবার অশান্তি।

সাধু বলল, বেটা, সংসারে শান্তি কোথায়? সংসার পাপের আগার। মুক্তি বলো শান্তি বলো সমস্তই এই এর মধ্যে—এই বলে গাঁজার কল্কেটি দেখালো।

জরা শুধায়, তবে হিমালয়ে হাজার হাজার যোগী মুনি ঋষির ভিড় কেন? গাঁজা তো সংসারেও মেলে।

মেলে বই কি, তবে তা পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আর হিমালয়ে তা পথে-ঘাটে ফলে রয়েছে, তুলে নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। তাছাড়া এ দেবলোকের গাঁজায় দৈবগুণ প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলি বেটা।

তা পেলাম বাবা, কিন্তু আমার মীমাংসা তো পেলাম না। এ মুক্তি ক্ষণিক, আমি চাই স্থায়ী মুক্তি।

তখন সাধু বলল, এগিয়ে যা, আর কিছুদূর গেলেই হিমালয়ের আরম্ভ, সেখানে প্রথমেই মিলবে কিন্নর রাজ্য। সেখানে তোর স্থায়ী মুক্তি মিলবে—এই বলে সাধু অস্থায়ী মুক্তির দ্বারস্বরূপ কল্কেটিতে মনোনিবেশ করলো। আশান্বিত জরা ত্বরান্বিত পদে কিন্নর রাজ্যের দিকে যাত্রা করে।

কয়েকদিন পথ চলবার পরে জরা বুঝতে পারলো, জরার মত তন্ময় লোকের পক্ষেও সহজবোধ্য হল যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। চড়াই-

গুলো এখন বেশি খাড়া, উৎরাইগুলো বেশি ঢালু, উপত্যকাগুলো গভীরতর, শিখরগুলো উচ্চতর, দিনমান তেমন আর গরম নয়, রাত্রি শীতলতর, যখন-তখন কুয়াশা এসে সমস্ত অবলুপ্ত করে দেয়, মেঘের দল নীচের দিক থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে, আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তারাগুলোর কি স্বচ্ছতা, আর পাহাড়ের গায়ে ঋজু সুঠাম সরল গাছগুলো থাকে থাকে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে একেবারে শিখরের চূড়ান্ত অবধি। দেওদার, ধুপি, চিড় প্রভৃতি কয়েকটি গাছ বাদ দিলে অধিকাংশ গাছপালা তার অপরিচিত। আর উপত্যকায় যে ঘন সবুজ তৃণ তাদের রঙটি এমন গাঢ় এমন নবীন মনে হয় বসলে কাপড়ে ছোপ লেগে যাবে। জরার চোখ কিছুদিন থেকে পাহাড়ে অভ্যস্ত হলেও এ দৃশ্য তার চোখে নূতন। এ পাহাড় নয়, পর্বত।

এতকাল যে সব পাহাড়ে পাহাড়ে জরা ঘুরেছে সে সব হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা হলেও তার গৃহীরূপ। এবারে যেখানে এসে পৌঁছল জরা সেখানে হিমালয় গৃহত্যাগী মহাযোগী। হিমালয়ের দুর্ধর্ষ দুর্বার দুর্জয় দুরারোহ তুষারশুভ্র শৃঙ্গ দেখেই কি প্রাচীনেরা ধূর্জটির কল্পনা করেছেন! আর উমা? সে তো নবীন কোমল তটিনী-তরল শ্যামলঘন শস্যসুন্দর উপত্যকাগুলি। উপত্যকা অধিত্যকা বিবিক্ত শিখর এবং নিবিষ্ট অরণ্য গায়ে গায়ে সংযুক্ত থেকে যে বিষম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে কে নিশ্চয় করে বলতে পারে তাই হরগৌরী পরিকল্পনার মূলে নয়? হিমালয়ের প্রতিটি শৃঙ্গ স্বর্গারোহণের এক-একটি সোপান। এখানকার বায়ুতে জলে ফুলে ফলে আয়ু এবং অমৃত। অমৃত মুক্তির সোপান। সেখানে আজ প্রবিষ্ট জরা।

এতদিন একটা ক্লান্তির সঙ্গে লড়াই করে যেন চলছিল জরা, পা দুখানা তাকে বহন করতো না, তাকেই টেনে নিয়ে যেতে হত পা দুখানাকে। এখন যেন তার অদৃশ্য পাখা গজিয়েছে, উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে; এখানকার বায়ুতে এমন একটা আশ্বাস অনুভব করলো মনে হল মোড়টা ঘুরলেই বুঝি মুক্তি। কিন্তু মূর্খ জরা জানতো না যে ধূর্জটির তপোবনে নন্দী ভৃঙ্গী দ্বাররক্ষী। নন্দীর দায়িত্ব শাসন, ভৃঙ্গীর ত্রাসন। একজন স্বর্ণবেত্র উত্থিত করে, অপরজন নানা উপায়ে ভয় দেখিয়ে আগন্তুককে নিবারিত করে। এদের হাত থেকে ছাড়পত্র পেলে তবেই প্রবেশের অধিকার, তবেই শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি; ও ত্রয়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বিভূতি।

খাড়া চড়াই উঠতে উঠতে আরও উঠতে হবে যখন প্রত্যাশা করছে, হঠাৎ দেখল হঠাৎ চড়াইয়ের উচ্চতম স্থানটা একেবারে সমতল হয়ে গিরিশিখরগুলোর

দিগন্ত অবধি প্রসারিত। জরা এসে উপস্থিত হয়েছে একটি অধিত্যকায়—যেখানে নাকি সেই সাধুকথিত কিন্নর রাজ্য।

উচ্চাবচ পাহাড়ের মধ্যে সমতল অধিত্যকা দেখে জরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, তারপরে যখন তার চোখে পড়লো সেই সমতলে সুন্দর একটি নগর, সুরম্য অট্টালিকা, উদ্যান, বিপণি, ফোয়ারা, শ্বেতপাথরে ঘাট বাঁধানো সরোবর, সরোবরে নীল রক্ত উৎপল, পথের দুদিকে বকুল, শিরীষ, চম্পক কামিনী প্রভৃতি সুপুষ্পক ফুলের গাছ, তখন তার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময় একেবারে চরমে উঠল নগরের অধিবাসীদের দেখে। সকলেই তরুণ-তরুণী, শিশু, বালক-বালিকা কিশোরীও আছে, তবে তারা তো তারুণ্যের কুঁড়ি, ফুটে উঠলেই তরুণ-তরুণী। একটিও বৃদ্ধ চোখে পড়লো না তার, আর একটিও কুৎসিত বা বিকলাঙ্গ। রূপ ও যৌবন যেন এ রাজ্যের নিয়তি। তখনি সাধুর আশ্বাস মনে পড়লো, হ্যাঁ, এখানে পাপের মুক্তি, পাপীর শাস্তি মিললেও মিলতে পারে।

সে এগিয়ে গিয়ে সরোবরের ঘাটে উপস্থিত হল, দেখলো, কয়েকজন তরুণী সম্পূর্ণ বিবসন অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে, পান্নাতরল জলে এতটুকু আবরণের কাজ করেনি। আর কয়েকজন স্খলিতবস্ত্র তরুণী ঘাটে বসে সোনার লোষ্ট্রখণ্ড দিয়ে পা ঘষছে, কেউ বা সোনার দর্পণে মুখ দেখছে, আর কেউ বা মেঘমুক্ত কেশগুচ্ছে তেল মাখছে যার সুগন্ধ, কেশের গন্ধে আর তেলের গন্ধে মিলে অধিক-তর মনোজ্ঞ। এতদূরে এসে নাসায় প্রবেশ করছে জরার। তাকে কেউ দেখল কিনা বুঝতে পারলো না, আর দেখে থাকলেও জিজ্ঞাসা বা বিকার জাগলো না তরুণীদের ব্যবহারে। ঘাট থেকে দূরে এক জায়গায় জলে নেমে আকণ্ঠ জল পান করে যখন সে উঠল, মনে হল জল নয় অমৃত। অমৃত কখনো পান করেনি বটে, তবে এই রকম হওয়াই সম্ভব।

তারপরে সে একটি বীথিকা-পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগল। সে দেখতে পেলো পথটির একদিকে বকুল শিরীষ চাঁপা, অন্যদিকে কদম, শিউলি, লোধ্র, আরও দেখতে পেল উদ্যানে মল্লিকা যূথী চামেলী কুন্দ বিভিন্ন ঋতুর ফুল প্রস্ফুটিত। এমন তো কোথাও দেখেনি, তবে আগে তো কিন্নর-রাজ্যেও আসেনি। এমন সময়ে দেখতে পেলো তিনটি তরুণী, তিনটি স্বর্ণ প্রতিমা নিষ্কলঙ্ক তুষারের উপরে প্রথম সূর্যরশ্মির আভা তাদের রঙে, তার দিকে আসছে।

সাহসে ভর করে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি কিন্নর রাজ্য?

তরুণীদের একজন বলল, হ্যাঁ।

তার ব্যবহারে লজ্জা ও সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না, খুব সম্ভব ও দুটি শব্দ নয়, ঐ ভাব দুটির সঙ্গেও তাদের পরিচয় নেই।

আর একজন বলল, তোমাকে তো বিদেশী মনে হচ্ছে, কোথা থেকে আসছ?

জরা বলল, সে অনেক দূর, অনেক সময় লেগেছে এখানে পৌঁছতে।

দেশ ছেড়ে কেন এখানে এলে?

সে অনেক কথা, শুনে লাভ নেই। আমি দেশে দেশে, এখন পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছি মুক্তির আশায়। আমি পাপী, মহাপাপী, আমার কি গতি হবে তোমরা বলতে পারো?

তৃতীয়া বলল, এ রাজ্যে এ রকম কথা এই প্রথম শোনা গেল।

বিস্মিত জরা বলে, সে কি, পাপ-পুণ্য এসব কথা কি তোমরা শোননি?

তার মনে পড়ে যায় সুবালাকে। সে-ও তো এই রকম চমকে উঠেছিল।

তরুণীদের একজন বলল, ওসব শব্দ আমাদের দেশে অজ্ঞাত, পাপ-পুণ্য কাকে বলে?

আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো একজন মানুষকে খুন করলাম, নরহত্যা মহাপাপ।

কিন্তু হঠাৎ হত্যা করতে যাবে কেন?

মনে করো লোভে।

ওদের একজন বলে, লোভ হবে কেন?

জরা বলে, মনে করো তার ধনরত্নে আমার লোভ।

ওরা বলে, আমাদের দেশে ধনরত্ন যথেষ্ট আছে কিন্তু সে সব কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

তবে! বিস্ময় প্রকাশ করে জরা।

তবে আর কি, যার যা প্রয়োজন নেয়।

কেউ বাধা দেয় না?

কে বাধা দেবে? আমাদের দেশে রাজা নেই, রাজশাসন নেই,—ওসব ছাড়াই আমাদের চলে যায়।

আচ্ছা ধনরত্ন থাক্। মনে করো কারো সুরম্য একটা অট্টালিকা বাড়ি আছে, তার লোভে হত্যা করলাম।

দেখো বিদেশী, এদেশে সকল হর্ম্যই সুরম্য কিন্তু তাও কারো ব্যক্তিগত নয়, যার যেখানে খুশি বাস করছে।

জরা বলল, আচ্ছা বাড়িও যাক। কারও সুন্দরী নারী আছে তার লোভে স্বামীকে হত্যা করলাম।

এবারে সুন্দরীরা হেসে উঠল, বলল, দেখতেই পাচ্ছ এদেশে নরনারী সকলেই সুন্দর। কিন্তু তাদের মধ্যেও সম্বন্ধ ব্যক্তিগত নয়।

কেন, বিবাহ প্রথা কি তোমাদের নেই?

না, যে যার সঙ্গে খুশি বাস করছে, তাকে ভালো না লাগলে আবার আর একজনের সঙ্গে গিয়ে বাস করছে।

জরা শুধায়, তাদের সন্তান হলে?

সন্তান হয় বই কি! তবে তারাও কারো বক্তিগত নয়!

তবে কার?

সকলেই এই কিন্নর রাজ্যের নাগরিক। একটু বয়স হলেই তারা যথেচ্ছ বিচরণ করে।

বিস্ময়ের ধমকে জরা নির্বাক হয়ে যায়।

এমন সময়ে তরুণীদের একজন উচ্চস্বরে ডাকে, তুহিন, এদিকে এসো।

জরা দেখে তার ডাক শুনে একজন সুন্দর যুবক এগিয়ে আসে। সে লোকটি কাছে এলে সেই তরুণীটি বলে, তুমি আজ রাতে আমার কাছে থাকবে।

তুহিন নামে সেই যুবকটি বলে, নবীনা, তোমার কাছে থাকতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু আগেই যে আরতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তুমি কেন আজকের মতো আর কাউকে বলো না।

তাই হবে, গন্ধর্বকে না হয় বলবো।

জরা তাদের কথোপকথন শুনে ভাবে এরা কি বাতুল নাকি?

এবারে তুহিন লক্ষ্য করে জরাকে, শুধায়, একে তো আগে দেখিনি!

নবীনা বলে, বিদেশী লোক।

এখানে কেন?

পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় লোকটা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তুহিন বলে, তার মানে মাথা খারাপ।

জরা আর নীরবে থাকতে পারে না, বলে, মাথা খারাপ কার? আমার, না তোমাদের?

কেন বলো তো? শুধায় তুহিন।

কেন আবার কি! তোমাদের এখানে দেখছি নীতি বিবেক ধর্ম রাজশাসন কিছুই নেই।

তুহিন বলে, সত্যিই ওসব কিছু নেই, তবু তো দেখো আমাদের আনন্দে চলে যাচ্ছে।

জরা বলে, এখন যাচ্ছে বটে, যৌবনে ওরকম মনে হয়, কিন্তু বয়স হলে দেখতে পাবে যে…

বাধা দিয়ে তুহিন বলে, বয়স তো কম হয়নি আমাদের। আমার বয়স দেড়শ বছর, আর এই সুন্দরীদের বয়স একশ পঁচিশ-ত্রিশ হবে।

কি যত সব বাজে কথা বলছ! তোমার বয়স খুব বেশি হবে তো পঁচিশ-ত্রিশ, আর এই তরুণীদের কিছুতেই পঁচিশের বেশি নয়।

তুহিন বলে, তোমার কাছে মিছে বলায় কি লাভ?

জরা বলে, তবে দেখছি তোমাদের চিরযৌবন!

এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ, কিন্নর রাজ্যে চিরযৌবন।

এ কেমন করে সম্ভব হল!

খুব সহজে। এই তো এখুনি বিস্মিত হয়েছিলে আমাদের এখানে কারো শাসন নেই—না রাজার না সমাজের। ওসব নেই সত্যি, তবে এক শাসন আছে—যে শাসন স্বভাবের।

সে আবার কি?

স্বভাব যদি তার বিধিনির্দিষ্ট পথটি পায়, কোন বাধা না আসে, কেউ বাধা না দেয় তবে মানুষ চিরানন্দময় হয়। চিরানন্দময়ের আবার জরা মরণ কি! সে তো চিরযৌবন চিরজীবী।

চমকে উঠে জরা শুধায়, বলো কি! তোমাদের কি মৃত্যু নেই?

না। মরবে কেন? কেন জীর্ণ হবে মানুষ!

জীর্ণ হবে কারণ আধিব্যাধি জরা নিরন্তর তার জীবনরস শুষছে। সাধ্য কি মানুষ চিরযৌবন চিরজীবী হয়!

সে তোমাদের দেশের নিয়ম হতে পারে। তোমরা স্বভাবের পথে ধ্যানধারণা পাপপুণ্য নীতি বিবেক ঈশ্বর পরকাল স্বর্গ নরক প্রভৃতি এনে ফেলেছ, তাই স্বভাব বিধিনির্দিষ্ট পথটি না পেয়ে কখনো শুকিয়ে মরে, কখনো বন্যা ঘটায়। তোমরা ম্যুজ কুব্জ রুগ্ন জীর্ণ বৃদ্ধ হয়ে পড়ো। মরণ তো ভালো, এইসব থেকে মুক্তি দেয়।

স্বভাবের নিয়ম বলতে কি বোঝায়?

এ তো সহজ। মন যা চাইবে, প্রাণ যা চাইবে, ইন্দ্রিয় যে পথে যেতে চাইবে বাধা দিয়ো না। মন নারী চায় ভোগ করো, সুখাদ্য চায় ভোগ করো, ধনরত্ন চায় ভোগ করো, নৃত্যগীতি বিলাস চায় ভোগ কর, দেখবে জরা মৃত্যু দুঃখ

পাপ যে যেতে পারবে না।

জরা হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে একখানা শিলাসনে বসে পড়ে আপন মনে বলতে থাকে, তবে তো দেখছি এদের কাছে মুক্তির উপায় মিলবে না। এরা স্বভাবতঃ মুক্তজীব, বন্ধন না মানলে মুক্তির উপায় জানবে কি করে! তবে তো সাধুজী ভুল সংবাদ দিয়েছেন।

তুহিন বলল, কোন্ সাধু তোমাকে কি সংবাদ দিয়েছে জানি না, কোন সাধু-সন্ন্যাসী আমাদের দেশের রীতিনীতি জানে না, সত্য কথা বলতে কি এখানে তাঁদের প্রবেশের পথ রুদ্ধ। তুমি যে কিভাবে প্রবেশ করলে বুঝতে পারছি না।

জরা বলল, তোমাদের রীতিনীতি তোমাদের থাক। আমার কি গতি হবে তাই ভাবছি।

দেখো বিদেশী, তোমার গতি তারাই বলতে পারবে যারা ঐ পথের পথিক। কিন্নর রাজ্য আধিব্যাধি জরামরণহীন আনন্দময় চিরযৌবনের দেশ—বলল তুহিন।

জরা স্বগত ভাবে বলে, এমন রাজ্য যে পৃথিবীতে আছে জানতাম না।

তোমার কথা এক হিসাবে সত্য। এ রাজ্য পৃথিবীর অন্তর্গত নয়। এ রাজ্যের অবস্থিতি পৃথিবী ও স্বর্গের ঠিক সীমান্তে। আর এক ধাপ অগ্রসর হলেই নন্দনলোক।

তবে তোমরা আর এক ধাপ এগিয়ে সেখানে যাও না কেন? শুধায় জরা।

মনুষ্যদেহধারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ, শুনেছি মহারাজ যুধিষ্ঠির সেখানে সশরীরে যাবেন।

তোমরা দেখছি যুধিষ্ঠিরকে জানো। তাহলে নিশ্চয় বাসুদেবের নাম শুনেছ?

তুহিন বলে, কি বলছ! তাঁর নাম কে না শুনেছে? তবে কি জানো আমরা বাসুদেবের ভক্ত নই, আমাদের আরাধ্য ব্রজের কৃষ্ণ, সেই চিরানন্দময় চিরকিশোর।

তবে যে বললে তোমরা ঈশ্বর মানো না!

কে বলল মানি না! আমরা মানি ভগবান আছেন। আছেন তো আছেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরি না।

তবে কেন কৃষ্ণকে স্বীকার করো?

স্বীকার করি সখা বলে, বন্ধু বলে, আমাদের আনন্দের সঙ্গী বলে, ভগবান বলে নয়।

আমি তো তোমাদের ভাবগতিক কিছুই বুঝতে পারছি না। কৃষ্ণকে মানো,

বাসুদেবকে মানো না। এ দুই কি আলাদা!

সহজ কথাটা সহজে বুঝতে না পারা তোমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বিদেশী। যে রূপে তিনি গোপিনীদের সখাদের ব্রজবাসীদের আনন্দ দিতেন আমরা তাঁর সেই চিরকিশোর রূপটি মানি। বাসুদেব রূপে তো তিনি আনন্দময় নন। তখন তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ধনুকখানায় জ্যা আরোপণ করেছেন, তখন তিনি বীর-শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রস্রষ্টা, চিন্তানায়ক, রাষ্ট্রপতি, তখন তিনি বিশ্বমূর্তি। ঐ মূর্তি দেখে মহাবীর অর্জুন অবধি ভীত হয়েছিলেন। বিশ্বরূপের বদলে বন্ধুরূপে দেখা দিতে মিনতি করেছিলেন কৃষ্ণকে। তবু বলি ও রূপ মর্ত্যের মানুষের যাদের সমস্যা অসংখ্য, আর সেই অসংখ্যের নাগপাশ থেকে যারা মুক্তিপ্রয়াসী।

তুহিনকে বাধা দিয়ে নবীনা বলল, বিদেশীর স্নানাহার হয়নি দেখছি, তার ব্যবস্থা করে দাও।

জরা বলল, সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না, আমি ঐ সরোবরের জল পান করেছি, জল তো নয় অমৃত, ওতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই মিটেছে। এখন আমাকে বিদায় দাও।

কোথায় যাবে?

পথ যেখানে নিয়ে যায়।

পথ কি তোমার মুক্তির খবর রাখে?

হয়তো রাখে না, তবু পথ ছাড়া আমার আর গতি কি? পথে পথে ঘুরে ঘুরেই জীবন কাটাবো যদি কখনো তেমন লোকের সাক্ষাৎ পাই। তেমন কাউকে তোমরা জানো?

তুহিন বলল, শুনেছি হিমালয়ের কোনখানে আশ্রম স্থাপন করে বিরাজ করছেন চারুবাক নামে ঋষি। যদি ভাগ্যে থাকে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিলেও দিতে পারেন।

কি নামটি বললে? আর একবার বলো।

ঋষি চারুবাক।*

* মহাভারতে পাওয়া যায় যে দুর্যোধনের চার্বাক নামে এক বন্ধু ছিলেন। এই 'বাক্যবিশারদ' দার্শনিককে বোধ করি Sophist বললে অন্যায় হয় না। তিনি বেদবিরোধী ছিলেন বলে বেদবাদী ঋষিগণ তাঁকে বলেছেন চার্বাক রাক্ষস। খুব সম্ভব চার্বাক শব্দটি চারু-বাক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। তা যদি হয় তবে বুঝতে হবে অনেকের কাছে তার বাক্য সুন্দর মনে হতো। সম্ভবতঃ চারুবাক, চার্বাক শব্দের মধ্যে এই ইতিহাস লুপ্তাকারে থেকে গিয়েছে। মহাভারতের সমাজ, পৃঃ ৬৫২, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ।

চারুবাক। না, আর ভুল হবে না, চললাম। এই বলে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে জরা আবার পথ চলতে শুরু করলো।

জরার বিদায়ে চিরানন্দলোক থেকে রাহুর উপচ্ছায়া অপসারিত হল।

॥ ৫ ॥

আবার পথে। একে পথ বলা ভাষার অপব্যবহার। খাড়া পাহাড়ের কাঁধ-বরাবর পথিকের পায়ে পায়ে একটা নিরিখ পড়ে গিয়েছে, কোনমতে একজন লোক চলতে পারে, উল্টোদিক থেকে আর একজন এসে পড়লে বিপদ, একজনকে পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আঁকড়ে ধরে পাশ দিতে হয়। ডান দিকে পাহাড় সোজা উঠে গিয়েছে একেবারে আকাশের সীমানা অবধি; গায়ে বনস্পতির অক্ষৌহিণী; তার গায়ে মাথায় জড়ানো মোটা মোটা লতা; অজানা ফুলে অজানা পতঙ্গের চঞ্চলতা; সেই অরণ্যের মাঝে নিশ্চয় আছে অজানা শ্বাপদের দল; সমস্ত নিস্তব্ধ কিন্তু নীরব নয়, কেমন একটা গম্ গম্ গম্ভীর ধ্বনি, একেই বোধ করি প্রাচীনেরা ওঙ্কার শব্দ বলেছেন। আর বাঁ দিকে ঐ অতি নিম্নে পাহাড়-বরাবর একটি ক্ষীণ সাদা সুতো, তার দু পাশের শাল দেওদার বনস্পতির ক্ষুদ্রায়তন স্মরণ করিয়ে দেয় উপত্যকার গভীরতা।

সর্বত্র পথ প্রায়ে চলার মত হলেও বা হত, অনেকগুলিই পথের নিরিখ নয়, পাথরের খণ্ড পড়ে আছে—ওটাই নাকি পথ। পায়ের চাপে একখানা পাথর খসে পড়লেই নির্ঘাত পতন, হাড়-মাংসের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, ঐ যে নীচে মাংসাশী পাখিগুলো উড়ছে তারা বঞ্চিত হবে না। উপতাকার ওপারে আবার পাহাড়ের ঐ একই দৃশ্য। আজ সারাদিনের মধ্যে একখানি পাহাড়ী গ্রাম চোখে পড়েনি জরার। গতকল্য এক পাহাড়ী গ্রামে আশ্রয় জুটেছিল, গাঁয়ের লোকে সাধু মনে করে তাকে খাদ্য ও ঘরের দাওয়ায় রাত্রি যাপন করতে দিয়েছিল। আজ সারাদিন অনাহার, তাতে জরা অনভ্যস্ত নয়, রাতে যে কোথাও আশ্রয় মিলবে তারও আশা নেই—তাতেও সে অভ্যস্ত। তবে একটা বসবার স্থান তো আবশ্যক—এই পথের সরু সুতলির উপরে বসা দূরে থাক পা ফেলবার স্থানও যে সর্বত্র নেই।

সারা দিনের মধ্যে চোখে পড়েনি একটা পথিক। কাউকে শুধাতে পারেনি তার গতি কি হবে, শুধু মনের মধ্যে জপে চলেছে আমি পাপী, আমার কি গতি হবে। এমন সময়ে মোড় ঘুরতেই জরার চোখে পড়লো অনেকটা সমতল স্থান,

সেখানে গাছপালাও কম। এখন এই হঠাৎ দৃশ্যান্তরে আর সে বিস্ময় বোধ করে না। পাহাড়ে সবই অভাবিত আচমকা। তার পা আর চলছিল না, একটা গাছের গুঁড়ির কাছে বসলো, বসলো কি ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো আকাশ আলোয় ভরে গিয়েছে আর সম্মুখে হাত জোড় করে দণ্ডায়মান কয়েকজন পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ, বাবাজী গোড় লাগে।

জরা তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় বলল, আমি সাধু-সন্ন্যাসী নই, নিতান্ত পাপী—মহাপাপী।

তাতে ঠিক উল্টো ফল হল। এই সরল পাহাড়ীরা জানে প্রকৃত সাধুরা সহজে ধরা দেন না, নানা অছিলায় মুক্তি পেয়ে প্রস্থান করেন।

তারা বলল, বাবাজী, সংসারী মানুষ পাপীতাপী হবে, আপনার মত গৃহত্যাগী পাপী হতে যাবে কোন্ দুঃখে।

জরার এরকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে, জানে যে দোষ স্বীকার করে প্রসাদ-প্রত্যাশীদের হাত থেকে সাধু-সন্ন্যাসীদের মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই সে নীরবতা অবলম্বন করলো। তাতে গৃহীদের ভক্তি গেল আরও বেড়ে। এমন সময়ে একজন গৃহী এক লোটা দুধ আর কতকগুলো আখরোট নিয়ে এসে উপস্থিত হল, সাধুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো। জরা বুঝলো এগুলো প্রত্যাখ্যান করলে তাদের ভক্তিতে এমন আতিশয্য হবে যে সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। আর তাছাড়া কালকের অনাহারে সে এমনি দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে খাদ্যের তার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দুধটা পান করে কয়েকটা আখরোট ভেঙে খেল, বাকিগুলো বিতরণ করে দিল, তারা সেগুলি প্রসাদ মনে করে মাথায় ঠেকিয়ে গাঁয়ের দিকে প্রস্থান করলো। জরা এই সুযোগে করলো স্থানত্যাগ।

জরার দেশ কাল সম্বন্ধে বিভ্রম জন্মে গিয়েছে। কতকাল হল নরেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করেছিল খেয়াল নেই—সে যেন গতজন্মের স্মৃতি। কিন্নর রাজ্য ছেড়েছে কবে! কখনো মনে হয় দু'চার দিন আগে, কখনো মনে হয়, অনেক অনেক কাল। আর স্থান? এ কোন্ স্থান জানে না, কোথায় চলেছে জানে না। দেশভ্রমে দিক্‌ভ্রম। তবে সেটা হতে দেয়নি। প্রতিদিন প্রাতে সূর্যোদয় দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নেবার মত দিকনির্ণয় করে নেয়। ছাগর্ষির উপদেশ পূবে যাবে দক্ষিণে যাবে, পূর্বে হিমালয়, দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে বা পশ্চিমে নয়। জরা পূবদিকের যাত্রী। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীতে স্নান করতে নেমে নিজের দাড়ি আর চুলের দৈর্ঘ্য দেখে বুঝতে পারে অনেক কাল গিয়েছে তার মাথার উপর দিয়ে। কত কাল! তা জানে না। নরেন্দ্রনগরে তার দাড়ি ছিল না,

চুল সামান্য। এখন দাড়ি বুকের উপরে এসে পৌঁছেছে, চুল পিঠের উপরে। সেই গোঁফ-দাড়ির আগাছা ভেদ করে চোখে পড়লো নিজের মুখখানি। এ দুয়ে কত প্রভেদ। হ্যাঁ, কপালে ও গালে দুঃখ-কষ্ট ছাপ বসিয়ে দিয়েছে বটে তবু তারুণ্য ঘোচাতে পারেনি। তার বয়স কতই বা হবে, খুব বেশি হবে তো দু'কুড়ি। তার কিছু কম হওয়াই সম্ভব। অবশ্য দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেললে তারুণ্য স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। তখনি মনে পড়ে যায় কিন্নর রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের।

জরা ভাবে বোকা পেয়ে তাকে ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে দিলে না তো! বলে কিনা ছোকরার বয়স দেড়শ, আর ছুঁড়ি তিনটের সোয়া শ। ওদেশে যে বৃদ্ধ নেই, অর্থাৎ চুল দাড়ি পাকা ন্যুব্জদেহ মানুষ নেই, সে তো চোখেই দেখলাম। আর এই চিরযৌবন নাকি প্রবৃত্তিকে বাধা না দেওয়ার ফল। সে বলে যেত সব…কিন্তু তখনি মনে পড়ে যায় যা দেখল আর শুনলো তাকে মিথ্যা বলে কি করে। ছোকরা এসে ছুঁড়ি তিনটেকে পথের মাঝে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলে আর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কেমন সরলভাবে হয়ে গেল। ওরা তো স্পষ্টই বলল, প্রবৃত্তির পথে ধর্মনীতি বিবেক আচার প্রভৃতির শিলাখণ্ড ফেলবার ফলেই বন্যা ঘটে, তাতেই অকালে ধসে পড়ে তারুণ্য যৌবন আনন্দ সুখস্পৃহা। নাঃ, ওরা বেশ সুখে আছে। অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। আর সে কিনা পথে পথে ঘুরে মরছে! মুক্তির সন্ধানে! নাঃ, ওরা বেশ সুখে আছে।

তখনি মনে পড়ে যায় খট্টাশ আর দলবলকে। তারাও তো বেশ সুখী ছিল। ধর্মনীতি বিবেক বলে হায় হায় করে বুক চাপড়ে মরতো না। মাঝখান থেকে তার এ দশা কেন? দু'দিকে সুখের সমান্তরাল তীরভূমি, মাঝখানকার দুঃখের আবর্তে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন মনে পড়ে যায় কিন্নর রাজ্যের তরুণটি কি একজন কবির যেন নাম করেছিল—চারুবাক না কি। পাছে নামটা ভুলে যায় তাই বার বার মনে মনে উচ্চারণ করে, এক-আধবার হয়তো জোরে বলে ফেলেছিল।

কি বাবাজী, সকালবেলাতেই ঐ অলুক্ষণে নামটা করছো কেন?

জরা চমকে চেয়ে দেখে পাশে এসে বসেছে আর একজন সন্ন্যাসী। হিমালয় সন্ন্যাসীর রাজ্য।

জরা শুধালো, আপনি কখন এলেন? কোথায় থাকেন?

নবাগত একটু রুক্ষভাবেই বলল, এখনি এসেছি। আর নিজে সন্ন্যাসী হয়ে জানেন না কোথায় থাকি! সন্ন্যাসীর যেখানে রাত সেখানে কাত। আপনার

প্রশ্নের উত্তর পেলেন তো, এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর শুনি—সকালবেলাতেই ঐ পাষণ্ডটার নাম করছিলেন কেন?

কেন, তাতে দোষ কি?

সকালবেলায় পাষণ্ডের নাম করলে দোষ কি?

পাষণ্ড বলেই দোষ।

নবাগত বললো, আরে এ যে মহাষণ্ড!

পাষণ্ড, মহাষণ্ড! সে কি আমি শুনেছি তিনি ঋষি।

ও বেটা যদি ঋষি হয় তবে বনের ভালুকগুলোও ঋষি। তা নামটি কোথায় পাওয়া হল?

জরা জানায়, কিন্নর রাজ্যে।

ও, ইতিমধ্যে সেখানেও যাওয়া হয়েছে! তবে তো নরকের দরজাটা দেখেছ, এবারে খাস নরকটা দেখতে বুঝি ইচ্ছে?

জরা বলল, সাধুজী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কেন তাঁকে পাষণ্ড বলছেন!

আগে কি প্রয়োজন সে বেটার কাছে শুনি?

জরা বলে, আমি ঘোরতর পাপী, মুক্তির সন্ধানে বেরিয়েছি, কিন্নর রাজ্যের লোকেরা বলল, ঋষি চারুবাক জানেন মুক্তির সন্ধান।

ঋষি চারুবাক! বেটা রাক্ষস চার্বাক।

রাক্ষস কেন? মানুষ খায় নাকি? শুধায় জরা।

মানুষ খায় না, খায় তার মুণ্ডুটি আর তার ইহকাল পরকাল।

জরা বলে, আমার তো ঐ দুয়ের একটাও নেই।

মুণ্ডুটি আছে তো, এবারে সেটাও থাকবে না।

সাধুজী, আমার মাথা-মুণ্ডুতে কি প্রয়োজন? মুক্তি ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

তা দেবে মুক্তি। গোটাকতক যুবতী জুটিয়ে দেবে, আর সেই সঙ্গে পায়স পিষ্টক পুরোডাস আর ভাঁড় ভাঁড় মাধ্বী। মুক্তি না পেয়ে আর উপায় কি?

কি বলছেন! তিনি একজন ঋষি।

আরে ঋষি বলেই তো বলছি। এক ঋষি বিশ্বামিত্র, আর এক ঋষি পরাশর, আবার এক ঋষি বেদব্যাস। এদের কলঙ্কে কান পাতবার উপায় নেই।

তার সন্তোষ-বিধানার্থে জরা বলল, সাধুজী, আপনিও তো একজন ঋষি।

তবে রে বেটা! আমি হলাম কিনা ঋষি—এই বলে হাতের দণ্ডখানা

উত্তোলন করলো জরার মাথা লক্ষ্য করে।

জরা সরে এসে বলল, মাপ করবেন, আমি জানতাম না আপনি কী?

নবাগত সদম্ভে বলল, আমি মুনি, মৌন থাকাই আমাদের ধর্ম আর সেই সং অক্রোধ ক্ষমা তিতিক্ষা।

মুনি-ধর্মের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর মুনিত্বে আর সন্দেহ রইল না। এখ সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু, এতক্ষণ চিনতে পারিনি, দোষ হয়ে গিয়েছে এবারে চারুবাক ঋষির আশ্রমের সন্ধান যদি জানেন তবে দয়া করে বলে দিন।

মুনি প্রস্থান করতে করতে বলল, জানি না।

তারপরে ফিরে এসে বলল, জানি কিন্তু বলবো না।

এই বলে সবেগে প্রস্থান করলো, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জরা।

॥ ৬ ॥

জরা যখন চার্বাক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। আশ্রমে প্রবেশ করতেই একজন তরুণ শিষ্য তাকে অভ্যর্থনা করে পাদ্য-অর্ঘ্য দিল, তারপরে বলল, আর্য, এখন আপনি বিশ্রাম করুন, কালকে প্রাতঃকালে আশ্রমগুরুর কাছে আপনাকে নিয়ে যাবো।

জরা বলল, বৎস, সত্যই পথশ্রমে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, আমার বিশ্রামের বড় প্রয়োজন।

শিষ্যটি বলল, সে তো খুবই স্বাভাবিক। হিমালয়ের এই দুর্গম অধিত্যকা আসতে হলে অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

তাকে অনুসরণ করে চলতে চলতে জরা দেখতে পেলো সরল দেওদার প্রভৃতি বনস্পতির ছায়ায় ছোট ছোট্ট পর্ণকুটির, কুটিরে কুটিরে দীপ প্রজ্বলিত, আশ্রমের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সমস্ত তকতক ঝকঝক করছে। আর সেই স্নিগ্ধশীতল আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত করে একটি নিবিড় শান্তি। ভারি আরাম বোধ করলো সে।

শিষ্য তাকে নিয়ে একটি পর্ণকুটিরে প্রবেশ করে পাথরের মেঝের উপরে খানদুই কম্বল বিছিয়ে দিল, বলল, আপনি উপবেশন করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আহারের সময় হবে তখন আপনাকে মহানসের সমীপে ভোজনশালায় নিয়ে যাবো।

জরা বললো, বৎস, তোমাদের অভ্যর্থনা ও সমাদরে আমি অত্যন্ত প্রীত হলাম। তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

জরা উপবেশন করলে সে অদূরে মেঝের উপরে বসলো। জরা বলল, বৎস,

তুমি শীতল মেঝেতে বসলে কেন? এই কম্বলের উপরে এসে বসো।

শিষ্যটি বলল, আর্য, অতিথির সঙ্গে সমাসনে বসা বিধেয় নয়, আমি এখানে বেশ আছি।

জরা শুধালো, তোমার নাম কি বৎস?

আমার নাম অরণি।

অরণি! বেশ সুন্দর নামটি।

অরণি শুনে হেসে উত্তর দিল, আর্য, শুধু আমার নামটি নয়, আমাদের এখানে সমস্তই সুন্দর, কালকে ভোরের আলোয় দেখে সন্তুষ্ট হবেন।

জরা প্রশ্ন করলো, বৎস, তোমরা এখানে কোন্ দেবতার উপাসক?

উত্তর শুনতে পেলো, আর্য, আমরা কোনো দেবতার উপাসক নই, আমরা ব্রাত্য।

ব্রাত্য শব্দটি কথনো শোনেনি জরা, তাই শুধালো, ব্রাত্য বলতে কি বোঝায়?

আমরা দেবোপাসক নই বলে বেদবাদী মুনি-ঋষিগণ আমাদের বলে ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রতভ্রষ্ট বা পতিত। তারা আমাদের একঘরে করে রেখেছে।

জরা শুধায়, তাই বুঝি এই দুর্গম স্থানে তোমাদের আশ্রয়!

না আর্য, ঠিক সেজন্য নয়। এ স্থান সুন্দর স্বাস্থ্যময়, নগর কোলাহল হতে দূরে অবস্থিত বলে সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

জরা বলে, এইমাত্র বললে, তোমরা কোন দেবতার উপাসনা করো না তবে আবার সাধনা কিসের? কার সাধনা করো?

অরণি বলল, কারো সাধনা নয়, আমরা জীবনের সাধনা করি, আমরা জীবনসাধক।

বিষয়টা তো বুঝতে পারলাম না বৎস, বুঝিয়ে দাও।

আর্য, অতি কঠিন প্রশ্ন করেছেন। বোঝাবো এমন সাধ্য আমার নেই। কালকে আশ্রমগুরুকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন।

এমন সময় শঙ্খবাদিত হল।

জরা শুধালো, কোন্ মন্দিরে শঙ্খ বাদিত হল?

শিষ্যটি বলল, কোন মন্দিরে নয়, তবে মন্দির শব্দ প্রয়োগ করতে হলে বলা যায়, ভোজনমন্দিরে। এই বলে সে মৃদু হাস্য করলো।

তারপরে বলল, গাত্রোত্থান করুন, ভোজনশালার দিকে যাওয়া যাক।

অরণিকে অনুসরণ করে জরা ভোজনশালায় এসে পৌঁছল। দেখতে পেল দীর্ঘ দুই সারিতে কুশাসনে ভোক্তাগণ, উপবিষ্ট প্রত্যেকের পাশে এক লোটা জল,

সম্মুখে কালো পাথরের থালাতে এক গুচ্ছ পুরোডাস, শাক, পাথরের বাটিতে মাংস ও পায়সান্ন। এই দীর্ঘ সারির একান্তে একজন বিভূতিসম্পন্ন কান্তিপুরুষ উপবিষ্ট। তিনি বললেন, আর্যগণ, এবারে অনুগ্রহ করে ভোজন আরম্ভ করুন।

অরণি নবাগত অতিথিকে পাশে নিয়ে বসেছিল। জরা বুঝলো, এদের মতবাদ যাই হোক, এরা খায়দায় ভালো, তখনি মনে পড়লো এরা জীবনসাধক। হ্যাঁ, জীবনসাধনার উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী বটে। নরেন্দ্রনগর ছাড়বার পরে এরকম সুখাদ্য জোটেনি জরার ভাগ্যে, অধিকাংশ সময়েই জুটেছে অখাদ্য ও নিখাদ্য। কাজেই সে যে আগ্রহের সঙ্গে খাবে এ আর বেশি কি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে খাদ্যগ্রহণে সকলেরই সমান আগ্রহ। জরা ভাবে তবে কি এরা সকলেও তারই মত রাহী আদমি নাকি! না, তা তো নয়। অরণির কাছে শুনেছিল যে সেদিন অতিথির সংখ্যা বেশি। দুপুরবেলাতেও এই সংখ্যা ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষুধার এই সজীব রূপ দেখে বুঝলো, এদের জঠরাগ্নি কিছু প্রবল, আর তা হবেই বা না কেন! হিমালয়ের জল ও হাওয়া দুই স্বাস্থ্যের অনুকূল।

কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে জরা লক্ষ্য করলো, এতক্ষণ একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুরোডাস ও মাংসের প্রতি। এক সারিতে, যে সারিতে সে নিজে উপবিষ্ট, ভোক্তাগণ গুম্ফ ও শ্মশ্রুমান, অনেকের শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য জরার দাড়িকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। অন্য সারিতে যুবকদলের গুম্ফশ্মশ্রু ক্ষৌরিত চিক্কণ কান্তিমৎ মুখমণ্ডল। অরণি কানে কানে বলল, এ সারিতে সমাগত অতিথিগণ, সম্মুখের সারিতে আশ্রমিকগণ, আর ঐ যিনি আহার করতে অনুরোধ করলেন তিনি আশ্রমগুরু চার্বাক। জরা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে দেখল, তবে ইনিই বহুশ্রুত বহুনন্দিত বহুনিন্দিত ঋষি চার্বাক। কই, ঋষিযোগ্য তো কিছুই নেই তাঁর মধ্যে, গোঁফদাড়ি ঘটাপটা! এ কেমন ঋষি!

জরা শুধালো, এত অতিথি সমাগম কি নিত্য হয়ে থাকে?

অরণি জানালো, প্রায় প্রত্যহ কিছু অতিথি সমাগম হয় তবে আজ কিছু সংখ্যা বেশি।

কোন পর্ব আছে কি?

না আর্য, আগামীকল্য এক বিতর্ক হবে।

কি নিয়ে?

অরণি জানায়, এইসব অতিথি বেদবাদী অর্থাৎ আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি মানেন। আমরা মানি না। তর্ক এই দুই পক্ষে হবে।

জরা শুধায়, তোমরা কি পাপপুণ্য মানো না?

পাপপুণ্যের উর্ধ্বে এক অবস্থা আছে, আমরা তাই মানি।

কি সেটা ?

আনন্দ। আমাদের জীবনসাধনা এই আনন্দ উপলব্ধির জন্যে।

শুনেছি বেদবাদীগণও আনন্দ স্বীকার করেন।

করেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের পথের ব্যবধান অনেক। আর্য, এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে আমি অনধিকারী। আজ রাতের মতো ধৈর্য ধরুন, কালকে বিচারসভায় সমস্ত অবগত হবেন।

ইতিমধ্যে ভোজন ও আচমন শেষ করে যে-যার কুটীরে প্রস্থান করলো। জরা শয্যায় শয়ন করামাত্র নিদ্রামগ্ন হল।

যে জরা তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে শিকার করে বেড়াতো, বাসুদেবকে হত্যা করেছিল, মদিরার ঘরে ঢুকে মদ খেয়ে মাতলামো করতো—সে-জরা আর আজকের জরায় অনেক প্রভেদ। সুমন্তনগরের জরা আর নরেন্দ্রনগরের জরা অনেক ভব্যতা, রাজকীয় আচার-ব্যবহার শিখেছিল তবু সে জরা আজকের জরা নয়; তারপর দুঃখের অনুশোচনায় কষ্টের তাড়নায় সঙ্কটে বিপদে পথে পথে অনেক বছর কেটে গিয়েছে তার। সাধুসঙ্গ করেছে, অসাধু-সঙ্গ করেছে, বাঘের মুখে পড়েছে, ভালুকের তাড়া খেয়েছে, কিন্নর রাজ্য দেখেছে। এইভাবে দুঃখের কটাহে তপ্ত হতে হতে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে পেকে উঠেছে; কেতাবী জ্ঞান না পেয়েও জ্ঞানের যা সার, ভালোমন্দ বিচার করবার কিছু ক্ষমতা লাভ করেছে। বেদ পুরাণ লোকায়ত মত সম্বন্ধে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকলেও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ হয়েছে। জ্ঞানীদের কথা বুঝতে পারে যদিচ নিজে জ্ঞানী বা পণ্ডিত নয়। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, চুম্বকশলাকা যেমন নিরন্তর উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকে তেমনি তার মনটি একাগ্র হয়ে আছে অভীষ্টলাভের দিকে, কিভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই অভিলাষ নিয়ে সে যখন পরদিন প্রাতে বিচারসভায় এসে বসলো, দেখলো পাণ্ডিত্যের তুলো ধুনে চতুর্দিক অন্ধকার করে ফেলেছে উভয় পক্ষের পণ্ডিতে। কেবল আশ্রমগুরু চার্বাক প্রসন্নমুখে নীরব।

উভয় পক্ষে বিতর্কটা কি রকম হচ্ছে বোঝাতে হলে আধুনিক রণকৌশলের সঙ্গে তুলনা দিতে হয়, অন্য কিছু তুলনীয় তো দেখি না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই উভয় পক্ষ কামানের গোলা চালাতে শুরু করে, গোলা-বর্ষণ করে প্রতিপক্ষকে থেঁতলে ঘায়েল করে নেওয়া উদ্দেশ্য, তারপরে প্রয়োজনমত পদাতিক বা অশ্বারোহী। এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে, কামানের গোলার বদলে দুর্বোধ্য দুর্বহ সংস্কৃত শ্লোক।

জয়ার এমন বিদ্যা নেই সংস্কৃত বোঝে, তাই গম্ভীরভাবে নীরব হয়ে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে উভয় পক্ষ যখন রণক্লান্ত তখন শ্মশ্রুমান একজন বেদবাদী বলে উঠল, হে চার্বাক রাক্ষস, সাধ্য থাকে তো প্রমাণ করো যে আত্মা, ঈশ্বর ও পরকাল নেই।

তার অনার্য সম্ভাষণে চার্বাকপন্থীদের একজন বলে উঠল, আশ্রমগুরুর অপমান অসহ্য, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

সেই শ্মশ্রুমান ব্যক্তিটি বলল, অনার্যের সঙ্গে ভদ্রতা অনাবশ্যক।

শিষ্যটি বলল, উনি যে অনার্য সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।

প্রমাণ ও ভদ্রতা অবান্তর। যুদ্ধ বিজয়ের পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে অনাহূতভাবে এই অশিষ্ট ব্যক্তি সভায় প্রবেশ করে সম্মিলিত ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাণী উপেক্ষা করে তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল, বলল বেদবাদী ব্রাহ্মণটি।

শিষ্য উত্তর দিল, অসংখ্য আত্মীয় ও নিরীহ প্রজার প্রাণের বিনিময়ে লব্ধ সিংহাসন সজ্জনের ধিক্কারের যোগ্য।*

তার উত্তর শুনে বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ অবজ্ঞাসূচক উচ্চহাস্য করে উঠল, বলল, ধর্মযুদ্ধে শত্রুনিধন পাপ নয়, বরঞ্চ শত্রুনিধন না করাই পাপ। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাদের বাক্যে লোকায়তগণ বলল, আপনারা অপোগণ্ডের মত কথা বলছেন, কৃষ্ণ পর্যন্ত মানতে রাজী আছি, কিন্তু তিনি যে ভগবান তার প্রমাণাভাব।

বেদবাদীদের একজন বলল, অন্ধের কাছে জগৎটাই প্রমাণের অতীত।

অন্ধ জগৎ দেখতে না পেলেও তাকে স্পর্শ করতে পারে, তাকে আস্বাদ করতে পারে, কিন্তু আপনাদের কে ভগবান প্রত্যক্ষ করেছেন বলুন।

তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হলেও মানস প্রত্যক্ষ।

সে প্রত্যক্ষতা আপনাদের কাছে সত্য হতে পারে, অন্যে তা মানবে কেন ?

বেদবাদীগণ বলল, তবে তোমরা কি মানো বলো দেখি ?

লোকায়তগণ অভিমত প্রকাশ করলো, যা প্রত্যক্ষ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যসম্মত তাই মানি, প্রমাণাভাবে তদতিরিক্তের অস্তিত্ব নেই।

তবে তোমরা আত্মা মানো না, কেন না তা প্রত্যক্ষ নয়।

নিশ্চয়ই মানি না।

তবে তো দেখছি তোমরা ঈশ্বর, পরকাল, ধর্মনীতি বিবেক কিছুই মান না ?

* মহাভারতের সমাজ, পৃঃ ৩৫২, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ।

একথা সত্য, স্বীকার করলো লোকায়তগণ। তারা আরও বলল, ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম প্রভৃতি অলীক কল্পনা রাজন্যগণের প্রেরণায় অভিসন্ধিপরায়ণ পরপিণ্ডভোজী ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি। ও একপ্রকার মানসিক মদ্য। ঐ মদ্য পান করিয়ে জনসাধারণকে বিকল করে রাখা হয়েছে।

কেন বলো তো বাপু? শুধলো একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

এই জন্যে যাতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে থাকে, রাজাদের হাত থেকে নিজেদের প্রাপ্য ছিনিয়ে না নিতে পারে।

ধরো, তোমার কথা যদি সত্যই হয় তাতে ব্রাহ্মণগণের লাভ কি?

লাভ রাজপ্রসাদ।

ব্রাহ্মণগণ দীন জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত, সামান্য আতপ চাল ও ঘৃতের বেশি তাদের প্রয়োজন হয় না তবে কেন অন্যায়ভাবে রাজপ্রসাদ যাচ্ঞা করতে যাবে!

তা নইলে যে ঐটুকু মেলে না। পরজীবী পরাশ্রয়ী পরান্নভোজীদের জীবন-ধারণের আর কি উপায়!

এসব যুক্তি অর্বাচীনের মত, অর্বাচীনরাই এতে মুগ্ধ হবে। আচ্ছা বাপু, তোমরা তো আত্মা ঈশ্বর পরকাল কিছুই মানো না, তবে তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি?

লোকায়তদের একজন বলল, সুখলাভ।

সুখলাভ তো পরকালবাদীদেরও কাম্য, তবে তফাতটা কোথায়?

তফাতটা পন্থায় ও সাধনরীতিতে।

সকলে চেয়ে দেখল আশ্রমগুরু এতক্ষণ নির্বাক হয়ে শুনছিলেন, এবার বলে উঠলেন, বেদবাদীদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ লোকায়তগণের লক্ষ্যে প্রভেদ নেই —প্রভেদ সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়ে।

সমস্ত বেদবাদীগণ দীর্ঘ চামরের মত দাড়ি সঞ্চালিত করে বলল, আর একটু খুলে বলুন।

তথাস্তু, বলে চার্বাক শুরু করলেন, আপনারা তপস্যা তিতিক্ষা কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি দ্বারা জীবনকে অহরহ কণ্টকিত করে রেখেছেন। অনাহারে অনিদ্রায় ভোগরাহিত্যে নিজেকে ক্লিষ্ট করেন, কেননা, আপনাদের ধারণা ঐ সব প্রক্রিয়ার পরিণামে সুখলাভ করবেন। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন ঐসব অমেধ্য প্রক্রিয়ার পরিণামে দেহরক্ষা করেন, সুখলাভ আর ঘটে না।

ব্রাহ্মণগণ বলল, ইহলোকে না হোক পরলোকে হয়।

চার্বাক বলেন, পরলোক যে আছে তা তো প্রমাণ হয়নি। আর তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করাই যায় যে পরলোক আছে তবু আমাদের জিৎ।

কেমন করে? দাবী করে বেদজ্ঞগণ।

আমরা ইহলোকে হাতে হাতে সুখলাভ করি, কোন অনির্দিষ্ট পরলোকের জন্ম তা মুলতুবী রাখি না।

ব্রাহ্মণগণ বলে, আমাদের সাধনপন্থা তো বিবৃত করলে, এবারে তোমাদের সাধনপন্থা কি শুনি।

বিলক্ষণ, বলে পুনরায় শুরু করেন চার্বাক, জীবনকে বঞ্চিত করো না, পঞ্চেন্দ্রিয়কে তাদের ভোগ্য যোগাও। হাতে হাতে সুখ পাবে। রসনা সুখাদ্য চায় তাকে বঞ্চিত করো না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুগন্ধ চায় গন্ধ পুষ্প ও সুরভিতে গৃহ পূর্ণ রাখো, শ্রবণেন্দ্রিয় মধুরধ্বনি প্রত্যাশা করে সুরম্য সঙ্গীত শ্রবণ করো, ত্বক ও উপস্থ নারীর স্পর্শ কামনা করে সুন্দরী যুবতী নারী উপভোগ করো—এই আমাদের সাধনরীতি। এভাবে যদি চলে তবে জরা-মরণরহিত হয়ে চিরপুণ্য-লোকে মানুষ বিরাজ করতে পারে। পারবে নয় পারে, হিমালয়ে অনেকগুলি কিন্নর রাজ্য আছে সেগুলি দেখে আসুন।

তারপরে তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের শুধালেন, মহাশয়, আমার বয়স কত অনুমান করেন?

একজন তাঁকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে বলল, যে রকম নাদুসনুদুস দেখছি, চল্লিশের উর্ধ্বে নয়।

চার্বাক বলল, আমার বয়স দু হাজার বছর, আরও অন্তত দু হাজার বছর বাঁচবো, হয়তো বা চিরজীবীও হতে পারি। এবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনাদের বৃদ্ধতমের বয়স কত?

এই অভাবিত প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল ব্রাহ্মণগণ। কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জানালো এই যে উদ্দালক ঋষি ইনিই আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, এঁর বয়স চুরাশি।

তবেই দেখুন বেদজ্ঞমহাশয়গণ, এই সামান্য বয়সে ভ্রান্ত সাধনপন্থা অবলম্বনের ফলে আপনারা শুকিয়ে চামচিকের মত হয়ে গিয়েছেন। আমার এই সৌম্য শিষ্যগণের মধ্যে তরুণতমের বয়স চুরাশির অনেক বেশি। এরা সকলেই ভোগী, সুখী ও লব্ধকাম।

একজন বেদজ্ঞ বলল, মহাশয়, ক্রমাগত ভোগে যে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে, ক্রমে উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, ধ্বজভঙ্গ রোগ দেখা দেয়, রোগ ও জরা মৃত্যুর অগ্রদূত-

রূপে এসে আক্রমণ করে তখন সুখ যে মাথায় ওঠে !

চার্বাক বলল, মহাশয়গণ, ভুল করছেন, অতিরিক্ত ভোগেই ঐ সব পরিণাম ঘটে, অতিরিক্ত ভোগে অগ্নিবর্ণ নষ্ট হয়েছিল, অতিরিক্ত ভোগে চন্দ্র ক্ষয়রোগযুক্ত। ভোগ ও অতিরিক্ত ভোগে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই দেখুন না কেন, অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনে অকালে আপনারা শুষ্ক হরিতকিতে পরিণত হয়েছেন। সর্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্। আরও যদি অনুস্বর-বিসর্গযুক্ত বাক্য শুনতে চান তবে বলি —সন্তোষহৃদিমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। বিচার করে নিয়মিত ভোগ করুন ইহজীবনেই পরম সুখলাভ করবেন অযথা নিজেকে ভোগা দেবার জন্যে ঈশ্বর-ফিশ্বর পরকাল-ফরকাল কল্পনা করবার প্রয়োজন হবে না।

চার্বাকের যুক্তির মধ্যে যতই ফাঁক থাকুক সে ফাঁকি ধরবার মত বিদ্যা উপস্থিত বেদবাদীদের ছিল না, তবু তারা ভাঙে তথাপি মচকায় না।

একজন জিজ্ঞাসা করলো, বেশ, ঈশ্বর পরকাল প্রভৃতি যেন নেই—কিন্তু জড়-জগতে চৈতন্য এলো কি ভাবে ?

চার্বাক বলল, চৈতন্যরূপ স্বতন্ত্র কিছু কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই, চৈতন্য জড়েরই বিকার। এই ধরুন না কেন, তণ্ডুল গুড় প্রভৃতি নানা দ্রব্যের কল্ক মিলিত হলে দু-তিনদিনের মধ্যে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপে যথাযথ সমাবিষ্ট পঞ্চ-ভূত থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি। কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়—অগ্নি তো কাষ্ঠেরই অবস্থান্তর। অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে সঞ্চালিত করে সেই সমুৎপন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে চালিত করে। অত কথায় কাজ কি, ভোগ্যবস্তুর ভোক্তৃত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত শরীরাতিরিক্ত জীব স্বীকারের প্রয়োজন নেই। কাজেই চৈতন্য জড়ের মধ্যেই বর্তমান।

চার্বাকের ব্যাখ্যা শুনে বেদবাদী কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপরে সমস্বরে বলে উঠল, ধিক্ পাপ আলোচনা। এ নরকসদৃশ স্থানে আর তিলার্ধকাল অবস্থান করা উচিত নয়।

এই বলে তারা গাত্রোত্থান করে চার্বাকের পিত্রান্ত করতে করতে সদলে প্রস্থান করলো, চার্বাকের সনির্বন্ধ অনুরোধ-উপরোধে বিচলিত হল না।

এতক্ষণ একান্তে বসে জরা সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল এবং শুনছিল, কতক বুঝতে পারছিল, কতক পারছিল না। সবাই চলে যাওয়ার পরে একমাত্র শ্মশ্রুমান ব্যক্তি হওয়ায় সহজেই চার্বাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চার্বাক বলল, মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি বেদবাদীগণের সঙ্গে প্রস্থান করেননি। আপনি দয়া করে আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

জরা উত্তর দেওয়ার আগেই অরণি তার বিবরণ নিবেদন করলো, বলল, গত রাত্রে তিনি এসেছেন, আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে।

তখন চার্বাক বলল, বড়ই আনন্দিত হলাম, তা কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি?

জরা করজোড়ে নিবেদন করলো, প্রভু, আমি মূর্খ, পেশাতে ব্যাধ। শাস্ত্র জানি না, এই যে আলোচনা হচ্ছিল তার সামান্যই বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আমি জড়বাদী বা চৈতন্যবাদী কিছুই নই। আপনারা সুখসাধক আর আমি ঘোরতর দুঃখী।

চার্বাক স্নিগ্ধভাবে শুধালো, কিসের দুঃখ আপনার?

প্রভু, আমি মহাপাপী। সেই পাপ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করে আমি দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুনেছি হিমালয় ভারতের সকল সমস্যার সমাধান, সকল তর্কের মীমাংসা, সকল সন্ধানের শেষ লক্ষ্য। তাই এখানে এসেছি যদি কোন একটা গতি হয়।

জরার বাক্য শ্রবণ করে চার্বাক অধোবদনে নীরবতা অবলম্বন করলো, উত্তর-প্রত্যাশী জরা করজোড়ে উন্মুখ হয়ে বসে রইলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষে বাক্‌স্ফূর্তি হল না। অবশেষে চার্বাক মুখ তুলে বলল, আর্য, আপনি লোকায়ত তত্ত্বের মর্মে আঘাত করেছেন।

জরা সকাতরে শুধালো, কেন প্রভু?

চার্বাক বলল, সংসারে সকলেই সুখের প্রত্যাশী, সকলেই সুখের সন্ধানে আমার কাছে আসে, এ পর্যন্ত কেউ পাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় আমার কাছে আসেনি, কাজেই ও সমস্যার সম্মুখে আমাকে কখনো পড়তে হয়নি। এই প্রথম। আজ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুঝতে পারলাম আমার তত্ত্বে এমন কোন উপায় নেই যাতে দুঃখীর দুঃখ দূর করতে পারে, পাপীর পাপ মুক্ত করতে পারে।

তার কথায় জরার দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, সেটুকু এড়ালো না চার্বাকের চোখ। তিনি বললেন, পাপতাপ দুঃখের উর্ধ্বে সুখলোক, লোকায়ত তত্ত্ব সেই সুখের সন্ধান জানে। এ তত্ত্ব স্বাস্থ্যসঞ্চার করতে সমর্থ, রোগমুক্ত করতে পারে না। স্বভাবতই সুখলাভের উপায় আবিষ্কার করেছি, ভেবেছি সংসারকে সুখময় করে তুলবো কিন্তু পাপীকে দুঃখীকে কিভাবে সুখলোকে উদ্বর্তন করানো যায় কখনো চিন্তা করিনি। কাজেই, আর্য, আপনার প্রার্থনার কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে লোকায়ত তত্ত্বের ক্ষমতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী নয়—এর সীমা আছে। কাজেই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি আপনার গতি নির্দেশ

করবার শক্তি আমার নেই।

চার্বাকের সরল স্বীকারোক্তি শুনে জয়া নীরবে অধোবদনে অশ্রুমোচন করতে লাগলো। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো, তাকে দেখে আহ্লাদিত হয়ে চার্বাক বলল, সখা আনন্দ, অনেককাল পরে তোমার দর্শন পেয়ে মন খুশী হল, এসো আমার কাছে, উপবেশন করো।

জয়া দেখল নবাগত আশ্রমিকগণের ন্যায় চিরতরুণ নয়, তার দেহে বয়সের নখক্ষত বিদ্যমান, বয়স পঞ্চাশের কাছে হবে।

চার্বাক শুধালো, তোমার তো ঘুরে বেড়ানো চিরকালের অভ্যাস, বলো, এবার কোথা থেকে আসা হচ্ছে।

আনন্দ বলে, তোমার কথা সত্য, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেই আমার আনন্দ, আমি দীর্ঘকাল একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারি না।

সে তো জানি কিন্তু এবারে এখানে কিছুকাল স্থায়ী হও।

আনন্দ স্বীকার করে যে তার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, বলে, কিছুকাল থাকবো তবে কতকাল বলতে পারি না, নিয়তি ইঙ্গিত করলেই আবার পথে বের হয়ে পড়তে হবে।

সে দেখা যাবে, এখন বলো কোথা থেকে আসা হচ্ছে।

আনন্দ বলে, এখন সোজা আসছি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে! আগ্রহের সঙ্গে আবৃত্তি করে চার্বাক। বলো সেখানকার সংবাদ কি?

অনেক সংবাদ। দ্বারকায় যদুবংশ আত্মনাশ করে লোপ পেয়েছে। বলভদ্র ও বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন আর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছেন।

চার্বাক শুধায়, এসব কতদিনের কথা?

তা অনেকদিন হল বইকি। সাত-আট বছর হতে পারে।

বলো কি! এতদিন হয়েছে, আমরা তো কিছুই জানতে পারিনি।

জানতে পারবে কি করে? তোমার আশ্রম হিমালয়ের দুর্গম উপত্যকায় সুখলোকে, পৃথিবীর দুঃখের এখানে প্রবেশে অনধিকার। ভ্রাতঃ চার্বাক, দুঃখের মহাসমুদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র এই সুখের দ্বীপ রচনা করায় কার কি লাভ? এ দ্বীপে ক'জনের স্থান হবে?

নৌকো বানচাল হলে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে যে কজনের স্থান হয় তাই লাভ সকলে মিলে ডুবে মরার চেয়ে যে কজন বাঁচে!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে চার্বাক আবার বলল, ভ্রাতঃ আনন্দ, তবে তোমার কথার মূল্য এইমাত্র বুঝতে পেরেছি। তোমার আগমনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে এই আর্য—এই বলে দেখালেন অধোবদন জরাকে, পাপ থেকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তুমি কি উত্তর দিলে ?

জানালাম যে এ সমস্যার উত্তর দান আমার ক্ষমতার অতীত। আজকে লোকায়ত তত্ত্বের সীমানা বুঝতে পেরেছি। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা করবো, এই আর্যের সঙ্গেও পরে আলোচনা হবে। এখন বলো অমেয় রক্তপাতে বিজিত পাণ্ডব সাম্রাজ্যের কি সংবাদ ?

সে সংবাদ না শোনাই ভালো।

কেন এমন বলছ আনন্দ ?

নামে সাম্রাজ্য কাজে মহা অরাজকতা, তালপুকুরে এখন ঘটি ডোবে না।

এই দুঃসংবাদে চার্বাক ও জরা দুজনেই উৎসুক হয়ে উঠল, চার্বাক প্রকাশ্যে, জরা মনে মনে।

খুলে বলো আনন্দ।

আনন্দ আরম্ভ করলো, হৃৎপিণ্ডের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে রক্ত পৌঁছয় না দেহের সীমান্তে, দেহে দেখা দেয় জরা ও মৃত্যুর আভাস। পাণ্ডব সাম্রাজ্যেও আজ সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ। একদিকে বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ, আর সেই সঙ্গে তাল রক্ষা করে অন্তর্গত প্রজাবিদ্রোহ। একটাকে সামলাতে পারে এমন শক্তি কোন্ রাজার! রাজা দুর্বল, ঘটনাচক্রের দাস। আদেশ প্রচারিত হয়, পৌঁছয় না তা সীমান্তপ্রদেশসমূহে, আর যদিবা পৌঁছয় সামন্ত ও রাজকর্মচারীগণ তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করে যায়।

কী তাদের ইচ্ছা ?

সকলেরই ইচ্ছা ছিন্নভিন্ন সাম্রাজ্যখণ্ড নিয়ে রাজ্যস্থাপন করে। তখন একজনের ইচ্ছার সঙ্গে আর একজনের ইচ্ছার সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রজাসাধারণ সুযোগ বুঝে একদিকে যোগ দেয়—দুর্বল পিষ্ট হয়ে মরে। অনেকেই বোঝে কাজটা অন্যায়, কিন্তু বুঝলে কি হবে, নিছক প্রাণরক্ষার তাগিদে যে কোন দিকে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ভ্রাতঃ চার্বাক, পাণ্ডব সাম্রাজ্যে আজ কারো ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়, যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে যে কোন উপলক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তির প্রাণ যেতে পারে। এই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চার্বাক সমস্ত নীরবে শুনে বললেন, দেশের সবগুলি আলো একে একে নিভে গেল।

আনন্দ বলল, কুরুক্ষেত্রের ঝাপটায় গেল অধিকাংশ, তার পরে বাসুদেবের তিরোধানে আর সর্বশেষ পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানে বাকি ক'টা গেল।

উজ্জ্বলতম আলোটা গেল বাসুদেবের সঙ্গে।

নীরবে সমর্থন করলো আনন্দ। তখন চার্বাক বলল, শুনেছি এক ব্যাধের শরাঘাতে বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন।

আমিও সেইরকম শুনেছি চার্বাক। ভেবে পাই নে ব্যাধটা কেন মহাপুরুষকে মারতে গেল।

চার্বাক বলে, হয়তো না জেনে মেরেছে।

তা-ও কি সম্ভব! সংক্ষেপে মন্তব্য করে চার্বাক। তারপর বলল, না জানি সেই হতভাগ্যের মনে কী আত্মগ্লানি অনুভূত হচ্ছে, না জানি কী হল তার পরিণাম!

কে রাখে তার সন্ধান, মন্তব্য করলো আনন্দ।

চার্বাক কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, আনন্দ, এই যে মহাশয় আমাদের সম্মুখে উপবিষ্ট, পাপের গ্লানিতে সংসার পরিত্যাগ করে ইনি পথে পথে মুক্তির উপায় সন্ধান করে ফিরছেন। কি পাপ ইনি করেছেন জানি না, তবে এমন আর কি গুরুতর হবে! একটা সাধারণ পাপে যদি এত গ্লানি হয় তবে বাসুদেবকে হত্যার পাপে না জানি কি দাবানল জ্বলছে সেই অভাগা ব্যাধটার মনে।

এতদিনে বোধ করি আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়িয়েছে লোকটা।

সে পাপের গ্লানি কি এক জীবনে দূর হওয়ার!

এ কি কথা তোমার মুখে চার্বাক! তুমি তো পরকাল মানো না!

আমি মানি না সত্য কিন্তু সে লোকটা তো মানে। তাহলে হল। অনেক বিষয় আছে যার অস্তিত্ব নির্ভর করে মানা না-মানার উপরে।

তারপরে চার্বাক জরাকে সম্বোধন করে বলল, আর্য, এখন চলুন স্নানাহারের উদ্যোগ করা যাক। সন্ধ্যাবেলায় আপনার সঙ্গে আবার আলোচনা করবো।

॥ ৭ ॥

সন্ধ্যাবেলায় চার্বাক ও জরার মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল, আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।

চার্বাক বলছিলেন, আর্য, আমার দ্বারা আপনার অভীষ্ট লাভ হল না, পাপ থেকে মুক্তির সন্ধান দান আমার তত্ত্বের অতীত। কিন্তু আপনার দ্বারা আমি

লাভবান হয়েছি।

চার্বাকের স্বীকারোক্তিতে জরা লজ্জিত হয়ে বলল, এমন করে বলবেন না, ওতে আমার পাপের ভার আরও বাড়ে যে।

সত্যভাষণে পাপ বাড়বে কেন? আর আমার এই উক্তি অত্যন্ত নির্মম সত্য।

কেন প্রভু? শুধায় জরা।

আপনার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুঝতে পেরেছি লোকায়ত তত্ত্ব নীরন্ধ্র নয়। বেদবাদীরা যদি ভ্রান্ত হয় তবে লোকায়ত তত্ত্বও অভ্রান্ত নয়। বেদ-নির্দিষ্ট পন্থা যদি সুখ দিতে না পারে তবে লোকায়ত পন্থাও দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। লোকে কখনো না কখনো, কোন না কোন অবস্থায় পাপ করবেই। সেই পাপ থেকে মুক্তির পন্থা যদি না থাকে তবে তো জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে।

সত্যই কি মুক্তির পন্থা নেই প্রভু?

অবশ্যই আছে তবে তা লোকায়তগণ ও বেদজ্ঞগণ কেউ জানে না।

তবে পাপীর কি গতি হবে প্রভু!

সেই প্রশ্নই তো আজ সারাদিন নিজেকে করেছি।

উত্তর?

পাইনি, বললেন চার্বাক।

তবে?

হতাশ হওয়ার কারণ নেই আর্য, আমি না জানলেও কেউ না কেউ অবশ্যই জানবে।

আপনার মত জ্ঞানী যদি না জানেন—

তাকে বাক্যটি সম্পূর্ণ করবার অবসান দিলেন না চার্বাক, বললেন, আমি জ্ঞানের সাধনা করি নে, কেবল আনন্দরস পানে তন্ময় হয়ে ছিলাম। আজ আপনার প্রশ্নে বুঝতে পারলাম জীবনে একটা অন্ধকার দিক আছে। এতদিন তার সন্ধান জানতাম না, এবারে সেই প্রচেষ্টা করবো। জানি তার পরিণাম কি। আমি যে কৃত্রিম সুখলোক নির্মাণ করেছি তাতে কলি প্রবেশ করবে।

তার ফলে?

তার ফলে শুকিয়ে উঠবে পাতা, ঝরে পড়বে ফুল, ফল ফলবে বিষময়।

দুঃখের সঙ্গে জরা বলল, আমি এসে দুর্বিপাকটি ঘটালাম।

মোটেই নয়, আপনি এসে আমার মুখ ফেরাতে বাধ্য করলেন সেই দিকে যে দিকটা আমি এতকাল অস্বীকার করেছি। বেদবাদীরা আমাদের পরিহাস করে বলে যে, আমাদের ইষ্টমন্ত্র হচ্ছে যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, ঋণ করেও খাবে,

কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে আর ফেরে না। ভস্মীভূত দেহ আর ফেরে কি না ফেরে জানি না, তবে আপনাকে দেখে বুঝতে পারলাম যে দেহ ভস্মীভূত হওয়ার আগেও মানুষ পলে পলে দগ্ধ হতে পারে। আপনাকে নমস্কার। রাত অনেক হয়েছে, এখন বিশ্রাম করুন।

জরা বলল, প্রভু, আমি বিদায় নিয়ে রাখছি, শেষরাত্রে আবার পথে নামবো।

কে বলতে পারে হয়তো পথেই আপনার অভীষ্ট লাভ হবে, বলে বিদায় নিলেন চার্বাক ঋষি।

এর পরে কি আর জরার ভ্রম হওয়া সম্ভব! তার মনে পড়লো সকাল বেলায় আনন্দের মুখে শুনেছিল দেশ এখন সম্পূর্ণ অরাজক, সাধু নির্জিত অসাধু প্রবল ; রাজা অবজ্ঞাত, রাজকর্মচারী আত্মাভিমুখী ; বহিঃশত্রু সমাগত অন্তঃশত্রু সমুত্থিত। অরাজকতা আর কাকে বলে! এখন তার মনে হল তার হৃদয়টারও সেই অবস্থা। অরাজক অরাজক—ঘোর অরাজক, তার উপরে অন্ধকার। আলো-গুলো একে একে নেভেনি, এক সর্বনাশা দমকায় উজ্জ্বলতম আলোটা নিভে গিয়েছে।

আর অদৃষ্টের নিদারুণ বিদ্রূপ! সাধারণ পাপীর যদি এত আত্মগ্লানি হয় তবে না জানি বাসুদেব-হত্যাকারীর গ্লানি কি জ্বালাময়, মন্তব্য করেছিলেন চার্বাক। যদি তিনি জানতেন সেই নরাধম সেই মুহূর্তে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট! তা হ'লে না জানি কি কাণ্ডই ঘটতো! হঠাৎ তার কি কারণে জানি না হাসি পেলো—হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠলো। তারপরেই সেই হাঃ হাঃ শব্দ হায় হায় শব্দে পরিণত হল আর হাসির বাষ্প গলে গিয়ে দুই চোখ জলে ভেসে গেল। জরা কি পাগল হয়ে যাবে নাকি! তখন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিবলে হাসি-কান্নাকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল—বাসুদেব, বাসুদেব, রক্ষা করো। তোমার হত্যাকারীকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পারো। বাসুদেব, বাসুদেব, বাসুদেব!

॥ ৮ ॥

পরদিন ভোরবেলা চার্বাক-আশ্রম থেকে বের হয়ে জরা উপত্যকার বনে নামতে লাগলো। উপত্যকার অপর দিকে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে সেটা পার হলেই দক্ষিণ দিকের পথ পাওয়া যাবে। অরণিকে জিজ্ঞাসা করে পথের বিবরণ জেনে

নিয়েছিল জরা। অরণি বলে দিয়েছিল যে ঐ পাহাড়টার নাম পাঁচচুল্লি, তার পরে ছুটো পথ দেখতে পাওয়া যাবে, একটা শাখা গিয়েছে সোজা উত্তরে, অপরটা কিছু দূর পুবে গিয়ে তারপর সোজা গিয়েছে দক্ষিণে। উত্তরের পথটা গিয়েছে উত্তর কুরুতে, দক্ষিণেরটা ভারতবর্ষে। সেই পথটা আপনাকে ধরতে হবে, আর মনে রাখবেন যে আপনি যাচ্ছেন পশ্চিম থেকে। জরা তাকে জানিয়েছিল যে সে ভারতবর্ষে যেতে চায়।

উপত্যকায় নেমে একটি স্রোতস্বিনী দেখতে পেলো। এতদিনে জরা বুঝে নিয়েছে যে উপত্যকা মানে নদী। প্রবল আর ক্ষীণ এই প্রভেদ। এই নদীটি ক্ষীণ। সে আরও বুঝেছিল নদীতে আর পাহাড়ে বেশ লুকোচুরি খেলা চলছে। পাহাড়গুলো চায় নদীগুলোকে বন্দী করতে, নদীগুলো কিছুতেই ধরা দেবে না। নদীর ধারে বসে এক পেট জল খেয়ে নিল জরা। এই ক'মাসের পাহাড়ী অভিজ্ঞতায় বুঝেছে এসব পথে জলটাকেই খাদ্য বলে গ্রহণ করতে হবে, খাদ্য কথনো কদাচিৎ মিলে গেলেও যেতে পারে। নদীর অপর পারে গিয়ে পাঁচচুল্লি পাহাড়ে ওঠবার আগে একবার ফিরে তাকালো চার্বাক-আশ্রমের গিরিচূড়ার দিকে। মনে পড়লো গত রাত্রে চার্বাকের স্বীকারোক্তি।

চার্বাক বলেছিল সে সুখ দিতে পারে, কিন্তু ছুঃখ দূর করবার উপায় তার অজানা। অথচ ছাগর্ষি বলেছিল সংসারে সুখ বলে কিছু নেই, ছুঃখের অভাবকেই কথনো সুখ বলে মনে হয়, যেমন নাকি এই পাহাড়ে সমতলভূমি। পাহাড়ে কোন ভূখণ্ড সমতল নয়, পাহাড়ের অভাবকেই কোথাও কোথাও সমতল মনে হয়, লোকে তার নাম দিয়েছে উপত্যকা। জরা সুখের প্রার্থী নয়, চায় পাপ থেকে মুক্তি, পাপের পরিণাম তো ছুঃখ। চার্বাক ও ছাগর্ষি ছুজনেই অক্ষম তার পথনির্দেশ করতে। বুঝতে পারে না এখন তার কি কর্তব্য। পা ছুখানার পথ চলে চলে পথচলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেই অভ্যাসের বশে সে পথ চলে। সে ধরে নিয়েছে এইভাবে পথ চলতে চলতেই একদিন কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ে জীবনের অবসান ঘটবে। ভাবে ভালোই হবে, এই পাপ-পুণ্যের সুখ-ছুঃখের দোটানা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

জরা ভেবেছিল ছুপুরবেলার মধ্যেই পাহাড়টা পার হতে পারবে, কিন্তু ছুপুর পার হয়ে গেলেও দেখলো এখনো অনেক পথ বাকি। পাহাড় ও নারী নিতান্ত আয়ত্তের মধ্যে মনে হলেও আসলে তারা অনেক দূরবর্তী। এতখানি পথ এসেও একটিও পথিক তার চোখে পড়েনি। এমন নেড়া ও নির্জন পাহাড় আগে দেখেনি। সন্ধ্যাবেলায় পা ছুটো যখন অত্যন্ত ভারি মনে হল, একটা গুহা

দেখতে পেয়ে তার মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দিল। ভোরবেলা উঠে একটা ছোট গিরিচূড়া পার হতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো তার অনুরূপ আগে কখনো দেখেনি।

সমস্ত উত্তর আকাশটা জুড়ে যতদূর দেখা যায়, দেখা যায় পশ্চিমতম থেকে পূর্বতম সীমান্ত অবধি, সে দেখতে পেলো সাদা তরঙ্গের নিস্তব্ধ ওঠাপড়া। যেন সাদা শিবির সারি। লোকমুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শুনেছিল, সে বিবরণ কে না শুনেছে সারা ভারতবর্ষে, শুনেছিল যে কুরু-পাণ্ডবের উঁচু-নীচু সাদা শিবিরের সারিতে সমস্ত কুরুজাঙ্গল ভরে গিয়েছিল। সে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো, তবে তখনো জানতো না যে এ বিস্ময়ের অ আ ক খ মাত্র। হঠাৎ একটা রঙের বিদ্যুৎ তরঙ্গিত হয়ে গেল ঐ সাদার পটে, গাঢ়তম লাল থেকে ফিকেতম বেগনি পর্যন্ত। আর রঙ যে এমন চঞ্চল হয় কে জানতো! এই যেখানে লাল ছিল সেখানে হলদে, এই যেখানে বেগনি ছিল সেখানে কমলা। এ কি মুহুর্মুহু রঙের পালা-বদল! একবার রাজবাড়িতে কোন একটা পরব উপলক্ষে নাচ দেখতে গিয়েছিল। আসরে বিশ-পঁচিশজন সুন্দরী নারী নাচছে, তাদের ঘাগরাতে, কাঁচুলিতে, ওহাড়নিতে নাচের তালে তালে আর ঝাড়বাতির আলোয় আলোয় দেখেছিল এমনি রঙের পালাবদল, চোখে ধরবার আগেই বদলে যায়। হরিণের রক্তের লাল, চোখের সাদা, লোমের ধূসরতা, শিরদাঁড়ার পাটল আভা,—কটাই বা রঙ তার জানা! এ যে সংখ্যাতীত! কতক্ষণ মুগ্ধভাবে তাকিয়েছিল জ্ঞান ছিল না হঠাৎ সম্বিৎ হতেই দেখলো নাচ শেষ করে নটীরা অন্তর্ধান করেছে। প্রকাণ্ড আসর সাদা ও শূন্য। দেখলো যে সে উপবিষ্ট, গোড়াতে দাঁড়িয়ে ছিল, কখন বসে পড়েছে জানে না। বুঝলো এ হচ্ছে চিরতুষারের দেশ যার উত্তরে নাকি উত্তর কুরু।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো দক্ষিণ দিক থেকে আসছে পাহাড়ী ছাগলের লম্বা এক সারি, তাদের পিঠে মোট বোঝাই, সেই সারির সঙ্গে মাঝে মাঝে মালিক বা প্রহরী। পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়ালো জরা। কিন্তু তারা আর এগোল না। জরা একটা সমতল স্থানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এসে ছাগলের পিঠ থেকে বোঝা নামালো সেই বিদেশী ব্যাপারীর দল। ছাড়া পেয়ে ছাগলগুলো পাহাড়ের গা খুঁটে খুঁটে উদ্ভিদকণা খেতে আরম্ভ করলো, এসব উদ্ভিদ যে আছে আগে জরার চোখে পড়েনি।

ব্যাপারীরা মোট খুলে বের করলো মোটা মোটা রুটি আর চাটনি আর তারপরে সকলে গল্প করতে করতে খেতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় একজনের চোখে পড়লো জরাকে, ইশারা করলো কাছে আসতে। জরা কাছে এলে শুধালো, রাহী আদমি ?

জরা বলল, হাঁ জী।

আর একজন তার লম্বা দাড়ি চুল ও জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখে শুধালো, সন্ন্যাসী ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে জরা, শুধু কপালে হাত ঠেকালো।

ব্যাপারীরা তাকে বসতে বলে খানকতক রুটি ও খানিকটা চাটনি দিল, বলল, সাধুজী, খেয়ে নাও, এ পথে পরে কোথাও কিছু পাবে না।

জরা জানালো, সে দক্ষিণ দিকে যাবে।

কোথায় ?

ভারতবর্ষে। তোমরা কোথায় যাবে ?

তারা জানাল—ঐ পাহাড় পেরিয়ে তাদের দেশ।

বিস্মিত জরা বলল, ও পাহাড় পার হবে কি করে ! ও তো কেবল বরফ !

একজন বলল, বটে, তবে ওর মধ্যেই পথ আছে, নামান জমি আছে, ঝরনা আছে, গ্রামও আছে।

এতক্ষণে জরা লক্ষ্য করলো যে তাদের নাক চোখ কপাল একটু ভিন্ন রকমের। বিদেশী সন্দেহ নেই। জরা শুধালো, তোমরা আমাদের দেশের ভাষা জানলে কি করে ?

অনেককাল থেকে আমরা ব্যবসা করতে আসা-যাওয়া করি তাই শিখে নিয়েছি। দেশের ভাষা না জানলে কি ব্যবসা করা যায় !

কিসের ব্যবসা তোমাদের ? শুধায় জরা।

একজন বলে, দেশ থেকে আনি পশমী কাপড়, বিক্রি করে নিয়ে যাই সুতি কাপড়।

সুতি কাপড়ে শীত মানে ?

এই তো আমাদের গায়ে সুতি কাপড়। তবে এখনি তা বদলে পশমী কাপড় গায়ে দেবো।

আর একজন বলল, আমাদের দেশ থেকে সুতি কাপড় চালান হয়ে যায় কম্বোজে গান্ধারে আরও কত দেশে।

আবার কবে ফিরবে তোমরা ?

আর বোধ হয় শীঘ্র ফিরবো না।

কেন ?

কেন কি সাধুজী, দেশে রাজা না থাকলে ব্যবসা করে সুখ নেই।

রাজা নেই কি বলো ?

নামে আছে কাজে নেই।

আর একজন ব্যাপারী বলল, একেবারে না থাকলে একরকম। এ যে সকলেই রাজা।

আনন্দর মুখে জরা কিছু কিছু শুনেছে, তবু আরও জানবার আশায় শুধালো, সকলে রাজা, সে আবার কি ?

এই দেখো না সাধুজী, আমাদের মালপত্তর তিনবার লুট হয়ে গেল।

লুটে নিল! বিস্মিত হয় জরা।

লোকটি বলে, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ, এখানে তো লুট করে নেয় না, দান বলে নেয়।

দেশের নিন্দায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে জরা বলে, যদি দান করে থাকো তবে আর দুঃখ কি ?

সাধুজী, দান কি ইচ্ছায় করেছি? দান বলে যারা হাত বাড়ায় তাদের হাতে যখন তীর ধনুক বল্লম রামদা দেখি তখন কাজে-কাজেই দান করতে হয়।

আর একজন জের টেনে বলে, তারা যেতেই আর একজন এসে বলে, ওদের অত দান করলেন আমাদের পাঁচটা ছাগল দান করুন। তাদের হাতেও অস্ত্র কাজেই দান করতে হয়।

তৃতীয়জন বলে, সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা দল এসে বলে, মাল ও ছাগল দান করলেন, আপনার আঙরাখার জেবে যা আছে আমাদের দান করুন। দাবি সশস্ত্র কাজেই বাধ্য হয়ে দাতা সাজি। আর সাধুজী, ওরা এত সংবাদ রাখে কি করে! কেমন করে জানলো পাঁচটা মোহর ছিল আমার জেবে!

জরা বলল, গরীব, খেতে পায় না, তাই এমন করে।

বাধা দিয়ে একজন ব্যাপারী বলল, না সাধুজী, আমি ত্রিশ বছর যাতায়াত করছি, এদেশে গরীবকে কখনো লুটপাট চুরি-ডাকাতি করতে দেখিনি। অন্য দেশে গরীব লোক লুঠেরা হয়, ডাকু হয়। এদেশে ধনীরা আরও ধনী হওয়ার আশায়, ভদ্রলোকেরা ভদ্রতার সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করবার আশায়, শিক্ষিতরা নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপনের আশায় চুরি করে, ডাকাতি করে, যদিচ নাম দেয় দান আর যৌতুক। সাধুজী, যদি দেশকে ভালবাসতো তাহলে নিজেদের চুরি-ডাকাতির বোঝা গরীব-দুঃখীর নামে চালাতো না। না সাধুজী, এদেশে আর ফিরবো না।

জরা যা সংক্ষেপে শুনেছিল আনন্দর মুখে, এবারে তার বিস্তারিত পরিচয় পেলো।

ব্যাপারীর দল সারাদিন বিশ্রাম করে পরদিন প্রাতে সুতি কাপড়ের উপরে পশমী কাপড় গায়ে দিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলো, যাওয়ার সময়ে তারা খানকতক চাপাটি আর কতকটা চাটনি দিল জরার হাতে, বলল, সাধুজী, পথে খেয়ো, বদরিনাথ পৌঁছবার আগে আর কিছু মিলবে না।

অপস্রিয়মাণ সেই দলটির দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করলো জরা।

॥ ৯ ॥

অনাবিল তুষাররাজ্যে দিনের পর দিন চলতে চলতে জরার মনে হয়েছিল বুঝি এ পথের শেষ নেই, কখনো কখনো ধারণা হয়েছে বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছে। অসম্ভব নয়, চিহ্নহীন একটানা তুষার পথ ভুলিয়ে দেবে এ আর আশ্চর্য কি! ভোরবেলায় যেদিন সূর্য দেখা যায় দিকনির্ণয় করে নেয়, সূর্য সব দিন যে দেখা যায় এমন নয়। যতদূর দেখা যায় সমস্ত সাদা, এমন কি আকাশটাও সাদাটে। মাঝে মাঝে তুষারঝড় আসে তখন প্রাণ বাঁচানো দায়, কিন্তু যার ভাগ্যে দুঃখ-ভোগ শেষ হয়নি তাকে মারে কার সাধ্য!

সেদিন সকালবেলা পথ চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়লো দূরে পাহাড়ের গায়ে একটি কালো বিন্দু। ওটা কি! চোখের ভুল নয়তো! না, চোখের ভুল এতক্ষণ থাকে না, তাছাড়া কালোটা ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। সেই কালো বিন্দুটা লক্ষ্য করে পথ চলে জরা। এবারে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামছে; হ্যাঁ, এতক্ষণে কালো বিন্দুটা একটা মন্দিরের আকার লাভ করেছে। তবে ওটাই বদরিনাথের মন্দির। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে দেখতে পায় মন্দিরের কাছে অনেকগুলি ছোট ছোট কালো বিন্দু নড়ছে যেন। ওগুলো কি তবে! মানুষ! দণ্ড-দুয়েকের মধ্যে মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ায় জরা।

অবশেষে কালো একটা মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ায়, দেখতে পায় যাত্রীদের কতক ভিতরে ঢুকছে, কতক বের হয়ে আসছে, ঘণ্টা বাজছে, ধূপধুনার গন্ধ আর ধোঁয়া। কাছে কয়েকজন পসারী ফুল বেলপাতা চন্দন প্রভৃতি বিক্রি করছে। তাকে সাধু মনে করে একজন পাণ্ডা বলল, যাও সাধুজী, দর্শন করো। সে কম্পিত বক্ষে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলো রত্নবেদী, আর সে বেদী শূন্য; দেবতা কোথায়? অথচ এ কি, যাত্রীরা কাকে প্রণাম করছে, কাকে প্রদক্ষিণ করছে, কার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিচ্ছে! সে জিজ্ঞাসা করে, দেবতা কোথায়?

দেবতা কোথায়? সবাই একসঙ্গে বিস্মিত হয়ে তাকায়। লোকটা বলে কি? একজন পাণ্ডা তখনি তাকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে মন্দির থেকে বের করে দেয়। একজন বলে, লোকটা ভণ্ড—কেউ বলে ম্লেচ্ছ, কেউ বলে পাপী। সে-সব কথা তার কানে যায় না, পাণ্ডার প্রবল ধাক্কায় একটা পাথরের উপরে পড়ে তার কপাল ফেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। সে ব্যথা অনুভব করে না, জরার কেবলি কানে বাজতে থাকে পাপী, ঘোর পাপী, মহাপাতকী।

নিরিবিলিতে গিয়ে বসে ভাবে, পাপী তার আর সন্দেহ কি। পাপী বলেই দেবতা দর্শন দিলেন না। ভাবে, দেবতা কি তবে কেবল পুণ্যবানের জন্যই, তবে পাপীকে উদ্ধার করবে কে? মানুষেও পারলো না, দেবতাও দেখা দিলেন না, তবে তার আর মুক্তি নেই, গতি নেই। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে, রক্তের ধারায় আর চোখের ধারায় মিশে যায়। এক-আধটা ফোঁটা মুখের মধ্যে ঢোকে—দুয়েরই স্বাদ লবণাক্ত।

হঠাৎ জরা পিঠের উপরে স্পর্শ অনুভব করে, ফিরে তাকিয়ে দেখে একখানি শীর্ণ হাত আর তার পিছনে সেই শীর্ণ হাতের মালিক তিনকাল-গত এক শীর্ণ বুড়ী যার দেহটা পাহাড়ের এক খোঁদলের মধ্যে—কেবল মুখখানা উঁকি দিচ্ছে, আর ঐ হাতখানা বাইরে। বিস্ময়ে সন্ত্রাসে তার রা সরে না। কিভাবে কথা আরম্ভ করবে সে? তার দ্বিধা কাটিয়ে দিয়ে বুড়ীই প্রথমে কথা বলল, বাবা, মনে পাপ আছে তাই দেবতা দেখা দিলেন না, দুঃখ করো না, সময় হলেই দেখা পাবে।

এত কথা তুমি কি করে জানলে বুড়ী-মা?

শোনো কথা আমার ছেলের। আমি যে এখানে বসে বসে সব দেখছি, সব শুনতে পাই।

জরা খেদের সঙ্গে বলল, আর সকলেই দেখতে পেলো, কেবল আমাকেই বঞ্চনা!

সে বলল, দেখতে পেলো!

কই, কেউ তো বলছে না যে দেখতে পেলো না।

বাবা, ওরা সব মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তুমি নিশ্চয় জেনো অনেকেই দেখা পায়নি দেবতার। তবে কি জানো, জানালেই বলবে পাপী তাই চুপ করে থাকে। আবার কেউ কেউ বা শোনা কথা বলছে, আহা কি দেখলাম! চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি!

জরা শুধায়, বুড়ী-মা, তুমি কি দর্শন পেয়েছ?

নিজ মুখে বলতে নেই বাবা, তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি যে প্রথমটায় দেখা দেননি।

কেন ?

কেন কি, নিশ্চয় পাপ ছিল।

তুমি আবার কি পাপ করবে বুড়ী-মা !

শোন কথা। পাপ করা কি কারো একচেটিয়া ! জেনে হোক না জেনে হোক সকলকেই পাপ করতে হবে।

না জেনে করলেও পাপ ?

পাপ বইকি ! এই দেখো না কেন একটা দিনের মধ্যে আমার স্বামী পুত্র গেল, রাতের বেলায় ঘরখানা পুড়ে গেল। এসব যদি আমার পাপে না হয় তবে কার পাপে !

তখন তুমি কি করলে ?

আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন এক সাধু বললেন, কাঁদলে কি হবে মা, চোখের জলে পাপ ধুয়ে যায় না।

তবে কি করলে যায় বাবা ? আমি শুধাই।

পাপপুণ্যের মালিককে গিয়ে ধরো।

তিনি থাকেন কোথায় ? আবার শুধাই।

সাধু বললেন, বদরিনাথে যাও, সেখানে তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে বিরাজ করছেন।

আমি বলি, কার সঙ্গে যাবো বাবা, অতদূরের পথ !

জরা বাধা দিয়ে শুধায়, কোথায় তোমার বাড়ি ছিল, বুড়ী-মা ?

সেই কাবেরী নদীর তীরে, চোলদের দেশে।

সে যে অনেক দূর !

সে কথার উত্তর না দিয়ে বুড়ী বলে, সাধু বললেন কার সঙ্গে আবার যাবে। নিজের মনের সঙ্গে যাবে। মনটি এখানে ফেলে রেখে শুধু দেহটি নিয়ে যাবে সে হবে না।

আমি বললাম, বাবা, গরীব মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া তো নেই।

থাকলেই বা কি। গাড়ি চড়ে যাবে রাজার কাছে, তোমার স্পর্ধা তো কম নয় !

তবে ?

গণ্ডী টানতে টানতে যাও।

সে যে অনেক বছর লাগবে !

লাগলেই বা। তীর্থের পথে মৃত্যু হলেও তীর্থদর্শনের ফল হয়।

গণ্ডী টানতে টানতে এলে? শুধায় জরা।

হ্যাঁ বাবা।

কত বছর লাগলো?

তা তো জানি না, তবে এই জানি যাত্রা করেছিলুম যুবতী বয়সে, এসে পৌঁছলাম যখন বুড়ী হয়েছি।

দেখা পেলে?

না বাবা।

বলো কি বুড়ী-মা! এত কষ্ট স্বীকার করলে তবু দেখা দিলেন না!

দেখা দেবেন কেন? তখনো যে মনটা এসে পৌঁছয়নি, সেটা পিছনে পড়ে ছিল।

ঠাকুর তো বড় কঠিন!

হতেই হবে, পাথরে গড়া যে! বলে বুড়ী।

কবে দেখা পেলে?

সহজে আর মন্দিরে যাই না, এখানে বসে থাকি।

কেন?

দেখা পাই কি না পাই এই ভয়ে।

তার পরে কিভাবে দর্শন মিলল?

একদিন স্বপ্নে এসে বলে গেলেন, ও বুড়ী, তোর জন্যে আর কত দিন বসে থাকবো, এসে আমাকে দর্শন দিয়ে যা।

তুমি দেবে দর্শন! চমকে ওঠে জরা।

সেই কথাই তো শুধিয়েছিলাম, তা তিনি কি বললেন জানো, মা কি চিরকাল ছেলেকে দেখবে, ছেলের কি কখনো ইচ্ছা হয় না মাকে দেখতে। শীগগির আয় বুড়ী।

বুড়ী-মা, তুমি বড় ভাগ্যবতী। এই বলে হাত বাড়িয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তবে হয়তো আমিও দেখা পাবো।

পাবে বইকি বাবা, কেবল শক্ত হয়ে থাকা চাই। পাথরের দেবতা পাথরকে বড় খাতির করে।

কিন্তু বুড়ী-মা, আমি যে ঘোর পাপী।

পাপের আবার বেশি কম কি বাবা, ছোট সাপের বিষ কি কিছু কম!

বুড়ী-মা, আমি যে বাসুদেবের কাছে অপরাধ করেছি।

তবে তো বাবা তোমার ওষুধ এ বস্তিখানায় নেই।

সে আবার কি রকম বুড়ী-মা, শুনেছি যিনি বাসুদেব তিনিই বিষ্ণু।

তা বটে, তবে কি জানো সব জল সমান হলেও কুয়োর জলের গুণ নদীর জলে নেই। আমাদের গাঁয়ে একটা কুয়ো ছিল, তার জল নয় তো ওষুধ, কত দূরদূরান্ত থেকে লোকে এসে জলপান করে যেতো।

হতাশভাবে জরা বলে, আজ আট-দশ বছর ধরে কত দেশ কত পাহাড় কত গুণী-জ্ঞানীর কাছে ঘুরলাম। শেষে অনেক আশা নিয়ে এলাম, এখন বলছ এখানে হবে না?

তা কি করবো বাবা, যে বস্তিখানায় তোমার ওষুধ আছে সেখানে যেতে হবে তো।

সে কোথায়?

বাসুদেবের কাছে যদি অপরাধ করে থাকো তবে তোমাকে যেতে হবে শ্রীবৃন্দাবনে, সেখানে তিনি লীলাখেলা করে গিয়েছেন কিনা।

সারারাত বুড়ী-মার কথা ভাবে জরা। এ কি আশ্চর্য! এই আট-দশ বছর পাহাড়-পর্বতে কত জ্ঞানী-গুণী যোগী-তপস্বীর দেখা পেয়েছে, কেউ সন্ধান দিতে পারেনি পাপীর মুক্তি কি উপায়ে হতে পারে। কেউ সরলভাবে বলেছে জানি না, কেউ বা দুর্বোধ্য শাস্ত্র আউড়েছে, কেবল চার্বাক সরলভাবে জানিয়েছিল সুখের সন্ধান জানে, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় তার অজ্ঞাত। তাদের তুলনায় এই বুড়ী নিরক্ষর, নিতান্ত অজ্ঞ। আর শেষে কিনা তার কাছে একটা পথের ইশারা পাওয়া গেল! বুড়ীর কত কথাই না তার মনে পড়ে। বলেছিল, বাবা, পূর্ণাবতার ছাড়া কে দূর করবে তোমার দুঃখ! বলেছিল, বাবা, তুমি যদি পূর্ণাবতারের কাছে অপরাধ করে থাকো তবে একমাত্র তিনিই মোচন করতে পারেন তোমার পাপ, যে-সাপে কেটেছে সেই সাপে ওঠাবে তোমার বিষ।

পূর্ণাবতার শব্দটা ইতিপূর্বে শোনেনি জরা। অবতার শব্দটা বাসুদেব প্রসঙ্গে শুনেছে। অর্থ ধরে নিয়েছে দেবতা বা ভগবান। কিন্তু পূর্ণাবতার কি! পূর্ণাবতার আবার কে! বুড়ীকে শুধিয়েছিল, সে বলল পূর্ণাবতার হচ্ছে পূর্ণাবতার —যেমন চাঁদের পূর্ণাবতার পূর্ণিমার চাঁদ। জরা ভাবে ও তো উপমা হল, অর্থ হল না। বুড়ী বলেছিল বৃন্দাবনে যেতে, সেখানে পূর্ণাবতার লীলা করে গিয়েছেন। বেশ, সেখানেই যাবে, দেখা যাক, সেখানকার লোকে বলতে পারে কিনা। আরও ভাবল, পথে যেতে যেতে সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করবে পূর্ণাবতার কাকে বলে। একমাত্র তিনিই তো পাপ থেকে মুক্ত করবেন তাকে, কিন্তু তার আগে জানা দরকার পূর্ণাবতার কে?

ভোরবেলা বুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে, পাহাড় থেকে সমতলে নামলে তবে তো বৃন্দাবনের পথ। চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁকা পথ ধরে চলছে তো চলছেই, এবারে তার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। পথে দেখতে পায় শুধু রাহী লোক, তীর্থযাত্রী আর কাঠুরে। না, এরা পূর্ণাবতারের সন্ধান জানবে কি করে? কয়েক দিন পথ চলবার পরে ভাগীরথীর ধারাকে অনুসরণ করে, দুদিকে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে সঙ্কীর্ণ খাদের ভিতর দিয়ে ঘোরনাদে ছুটেছে ভাগীরথী।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পায়, নিঃসঙ্গ এক পথিক দ্রুত এগিয়ে আসছে। তার মনে হল আর দশজন লোক থেকে তিনি যেন স্বতন্ত্র। দীর্ঘাকৃতি প্রবীণ পুরুষ, পরনের ধুতির খুঁট গায়ে জড়ানো, হাতে দেহপরিমিত যষ্টি, চোখ পথের দিকে নিবদ্ধ, চিবুকে দৃঢ় সঙ্কল্পের ঘোষণা। পথিক আরও কাছে এসে পড়তেই দেখতে পেলো তার পিছনে কালো রঙের একটি শীর্ণ কুকুর। সে কি ঐ সাধুর, না পথের কুকুর তাঁর সঙ্গ নিয়েছে! জরার মনে হল এই সাধু কোথায় চলেছেন জানি না, তবে তিনি পূর্ণাবতারের সন্ধান যেন দিলেও দিতে পারেন। সাধু আর একটু কাছে এসে পড়তেই পথরোধ করে জোড়হাতে দাঁড়ালো। সাধু থামলো না, তবে তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা।

জরা করুণভাবে শুধালো, বাবা, পূর্ণাবতারের সন্ধান কোথায় পাবো?

সেই সন্ধানেই তো চলেছি। বলতে বলতে সাধু এগিয়ে গেল, এক পা-ও থামলো না।

জরা পিছন ফিরে দেখল মুহূর্তের মধ্যে তিনি পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কুকুরটাও। জরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, এই অসামান্য সাধুও যদি পূর্ণাবতারের সন্ধানে বহির্গত তবে তার মত পাপীর কি আশা থাকতে পারে! তার ইচ্ছা ছিল অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে সাধুটিকে, কিন্তু সাধু না থামলো এক মুহূর্ত, না তাকালো তার দিকে। এহেন সাধুও যদি জিজ্ঞাসু হয় তবে তার জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে কে! কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না, বৃন্দাবনে তাকে পৌঁছতেই হবে—শেষ ভরসা সেখানে বুড়ী বলেছিল।

॥ ১০ ॥

অবশেষে বৃন্দাবনে। সমতলভূমিতে পদার্পণ করে অবধি জরা একটি স্বস্তির ভাব অনুভব করছিল যেমনটি গত আট-দশ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে পায়নি। তার

যদি বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতো তবে বুঝতো যে সমতলবাসীর স্বস্তি সমতলে। সমতলের প্রভাবেই হোক আর নাই হোক ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করবামাত্র তার সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল। যমুনার শীতল জলে স্নান করে একটি গাছের ছায়ায় উপবেশন করলো. এমন সময় দেখল একজন ব্রজাঙ্গনা কিছু খাদ্য নিয়ে এসে তার হাতে দিল।

আমাকে কেন বহিন ?

মেয়েটি বলল, ব্রজমণ্ডলে স্নানান্তে কেউ অভুক্ত থাকে না।

কিন্তু আমাকে তো তুমি চেনো না!

ব্রজমণ্ডলে কেউ কারো অচেনা নয়, সকলেই তাঁর সখা, নয় সখী।

কার ? শুধায় জরা।

পূর্ণাবতারের।

কার বললে ? চমকে শুধায় জরা।

পূর্ণাবতারের।

আশামিশ্রিত আর্তস্বরে জরা চিৎকার করে ওঠে, আমি যে তাঁরই সন্ধানে এসেছি।

ব্রজাঙ্গনা পাশে বসে স্নেহের সঙ্গে বলল, এখানে তাঁর সন্ধান করতে হয় না, তিনিই সকলকে সন্ধান করে ফিরছেন।

সন্ধান করে ফিরছেন! কেন ?

লীলা করবেন বলে।

জরার মনে পড়ে বুড়ী-মার কথা। সে তবে তো সত্যই বলেছিল যে বৃন্দাবনে তিনি লীলা করে গিয়েছেন।

জরা বলল, কিন্তু বহিন, আমি যে পাপী।

তবে তো তোমাকে আগে খুঁজে বের করবেন।

জরা আবার বলে, আমি যে ঘোর পাপী।

তবে তো তোমার আর বিলম্ব নেই, তাঁর সাক্ষাৎ পেলে বলে।

কোথায় তিনি ?

সর্বত্র। এখানকার আকাশে বাতাসে তরুলতায় কান্তারে প্রান্তরে—কোথায় নয় ?

মন্দিরে ?

বেশ, সেখানে দেখতে চাও সেখানেও দেখা দেবেন।

কাকে শুধাবো ?

যাকে খুশি, এখানকার পাখিটা অবধি তাঁর নাম উচ্চারণ না করে খাদ্যগ্রহণ করে না।

কি নাম তাঁর?

হাজার নাম, যার যেমন অভিরুচি বলে, আমরা বলি কৃষ্ণ-বাসুদেব।

জরার হাত থেকে খাদ্য স্খলিত হয়ে পড়ে যায়।

ব্রজাঙ্গনা খাদ্য তুলে তার মুখে দেয়। কিন্তু কে তখন খাবে! জরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছে।

মূর্ছা ভাঙলে দেখল তার মাথা মেয়েটির কোলের উপরে আর সে পল্লব দিয়ে বীজন করছে। শুধালো, আমি কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম?

মেয়েটি সস্নেহে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে নাড়ছিল, বলল, এখানে এসেছ এখন জ্ঞান হবে।

কি করে জ্ঞান হবে? আমি যে মূর্খ!

মেয়েটি বলল, তা হলে তো জ্ঞান হতে বাধা নেই।

সে আবার কি রকম?

সাদা পটের উপরেই তো ছবি ফোটে ভালো। যারা জ্ঞানী তাদের মনে যে অনেক আঁকজোক, সেখানে ছবি আঁকতে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

জরা বিস্মিত হয়, শুধায়, এসব কথা কে শেখালো তোমাকে?

কেউ নয়, মন সাদা রাখলে কথা আপনি এসে জোটে। ভরা কলসী তো ভরা যায় না, কলসী খালি রাখলেই যেমন ভরে ওঠে।

এসব তো জ্ঞানীর মত কথা!

মেয়েটি হেসে বলে, তবে তাই।

ঐ হাসি দেখে জরার মন অতীতের মধ্যে ডুব দেয়—মনে পড়ে এ রকম হাসি যেন কোথায় দেখেছে। সে ভাবতে চেষ্টা করে।

কি ভাবছ? শুধায় ব্রজাঙ্গনা।

ভাবছি ঐ রকম হাসি যেন কোথায় দেখেছি।

আবার হেসে মেয়েটি বলে, হাসির কি আবার স্থানকাল আছে?

পাত্রপাত্রী তো থাকতে পারে।

তুমিও তো বেশ কথা বলতে শিখেছ! শেখালো কে?

জরা একটি মাত্র শব্দে উত্তর দেয়—দুঃখ।

দুঃখ হাসির কি জানে?

বলো কি বহিন, দুঃখের শক্তির মধ্যেই তো হাসির মুক্তা জন্মায়।

এত দুঃখ কিসের ?

পাপীর আবার দুঃখের অভাব কি ? পাপটাই তো দুঃখ।

তবে মনে করো না কেন আমিও পাপী।

তবে তো কৃষ্ণ-বাসুদেব তোমাকে দয়া করেছেন।

পাপ মুখে কেমন করে বলি। আবার গম্ভীর হলে কেন ?

ঐ হাসিটার ইতিহাস ভাববার চেষ্টা করছি।

সে চেষ্টা না হয় পরে করো। এখন উঠবে কি ?

কোথায় যাবো ?

তবে কি এই নদীর ধারেই পড়ে থাকবে ?

সে কথার উত্তর দেয় না, আনমনা হয়ে বসে থাকে জরা। হঠাৎ তার মনে হয় তা কি সম্ভব! এ হাসি যার মুখে দেখত তাকে তো অনেক কাল আগে নিজে সে হত্যা করেছে। তবে ? তবে এক রকম হাসি কি দুজনে হাসে না ? তবু যেন এ হাসিতে সে হাসিতে তফাত আছে। সে হাসি ছিল পাথরে মেশানো সোনা, আর এ হচ্ছে নিকষিত হেম। দু-ই সোনা। তখনি মনে পড়ে সংসারে সোনা কি একাধিক খণ্ডে থাকতে নেই! চিন্তার সূত্রে কেমন জট পাকিয়ে যায়।

তাকে তদবস্থ দেখে ব্রজাঙ্গনা শুধায়, আমাকে কি চিনতে পারলে না জরা ?

চমকে উঠে জরা বলে, জরা! জরা! কে বলল ঐ নাম ?

আমি।

তুমি! তুমি কে ?

এক সময় যার নাম ছিল মদিরা, আমি সেই অভাগিনী।

তুমি মদিরা ?

এখন আর মদিরা নই, এখন ব্রজাঙ্গনা।

কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

তোমার তো চিরকাল ঐ রকম, কিছুতেই কিছু বুঝতে পারো না, অন্ততঃ প্রথমটায়।

স্তম্ভিত জরা বলে, কিন্তু তোমাকে যে আমি স্বহস্তে বধ করেছি!

তাই তো জন্মান্তরে ব্রজাঙ্গনা নাম হয়েছে।

এখন পরিহাস রাখো, সমস্ত খুলে বলো, আমার মাথা কেমন ঘুরছে।

বুঝেছি, আমার কোলের উপর মূর্ছা যাওয়ার সাধ হয়েছে। তা মূর্ছা

যাওয়ার দরকার কি, এমনি আমার কোলে মাথা দিয়ে শোও না, আবার বীজন করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

মঠে।

কার মঠ?

ব্রজাঙ্গনাদের।

সেখানে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

সেখানে ঢুকবে কেন, পাশে আছে ব্রজবালকদের মঠ।

সেখানেই বা আমার স্থান হবে কেন?

কেন হবে না? এখানে সবাই হয় ব্রজাঙ্গনা, নয় ব্রজবালক, সকলেই হয় তার সখা, নয় সখী।

কার?

পূর্ণাবতার কৃষ্ণ-বাসুদেবের।

মদিরা, আমার সমস্ত ইতিহাস তো জানো তবু বলছ সেখানে আমার স্থান হবে?

হ্যাঁ, তবু বলছি। নাও এখন ওঠো। বলে তার হাত ধরে টানে।

জরা উঠে দাঁড়ায়, শুধায়, তোমার ইতিহাস কখন বলবে?

সময় হলেই বলবো।

সময় কখন হবে?

যখন অসময় নয়, ঐ যে আমাদের মঠ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এস আমার পিছু পিছু।

॥ ১১ ॥

জরা মাথায় হাত দিয়ে নত মুখে বসে আছে, দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে তার। পাশে উপবিষ্ট মদিরা। মদিরা অপ্রস্তুত হলেও দুঃখিত নয়—সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে আসল কথাগুলো বাদ দেওয়া যায় না। দুঃখ যেখানে অনিবার্য সেখানে নিবারণ করবার কি উপায়!

কি জরা, কি হল? আট-দশ বছর আগেকার কথা, এখন আর দুঃখ করে কি লাভ?

কালের বিচারে আট-দশ বছর হতে পারে, আমার মনের বিচারে তো সন্ত-ঘটিত।

তোমার দুঃখের কারণটা কি শুনি? আমাকে মারতে পারোনি বলে, না রানী সীমন্তিনীকে মেরে দিলে বলে?

জরা বলে, দু-ই। কিন্তু মদিরা, তোমাকে শুধাই, এসব কথা শুনে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে না?

গত জন্মের ঘটনায় সুখ-দুঃখ কি কেউ অনুভব করে। আমি তো কতবার বলেছি মদিরা মরে গিয়েছে, নূতন জন্মে সে ব্রজাঙ্গনা।

কিন্তু আমি তো সেই জরাই আছি।

তাই তো দেখছি, তেমনি অবুঝ তেমনি গোঁয়ার। ভেবেছিলাম এতকাল পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে, দুঃখের পরে দুঃখের আঘাতে সম্বিৎ হয়েছে তোমার।

থাক্, উপদেশ রাখো।

মূর্খকে উপদেশ ছাড়া আর কি দেব। এখন চোখের জল মুছে ঘটনাগুলো গুছিয়ে বলো।

জরা শুধায়, তুমি কেন বলেছিলে যে রানী আমার প্রতি আসক্ত?

ভুল বলিনি, তখন তাই মনে হয়েছিল। পাপীর মন সর্বত্র পাপের ছায়া দেখে। দু'দিন না যেতেই বুঝলাম রানী সীমন্তিনী সতীসাধ্বী, পতিগতপ্রাণা।

তখন আমার ভুল ভাঙালে না কেন?

বাপ রে তাহলে কি আমার রক্ষা থাকতো! তখন তুমি মনে মনে জাঁকড়ে বসেছ, রানীর মালা পেয়েছ, কৌস্তুভমণি হার আমার হাতে দিয়েছ তাঁকে উপহার দেবার জন্যে, এমন অবস্থায় যদি বলি যে আমি ভুল বুঝেছিলাম তাহলে কি করতে বলো তো?

জরা বলে, গলা টিপে মেরে ফেলতাম।

তবেই দেখো। তাই ভাবলাম যে বোকাটাকে নিয়ে একটু খেলানো যাক। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল—

আবার কি কারণ?

শুনলে কি বিশ্বাস করবে?

বিশ্বাসযোগ্য হলে অবশ্যই করবো।

বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবু শুনি, দাবি করে জরা।

আমি তোমাকে ভালবাসতাম কিন্তু তখন তুমি রানীগতপ্রাণ, আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? তাই বানিয়ে বানিয়ে উপন্যাস বলে গেলাম। বললাম, যে রাজা আমাতে আসক্ত, রাতে বাগানবাড়িতে নিয়ে যান। তারপরে যখন

তোমার কাছে শুনলাম যে আমাদের সন্ধানে বাগানবাড়িতে গিয়েছিলে বললাম যে এখন আর বাগানবাড়িতে নিয়ে যান না, রাজবাড়িতেই ঘটে আমাদের মিলন।

সেই কথা বিশ্বাস করবার ফলেই তো তোমাকে মারতে চেয়েছিলাম।

কেন, মেরে কি লাভ হত?

জরা বলে, আমার এ কথাটা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।

বিশ্বাসযোগ্য হলে অবশ্যই করবো।

না, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবু শুনি।

তোমার উপর রাজার আসক্তি শুনে বুঝলাম যে তোমাকে ভালবাসি।

মদিরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জরা বলে যায় যে রাজার হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব। তাই যখন দেখলাম রাজা তোমার সঙ্গে আলিঙ্গনে বদ্ধ, এক তীরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলাম দুজনকে। কে জানতো মরলো সতীসাধ্বী নিরপরাধ রানী আর দেবতুল্য রাজা। এতেও যদি আমি অভাগা না হই তবে অভাগা আর কে?

তারপরে জরার নজর পড়ে মদিরার মুখের দিকে। সেখানে পটপরিবর্তন দেখে। দেখতে পায় নেপথ্যের মানুষটিকে। সে বলে ওঠে, মদিরা, এখনো তুমি আমাকে ভালবাসো?

মদিরা নির্বিকার কণ্ঠে বলে, ব্রজাঙ্গনাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে নেই।

মিথ্যা কথা। তোমার চোখ বলছে, মুখ বলছে, সর্বাঙ্গ বলছে তবু বলছ আর কাউকে ভালবাসতে নেই?

মদিরা পুনরায় অধিকতর অবিচলিত কণ্ঠে বলে, বাজে কথা রাখো, বলো এই ক'বছরের ঘটনা।

অগত্যা জরা আরম্ভ করে।

রাতের বেলায় রাজবাড়ির প্রাকারের উপরে আমি পাহারায় ছিলাম; ভোর-রাতে আক্রমণ হবে সবাই জানতো, তাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম। এমন সময়ে দেখলাম রাজবাড়ির তেতলার ছাদে রাজা একজন রমণীকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে দণ্ডায়মান, মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছিল না। অনুমান করলাম তুমি।

মদিরা বাধা দিয়ে বলে, ও আর কতবার শুনবো, তারপর কি হল বলো।

তখন জরা একে একে বলে যায় সুমন্তনগরের পরাজয়, লুটপাট, তার বন্দীদশা,

নরেন্দ্রনগরে আগমন এবং সেখানে ভাগ্যের নাগরদোলায় পাক খাওয়া। এমনি ভাবে পাহাড়ে পলায়ন, ছাগঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ, কিন্নররাজ্যের অভিজ্ঞতা, চার্বাক আশ্রমে আতিথ্যলাভ, একজন সাধুপুরুষ তার অনুসরণে কুকুরের দর্শন লাভ, অবশেষে বদরীনাথ ও বুড়ী-মার কথা।

মদিরা তন্ময় হয়ে শোনে।

জরা বলে, এবারে তোমার কি হয়েছিল বলো।

আমার বৃত্তান্ত দুঃখের হলেও এমন ঘটনাবহুল নয়।

তবে তো বেশিক্ষণ লাগবে না, বলো শুনি।

রাজবাড়িতে যখন লুটপাট শুরু হল আমাকে ধরে নিয়ে এল সেনাপতির কাছে। সেনাপতি আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, মন্দ নয়। তাঁর কথা শুনে যে সৈনিক আমাকে নিয়ে এসেছিল, বললে, তাহলে আপনার জন্যে রাখি। সেনাপতি বললেন, না, এখন আমার অর্থের প্রয়োজন। একে নিয়ে যাও তক্ষশিলার বাজারে, দেখো যেন চড়াদামে বিক্রি হয়।

মদিরা বলতে থাকে, তক্ষশিলার বাজারে মথুরার একজন বণিক, পরে শুনলাম তাঁর নাম শেঠ মথুরা দাস, আমাকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে মথুরায় নিয়ে এল আমাকে। তারপরেই বাধলো গোল।

কি রকম, ঔৎসুক্য জ্ঞাপন করে জরা।

মথুরা দাসের নজর ছিল আমার দেহটার উপরে কিন্তু কুঠীতে এসে আবিষ্কার করে ফেলল কৌস্তভমণির হার। তখন নজর গেল ঐ হারটার দিকে। বণিক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, নারীদেহ যতই লোভনীয় হোক তার নাশ আছে, মণিহার চিরকাল থাকে। যখন বুঝলাম যে ঐ হারটা হাতাবার চেষ্টায় আছে বণিক, একদিন পালিয়ে চলে এলাম বৃন্দাবনে।

হারটা নিয়ে এলে?

তা নয়তো কি তাকে উপহার দিয়ে আসবো?

সে কি জানে না তুমি এখানে এসেছ?

জানে না আবার!

তবে আসে না কেন? মথুরা থেকে বৃন্দাবন এইটুকু তো পথ।

এসেছিল বইকি।

কি বলল?

কি বলল? নারীকে ভোলাতে যত রকম মিষ্টি কথা পুরুষের জানা আছে সমস্তই বলল।

গেলে না কেন ?

পাগল নাকি। সংসারে যত অপরাধ আছে হয় তা নারীঘটিত, নয় স্বর্ণঘটিত, অনেক সময়ে একসঙ্গে দুটোই। বুঝেছিলাম বলেই গেলাম না।

জোর করতেও তো পারতো ?

পারলে করতো কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেন ?

কংসের পরিণাম মথুরার লোকে এখনো ভুলতে পারেনি তাই ব্রজবাসীর উপরে জুলুম করতে সাহস পায় না। তাছাড়া না যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে—

কি কারণ আবার ? শুধায় জরা।

ব্রজেশ্বর আমাকে কৃপা করলেন।

দু'দিনের মধ্যেই ?

আগেই তো বলেছি পাপীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে আছে। সাধুদের সাতজন্ম ঘোরান, পাপী তিনজন্মে দেখা পায় একথা শোননি ?

তবে তো আমার আশা আছে।

আশা বলে আশা ! তোমার যা পাপ তুমি একজন্মেই তাঁর কৃপা পাবে। তাই তো বলছি, চলো আজ সন্ধ্যেবেলায় আরতির সময়ে তাঁকে দর্শন করে আসি।

জরা বলে, আজ থাক।

কেন, থাকবে কেন ? ধুলোপায়ে দেবদর্শন করতে হয়।

ভাই মদিরা, আমার সর্বাঙ্গে ধুলো, ধুলেও যাবে না।

সেই তো ভরসা। ব্রজেশ্বর আমার খেলুড়ীদের সর্দার, সারাদিন ব্রজবালাদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ছুটোপাটি করে খেলা করেন, ধুলো লাগবে না গায়ে !

মদিরা বলে, চলো মন্দিরে যাই।

জরা বলে, আজ থাক।

এমনি আজ কাল বলে কালকর্তন করে জরা মন্দিরে যেতে চায় না। কখনো একাকী কখনো মদিরার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শ্রীধাম দর্শন করে। একদিন দুজনে সাঁতরে যমুনার পরপারে গোকুল দর্শন করে এলো। মদিরা বলেছিল, চলো নৌকায় যাই।

জরা উত্তর দিল, সাঁতার দিই, যমুনার জল লাগুক সারা গায়ে।

একদিন গিরি-গোবর্ধনে আরোহণ করলো। মাঠ ঘাট প্রান্তর কিছুই আর না দেখা থাকলো না। ঘুরতে ঘুরতে একদিন জরা শুধালো, মদিরা, ঐ বনটা তো দেখা হল না, চলো যাই।

মদিরার সঙ্গে বনে প্রবেশ করলো, অধিকাংশ তমাল গাছ, কদম, শেফালিকাও

আছে। খুব বড় বন নয়, তবে বাগান নয় বন সন্দেহ নেই। ছায়াটি যেমন স্নিগ্ধ তেমনি ঘনান্ধকার।

জরা বলল, মদিরা, বনের মধ্যে দিনের বেলাতেও এক খণ্ড রাত্রি যেন বিরাজমান। রাতের বেলায় না জানি কি গভীর মায়া হয়!

হয় বইকি, কিন্তু কখনো রাতে যেন প্রবেশ করো না।

কেন? আমি তো ভাবছিলাম রাতে এসে দেখে যাবো।

সতর্ক করে দেয় মদিরা, বলে, এমন কাজটি করো না। এর নাম নিকুঞ্জবন। এখানে রাতের বেলায় ব্রজেশ্বর এসে গোপিনীদের নিয়ে বিহার করেন; তখন মানুষ এলে মারা যায়, নয় পাগল হয়ে যায়।

বিস্মিত হয় জরা। মদিরা বুঝতে পারে না জরা কেন মন্দিরে যেতে চায় না। তার বুঝবার কারণও নেই। জরার মনের কথা একমাত্র জরা জানে। জরার ভয় বদরীনাথের মত এখানেও যদি ভগবান দয়া না করেন, যদি দেখা না দেন। তবে তো আর সংসারে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। বুড়ী-মা বলেছিল বৃন্দাবনে আছেন পূর্ণাবতার। সেই পূর্ণাবতার নির্দয় হলে হাতে আর তো কিছুই থাকলো না। তখন যেমন পাপ তেমনি থাকবে, মুক্তির দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ। তখন কি গতি হবে তার।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কিছুতেই ছাড়লো না মদিরা, জোর করেই ধরে নিয়ে গেল মন্দিরে। শঙ্খঘণ্টা ধূপধুনা আলোকমালায় মহাসমারোহ; পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করছে; কাতারে কাতারে নরনারী যুক্তকরে গলদশ্রুলোচন; জরা সাগ্রহে তাকিয়ে দেখল রত্নবেদী শূন্য। কিছুক্ষণ কাটলো তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে। সেই জায়গাটি মুহূর্তের মধ্যে জরার মনে হল তার আগে পিছে উপরে নীচে ইহলোকে পরলোকে কোথাও কোন আশ্রয় নেই; সে অনন্ত শূন্যে নিরন্তর পতনশীল। জরার মুক্তি নেই, সদ্গতি নেই, পরিত্রাণ নেই। সে ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল।

রাতের বেলায় কোথাও তাকে খুঁজে পেলো না মদিরা। পরদিন অনুসন্ধান করতে করতে তাকে মূর্ছিতাবস্থায় পাওয়া গেল নিকুঞ্জবনের প্রান্তে।

॥ ১২ ॥

জরার মাথা কোলে তুলে নিয়ে মদিরা বাতাস করতে করতে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চৈতন্য হল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে

শিয়রের দিকে তাকাতেই মদিরাকে দেখতে পেলো, দেখতে পেলো কিন্তু কথা বলল না, অবোধের মত চেয়ে রইলো।

মদিরা বলে, জয়া ভাই, তুমি এখানে এলে কখন? কখন তুমি মন্দির থেকে সরে পড়লে টের পাইনি। মঠে এসে তোমাকে না দেখতে পেয়ে কালকে সারা-রাত তোমাকে খুঁজে ফিরেছি। সকালবেলায় একবার মনে হল, কি সর্বনাশ, নিকুঞ্জবনের দিকে যায়নি তো! চলে এলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। ব্রজেশ্বরের কৃপায় প্রাণে যে রক্ষা পেয়েছ এই যথেষ্ট।

জয়া উঠে বসে বলল, প্রাণটা গেলে এমন কি ক্ষতি হত!

কেন, জীবনে এমন বিতৃষ্ণা কেন ভাই?

তৃষ্ণা না মিটলেই বিতৃষ্ণা।

কি হয়েছে খুলেই বলো না।

বলবার তো কিছু নেই মদিরা, তোমরা সকলে শ্রীমূর্তি দেখে অশ্রুমোচন করতে লাগলে আর আমি দেখলাম বেদী শূন্য।

বলো কি! বিস্মিত হয় মদিরা, ব্রজনাথ তোমাকে দেখা দিলেন না!

কই আর দিলেন! তখন ভাবলাম আজ রাতে নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করবো, হয় দেখা পাবো, নয়-প্রাণে মরবো।

কি সর্বনাশ! তোমাকে তো বলেছিলাম, এখানে রাতের বেলায় এলে প্রাণ যায়!

আবার সঙ্গে এও বলেছিলে তিনি রাতের বেলায় এখানে আগমন করেন।

এ তো সবাই জানে।

তাই তো এলাম। তারপরে হঠাৎ রেগে উঠে বলে, দেখা দেবেন না বললেই হল! আজ দশ বছর বনে-পাহাড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর উনি মজা পেয়েছেন। একবার বদরীনাথে ফাঁকি দিলেন আবার এখানে।

কি করবে বলো তার দয়া না হলে তো দেখা পাওয়া যাবে না।

সে তো বুঝলাম কিন্তু দয়া না হবে কেন শুনি? এখন মনে হচ্ছে বেশ করেছিলাম তীরের আঘাত করে, উপযুক্ত শাস্তি হয়েছিল।

মদিরা তার মুখ চেপে ধরে, ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই।

কেন বলতে নেই শুনি? সবাই শতমুখে তাঁর প্রশংসা করে বেড়াবেন এটাই শুধু বুঝি বাঞ্ছনীয়? আমার মুখ আছে বলবো, দেখি কি করতে পারেন তিনি। এই কয় বছরে আমার যে অবস্থা করেছেন তার বেশি আর কি করবেন।

প্রাণটা তো যেতে পারতো?

তা হলেই তোমার ব্রজেশ্বরের কীর্তি সম্পূর্ণ হত। এই জেনো মদিরা, জরা প্রাণের মায়া করে না।

সে সব কথা পরে হবে—এখন চলো দেখি, বলে তাকে টেনে নিয়ে মঠে এলো মদিরা।

বিকেলবেলায় মদিরা শুধালো, ওখানে গিয়ে কি দেখলে তুমি?

কিছুই না। নিকুঞ্জবনের কাছে এসে পৌছতেই শুনতে পেলাম বনের মধ্যে শত শত ঝিঁঝি ডাকছে। কান পেতে শুনে বুঝলাম, না, ঝিঁঝি নয়, নূপুরের ঝঙ্কার আর অনেক বামাকণ্ঠ থেকে উঠছে ললিত সঙ্গীত। ভাবলাম তবে তো কথা মিথ্যা নয়, আবির্ভূত হয়েছেন ব্রজেশ্বর, গোপিনীরা তাঁকে ঘিরে নাচছে আর গান করছে। এই সুযোগ মনে করে দৌড়ে ঢুকতে গেলাম, তারপরে আর কিছু মনে নেই।

তবে তো তিনি তোমাকে দয়া করেছেন।

ও রকম খুচরো দয়ার ভিখারী জরা নয়। পূর্ণাবতারের কাছে পূর্ণ দয়া আদায় করে তবে ছাড়বো। আমি দয়ার ভিখারী নই, দয়ার দাবিদার। আমার সব নিয়েছেন আর দয়ার কপর্দক দিয়ে খুশী করবেন সে বাপের ছেলে আমি নই।

মূর্ছার মধ্যে কিছু দেখতে পাওনি জরা?

মূর্ছার মধ্যে আর কি দেখবো। তারপরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে একটা স্বপ্ন।

কি স্বপ্ন শুনি?

দেখলাম যে বাণে বিদ্ধ করলাম একটা হরিণকে। সেটা সারাটা বন ছুটে ছুটে বেড়িয়ে ঘুরে চলে এলো তার বাসস্থানে, সেখানে পড়ে মরলো।

মদিরা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, স্বপ্নের অর্থ কিছু বুঝলে?

স্বপ্নের আবার কি অর্থ হবে?

বলো কি! ভগবান স্বপ্নের ইঙ্গিতে কথা বলেন। আমার মনে হচ্ছে তুমি সেই বাণ খাওয়া হরিণ, বনে-পাহাড়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছ, তোমাকে ফিরে যেতে হবে তোমার বাসস্থানে, তবে মিলবে তোমার মুক্তির উপায়।

জরা ব্যঙ্গ করে বলল, ব্রজধামে গাঁজা চলে দেখি!

না জরা, গাঁজা-গুলি নয়। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত ব্রজবাসীতে বুঝতে পারে। তুমি দ্বারকায় ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হও।

দ্বারকা তো এখন সমুদ্র।

সমুদ্রেই তো আদিকালে ছিলেন নারায়ণ। সেখানে তোমাকে দেখা দেবেন, তোমার চক্রাবর্তন পূর্ণ হবে সেখানে গেলে। তুমি যাও সেখানে।

তুমিও চলো না মদিরা?

না ভাই, আমি মন-প্রাণ দিয়েছি ব্রজেশ্বরের পায়ে, ব্রজমণ্ডলের বাইরে আমার যাওয়ার উপায় নেই। আর এক কথা। যাওয়ার সময় কৌস্তুভমণির হারটা নিয়ে যেয়ো।

সেখানে কাকে দেব?

সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ো, তা হলেই তিনি পাবেন।

বেশ যাবো সেখানে। ধরো সেখানেও যদি না পাই তাঁর কৃপা?

পেতেই হবে।

পরদিন প্রাতে জরা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়। মদিরা দেয় তার হাতে কৌস্তুভমণি হার। বলে, সাবধানে রেখো, দেশ এখন অরাজক।

আমার মনের চেয়েও কি বেশি। চলো না আমার সঙ্গে মদিরা।

মদিরা বলে, না জরা, ব্রজাঙ্গনার মন ব্রজেশ্বরের পায়ে, তার আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

তখন মদিরার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করে। যমুনা পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলতে থাকে। যতক্ষণ তার দেহ বিন্দুতে পরিণত হয়ে মিলিয়ে না যায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মদিরা। তারপর জরা অদৃশ্য হয়ে গেলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুই গালে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু নিয়ে ফিরে চলে মদিরা। হায় রে ব্রজাঙ্গনার মন!

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

পঞ্চম খণ্ড

॥ ১ ॥

যমুনা পার হয়ে পশ্চিমদিকে চলতে আরম্ভ করেই জরা বুঝতে পারলো পথের ভয় সম্বন্ধে মদিরা যা বলেছিল তার একবর্ণ মিথ্যা নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার মনে হল যে মদিরা প্রকৃত বিবরণ সমস্তটা জানতো না। সকালবেলায় যাত্রা শুরু করেছিল, দুপুর নাগাদ কয়েকজন লোক এসে তাকে ঘেরাও করলো, বলল, বাবাজী যাও কোথায়?

জরা বলল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, তীর্থদর্শনে চলেছি।

ওরা বলল, বটে, তা দক্ষিণা দিয়ে যাও, আমরা যে তীর্থের পাণ্ডা।

জরা বলে, ভাই, সন্ন্যাসী মানুষ পয়সা কোথায় পাবে?

উত্তরে শোনে, দক্ষিণা না দিলে দেবতা দেখা দেবেন কেন?

ভক্তিতে কি দেবদর্শন মেলে না?

জরার উত্তর শুনে ওরা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

একজন বলে, তোমার দাড়ি আর জটা যে পরচুলা নয় কেমন করে জানবো। অনেক বেটা সাজা সন্ন্যাসী হয়ে দক্ষিণা এড়িয়ে পথ চলে।

অন্য একজন বলে, জিজ্ঞাসাবাদে দরকার কি? পরীক্ষা করলেই হয়। এই বলে সে জরার দাড়ি আর জটা ধরে টানাটানি শুরু করে।

নাঃ, দাড়ি আর জটা ওর নিজস্ব বলেই মনে হচ্ছে। যাঃ বেটা, খুব বেঁচে গেলি।

এমন সময়ে দলের একজন বলে ওঠে, বাবাজী, তোমার গলায় ঝোলানো ঐ সৌখিন থলিটিতে কি আছে দেখি।

জরা বলে, ওতে আমার জপের মালা।

তবু দেখি না, অনেক বেটার জপের মালায় সোনাদানা থাকে।

আমি ভিক্ষুক, সোনাদানা কোথায় পাবো?

তবু দেখতে দোষ কি—এই বলে সেই লোকটা গলা থেকে থলি খুলে নিয়ে মালাটা বের করে এবং পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে বলে, নাঃ, কতকগুলো ঝুটা পাথর!

তারপরে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে সবলে গলায় এক ধাক্কা দেয়, বলে, অনেকটা সময় তোর নষ্ট করেছি, এবারে জলদি এগিয়ে যা।

জরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে দ্রুত চলে, পিছনে ফিরে তাকায় না।

তখন তার মনে পড়ে, মদিরা কেন এই কৌশলটি করেছিল। কৌস্তুভমণির হারটি জরার হাতে দিয়ে সে বলেছিল, জরা, পথঘাটের যে অবস্থা তাতে যে এটা নিয়ে নিরাপদে পৌঁছতে পারবে তা মনে হয় না।

জরা অসহায় ভাবে শুধায়, তবে উপায়?

উপায় একটা করতেই হবে।

এই বলে সেই হারটায় কতগুলো ছোট ছোট ঝুটো পাথর গেঁথে দেয় আর কৌস্তুভমণিটা কাদায় এমনভাবে লিপ্ত করে যাতে তার দীপ্তি ঢাকা পড়ে যায়। তখন আর মালাটাকে সামান্য জপের মালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

জরা শুধায়, এমন করলে কেন?

মদিরা বলে, পথ চলতে আরম্ভ করলেই বুঝতে পারবে।

জরা এখন বুঝতে পারলো।

মদিরা আরও অনেক পরামর্শ ও সতর্কবাণী তাকে শুনিয়েছিল, বলেছিল, চর্মন্বতী নদী (চম্বল) পার হলেই তখন জানবে প্রত্যেকটি লোক তোমার শত্রু। এই হল মৎস্যদেশের অবস্থা। তারপরে যখন মালবদেশে (মালোয়া) প্রবেশ করবে, তখন আর কি বলবো, ভগবান বাসুদেব তোমাকে রক্ষা করুন এই বলতে পারি।

জরা বলে, তা তো বটেই, তবু কিছু পরামর্শ দাও।

পরামর্শ! অনেকক্ষণ ভাবে মদিরা, তারপরে বলে, পথে বড় বড় নগর এড়িয়ে চলবে, রাতের বেলায় বনের মধ্যে থাকবে তবু কোন চটিতে আশ্রয় নেবে না। আর কোন রাহী লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করবে না।

বিস্মিত জরা শুধায়, কেন এমন বলছ?

জানি বলেই বলছি। আজকের দিনে এই ব্রজমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেশ চোর-ডাকুর বাথান হয়েছে।

রাজা?

রাজা এখন চোর-ডাকুর সর্দার। লোক এখন আবিষ্কার করেছে ক্ষেতি করবার চেয়ে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করায় অনেক লাভ। আর যে-সব লোক ক্ষেতি করে তারা রাজস্ব দেয় না।

কেন?

কেন কি? ক্ষেত থেকে ডাকুরা শস্য কেটে নিয়ে যায়, রাজস্ব যোগাবে কেমন করে?

রাজা শাসন করে না কেন?

আরে বোকা, এটা বোঝ না যে রাজত্ব না পেলে রাজা আর ভিখারীতে প্রভেদ কোথায়? তাই রাজারা এখন পেটের দায়ে চোর-ডাকুর সর্দার বনেছে, চুরি-ডাকাতির ভাগে এখন রাজার রাজগী।

জরা বলে, শুনেছি ইন্দ্রপ্রস্থে এখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নাতিরা রাজত্ব করেন। তাঁরা শাসন করেন না কেন?

জরা, দুঃখের কথা আর কি বলবো! ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের বাইরে এখন তাঁদের শাসনদণ্ড অচল। রাজকর্মচারীরা ডাকু আর লুঠেরাদের সঙ্গে যোগসাজসে পেট ভরায়। মহারাজ পরীক্ষিতের এখন প্রায় একটানা একাদশীর অবস্থা।

সব বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় জরা, মুখে কথা যোগায় না। কিছুক্ষণ পরে বলে, মদিরা, দশ বছর হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে বনেজঙ্গলে ঘুরেছি, সেখানে যে এর চেয়ে অনেক নিরাপদ।

হবেই তো, সেখানে মানুষ কোথায়?

মানুষ এমন অমানুষ? বলে ফেলে জরা।

মানুষ বলো বনমানুষ ব'লা কিছুতেই আপত্তি করবো না।

জরা বলে, ভাই মদিরা, একটা কথা বুঝিয়ে দাও। দশ বৎসর আগে যখন দ্বারকা ছেড়ে রওনা হয়েছিলাম তখনো তো দেশের এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা ছিল না।

আরে, এটা আর বুঝলে না। তখনো যে অট্টালিকা দাঁড়িয়ে ছিল। যদিচ তখনই বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন, যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে, পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানে উদ্যত তবু অট্টালিকাটা ভেঙে পড়েনি। তারপর গত দশ বছরের মধ্যে অট্টালিকা ভেঙে পড়ায় সব বিশৃঙ্খল লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে।

জরা উত্তর দেয় না। মদিরা শুধায়, কি ভাবছ?

দেশের কথা।

দেশের কথা ভাববার তোমার আমার কি অধিকার? যেখানে স্বয়ং বাসুদেব আর পাণ্ডবগণ ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে তুমি আমি কে?

আবার জরা নিরুত্তর। মদিরা শুধায়, কি হল?

জরা বলে, পূর্ণাবতার বাসুদেব যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে আর ভরসা কোথায়?

এবারে উত্তর খুঁজে পায় না মদিরা। জরা শুধায়, কি বলো?

কি আর বলবো! তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিই এমন জ্ঞান নেই।

সত্যিই তো, পূর্ণাবতার যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে মানুষে কোন্ ভরসায় জীবনধারণ করবে।

মদিরা, তুমি তো জানো যে আমি মুখ্যু-সুখ্যু চোয়াড় ব্যাধ, তার উপরে যার বাড়া পাপ নেই তাই করেছি। পাপীর মুক্তিসন্ধানে দশ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি। মুক্তির সন্ধান পাইনি তবে অনেক জ্ঞানী গুণী যোগী তপস্বীর দর্শন পেয়েছি। তাদের উপদেশের সঙ্গে আজ তোমার কথা মিলিয়ে নিয়ে যেন বুঝতে পারছি পূর্ণাবতার নিজে হাতে কলমে কিছু করেন না। দেখো না কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সবাই যখন অস্ত্রধারণ করলেন তিনি অস্ত্র না ধরে ঘোড়ার বল্গা মাত্র ধারণ করলেন; তারপর যদুবংশকে বিনষ্ট হতে দেখেও তাদের রক্ষার্থ কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করলেন না। তাই মনে হচ্ছে পূর্ণাবতার নিজে কিছু করেন না, দৃষ্টান্তস্বরূপ আবির্ভূত হয়ে সমস্ত মনুষ্যসমাজকে পূর্ণাবতারত্বের পথে চলতে আহ্বান করেন। পূর্ণাবতার ব্যর্থ হননি, ব্যর্থ হয়েছে মানুষ।

জরার মুখে এমন গভীর তত্ত্ব শুনতে পাবে মদিরার কল্পনাতীত ছিল, সে হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না। তারপরে হঠাৎ উঠে এসে জরার পায়ের ধুলো নিয়ে বলে ওঠে, জরা, তুমি তো মুক্তপুরুষ।

জরা শশব্যস্তে সরে গিয়ে বলে, মদিরা, এ কি করলে, এ কি করলে! ব্রজাঙ্গনা হয়ে ঘোর পাতকীর পাদস্পর্শ করলে! তবে ভরসা এই যে চরম পাপ যে করেছে তার পাপ আর বাড়বে কি করে? না মদিরা, আমি মুক্তপুরুষ নই, আমি মুক্তির সন্ধানী।

মদিরা বলে, যেখানে যাচ্ছ, মুক্তি সেখানেই মিলবে, মুক্তিদাতা তোমাকে ডাকছেন। তোমাকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজেরও যে মুক্তি নেই। এ জেনো নিশ্চয়, তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

জরা রওনা হয়ে যায়। মদিরা সব রকম পরামর্শ ও সতর্কবাণী তাকে শুনিয়েছিল, কেবল একটি বিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে ভুলে গিয়েছিল, না ঠিক ভুলে যায়নি, তবে সে বিষয়টা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল তাই বলা প্রয়োজন বোধ করেনি।

॥ ২ ॥

মথুরাপ্রসাদ কৌস্তুভমণিটার লোভ পরিত্যাগ করতে পারেনি। বরঞ্চ ঐ মণিটা নিয়ে মদিরা পালিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেলে ওটার প্রতি আকর্ষণ অধিকতর দুর্নিবার

হয়ে উঠল। কিভাবে ওটাকে হস্তগত করা যায় এখন তার দিবসের চিন্তা রাত্রির স্বপ্ন। মদিরা সামান্ত লোক ও তুর্বল, কাজেই লোক পাঠিয়ে লুঠ করে আনা কঠিন ছিল না। কঠিন ছিল না, তবে অসম্ভব। মথুরাবাসী নরনারী সকলের সংস্কার ছিল যে বৃন্দাবনে গিয়ে হামলা করা চলবে না। সেই একবার কিশোরবীর মথুরাপতি কংসকে বিনাশ করেছিল, সেই স্মৃতি সকলের মনে কাজ করতো। আজ সে কিশোর বৃন্দাবনে নেই, মথুরায় নেই, পৃথিবীও পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু হলে কি হয়, সংস্কার তুর্মর। অতএব জোরজুলুম চলবে না। কিভাবে ওটি হস্তগত করা যায় উপায় চিন্তা করতো মথুরাপ্রসাদ।

তক্ষশিলার বাজার থেকে চড়া দামে কিনে এনেছিল মদিরাকে তার রূপের মোহে। কিন্তু একদিনও তাকে ভোগ করতে পারেনি। মথুরায় এসে নগর-প্রান্তে উপবন-বাটিকায় বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিল মথুরাপ্রসাদ। মদিরা এরকম জীবনযাপনে অনভ্যস্ত নয়, এখানেও তার আপত্তি ছিল না। রাতের বেলায় মথুরাপ্রসাদ যখন এসে উপস্থিত হল প্রথমেই তার নজরে পড়লো ঐ অলৌকিক রত্নটি। আর প্রথম দর্শনেই প্রেম। নারীর মোহ রত্নের মোহে পরিণত হল। মদিরার অভ্যস্ত চক্ষু বুঝলো যে এখন তার চেয়ে ঐ মণিটার আকর্ষণ প্রবলতর মথুরাপ্রসাদের কাছে। কোন্ নারী এই অবজ্ঞা সহ্য করতে পারে! মুহূর্তমধ্যে তার মন পাষাণ হয়ে গেল। না, কিছুতেই এই অরসিককে দেহদান করবে না সে। তার এহেন দৃঢ় সঙ্কল্পের আবশ্যক ছিল না, কেননা, তখন মদিরা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে মথুরাপ্রসাদের চোখে।

মদিরার বিমুখতায় আরও কিছু কারণ ছিল। এ মণিহার যে বাসুদেবের স্মৃতি-জড়িত, সেটা কিনা শেষে অলঙ্কৃত করবে ঐ সামান্ত কামুকটার কণ্ঠ! হয়তো বা কোন লোভের মুহূর্তে পরিয়ে দেবে আর এক পণ্য নারীর কণ্ঠে। সে আগেই স্থির করেছিল যার হার তাকেই ফিরিয়ে দেবে। দ্বারকায় ফিরে যাওয়া যদি নিতান্তই সম্ভব না হয়, কাছেই তো বৃন্দাবন, সেখানে তিনি বাল্যলীলা করেছিলেন। এ মণিহার কার, কে দিয়েছিল, কোথায় পেলো, কত মূল্য প্রভৃতি উত্তর-প্রত্যুত্তরে সে রাতটা কেটে গেল। মথুরাপ্রসাদ বুঝতে পারলো এ রত্ন সহজে হাতছাড়া করবে না মদিরা। আরও বুঝলো যে মেয়েটা সহজ লোক নয়। মথুরাপ্রসাদ ভাবলো সেও সহজ লোক নয়, ছলে বলে কৌশলে হাত করবেই ও জিনিসটা, কেবল কিছু সময় দরকার। মদিরাও বুঝেছিল এই সত্যটা। তাই আদৌ সময় দিল না, পরদিন প্রাতঃকালেই হারটা নিয়ে বৃন্দাবনে পালিয়ে চলে এলো। এমন যে সম্ভব মাথায় আসেনি মথুরাপ্রসাদের, নতুবা পাহারা বসাতো।

বৃন্দাবনে এসে সমবয়সী এক ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো। মদিরা জানালো যে মথুরার বণিক মথুরাপ্রসাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, এখানে আশ্রয় চায়।

মেয়েটি জানালো, বহিন, এখানে নির্ভয়ে বাস করো, বৃন্দাবনে এসে হামলা করবার সাহস কারো নেই, বিশেষ মথুরার লোকের তো বটেই। ব্রজেশ্বর এখানে সকলের রক্ষক। সেই মেয়েটি যে মঠে বাস করতো সেখানে এসে উঠল মদিরা। তার ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে রাখলো কৌস্তভমণি হার, কাউকে বিশ্বাস করে সে সংবাদ জানাতে পারলো না। তারপরে দশ বৎসর চলে গিয়েছে। গোড়ায় যে ছিল পলাতকা নারী, সে ক্রমে পরিণত হল কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজাঙ্গনায়।

মথুরাপ্রসাদ সমস্ত খবর রাখে কিন্তু করবার কিছু নেই। এই দশ বৎসর তার অন্যান্য ইন্দ্রিয় শিথিল হলেও লোভটা বেড়ে গিয়েছিল, বস্তুতঃ লোভটা বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়গত নয় বলেই বয়সের সঙ্গে বেড়ে যায়। স্বভাবলোভী মথুরা-প্রসাদের বেলায় তা একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছিল। সে তাকে তাকে থাকলো।

ব্রিজপ্রসাদ আর ব্রিজনাথ নামে তার দুই বিশ্বস্ত সহচর ছিল, সমস্ত দুষ্কর্মের সহায় তারা। যেমন প্রভু তেমনি অনুচর। দুজনেই কলির চর, তাদের অসাধ্য বা অকরণীয় কিছু ছিল না। মথুরাপ্রসাদের আজ্ঞায় তারা দুজনে ছায়ার মত মদিরার কাছাকাছি থাকতো। সমস্ত খবর রাখতো, রত্নটা যে হাতছাড়া হয়নি জানাতো প্রভুকে। বৃন্দাবনে সকলেরই অবাধ গতিবিধি। তবে জুলুম করবার সাহস কারো ছিল না। মদিরাকে চোখে চোখে রেখে দশ বৎসর কেটে গেল।

একদিন তারা প্রভুকে জানালো যে সম্প্রতি জটাশ্মশ্রুধারী এক সন্ন্যাসী এসেছে আর তার সঙ্গে মদিরার কিছু অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা, ভাবগতিকে মনে হয় তাদের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় আছে। মথুরাপ্রসাদ আদেশ দিল যে এবার যেন কড়া পাহারা রাখে, ঐ সন্ন্যাসী বেটা মণিটা হাত করতে না পারে কিংবা ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেটা না পাচার করে দেয় মাগীটা। ও বেটীর অসাধ্য কিছু নেই, নইলে এমন সুখের বাগানবাড়ি ছেড়ে মঠে গিয়ে থাকে, অলঙ্কারের বদলে গায়ে তিলক ফোঁটা কাটে, আর কিনা মদের বদলে পান করে চরণামৃত! অনুচরেরা জানায় প্রভুর আদেশ হলে ঐ মণিশুদ্ধ মাগীটাকে নিয়ে এসে হাজির করে দেয় বাগানবাড়িতে। এ কথা শুনবামাত্র মথুরাপ্রসাদ দুই কানে আঙুল দিয়ে কপালে হাত ঠেকায়, শেষে কি কংসের মতো প্রাণে মারা পড়বে!

ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ সুদক্ষ গুপ্তচর। প্রত্যেকটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

রাখত। ইতিমধ্যে জরার সঙ্গে নানা অজুহাতে আলাপ-পরিচয় করে নিয়েছে। সে যে শীঘ্র দ্বারকায় রওনা হবে তাও জেনে নিয়েছে। মদিরা তাদের চিনতো না, তাই সন্দেহ করলো না। আর যাত্রার আগে জরার গলায় যখন একটি রেশমী থলি ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, জরা, এর মধ্যে রইলো তোমার জপের মালা, সাবধানে রেখো, তখন সমস্তই দেখলো অনুচরেরা। তারা বুঝলো ঐ মণিটা পাচার হতে চলেছে। তারা অবিলম্বে প্রভুকে গিয়ে খবর দিল।

সংবাদ শুনে মথুরাপ্রসাদ অনুচর দুজনকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে পথখরচের যথেষ্ট অর্থ দিয়ে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চাপিয়ে বিদায় দিল। বলল, দেখো, লোকটার পিছু নেবে। লোকটা যখন মালব দেশে প্রবেশ করবে তখন ছলে-বলে-কৌশলে ঐ থলিসুদ্ধ মণিটা হাত করে চলে আসবে। দেশ এখন অরাজক, খুনজখম রাহাজানি নিত্যকার ঘটনা, কে করলো লোকে জানতে পারবে না। তারপর আরও জানিয়ে দিল, ওটা পেলে তোমাদের জায়গীর দেবো।

ওরা প্রভুকে অভিবাদন জানিয়ে রওনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল, বেটাদের বিশ্বাস কি, যদি নিজেরাই আত্মসাৎ করে। তাই মথুরাপ্রসাদ ছদ্মবেশ ধারণ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে ওদের পিছু পিছু চললো। গুপ্তচরের উপরে গুপ্তচর। অনুচরদের সঙ্গে সামান্য ব্যবধান রক্ষা করে চললো স্বয়ং ছদ্মবেশী প্রভু। প্রভু ও গুপ্তচরদের মধ্যে সম্বন্ধটা চিরকাল বিশ্বাসের ভানের উপরে স্থাপিত।

এসব ব্যাপার মদিরার জানবার নয়। আর দশ বৎসর আগেকার মথুরাপ্রসাদের সেই লোভের বিবরণ এখন তার মনে প্রাচীন ইতিহাস মাত্র। সে দিক থেকে ভয় ছিল না তার মনে, তাই সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি। তবে বলে দিয়েছিল সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বেশি মেলা-মেশা না করে, কারণ অনেক সময় চোর ছিনতাই ও দাগাবাজ সাধুবেশে কার্যো-দ্ধার করে থাকে। আর কৌস্তভমণির কথা সাধু অসাধু কাউকে নয়।

॥ ৩ ॥

সারা দেশটাই অরাজক তবে তার মধ্যে যদি তর-তম করতে হয় তবে চর্মণ্বতী ও নর্মদা মধ্যস্থ ভূভাগকে নির্দেশ করতে হয়। এই অঞ্চলের প্রত্যেক লোক ছিনতাই; দুর্বল লোকে শক্তির অভাবে ঠগ ও চোর, প্রবল লোকে লুঠেরা ও ডাকাত, প্রত্যেকটি গ্রাম সমাজবিরোধীদের আড্ডা, প্রত্যেকটি এই সব সমাজবিরোধীদের

আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা। আবার দুর্গে দুর্গে বিরোধ ও দাঙ্গা, তখন নিজ নিজ অভিরুচি ও স্বার্থ অনুসারে আশেপাশের লোকেরা যে কোন দিক অবলম্বন করে। স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলেই দল পরিবর্তন করতে বাধে না। এই ভূভাগে যে সব অরণ্য আছে তার শ্বাপদগণ মানুষের ভয়ে সন্ত্রস্ত। দলবহির্ভূত সজ্জনগণের পক্ষে প্রাণ বাঁচানো কঠিন, কাজেই প্রাণের দায়ে তারা কোন না কোন দলে যোগদান করতে বাধ্য হয়, শেষে এমন অবস্থা হল যে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, নিরীহ সজ্জন আর থাকলো না। বিদেশী পথিক এদিকে বড় আসে না, ভুলে এসে পড়লে মারা পড়ে। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকটা নিরাপদ, তবে সম্পূর্ণ নয়, জরার প্রতি তাদের ব্যবহারে তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই পথ ধরে জরা চলেছে, কারণ অন্য পথ আর নেই—মথুরা থেকে দ্বারকা যাওয়ার এই একমাত্র পথ। জরা শাস্ত্রজ্ঞ হলে 'দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' শাস্ত্রবাক্যের নতুন অর্থ করতে পারতো।

সে যতটা সম্ভব পথ ও পথিক এড়িয়ে চলে, খাদ্য প্রধানতঃ বনফল ও কন্দ, কখনো গাঁয়ের কাছ দিয়ে যেতে বাধ্য হলে সহৃদয় গৃহস্থ বাজরার রুটি আর চাটনি দেয়, পানীয় নদী বা ঝরনার জল। কোনো কোনো গাঁয়ের লোকে রাতের বেলায় সেখানে আশ্রয় নিতে বলেছে, ক্লান্ত জরার আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন, তবু অস্বীকার করেছে, বলেছে তার বড় তাড়া।

পথটা প্রশস্ত, যদিচ অনেক কাল বেমেরামতে মাঝে মাঝে ভেঙে গিয়েছে আর পাঁচ-ছয় ক্রোশ ব্যবধানে পথিকের আশ্রয়ের জন্য চটির চালাঘর। এগুলি এড়িয়ে যেতে বিশেষভাবে মদিরা পরামর্শ দিয়েছিল। আসল কথা রাহী লোকের সংবাদ রাখবার এগুলো ঘাঁটি। পথিক এক চটি থেকে পরবর্তী চটিতে পৌছবার আগেই তার খবর পৌছে যায়। জরা দু'চারবার লুঠেরার হাতে পড়েছে তবে তার জীর্ণ সন্ন্যাসীর বেশ দেখে দাড়ি চুল টানাটানি পরীক্ষা করেই ছেড়ে দিয়েছে। সে দিনের বেলায় পথ চলে, সন্ধ্যা হলে রাজপথ থেকে দূরে কোন গাছতলায় আশ্রয় নেয়। এইভাবে কালীসিন্ধু নদী পার হয়ে তার মনে হল দ্বারকায় পৌছলেও পৌছতে পারে। মালব বা মালোআ একটা মালভূমি, কালীসিন্ধু চর্মণ্বতী বা চম্বলের একটি শাখা।

জরা আপন মনে না চললে এতদিনে বুঝতে পারতো তাকে অনুসরণ করে কিছু ব্যবধানে দুজন অশ্বারোহী তার পথে চলছে। ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইচ্ছা করলে নিঃসঙ্গ জরাকে যে কোন মুহূর্তে হত্যা করে রত্ন উদ্ধার করতে পারতো। কিন্তু এ কাজের বাধা তাদের অভিজ্ঞতা। তারা জানে

একটা রাহাজানি হওয়া মাত্র চারিদিকে লোক ছুটে যাবে তখন লুটের মাল বেহাত হতে কতক্ষণ। পূর্বতন অভিজ্ঞতার ফলে তারা জানে যে আপাতদর্শনে শূন্য মাঠ শূন্য নয়, সম্ভব-অসম্ভব নানাস্থানে লোক ওত পেতে আছে, শিকারের গন্ধ পেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই সতর্কতা আবশ্যক। দিবারাত্রি জরাকে তারা চোখে চোখে রেখে অনুসরণ করছে।

কদিন পরে ভোরবেলায় তারা লক্ষ্য করলো জরার একজন সহযাত্রী জুটে গিয়েছে, তারও সন্ন্যাসীর বেশ।

ব্রিজনাথ বলল, ভাই, এ কি হল, একটি ছিল দুটি হল যে।

ব্রিজপ্রসাদ বলল, তাই তো দেখছি। আশঙ্কা হচ্ছে ও বেটাও আমাদের মতই শিকার সন্ধানে আছে।

সন্ন্যাসীর বেশ যে।

ভাই ব্রিজপ্রসাদ, একবার ভেবে দেখো তো কতবার ঐ বেশে আমরা কার্যসিদ্ধি করেছি।

তা বটে, কিন্তু আরও যদি সঙ্গী জুটে যায় তবে যে শিকার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

দেখাই যাক না কতদূর কি হয়, বলে ব্রিজনাথ। মথুরাপ্রসাদজীর মুখে শোননি ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে, ঝোপ বুঝে কোপ।

জরাকে চোখ ছাড়া না করে ওরা এক জায়গায় আহার ও বিশ্রাম করে নিল।

একদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে জরা দেখল যে অদূরে রাজপথের পাশে একটি চটি। পানীয় জলের সন্ধানে সেখানে পৌঁছলে একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল, বলল, সন্ন্যাসীজী, প্রণাম।

সেই ব্যক্তি সসঙ্কোচে বলে উঠল, সাধুজী, আমি সন্ন্যাসী নই।

জরা শুধালো, তবে চুল দাড়ি বেশ সন্ন্যাসীর মত কেন?

সেই লোকটি হেসে উত্তর দিল, সাধুজী, এ কি জ্ঞানীর মতো কথা হল! চুল দাড়ি সন্ন্যাসী গৃহী সকলেরই গজায়, পথে ক্ষৌরকারের অভাবে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়েছে, ওদের দোষ নেই। আর বেশ। ভেক না হলে কি ভিক্ষা মেলে। সাধুজী, আমি গৃহী।

জরা বলে উঠল, আমাকে বার বার সাধু বলবেন না, আমি ঘোর পাপী, মহাপাপী, আমি যদি সাধু হই তবে অসাধু কে?

আচ্ছা সাধু না হয় নাই বললাম, বাবা বলতে নিশ্চয় দোষ নেই—যদিচ

আপনার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম।

তাহলে তো আপনি বলাও চলে না, আমাকে তুমি বলবেন, এই আমার আকিঞ্চন।

বেশ তাই বলবো, 'আপনি' হল শিষ্টতা, 'তুমি' আত্মীয়তা। তা কোথায় চলেছ বাবা?

জয়া বলে, পাপমুখে কেমন করে বলবো।

প্রশ্নকর্তা হেসে উঠে বলে, বা বা, উত্তরটা তো সাধু-সন্ন্যাসীর মতো হল।

আপনি কোথায় চলেছেন?

আপাততঃ অমরকণ্টকে, সামনেই, আর সামান্য ক'দিনের পথ।

জয়া হতাশভাবে বলে, আমার যে সম্মুখে এখনো অনেক পথ।

সে তো আনন্দের কথা বাবা, পথ চলার মত এমন আনন্দ আর আছে কি!

পথে যে চোর ডাকু দাঙ্গাবাজের দল!

আজ ওরা কোথায় নেই বাবা! তবে ওরা আমাদের নেবে কী? তোমার গলায় ঐ জপের মালার থলি আর আমার গলার থলিতে শালগ্রামশিলা।

জয়া বলে, আপনাকে যদি ঠাকুর বলি?

খুব ভালো, ঠাকুর বলো প্রভু বলো বাবাজী বলো আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

তবে তাই হোক। দুঃখের কথা আর কি বলবো। এর মধ্যে তিন-চারবার আমার দাড়ি চুল টেনে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

সাজা সন্ন্যাসী কিনা মনে করে তো।

হ্যাঁ, ঠাকুর কি করে জানলেন?

আমার উপর দিয়েও যে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, বাবা সব, চুল দাড়ির উপরে আমার মমতা নেই, একখানা ক্ষুর দাও, কেটে দিচ্ছি। তাই শুনে ওরা বলে কি জানো?

কি বলে ঠাকুর?

আমরা কি নাপিত?

আমি বললাম, রাম, রাম, নাপিত চুল দাড়ি দেখেই বুঝতে পারে, টেনে পরীক্ষা করতে হয় না তাদের। তোমার গলার থলিতে কি? শালগ্রামশিলা। বললাম, মানলে শালগ্রাম, না মানলে পাথর। তাই না শুনে ওরা বলে ওঠে, চল্ চল্ সময় যাচ্ছে। এ বেটা আসল সন্ন্যাসী। আমি বললাম, বাবারা, এবার ঠকলে। আমি সন্ন্যাসী নই, গৃহী। শুনে ওরা বলে, গৃহী তো গৃহ কোথায়?

আমি বলি, আমি তো শামুক নই যে গৃহটা পিঠে করে বেড়াবো। আমার কথা শুনে ওরা এতই বিরক্ত হয় যে আর দ্বিরুক্তি না করে চলে যায়।

জরা বলে, ঠাকুর, তোমাকে সঙ্গী পেয়ে মনের বল বাড়লো।

শুধু মনের বল বাড়লেই তো চলবে না, দেহের বল বাড়াও আবশ্যক। এই নাও রুটি আর চাটনি, আর ঐ দেখো কলসীতে জল।

তখন দুজন একত্র বসে পানাহার সমাধা করলো। ঠিক সেই সময়ে ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ অদূরে গাছতলায় বসে আহার ও বিশ্রাম করছিল। তাদের হুঁশ থাকলে লক্ষ্য করতো তাদের কিছু পিছনে আর একজন ঘোড়সওয়ার গাছের আড়ালে বিশ্রাম করছে, পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়াটা।

এই মানুষটিকে ভালো লেগে গিয়েছে জরার। সাধু—কিন্তু ভেক বা ভড়ং নেই, গভীর কথা যে হেসে বলা যায় গাম্ভীর্যের প্রয়োজন হয় না এই প্রথম দেখলো। দেশে-বিদেশে ঘুরেছে, লক্ষ্য করেছে সাধুরা হাস্য-বিমুখ, ছাগর্ষি মাঝে মাঝে হাসতো বটে কিন্তু সে হাসি যেন করাতের শব্দ, গা আতঙ্কে শিউরে ওঠে, কাটলো বুঝি! সে ভাবলো যতটা পথ পারা যায় এর সঙ্গে যাওয়া যাক।

দুজনে পাশাপাশি পথ চলছে, সাদা ধুলোর পথ, দুদিকে প্রবীণ গাছের সার, রোদ্দুরের তাত বাঁচিয়ে চলতে কষ্ট হয় না। জরা বলল, ঠাকুর, আমি বড় পাপী, মহাপাতকী।

ঠাকুর সংক্ষেপে উত্তর দিল, কে নয়?

জরা বলে, আমার মতো কেউ নয়।

ওতেই তো তুমি বেঁচে গিয়েছ বাবা।

কেন ঠাকুর?

মানুষে নিজের পাপকে লঘু করে দেখে কিংবা তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে হাল্কা মনে করে।

আমি যে পাপের ভারে ক্রমেই ডুবে যাচ্ছি। আজ দশ বছর হল, ঠাকুর, পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে অরণ্যে কি করে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সন্ধান করে ফিরছি। কত সাধু-সন্ন্যাসী যোগী তপস্বীর সঙ্গে দেখা হল, তারা আমার প্রশ্ন শুনে শাস্ত্র আওড়ায়। কিন্তু বাবা, ছবিতে জল দেখে তো তৃষ্ণা মেটে না। এদিকে যে সন্ধ্যা হয়ে এল।

ঠাকুর বলে, তবে তোমার মুক্তিও আসন্ন।

সে কি মৃত্যুর পরে?

পরে কেন, আগেই।

কিছু যে বুঝতে পারছি নে বাবা।

তবে বুঝিয়ে দিই। নদীতে মাঝি খেয়া পারাপার করে দেখেছ তো।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় জরা।

মাঝি ঘর থেকে ঘাটে আসবার সময়ে শিশুপুত্রটিকে নিয়ে আসে, তাকে একটা কিছু খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখে। বলে, বাবা, বসে বসে খেলো, এদিক-ওদিক যেয়ো না। তারপরে সারাদিন ধরে খেয়ায় লোক পারাপার করে, কত গাঁয়ের কত লোক এপার ওপার হচ্ছে। মাঝে মাঝে মাঝি তাকিয়ে দেখে ছেলেটা কি করছে। হ্যাঁ, ও ঠিক জায়গায় বসে আছে, আপনমনে খেলছে। তারপরে যখন বেলা পড়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, পারাপার হওয়ার লোক আর থাকে না, তখন শেষ খেয়ায় ছেলেটিকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে ঘাট-মাঝি। আপন লোক কিনা, তাই তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখে। বুঝলে না বাবা, তুমি তাঁর আপন লোক, তাই তোমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনের ঘটে!

জরা নিরক্ষর হলেও বোঝে এ শাস্ত্রবচন নয়—জীবনের অভিজ্ঞতা। সে তাহলে ভগবানের আপন লোক, তাই পার হতে দেরি হচ্ছে। কেউ এমন করে তো বোঝায়নি। সে প্রশ্ন করে, ঠাকুর, নিজের চেষ্টায় কি পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

ঠাকুর বলে, যায় আবার যায় না।

সে কি রকম ঠাকুর?

বাবা, তোমার আমার এমন কি সাধ্য যে পাপের ভার থেকে মুক্তিলাভ করি, তবে চেষ্টা করতে পারি এই পর্যন্ত। আমরা চেষ্টা করি আর তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন। যখন টের পান যে লোকটা প্রাণপণ করছে তবু পেরে উঠছে না তখন তিনি এগিয়ে এসে খানিকটা ভার ঠেলে ফেলে দিয়ে বোঝাটা অনেকখানি হাল্কা করে দেন, তাতেই তো মুক্তি সম্ভব হয়।

এসব কথাও জরার কাছে নূতন।

ঠাকুর আবার বলতে থাকে, তোমার আর্তি দেখে বুঝতে পারছি এবারে তাঁর আসন টলেছে, তোমার ভার লাঘব করবার উদ্দেশ্যে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

আর্তভাবে জরা শুধায়, কবে এসে পৌঁছবেন তিনি?

ঠাকুর হেসে বলে, ফিরে গেলে বোঝা যায় যে তিনি এসেছিলেন।

আর তো অপেক্ষা করতে পারি নে বাবা।

তবে নিশ্চয় জেনো তিনিও আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।

সকলের বেলাতেই কি তাঁর এই রকম দয়া?

তবে কি শুধু তোমার বেলায়। বাবা, মানুষের কাছে আমি তুমি সে আছে, তাঁর কাছে সবাই সে। সকলকে পার করে না দেওয়া পর্যন্ত যে তার ছুটি নেই।

এইভাবে প্রশ্নোত্তরে তাদের পথ অতিক্রান্ত হয়। পদাতিক, সওয়ার, শিবিকারোহী, সম্পন্ন ভিখারী পথিকের আর অন্ত নেই। এ অঞ্চলে দিগন্ত অবারিত, পাহাড় বা অরণ্য কোথাও বাধা সৃষ্টি করেনি। মাঝে মাঝে ছোট-বড় চটি। চলবার মুখে আবার প্রশ্ন জাগে জরার মুখে, ঠাকুর, আপনি তো গৃহী, তাহলে আপনার গৃহ আছে নিশ্চয়?

নিশ্চয় গৃহ আছে, গৃহিণী আছে, প্রতিপাল্য আছে।

জরা শুধায়, ছেলেমেয়ে?

কারো ছেলেমেয়ে নিশ্চয়।

তার মানে কুড়িয়ে আনা?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পথ থেকে কুড়িয়ে আনা, তিনটে খোঁড়া কুকুরের বাচ্চা, দুটো ছাগল, কয়েকটা ময়না আর শুকপাখি।

বিস্মিত জরা বলে ওঠে, এদের নিয়ে আপনার সংসার?

তা বইকি। এদের দায় কি ছেলেমেয়ের দায়ের চেয়ে কম! ছেলেমেয়ের একটু বয়স হলেই তাদের ভাষা বুঝতে পারা যায়, এরা যে চির-অবোলা।

তবে এদের মনের কথা বোঝেন কি ভাবে?

ভালবাসা দিয়ে। বিধাতা ভাষা সৃষ্টি করবার আগে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে ঠাকুর, এরাই আপনাকে মায়ার বন্ধনে বেঁধেছে।

আমিও বেঁধেছি তাদের, ছাড়া থাকে অথচ একটাও পালায় না।

শুকপাখি তো পোষ মানে না ঠাকুর!

খাঁচায় রাখে বলে পোষ মানে না, ছাড়া থাকলে আর পালাবে কেন?

এতগুলো পশুপাখিতে মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধে না?

বাধে বইকি বাবা, মানুষের সঙ্গ যে পেয়েছে—বলে তিনি হেসে ওঠেন, জরাও হাসতে থাকে।

ঠাকুর বলে, চলো বাবা, আজ এই হাটতলাতে রাত্রিযাপন করা যাক।

বিপদ-আপদ!

চটি হলে বিপদ-আপদের আশঙ্কা ছিল বটে। কিন্তু এ পোড়ো হাটতলায় কে আসতে যাবে! সপ্তাহান্তে একবার লোকের ভিড় হয় তারপরে

চারচালাগুলো শূন্য পড়ে থাকে। চোর-ডাকুতে আন্দাজে হানা দিয়ে শক্তি অপব্যয় করে না।

কাজেই দুজনে সেখানে বিশ্রামের আয়োজন করলো, তার আগে ঠাকুর ভল্লি থেকে বার করলো খানকতক চাপাটি ও আচার, ইঁদারায় জল ছিল।

ঠাকুর বলল, দেখো আমি গৃহী কিনা, অন্ততঃ দুদিনের খাদ্য সঙ্গে না নিয়ে পথ চলি না।

আহারান্তে যখন দুজন একখানি চালাঘরের মধ্যে পাশাপাশি শয়ন করলো, বাইরে তখন পূর্ণিমার আলোয় দিগদিগন্তের কাণাটি অবধি পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর একবিন্দু বেশি হলে যেন উপছে পড়বে।

ঠাকুর স্নেহের সুরে বলল, নাও বাবা, নির্ভয়ে ঘুমোও। তারপরেই হেসে উঠে বললেন, 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে' মহাজন বাক্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আজ আমরা দুজনে।

ঠাকুর যখন জরাকে অভয় দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে হাটতলার অদূরে বটগাছের ছায়ার আড়ালে দুজন অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল। আর তারও কিছু দূরে সাদা পথের ধূলায় অঙ্কিত হয়েছিল তৃতীয় একজন অশ্বারোহীর ছায়ামূর্তি।

॥ ৪ ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ গাছের ডালে ঘোড়াদুটাকে বেঁধে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেই চালাঘরের দিকে। সকাল থেকে লক্ষ্য করেছে তাদের শিকারের সঙ্গে আর একজন সন্ন্যাসী এসে জুটেছে, তাই তারা স্থির করেছিল আজকেই কাজ সমাধা করতে হবে, আরও সন্ন্যাসী জুটে যেতে কতক্ষণ, সংখ্যায় বেশি হলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, সন্ন্যাসীরা নিরস্ত্র; নিরস্ত্র তবে সবল। কাজেই ঘুমের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করাই নিরাপদ। মথুরাপ্রসাদের নির্দেশ ছিল, পারতপক্ষে প্রাণে মেরো না, তবে যদি বলপ্রয়োগ করে তবে তোমরাও করবে, মারা পড়লে তোমাদের উপরে সাধুহত্যার দায় বর্তাবে না।

দুজনে নিঃশব্দে কুটিরের পাশে এসে দাঁড়ালো। কান পেতে শুনলো কেউ কথা বলছে না, তারপরে নাসিকাধ্বনি শুনে নিশ্চিন্ত হল, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তখন ব্রিজনাথ ইশারায় ব্রিজপ্রসাদকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকলো। বাইরে যেমন আলো ভিতরে তেমনি অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই

অন্ধকারে তার চোখ অভ্যস্ত হতেই বুঝতে পারলো পাশাপাশি সন্ন্যাসীদ্বয় মাটিতে শয়ান। বৃন্দাবনেই সে লক্ষ্য করেছিল রত্নহারটি (প্রভু সেই রকম জানিয়েছিল) একটি থলিতে সন্ন্যাসীর গলায় ঝোলানো। গলার সেই সুতোটি কাটবার উদ্দেশ্যে ধারালো ছুরি সঙ্গে এনেছিল। এখন পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। এবারে সে মস্ত একটা ভুল করে বসলো যে-কেউ করতো। জরার গলার থলিকে কাটতে গিয়ে অপর সন্ন্যাসীটির গলার থলি কাটলো। পাশাপাশি দুজনে শয়ান। দুজনের দীর্ঘ চুলদাড়ি, তার উপরে ঘোর অন্ধকার, কাজেই এমন ভুল খুবই স্বাভাবিক। থলিটি হাতে করে দেখল বেশ ভারি। বুঝলো ধনী বণিক মথুরাপ্রসাদের লোভ লঘু বস্তুতে হতে যাবে কেন! বাইরে এসে অপেক্ষমাণ ব্রিজপ্রসাদকে ইশারায় জানালো কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। তখন দুজনে পূর্ববৎ নিঃশব্দে সেই বটগাছটির দিকে চলল, ঘোড়ায় চড়ে মথুরায় ফিরতে হবে।

সেই কুটির থেকে গাছটি খুব বেশি দূর তো দু' রসি। এইটুকু পথ যেতে যেতেই ব্রিজনাথের মনস্তত্ত্বে বিপ্লব ঘটে গেল আর তার কর্তা স্বয়ং শয়তান। শয়তানের মনোরথ গতি। সে ভাবলো এই অমূল্য রত্ন হরণ করাতে পাপটা তার হল আর সুফল ভোগ করবে মথুরাপ্রসাদ—এ হচ্ছে নৈতিক অধিকার। প্রভু তাকে বড়জোর পঞ্চাশ কি একশ' স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে। যতই দিক তাতে আবার সমান সমান ভাগাভাগি হবে ব্রিজপ্রসাদের সঙ্গে। ব্রিজপ্রসাদ কি করেছে, আর প্রভু তো কিছুই করেননি, মথুরার প্রাসাদে আরামে ঘুমোচ্ছে। তার মনে হল পাপ যখন তার সুফলটাও তার হওয়া উচিত। প্রয়োজন হলে নিরীহ সন্ন্যাসীকে প্রাণে মারতে হত, সে-পাপটা আগাম চাপিয়ে নিল নিজের ঘাড়ে। পাপ যখন করেছেই, তখন সুফলটাও তার পাওয়া উচিত। না, এটা কিছুতেই প্রভুর হাতে তুলে দেবে না। এমন কাজ করতে হলে ভাগ দিতে হয় ব্রিজ-প্রসাদকে। কিন্তু তাতে অনেক বাধা, সে-বেটা রাজী হবে কিনা কে জানে, তার উপরে লুটের মাল ভাগাভাগি নিয়ে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হয়, তার ফলে জানাজানি হয়ে যায়। ভাগে খুশী না হলে সে জানিয়ে দিতে পারে প্রভুকে। তখন! আর তাছাড়া ব্রিজপ্রসাদ তো একরকম কিছুই করেনি, চুরি করেছে সে, প্রয়োজন হলে সন্ন্যাসী হত্যা করতো সে, সে-পাপের ভাগ কি ব্রিজপ্রসাদ নিতো! তবে রত্নের ভাগই বা পাবে কেন? কিন্তু তাকে ফাঁকি দেওয়ার কি উপায়! তখন শয়তানের কটাক্ষে আর এক বিদ্যুৎ-চমক খেলে গেল তার মস্তিষ্কে। সে হাত দিয়ে অনুভব করলো অসিখানা যথাস্থানে আছে।

মণি মাণিক্য হীরা পান্না চুনি মরকত সমস্তই প্রস্তরবিশেষ। পথের ঐ

উপলখণ্ডের সঙ্গে তাদের প্রভেদ মনস্তত্ত্বগত বই নয়। এসব না লাগে গ্রাসাচ্ছাদনে না লাগে আশ্রয়নির্মাণে। তবু এইসব বিচিত্র উপল-প্রাপ্তির আশায় মানুষ কি পাপ, কি পণ্ডশ্রম না করে! অন্নপানীয় বিধাতার সৃষ্টি, মণিমাণিক্য সৃষ্টি শয়তানের। শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে শয়তানেরই ইঙ্গিত। এক্ষেত্রেও তারই জয় হল। ব্রিজপ্রসাদ ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে ঘোড়ায় চাপতে যাবে, সেই অসতর্ক মুহূর্তে ভূমিতে দণ্ডায়মান ব্রিজনাথ অসি নিষ্কাশিত করে তার মুণ্ড দেহচ্যুত করে ফেলল, আর তারপরেই নিজের ঘোড়ায় চড়ে সবেগে ছুটলো মথুরার বিপরীত দিকে। সে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল কেউ অনুসরণ করছে না, কে আর করবে, একমাত্র যে-ব্যক্তি করতে পারতো তার দেহ দ্বিখণ্ডিত। তবু আশঙ্কা! একেই বুঝি ভূতের ভয় বলে।

শিক্ষিত ঘোড়া সবেগে ছুটেছে। সাদা ধুলোর পথের উপরে ছায়াতরুর সমান্তরাল কালো কালো ডোরাকাটা। ব্রিজনাথ হঠাৎ মনে একপ্রকার অননুভূত পূর্ব উল্লাস অনুভব করলো। সে কি উদ্দাম গতির প্রেরণায়, না, সুনিপুণভাবে সম্পন্ন পাপের কৃতিত্বে, কিংবা ভাবী ঐশ্বর্যের মরীচিকার প্রলোভনে! পাপের প্রারম্ভে বড় সুখ।

হঠাৎ তার মনে হল পিছনে যেন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। তখনি বুঝলো এ তারই ঘোড়ার ক্ষুরের প্রতিধ্বনি। কিন্তু প্রতিধ্বনি যেন স্পষ্টতর নিকটতর হচ্ছে। সত্য কি প্রতিধ্বনি পরীক্ষা করবার আশায় ঘোড়া থামলো, না শব্দ তো থামলো না। ধ্বনি নেই প্রতিধ্বনি আছে এমন তো হয় না! তখন পিছনে তাকিয়ে দেখল দূরে পথের সাদার পটে ধাবমান একটি কালো বস্তু। তখনি দ্বিগুণ বেগে হাঁকিয়ে দিল নিজের অশ্ব। কেউ কি তাকে অনুসরণ করছে কিংবা নিজ প্রয়োজনে ধাবমান অশ্বারোহী! যেমনি হোক এত রাতের এমন স্থানের অশ্বারোহীকে বিশ্বাস কি! অশ্ব তীরবেগে সামনে ছুটছে, মাঝে মাঝে পিছনে তাকিয়ে অনুসরণকারীর ব্যবধান লক্ষ্য করছে ব্রিজনাথ।

ছদ্মবেশী মথুরাপ্রসাদ প্রচ্ছন্নভাবে অনুচরদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল—এ সংবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে। সে দেখল দুজনে ঘোড়া বেঁধে রেখে কুটিরের দিকে অগ্রসর হল; লক্ষ্য করলো তারপরে দুজনে গাছতলায় ফিরে এলো, লক্ষ্য করলো দুজনের বদলে একজনমাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তাও কিনা আবার উল্টো দিকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির কি হল? মথুরার বিপরীতে ঘোড়া ছুটলো কেন অপর ব্যক্তির! তখন মথুরাপ্রসাদ বটগাছতলায় এসে দেখতে পেলো একটি দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ। মরলো কে? তখনি বায়ুর আন্দোলনে পল্লব সরে গিয়ে চাঁদের আলো

এসে পড়ে প্রমাণ করে দিল মৃত ব্যক্তি ব্রিজপ্রসাদ। মথুরাপ্রসাদ বুনিয়াদি পাপী, কাজেই একলহমায় ঘটনার প্রকৃতি বুঝে নিল। রত্ন উদ্ধার করে, ব্রিজপ্রসাদকে মেরে ফেলে বেপাত্তা হওয়ার চেষ্টায় আছে ব্রিজনাথ। সে ভাবলো বেটা শয়তান। শয়তান না হোক শয়তানের অনুচর নিঃসন্দেহ। সে তুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ব্রিজনাথের অনুসরণে। মথুরাপ্রসাদ সুদক্ষ অশ্বারোহী, অশ্ব সুশিক্ষিত।

দুটি অশ্বই শিক্ষিত, অশ্বারোহী দুজনেই শিক্ষিত, নক্ষত্রবেগে তারা ছুটেছে। একজন লোভে, একজন ব্যর্থলোভের প্রতিহিংসায়। গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা পথের উপরে ছায়ার ডোরাকাটাগুলি দ্রুততর এসে পড়ছে শেষে এমন মনে হয় যে সমস্ত পথটাই ডোরাময়, আবার এমন মনে হয় যে সমস্ত পথটাই সাদা। পলায়নকারী ও অনুসরণকারীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই ক্ষীয়মাণ। রাত্রি নিষুতি, নিস্তব্ধ, কেবল আটটি ধাবমান ক্ষুরের একটি শব্দ। একটি তবে আটগুণ প্রবল।

ব্রিজনাথ দেখল অনুসরণকারী যে-ই হোক তার লোভটা ঐ রত্নটির প্রতি, সেটি পেলে নিশ্চয় ফিরে যাবে। তাই সেই থলিটি নিক্ষেপ করলো, কিন্তু তা চোখে পড়লো না মথুরাপ্রসাদের, তার চোখ বিশ্বাসঘাতক অনুচরের দিকে নিবদ্ধ। মুহূর্ত পরে দুজনে কাছাকাছি এসে পড়লো, ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল ব্রিজনাথ, চিনতে পারলো না ছদ্মবেশী প্রভুকে, তাকে দূর থেকে বিদ্ধ করবার ইচ্ছা, বল্লম ঋজুভাবে ধরলো। মথুরাপ্রসাদ ঝোঁক সামলাতে পারলো না, বল্লমের উপরে এসে পড়লো, বুকে পিঠে বিদ্ধ হয়ে গেল, বল্লম এফোঁড় ওফোঁড় হল, দুজনের ব্যবধান গেল কমে, ঘোড়া থেকে টলে পড়বার আগে তলোয়ারের এক কোপে ব্রিজনাথকে নিহত করলো মথুরাপ্রসাদ। প্রভু-ভৃত্য এক শয্যায় হল শয়ান।

॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মমুহূর্তে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে সন্ন্যাসীঠাকুর শয্যাত্যাগ করলো, সেই মুহূর্তে জয়াও উঠে বসলো। জয়া তার বুকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ঠাকুর, তোমার শালগ্রামশিলা গেল কোথায়?

ঠাকুর চমকে বুকের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই তো, থলিটা নেই, সুতোর আধখানা ঝুলছে। মনে হচ্ছে রাতের বেলায় কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছে। যাক, তোমার জপের থলি দেখছি যথাস্থানে আছে।

জয়ার বুঝতে বিলম্ব হল না যে-ই কেটে নিক তার লক্ষ্য ছিল জয়ার থলিটা,

অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে কেটে নিয়ে গিয়েছে ঠাকুরের শালগ্রামশিলার থলি। সে আরও বুঝলো যে কেটেছে সে জানে কি অমূল্য রত্ন রয়েছে জরার থলিতে। কে সে? কি করে জানলো সে?

ঠাকুর বলল, বাবা, আর চিন্তা করে লাভ নেই, যে নিয়েছে সে পাথরের টুকরো মাত্র নিয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি কি হঠাৎ এমন কোন ভক্ত কোথা থেকে এল যার লোভ আমার শালগ্রামটির উপরে।

জরার কাছে রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তাই তার বক্তব্য কিছু ছিল না। সে অনেকবার ভেবেছে ঠাকুরকে তার পাপের প্রকৃতি বলবে, কিছু ভূমিকাও করেছিল, ঠাকুর উৎসাহ দেয়নি।

জরা বলেছিল, ঠাকুর, আমার ইচ্ছা হচ্ছে আপনাকে সব কথা খুলে বললে মনের ভার লঘু হবে।

ঠাকুর বলেছিল, বাবা, মানুষের সাধ্য কি পাপের ভার লাঘব করে। তা পারেন একমাত্র অন্তর্যামী। তাকে বলো আর নাই বলো তিনি তো সমস্তই অবগত আছেন। বাবা, মুখের বলায় কি ভার কমে?

জরা শুধায়, তবে?

ঠাকুর বলে, মনের বলায়। মন তোমার তাঁর কানে কানে নিত্যনিয়ত বলে চলেছে আজ দশ বছর ধরে।

জরা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ঠাকুর বলে, চলো বাবা, আর বসে থেকে লাভ নেই, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে যাত্রা করা যাক।

কিন্তু ঠাকুর, আপনার নিত্যপূজার শিলা!

আবার মিলবে। আমি তো যাচ্ছি নর্মদা নদীর উৎস অমরকণ্টক তীর্থে, সেখানকার নদী-গর্ভে শালগ্রামশিলা পাওয়া যায়, এটিও ছিল সেখান থেকে পাওয়া।

এমন সময়ে ঠাকুরের মনে পড়ে যায় কাল রাতের ঘুমের মধ্যে ঘোড়ার দড়বড়ি যেন একবার কানে এসেছিল, তবে সেটা স্বপ্নের অভিজ্ঞতা না বাস্তব ঘটনা বুঝতে পারেনি। এখন মনে হল ঐ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে যেন শালগ্রাম খোয়া যাওয়ার যোগাযোগ আছে। কিন্তু শালগ্রামের প্রতি ঘোড়সওয়ারের লোভ কেন? হত মণিমাণিক্য, বোঝা যেতো।

শেষের শব্দ কটি হয়তো উচ্চারিত হয়ে থাকবে, জরা চমকে ওঠে। ঠাকুর কি তবে কিছু সন্দেহ করেছে নাকি!

তবু সন্দেহ নিরসন করে দিয়ে ঠাকুর বলে, এমন নির্বোধ লোকও তবে সংসারে আছে যে নাকি সন্ন্যাসীর ঝুলিতে রাজার ঐশ্বর্য কল্পনা করে।

দুজনে পথে বের হয়ে পড়েছে। ঠাকুর বলে, বাবা, মনে হচ্ছে আগামীকাল সন্ধ্যাতক অবন্তীনগরীতে গিয়ে পৌঁছবো। সেখানে মহাকালেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে অমরকণ্টকের দিকে চলে যাবো, তুমি যাবে তোমার পথে।

জরা বলে, ঠাকুর, এদিকের পথঘাট দেখছি আপনার জানা।

কি মুশকিল, জানা হবে না! আমি যে বছরে ছ'মাস ঘুরে বেড়াই।

জরা শুধায়, তীর্থ-দর্শনে?

প্রকাশ্যে তাই, মনের কথা জানেন মনের মালিক।

ঠাকুর, বিদায় নেবার আগে বলে যান আমার মুক্তি কি হবে না? কি উপায়ে হবে? বাবা, আমি জ্ঞানী নই, পণ্ডিত নই, জপ-তপ ধ্যানধারণা কিছুই জানি না। আজ দশ বৎসর বাণ-খাওয়া হরিণের মত পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে জনপদে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি, হেন তীর্থ নেই যেখানে না গিয়েছি, কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীকে শুধিয়েছি, কই কেউ তো সন্ধান দিতে পারলো না, সবাই বলে হাত জোড়া এগিয়ে দেখো, আর কোথাও যাও, আর কাউকে জিজ্ঞাসা করো।

তারপরে অত্যন্ত নৈরাশ্যময় কাতরস্বরে বলে, আর কতদূর এগোব বাবা, আর কোথায় যাবো, আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো। আপনাকে পেয়ে মনে বল লাভ করেছিলাম, আপনিও ছেড়ে চললেন।

তার আর্তি দর্শনে মনে ব্যথা পায় সন্ন্যাসী, বলে, বাবা, তোমার এত দুঃখ এত অনুতাপেও যদি তাঁর আসন না টলে তবে তাঁর দয়াময় নাম যে বৃথা হবে। এমন হতেই পারে না। তুমি যেখানে চলেছ যাও, তোমার মনস্কামনা সেখানেই পূর্ণ হবে।

ঠাকুর, পূর্ণাবতার কে? শুনেছি একমাত্র তিনিই আমার গতি করে দিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গ আর গড়াতে পারলো না, হঠাৎ দুজনে দেখতে পেলো পথের মধ্যে ঠাকুরের অপহৃত সেই থলিটা। ঠাকুর তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দেখল শালগ্রাম যথাযথ আছেন, মাথায় ঠেকালো। তারপর বলল, কেউ মণি-মাণিক্য মনে করে সংগ্রহ করেছিল তারপর পাথরের নুড়ি দেখে ফেলে গিয়েছে।

বলেন কি ঠাকুর, শালগ্রাম পাথরের নুড়ি!

যে মানে না তার কাছে নুড়ি ছাড়া আর কি?

ঠাকুর পুনরায় মাথায় ঠেকিয়ে আবার ঝুলিয়ে নিল গলায়।

আর কিছুদূর অগ্রসর হতেই তারা দেখতে পেলো দুটো মৃতদেহ লুটোচ্ছে পথের উপরে। দুজনেই তাদের অপরিচিত।

এরা কারা ঠাকুর?

আপাতত দুটি মৃতদেহ।

এখানে মরে পড়ে আছে কেন ঠাকুর?

বাবা, তোমার প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে আজকাল ঘরের চেয়ে পথেই লোক মরছে বেশি।

কেন?

কেন কি, অরাজকতার ঐ নিয়ম। সমাজ যখন সুস্থ থাকে তখন মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যথাকালে ঘরে মারা পড়ে। অসুস্থ সমাজে মানুষ ঘরে ফেরবার অবকাশ পায় না, কেউ মরে পথে, কেউ ঘরের দরজায়।

জয়া শুধায়, দেশের অবস্থার কি উন্নতি হবে না?

দেশ যদি উন্নতি না চায় তবে কি করে হবে?

এমন অরাজকতা কি কারো কাম্য?

অবশ্যই, নতুবা এমন হবে কেন?

কিন্তু কেন কাম্য সেটা তো বুঝতে পারছি না।

তার মানে তুমি অরাজকতা চাও না।

ঠাকুর, আমার মতো লোক হাজার হাজার আছে।

হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ আছে।

তবে?

শান্তিপ্রিয় লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ নয়, অন্যদিকে অরাজকতাকামীরা ব্যূহবদ্ধ, তাই মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও তারা নির্যাতিত। তারা ভাবে আমি তো প্রাণ বাঁচাই। আর তাছাড়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তারা জানে না যে রাজা নেই কিংবা রাজা অসহায়।

রাজা না থাক দলপতি আছে তো?

দলের জন্য আছে, তোমার আমার জন্যে নয়। কিংবা বলা উচিত দলপতি থেকেও নেই।

সে আবার কেমন?

গোড়ায় দলের লোক দলপতির শাসনে থাকে, কিন্তু যখনই বুঝতে পারে তাদের শক্তিতেই দলপতি শক্তিমান তখন দলপতির শাসনের বাইরে চলে যায়। তখন দলপতি হয়ে পড়ে দলাধীন। দলের লোক যা খুশি করে, দলপতি 'হাঁ হাঁ,

বেশ করেছ' বলে, নইলে নামের কর্তৃত্বটাও যে থাকে না। ঐ দেখো একটা সাজ পরানো ঘোড়া, মনে হচ্ছে ঐ মৃত লোক ছটোর কারো হবে।

এইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে অরাজকতার শত শত চিহ্ন দেখতে দেখতে তারা এগিয়ে চলে।

ঐ দেখো বাবা, পথের ডানদিকে একটা দগ্ধ গ্রাম।

আগুন লেগেছিল মনে হচ্ছে।

তার চেয়ে বলো আগুন লাগিয়েছিল।

কেন? কারা?

এখনো এরকম প্রশ্ন করছো? এগিয়ে চলো, আরও দেখতে পাবে।

আবার ঐ দেখো, একপাল উট নিয়ে চলেছে জনছুই লোকে।

কিনেছে নিশ্চয়।

না। আজকাল কেনাবেচা উঠে গিয়েছে, তার বদলে লুটপাট। পা চালিয়ে চলো বাবা, নইলে কালকে অবন্তীতে পৌছতে পারবো না।

ছজনে দ্রুততর চলতে থাকে।

পরদিন অবন্তীনগরে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, আরও আগে পৌছবার কথা, কিন্তু মাঝপথে ছু জায়গায় দাঙ্গা চলছিল বলে ঘুরে আসতে হয়েছে। অবন্তীনগরে সিংহদ্বার সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায়, ঠাকুরের মনে ভয় ছিল পাছে রাতটা বাইরে কাটাতে হয় কিন্তু এসে দেখল খোলা দরজা হা-হা করছে, দ্বারী বা শান্ত্রী কেউ নেই। ভিতরে ঢুকতেই জরা বাধা পেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল আর কি।

কি হল বাবা?

হোঁচট খেয়েছিলাম বাবা।

তখন দুজনে তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে পথের উপরে ছুটো লোক পড়ে আছে।

জরা শুধালো, এরা অবেলায় এখানে পড়ে ঘুমোচ্ছে কেন?

এদের এ ঘুম আর ভাঙবে না, আর এখন কার যে কখন বেলা হয় তার কি ঠিক আছে!

মারা পড়েছে নাকি?

ঠাকুরের অভ্যস্ত চোখ দেখে নিয়েছে যে একজনের বুকে আর একজনের পিঠে ছোরা বিদ্ধ হয়ে আছে।

কে মারলো এদের, বাবা?

হয়তো পরস্পরকে খুন করেছে, নয় আর কেউ খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছে।

সৎকার অবধি করেনি!

সৎক্রিয়ার ভার কি হত্যাকারীর? চলো, এখন মহাকালের মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক, আরতির সময় হয়েছে।

যেতে যেতে জরা বলে, বাবা, দেশব্যাপী যে খুনের বহর চলছে তাতে আশঙ্কা হচ্ছে কিছুকাল পরে দেশ জনশূন্য হয়ে যাবে।

বিধাতার হয়তো তাই অভিপ্রায়। দেখো বাবা, পুরাকালে বিধাতা এই উদ্দেশ্যে পরশুরামের মত অবতার পাঠাতেন। পরে দেখলেন তাতে বিস্তর ঝামেলা, তাই এখন নতুন উপায় অবলম্বন করেছেন। যখন কোন সমাজকে নাশ করবার প্রয়োজন হয় তখন তাদের হাতে অস্ত্র যুগিয়ে দেন, তারা পরস্পরকে হত্যা করে বিধাতার দায়িত্ব পালন করে।

জরা শুধায়, বিধাতার এমন উৎকট ইচ্ছা হয় কেন?

সমাজে ঘুণ ধরলে তাকে সরিয়ে দিতে হয় নয়তো সেই ঘুণ ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা। দেখলে না বাসুদেব কিভাবে যদুবংশ নাশের ভূমিকা সৃষ্টি করলেন! তিনি কি ইচ্ছে করলে তাদের বাঁচাতে পারতেন না!

বাঁচালেন না কেন? শুনেছি তিনি স্বয়ং ভগবান।

সেই জন্যেই বাঁচালেন না। নিজের বিধানকে ভগবান লঙ্ঘন করেন না।

জরা কোনরকমে আত্মসংযম করে জিজ্ঞাসা করে, শুনেছি তিনি এক ব্যাধের শরে মারা পড়লেন, কেন বাবা?

তুমি যা শোননি এবারে তা শুনে নাও, সেই ব্যাধ বাসুদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা, কাজেই যে পথে যদুবংশকে প্রেরণ করেছেন, সেই পথে নিজেও যাত্রা করলেন। বিধানস্রষ্টা বিধানঘাতী হতে পারেন না।

এবারে জরা শুধায় সেই ব্যাধটার কি হল?

নিশ্চয় করে কেউ জানে না। তবে তার সম্মুখে দুটো পথ খোলা আছে, হয় সে লোকটা নতুন নতুন দুষ্কৃতির গভীর থেকে গভীরতর পঙ্কে নিমজ্জিত হবে নতুবা অনুশোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নির্মল হয়ে মুক্তি পাবে।

বাবা কি বলতে চান যে এ হেন মহাপাপীরও মুক্তি সম্ভব!

বাসুদেবের কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়।

মহাকালের আরতি দর্শন করে অতিথিশালায় আশ্রয় নিল দুজনে। সেখানে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করে দুজনে শয়ন করলো।

মাঝরাতে মহা হলহলায় তাদের ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার কি জানবার আশায় বাইরে এসে দেখে নগরের উত্তর দিকে আগুন জলছে। যাদের ঘরবাড়ি পুড়েছে প্রাণভয়ে তারা ছুটে পালাচ্ছে, আর খুব সম্ভব যারা আগুন লাগিয়েছে

লুটপাট শুরু করে দিয়েছে তারা। কেমন করে কি ঘটলো জানবার জন্যে ঠাকুর যখন লোকের সন্ধান করছে তখন মহাকালের পুরোহিতকে সামনে দেখতে পেলো, শুধালো, ঠাকুরমশায়, আগুন কেমন করে লাগলো?

সে বলল, সন্ন্যাসীঠাকুর, আগুন আপনি লাগে না, লাগাতে হয়।

কেন লাগালো?

কেন লাগালো তারাই জানে যারা লাগিয়েছে।

তারা কারা?

সবাই তাদের জানে।

তবে বাধা দেয় না কেন?

আরে তাদেরও যে বাড়িঘর আছে।

ঠাকুর বলে, তোষণনীতির দ্বারা তারাই কি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে?

পাবে না তারা জানে।

তবে?

প্রত্যেকেই কুমীরকে খাদ্য যোগায় যাতে তাকে শেষ খায় এই প্রত্যাশায় আর কি।

রাজার সৈন্যরা কি করে?

লুটের ভাগ পায়, এ হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে তাদের কি লাভ? মাসান্তে বাঁধা বৃত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না।

রাজা কি করেন?

হয়তো তাঁর ভাণ্ডারেও লুটের ভাগ পৌঁছয়। এসব আলোচনা থাক সন্ন্যাসীঠাকুর, এ নগরে নিরীহ মানুষ সবচেয়ে বিপন্ন। কে কোথা থেকে শুনবে স্বয়ং মহাকালও রক্ষা করতে পারবেন না।

যা বলেছেন ঠাকুরমশাই, ভালোমানুষের কাল গিয়েছে। নানা দেশ ভ্রমণ করে বুঝতে পারলাম যে হয় ঐ সব লুঠেরা আর দাঙ্গাবাজদের দলে যোগ দিতে হবে, নয় মরতে হবে। তৃতীয় পথ বলে আর কিছু নেই।

তখন সন্ন্যাসীকে সহৃদয় বলে জানতে পেরে পুরোহিত মৃদুস্বরে বলতে আরম্ভ করলো, যা বলেছেন। আজ উত্তরপাড়ায় আগুন লেগেছে বলে তাদের নিরীহ মনে করবেন না, ওরাই কালকে দক্ষিণপাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল। আজ তার বদলা চলছে।

এমন বদলা-বদলি চললে সমস্ত নগরটা যে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন?

কেন, আশেপাশে কি আর জনপদ নেই?

এতক্ষণ জরা নীরবে শুনছিল, এবারে বলে উঠল, ঠাকুর, এর চেয়ে হিমালয়ের অরণ্য নিরাপদ ছিল।

তার কথা শুনে পুরোহিত বলল, অরণ্যে থাকে শ্বাপদ, তাদের উপদ্রবের প্রকৃতি তো সুপরিজ্ঞাত। এ যে মনুষ্য সমাজ।

বাবা, আজ নগরের চেয়ে পথ নিরাপদ, পথের চেয়ে অরণ্য।

পুরোহিত বলল, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনাদের বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। আমি বলি কি আজ রাতেই গন্তব্যস্থলে যাত্রা করুন, নয়তো কাল সকালে হয়তো শান্ত্রীরা আপনাদের বন্দী করে নিয়ে যাবে।

আমাদের কেন, শুধায় জরা।

আপনারা ভালোমানুষ তায় বিদেশী। ওরা বলবে আপনারা অবন্তীপুরীর শত্রুদের চররূপে এসে এই অগ্নিকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। সেদিন এই রকম অন্যায় অভিযোগে দুজন বিদেশী মারা পড়েছিল।

ঠাকুর বলল, বাবা চলো, এই মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

তখন তারা দুজনে পুরোহিতকে নমস্কার করে হাঁটুজল শিপ্রা নদী পার হয়ে রাজপথের উপরে এসে দাঁড়ালো। ঠাকুর বলল, বাবা সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নেই, এবারে আমি দক্ষিণে যাত্রা করবো অমরকণ্টকের মুখে। তুমি কোন্ তীর্থে এখন যাবে শুনতে পারি কি?

জরা বলল, দ্বারকায় যাবো মনের ইচ্ছা।

খুব সদিচ্ছা বাবা, যাও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন বাসুদেব।

আর কি দেখা হবে না ঠাকুর?

কে বলতে পারে যে হবে না! এ পৃথিবী যত বিশাল তত ক্ষুদ্র। আমারও দ্বারকায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

ঠাকুর, এ কদিন আপনার সঙ্গে থেকে মনে বল আর আশা পেয়েছিলাম। এখন বড় অসহায় বোধ করছি।

কোন ভয় নেই বাবা, তোমার পথে যাত্রা করো, আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

তাই যেন হয় বাবা, তাই যেন হয়। এই বলে বিদায় নিয়ে দুজন দুদিকে যাত্রা করলো।

তখন শুকতারা দেখা দিয়েছে পূব আকাশে।

আনাড়ি মানুষ কলার গাছে ভর দিয়ে বেশ ভেসে থাকে, হঠাৎ গাছটা সরে গেলে যেমন অসহায় বোধ করে তেমনি অবস্থা হল জয়ার। বৃন্দাবনে মদিরার এবং পথে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সাহচর্য লাভে জয়া মনে শান্তি না পেলেও স্বস্তি অনুভব করেছিল, গত দশ বছরের মধ্যে যার অনুরূপ অনুভূতি ঘটেনি তার জীবনে। মদিরার স্নেহ আর সেই সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য, সন্ন্যাসীর সজ্জীবনের স্পর্শ আর সেই সঙ্গে নিত্য চলমানতা অনেক পরিমাণে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার মনে আমূলবিদ্ধ গ্লানি। পাপ আর দুঃখ, মুক্তি আর সদ্‌গতি প্রভৃতি দুশ্চিন্তার দোলাতে দুলতে দুলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকবার আত্মহত্যা করে সমস্ত সমস্যার সমূলে সমাধান করবার কথা ভেবেছে, কিন্তু মরণে নরকে গতি হবে এই আশঙ্কা তাকে নিবৃত্ত করেছে।

কিন্তু বৃন্দাবনে এসে যখন ঘটনাধীন মদিরার সাক্ষাৎ পেলো আশার ক্ষীণ রশ্মি ফুটলো তার মনে। মদিরার মতো বারাঙ্গনা যদি শান্তিলাভ করে থাকে তবে সে-ই বা না পাবে কেন! অবশ্য মদিরার তুলনায় তার পাপের বোঝা অনেক ভারি তবে তার দুঃখও অনেক দুঃসহ, তাতে কি বোঝা পুড়ে গিয়ে খানিকটা হাল্কা হয়নি!

নরেন্দ্রনগর থেকে পলায়নের পরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোছায়া অতিক্রম করেছে ভাবতে গেলে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ছাগর্ষি, কিন্নররাজ্য, চার্বাক আশ্রম, হিমালয়ের নির্জন পথে যষ্টিধারী কুকুরমাত্রসঙ্গী নিঃসঙ্গ পথিক, বদরিকাশ্রমে শূন্যমন্দির দর্শন, গুহাবাসিনী বুড়ীমা—এমন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কখনো কি একজন মানুষের জীবনে ঘটেছে! পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কেউ জানে না; চিরানন্দময় কিন্নররাজ্য পাপ শব্দটাই জানে না, মহাজ্ঞানী চার্বাক আনন্দের ভাণ্ডারী কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় জানেন না; আর সেই নিঃসঙ্গ পথিক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বীকার করলেন মুক্তির উপায় সন্ধানেই তিনি চলেছেন। জয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে যায়, সে-ও তো মুক্তিসন্ধানী কিন্তু মনঃস্থির করবার আগেই তিনি পাহাড়ের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন, এগিয়ে দেখবার সাহস তার হল না।

সকলের দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসার প্রদীপ নিয়ে ঘুরেছে, শিখা জ্বালিয়ে দিতে কেউ পারে নি। কেবল বুড়ীমা, সেই নিরক্ষর অজ্ঞ বৃদ্ধাটি একবার আলোর ঝলকি জ্বেলেছিল, প্রদীপ জ্বলল না সত্য তবে বোঝা গেল এখনো নিরাশ হওয়ার

সময় আসেনি। তার কথাতেই এলো বৃন্দাবনে। কই সেখানেও তো দেখল মন্দির শূন্য। ঠিক তার মনে নেই কে তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে পূর্ণাবতার ছাড়া কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। কিন্তু কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেনি পূর্ণাবতার কে। অবতারের সঙ্গে পূর্ণাবতারের প্রভেদ কি? এ প্রশ্নের সমাধান করতে হয়তো পারতেন সন্ন্যাসী ঠাকুর। প্রসঙ্গটা জরা তুলেছিল, এমন সময়ে পথের উপরে মৃতদেহ দর্শনে বিষয়টা চাপা পড়ে গেল।

জরা আশা করেছিল অবন্তীপুরীতে পৌঁছে রাতের বেলায় নিরিবিলি প্রসঙ্গটার মীমাংসা জেনে নেবে। কিন্তু সেখানে যে অরাজক অবস্থা মাঝরাতেই নগর ছেড়ে বের হয়ে পড়তে হল। সন্ন্যাসী গেলেন অমরকণ্টকে, জরার ইচ্ছা হয়েছিল সে-ও যায়, কিন্তু সন্ন্যাসী তেমন উৎসাহ দিলেন না, তাছাড়া কৌস্তুভমণিটা সত্বর দ্বারকার সমুদ্রজলে সমর্পণ করতে হবে। কতজনের কত লোভ এড়িয়ে মদিরা তাকে রক্ষা করে এসেছে আর পথের মধ্যে রাহাজানি হতে হতেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছে মণিটা। না, আর কাছে রাখা নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি পা চালায়।

কিন্তু পা চলবে কি! এমন উচ্চাবচ অনুর্বর দগ্ধ তাম্র ভূখণ্ড আগে তার চোখে পড়েনি। আর রাস্তা! মানুষের আর গো-মহিষের যাতায়াতে একটা নিরিখ পড়েছে, লোকে তাকেই রাস্তা বলে। ছায়াতরু বলতে কিছু নেই, উদ্ভিদের বুনো কুল আর বুনো খেজুরের গুল্ম—আর অখণ্ড কাঁটাগাছের ঝাড় যার নাম জানে না জরা। সে জেনে নিয়েছিল অবন্তী থেকে পশ্চিম দিকে দ্বারকা। সেই নির্দেশ অনুসারে চলেছে পশ্চিমে। তার উপরে আবার পথটা এমন বিরলপথিক যে প্রয়োজন হলে জিজ্ঞাসা করবার লোক মেলে না।

ও ভাই, এই পথ তো দ্বারকায় গিয়েছে? শুধালো জরা দীর্ঘদেহী, দীর্ঘতর লাঠিকাঁধে এক রাহী আদমিকে।

জরার প্রশ্ন শুনে অনেকক্ষণ লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে, তারপরে হেসে উঠে বলল, ঐ চুল দাড়ি যদি পুরচুলা না হয় তবে পৌঁছলে পৌঁছতেও পারো—হ্যাঁ, এই পথটাই দ্বারকায় গিয়েছে বটে।

কেন এমন কথা বলছ ভাই?

এগোলেই বুঝতে পারবে।

কেন ডাকু আছে?

আজকে ডাকু নয় কে। রাতের বেলায় আমিও ডাকাতি করি।

এই স্পষ্ট স্বীকৃতিতে অবাক হয়ে গেল জরা। শুধালো, আর দিনের বেলায় কি করো ভাই?

যা করতে দেখছ। দিনের বেলায় যে-সব পথিককে পথ বাৎলে দিই রাতের বেলায় তাদেরই মাথায় এই লাঠি—বলে লাঠি দিয়ে এমন একটি ভঙ্গী করলো যার একটিই মাত্র অর্থ হয়।

তাহলে মনে হচ্ছে রাতের বেলায় পেলে আমাকেও মারবে।

না, তোমার চুল-দাড়িগুলো সত্যি বলে মনে হচ্ছে, সাধু-সন্ন্যাসীকে আমরা কিছু বলি নে।

তোমরা কি চুল-দাড়ি দেখে সাধু-সন্ন্যাসী বোঝো নাকি?

আর কি দিয়ে বুঝবো বলো, ভিতরে ভিতরে তো সব শালা লৌণ্ডা।

আচ্ছা তবে আসি—বলে জরা দ্রুত পা চালাল, এমন লোকের সান্নিধ্যে বেশিক্ষণ থাকা অনুচিত। যা লাঠির দৈর্ঘ্য আর গোঁফের বহর, রাতের কাজ দিনের বেলায় করলে ঠেকায় কে। তবে কি না তার চুল-দাড়ি পরচুলা নয়।

সূর্য যখন মাথার উপরে উঠেছে তখন দারুণ তৃষ্ণা পেলো জরার। কাছে-পিঠে কোথাও না আছে গ্রাম, না আছে নদীনালা। এমন সময়ে সে দেখতে পেলো, অদূরে একজন রাখাল বালক কতকগুলো গরু চরাচ্ছে। তাকে শুধালো, ভাই, এখানে কোথাও ঝরনা কি নদী আছে?

প্রশ্ন শুনে রাখালটি হঠাৎ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে পাচনিখানি বাঁশের মতো আড় করে ধরলো মুখের কাছে আর তারস্বরে গেয়ে উঠল, 'যুমনাকি তীরে নীরে গাও চরাওয়ে, মিঠি তান শুনাঁওয়ে।'

তার ভাবে-ভঙ্গীতে জরা তো অবাক। গান থামলে জিজ্ঞাসা করলো, চাইলাম জল, আর তুমি গান ধরলে—ব্যাপার কি!

কেন, গানের মধ্যেই তো যমুনা আছে—যত খুশি জল পান করে নাও।

তারপরে হেসে উঠে বলল, আজ রাতে আমাদের গাঁয়ে যাত্রাপালা আছে, আমি সাজবো শ্রীকৃষ্ণ, তাই একটু মহড়া দিয়ে নিলাম, সুযোগ পেলাম কিনা। জল খাবে তো আমার সঙ্গে এসো।

জরা চলল তার সঙ্গে, তিন-চার রশি ব্যবধানে পৌঁছে দেখতে পেলো একটা উট ইঁদারার চারদিকে ঘুরে ঘুরে জল টেনে তুলছে, সেই জল সরু নালা দিয়ে চাষের ক্ষেতে চলেছে।

নাও খেয়ে নাও, এই বলে ছোকরা উটটাকে থামালো। একটা মাটির পাত্রে জল নিয়ে দিল জরাকে। জরা আকণ্ঠ পান করলো। আঃ কি শীতল আর নির্মল, পাতাল থেকে উঠছে কিনা।

স্নান করে নাও না ভাই, এমন জল আর কাছেভিতে পাবে না।

দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন ছিল না, জরা দেহ শীতল করে স্নান করে নিল। স্নান সমাধা হলে ছোকরা বলল, স্নানের পরে আহার। বলি খাবে কি?

ছেলেটিকে রসিক মনে হয়েছিল জরার, তাই সুরে সুর মিলিয়ে বলল, বাতাস।

বাতাস নয় বাতাসা—আর তার সঙ্গে দহিচূড়া, চলো আমার ঘরে। সাধু-ভোজন করিয়ে আজ একটু উপরি পুণ্যলাভ করবো।

ক্ষুধায় জরার নাড়ি জ্বলে যাচ্ছিল, বিনা ওজরে চলল রাখালের ঘরে। ঘরে পৌঁছতেই ছেলের সঙ্গে জরাকে দেখে তার বুড়ীমা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, ওরে পচা, আজ একটা সন্ন্যাসীকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এসেছিস, তোদের পাপের ভারে মা বসুমতী যে তলিয়ে যাবে।

পচা অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠল, পাপের ভার হাল্কা করবার আশাতেই এঁকে নিয়ে এসেছি, সন্ন্যাসীভোজন করিয়ে পুণ্য করো।

জরা বুঝতে পারে না ব্যাপার কি। পাপই বা কোথায়, পুণ্যই বা কেন?

তবে নে, শীগগির খাইয়ে বিদায় করে দে। তোর দাদারা ফিরে এলে আর রক্ষা পাবে না। ওরা আবার এমনি পাষণ্ড যে সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ কিছু মানে না।

নাও ঠাকুর, বসে পড়ো, বলে পচা।

পচার মা শালপাতায় চিঁড়ে দই গুড় সাজিয়ে দিয়েছে, লোটাতে জল দিয়েছে। জরা বিনাবাক্যব্যয়ে বসে খেতে শুরু করলো। বুড়ী না শুনতে পায় এমন স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার মা কি সব বলছিল?

পচা চোখের ইশারায় ও প্রসঙ্গে যেতে নিষেধ করলো, বলল, এখন খাও, পরে হবে।

জরার আহার শেষ হলে বুড়ীর কাছে বিদায় নিল। পচা বলল, চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

তার মা বলল, দেখিস তোর দাদাদের সম্মুখে না পড়ে। আর কাকে ছেড়ে কার কথা বা বলি, একেবারে গাঁয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিস।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে জরা শুধালো, ভাই পচা, ব্যাপার কি বল তো?

ব্যাপার বুঝতে পারলে না? এ গাঁয়ে বিদেশী লোক এসে পড়লে মারা পড়ে।

কেন?

আরে কেন কি, এ গাঁয়ের লোকের ওটাই ব্যবসা, বেশ ভালো উপার্জন হয়। কালকেও তিনজন মরেছে।

তোমার দাদারা ?

আমার সাত দাদা, তারা ঐ তিনের দুজনকে মেরেছিল। টাকার ভাগ নিয়ে তারপরে নিজেদের মধ্যে মারামারি।

কেন ?

জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করা সহজ, কিন্তু তিন পাঁচ সাত বেজোড় সংখ্যাগুলো ভারি বেয়াড়া, সহজে ভাগের আওতায় আসে না।

জয়া বলে, তোমাকে ধরলেই তো আট হত, দিব্যি মিলে যেতো।

আমি ওর মধ্যে নেই।

হঠাৎ দৈত্যপুরে প্রহ্লাদ হতে গেলে কেন ?

বোধ করি যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজতে সাজতে মনে দয়ামায়া কিছু জন্মেছে।

জয়া তার মনের কথা আরও জানবার আশায় বলে, কৃষ্ণ কি দয়াময় ?

উত্তর শোনে, বেশ ঠাকুর, এদিকে বললে চলেছ দ্বারকায় আর শুধাচ্ছো কৃষ্ণ কি দয়াময় ?

দ্বারকায় যে তীর্থ করতে যাচ্ছি কে বলল ?

ওঃ বুঝেছি, বলে পচা, তবে নিশ্চয় যাচ্ছ মাছ ধরতে। তবে তা তোমার কম্ম নয়।

কেন বলো তো ?

সে জায়গা নদী নালা পুকুর নয়।

তবে কি ?

যাও গেলেই দেখতে পাবে। তবে সাবধান করে দিই, পথে কোন গাঁয়ে আশ্রয় নিয়ো না।

সে ভয় করো না, আমি গাছতলায় থাকবো।

তার চেয়ে নিরাপদ যদি গাছের উপরে থাকতে পারো, বেশ ঝাঁকড়া দেখে গাছ বেছে নিয়ো।

তার পরামর্শ শুনে জয়া হেসে উঠল।

হাসির কথা নয়, সন্ন্যাসী, মনে রেখো।

ভুলবে না বলে বালকটির কাছে বিদায় নিয়ে জয়া চলতে শুরু করে। পচা গান ধরে 'যমুনাকি তীরে নীরে গাও চরাওয়ে, মিঠি তান শুনাওয়ে।' আজ রাতে যাত্রাপালায় তাকে কৃষ্ণ সাজতে হবে।

অনেক দূর চলে এসেছে জয়া, তবু তার কানে বাজাতে থাকে ঐ গানের কথা আর সুর। সে ভাবে এত দূরে কি ঐ কচি বালকের কণ্ঠস্বর আসছে, না ঐ সুর

মনের মধ্যে বহন করে এনেছে তাই শুনতে পাচ্ছে। সে ভাবে এ কি শুধু যাত্রাপালার মহড়া, না ঐ গানের মধ্যে অবোধ বালক এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যাতে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঐ সাত ডাকাতের ভাই কৃষ্ণ সাজতে সাজতে জাতব্যবসা অস্বীকার করে ফেলেছে তাই মনে মনে যমুনার তীরে গোরু চরাচ্ছে—আর মধুর গান শুনতে পাচ্ছে। আর সে জরা, এমনি হতভাগ্য যে সশরীরে যমুনা তীরে গিয়ে না পেলো শান্তি, না পেলো মধুর সঙ্গীতের রেশ।

সেদিন মরীয়া হয়ে রাতের বেলায় মদিরার নিষেধ সত্ত্বেও নিকুঞ্জ বনে গিয়েছিল, সঙ্কল্প করেছিল হয় দর্শন লাভ করবো নয় মৃত্যু হবে। কিন্তু না পেলো দর্শন না হল মৃত্যু। তখনিই তার মনে হয় মূর্ছা হতে গেল কেন! হয়তো বাসুদেব ঐ মূর্ছার ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ওরে নির্বোধ তোর মুক্তি এখানে নয়, এতকাল বাসুদেবরূপে যাকে মনন করলি তারই পীঠস্থানে অপেক্ষা করছে তোর জন্যে মুক্তি। এই চিন্তা মনে উদিত হওয়া মাত্র কেমন একটা প্রসন্নতা অনুভব করে, যেন সমস্ত শরীর থেকে রক্তমাংসের ভার ঝরে পড়ে গিয়ে অশরীরী রূপ লাভ করেছে সে। আশায় আশ্বাসে দ্রুততর বেগে চলতে থাকে।

আবার তার হিসাব থেকে দিনের গণনা স্খলিত হয়ে গিয়েছে, যেমন গিয়েছিল হিমালয়ে। কত দিন গেল, কত রাত গেল মনে থাকে না, সূর্য অস্ত যায়। সে পশ্চিমে সেই দিক লক্ষ্য করে চলে। কত সূর্য উদিত হয়, কত সূর্য অস্তমিত হয়, জরার চলার আর বিরাম হয় না। অবশেষে একদিন রাত্রি প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হলে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়। পরিশ্রান্ত দেহের শক্তি নেই সে পাহাড় লঙ্ঘনের, তাই সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো পাহাড়ের নীচে। কাল সকালে গিরি অতিক্রম করে আবার চলতে আরম্ভ করবে।

॥ ৭ ॥

ভোরবেলা জরা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের চুড়ায় উপস্থিত হতেই তার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হল তা সম্পূর্ণ অভাবিত। সে দেখতে পেলো যতদূর দেখা যায় অবারিত সমুদ্র। এখানে সমুদ্র এলো কোথা থেকে! সম্মুখে আর তো পথ নেই, কোথা দিয়ে কি ভাবে যাবে। সমস্ত পথ লুপ্ত করে দিয়ে প্রকাণ্ড সমুদ্র শায়িত। ঘন নীল তার জল, শিশুর বক্ষস্পন্দনের মতো মৃদুমন্দ কাঁপছে। তীরের কাছে সমুদ্রের জল

যেমন সবুজ এখানে তা মোটেই নয়, গভীর সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল তার জল।
বিস্মিত হয়ে বসে পড়লো। এবারে কি করবে সে!

জরা দেখতে পেলো, পাহাড়ের উপরে একজন কাঠুরে কাঠ সংগ্রহ করছে। তার কাছে গিয়ে শুধালো, ভাই, এখানে যদুদের রাজধানীতে যাবার পথ কোথায়?

কাঠুরে তার কথায় অবাক হয়ে গেল, বলল, এখানেই তো তাদের রাজধানী ছিল।

কোথায় সেই রাজধানী?

কাঠুরে একটুকরো কাঠ জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল, ঐখানে।

তার মানে?

তুমি বুঝি বিদেশী?

জরা বলল, হ্যাঁ।

তাই। সে রাজধানী তো আজ দশ বছরের উপর সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে।

বলো কি—বলে হতাশ হয়ে বসে পড়লো, তবে তো তার সমস্ত আশা ঐ সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে। তখন তার মনে পড়লো খট্টাসের দলের সঙ্গে যাত্রা করবার সময় এই রকম একটা জনশ্রুতি তার কানে এসেছিল, তবে বিশ্বাস হয়নি। তখন আবার শুধালো, কাঠুরে ভাই, লোকজন সব গেল কোথায়?

যারা পেরেছে পালিয়েছে, যারা পারেনি হাঙর কুমীরের পেটে গিয়েছে।

তবে এখন উপায়? এ কথাটা ঠিক কাঠুরের প্রতি নয়, নিজের উদ্দেশ্যেই।

কাঠুরে বলল, উপায় আর কি, যেখান থেকে এসেছ ফিরে যাও, নইলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, কুমীর হাঙরের পেটে চলে যাও, সেখানে দেখা হলে হতেও পারে—এই বলে সে হাসলো।

জরা লক্ষ্য করলো, তার পুরু ঠোঁট দুখানি হাসিতে তরঙ্গিত। কাঠুরে নিজের কাজে মন দিল, জরা বসে রইলো মাথায় হাত দিয়ে। তার মনের মধ্যে সূক্ষ্ম স্থূল সুতোয় বুনন চলছিল তবে সে বিষয়ে জরা সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। মানুষ মনের গতিবিধি সম্পূর্ণ জানতে পারলে তার জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

জরা ভাবছিল তবে তো তার পাপ থেকে মুক্তিলাভ হল না। মনে পড়লো মদিরার কথা, মদিরাও জানতো না যদুবংশের রাজধানী অতলে তলিয়ে গিয়েছে, তার আগেই সে রাজধানী ছেড়ে যাত্রা করেছিল। তার মনে পড়লো মদিরা বলেছিল, জরা-ভাই, কৃষ্ণ বাসুদেব এখানেও তোমার মনস্কামনা পূরণ করলেন না,

তোমাকে ফিরে যেতে হবে, যেখানে তিনি তোমার শরে নিহত হয়েছিলেন সেখানে তোমার মনস্কামনা পূরণ করবেন। কিন্তু এখানে যে অতল সমুদ্র!

বেলা বেড়ে ওঠে, সূর্যের তাপ প্রখরতর হয়, সেদিকে খেয়াল নেই জরার। তার এমনি মূঢ় অবস্থা যে, কিছু চিন্তা করছে বললে ভুল হবে। সে শক্তিও তার লোপ পেয়েছিল। তার মনের সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা, যেমন অরাজক অবস্থা আজ দেশের। দেশে যেমন নিরন্তর হানাহানি চলছে, নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন তেমনি হানাহানি তার মনের মধ্যে। একজন বলেছিল, ওরে মূঢ়, পাপ পাপ করে এমন দুর্লভ মানবজন্মটা নষ্ট করলি, এত ঐশ্বর্য কিছুই ভোগে লাগল না। এ হচ্ছে মোটা সুতোর বুনন। আর সরু সুতোর বুনন, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য তাতে বিপরীত কথা। পাপীর আবার ভোগ কি, কেবলি দুর্ভোগ। মনে নেই ছাগর্ষির দৃষ্টান্ত, রাজার ছেলে হয়েও কেন সে গুহাবাসী! আবার চার্বাক ঋষি তো আনন্দেই আছেন, কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় তো তিনি জানেন না। আর ঐ যে গিরিসঙ্কটে যষ্টিধারী নিঃসঙ্গ যাত্রী, হয়তো কোন রাজার ছেলে হবেন, তিনিও তো স্বীকার করলেন পাপ থেকে মুক্তির উপায় জানেন না। আরে তোর মতো মহাপাপী তো ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেনি, তুই হত্যা করেছিস, স্বয়ং পূর্ণাবতারকে। তোর আবার মুক্তি কি, তোর আবার সদ্‌গতি কি। ডুবে মর, মর, তাহলে আর কিছু না হোক এই যমযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবি। জরা দুই কানে এই দুই পরামর্শ শুনতে পায়। একজন বলে ভোগ কর, ভোগ কর, এখনো সময় আছে, ইন্দ্রিয়সমূহ সতেজ আছে। আর একজন বলে এখনো তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি, আরো দুর্ভোগ, আরো দুঃখ তোর কপালে আছে। আবার শুনতে পায়, দেখলি তো এত হাঁটাহাঁটি, এত দুঃখভোগ সমস্ত নিষ্ফল হল, কোথায় তোর যদুবংশের রাজধানী, সমস্ত সমুদ্রসাৎ, সেই সঙ্গেই কি সমুদ্রসাৎ হয়নি তোর আশা-ভরসা! দেখ তো কিন্নররাজ্যে সবই কেমন খোলা আছে। তা নয় কোথায় মুক্তি, কোথায় সদ্‌গতি বলে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে মরছিস। আবার তখনি অতিশয় মৃদু একটি কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, ওরে জরা, এখনো তোর চলা শেষ হয়নি, হতাশ হয়ে বসে থাকিস না, উঠে পড়্, চল্ চল্। সমুদ্র? এমন সমুদ্র আর নেই যার তল না আছে, এমন সমুদ্র নেই যার পাড় না আছে। আর নৌকো থাকলে অতলে অপারে কি ভয়? কতক্ষণ সে স্থাণুবৎ বসেছিল তার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ পিঠের উপরে একটা আঘাত পেয়ে সম্বিৎ লাভ করলো, নড়তেই একটা কাঠঠোকরা পাখি ভয় পেয়ে উড়ে গেল। তাকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড মনে করে কাঠঠোকরা পাখিটা তাকে ঠোকরাচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়ালো।

এবারে সে লক্ষ্য করলো অদূরে একখণ্ড ডাঙা জমি, তার উপরে কয়েকটা গাছও আছে। জমিটা পাহাড়ের লাগোয়া, অর্থাৎ সমুদ্রের জলে না নেমেও সেখানে যাওয়া যায়। বিস্মিত হল এতক্ষণ দেখেনি কেন ভেবে, ভাবলো একবার ওখানে যাওয়াই যাক না, দেখা যাক কি আছে। সেইদিকে সে যাত্রা করলো।

তার আগে একটা কাজ করলো। গলায় থলি থেকে কৌস্তুভমণি হারটা বের করে নিয়ে ঝুটো পাথরগুলো খুলে ফেলে দিল। তারপরে কৌস্তুভটা সমুদ্রের জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল; সোনার সুতোয় উজ্জ্বল রত্ন ঝকঝক করে উঠে সূর্যের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিল। তার মনে হয়েছিল এখন আর গোপনীয়তার কারণ নেই, কারণ হয় এখানেই তার মুক্তি হবে, নয় মৃত্যু—খুব সম্ভব মৃত্যু। যদি মরে মলিন রত্ন সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন? যার রত্ন অমলিন তার কাছে ফিরিয়ে দেবে।

ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলতে চলতে একসময় সেই শুকনো ডাঙায় এসে পৌঁছল, দেখতে পেল শুধু গাছপালা নয়, গোটা দুই গরু-ছাগল চরছে, আর দেখতে পেল একখানি কুটির। এখানে এই নির্বান্ধব পুরীতে অতল সমুদ্রের মধ্যে বাস করে কে? হয় সাধু, নয় ডাকু। তার পক্ষে এখন দু-ই সমান। নির্ভয়ে সে এগিয়ে গেল, কুটিরের কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলো, এসেছ বাবা, বলেছিলাম না যে আবার দেখা হবে।

এ কি, ঠাকুর যে! বলে জরা প্রণাম করলো।

প্রভুদয়াল জড়িয়ে ধরলো তাকে বুকে। বলল, চলো বাবা বসিগে।

। ৮ ।

জরা বলল, ঠাকুর, এখন থেকে আপনাকে প্রভু বলে সম্বোধন করবো।

বেশ বাবা, তাই করো—ওটাই যে আমার নাম।

বুঝতে পারে না জরা।

আমার নাম প্রভুদয়াল, লোকে প্রভু বলে ডাকে, কেউ কেউ আবার বলে প্রভুজী।

তবে আমিও তাই বলবো।

তারপর বলে, প্রভু, এই কি আপনার কুটির?

কুটির বলছ কেন, বলো প্রাসাদ। প্রাসাদ তো ইট-পাথর দিয়ে তৈরি হয়

না, তৈরি হয় মনের সন্তোষ দিয়ে। আমি যদি এখানে সন্তুষ্ট হয়ে বাস করি তবে এই আমার প্রাসাদ। তাছাড়া যেখানে বাসুদেবের পায়ের ধুলো পড়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রাসাদ আর কোথায়?

বাসুদেবের পায়ের ধুলো! প্রভু, আপনি কি তাকে দেখেছেন?

প্রভুদয়াল হেসে উত্তর দেয়, দেখব না, এখানেই যে তিনি বাস করতেন!

এই সমুদ্রে! বিস্ময় প্রকাশ করে জরা।

সমুদ্রে বললে অন্যায় হয় না, শোননি যে সমুদ্রে ছিল নারায়ণের অনন্তশয্যা। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও এখানেই যে ছিল তাঁর রাজধানী।

ছিল যদি তবে এখন কোথায়—এ যে অতল সমুদ্র!

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে যজ্ঞস্থল জল দিয়ে প্লাবিত করে দিতে হয়। যে কর্ম-যজ্ঞের জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তা শেষ হয়ে যেতেই সমস্ত প্লাবিত করে দিয়ে লীলা সম্বরণ করেছেন তিনি।

তবে তো এখানে আসা আমার সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে।

সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বাবা, তাঁর আদিশয্যায় তাঁকে দেখতে পেলে।

ব্যাকুলভাবে জরা বলে, কই দেখতে পেলাম প্রভুজী?

আর সকলকে চোখে দেখতে হয়, পূর্ণাবতারকে দেখবার ইচ্ছাতেই তাঁকে দেখা হয়। তাঁকে দর্শনের এমন ব্যগ্র ব্যাকুলতা তো আর কারো মধ্যে দেখিনি বাবা!

প্রভু, পূর্ণাবতার কি বুঝিয়ে দিলেন না তো, সেদিন কথা তুলতেই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এখন আবার চাপা পড়ুক, যথাসময়ে হবে, আগে তোমার আহারাদির ব্যবস্থা করে দিই।

এই বলে সে ডাকলো, ওগো কাশ্যপের মা, এদিকে এসো, তোমার আর একটি ছেলে এসেছে।

ডাক শুনে কুটির থেকে একজন বয়সে প্রৌঢ়া, ভাবে তরুণ নারী বের হয়ে এলো, কই বাবা?

প্রভুদয়াল বলল—এই যে।

জরাকে দেখে প্রভুদয়ালের পত্নী বলে উঠল, এ ছেলেটি যে আমার রীতিমত সন্ন্যাসী।

না মা, আমি মহাপাপিষ্ঠ নরাধম বলে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল।

সন্ন্যাসী পায়ে হাত দিল—না জানি কত পাপ হল আমার!

মা, তোমাকে আর বাবাকে দেখে মনে হয় পাপের এখানে প্রবেশের পথ নেই।

কেবল পাপীর আছে কি বলো বাবা! এই বলে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে প্রভুজী।

প্রাণখুলে যে হাসতে পারে পাপ তার মনে জমতে পারে না। স্রোতের মুখে কি আবর্জনা জমে!

নাও এখন তোমার সন্ন্যাসী ছেলের আহারের ব্যবস্থা করে দাও।

এসো বাবা আমার সঙ্গে।

এই সময় গোটা দুই নেড়িকুত্তা, তার মধ্যে আবার একটা খোঁড়া, আর গোটা দুই ছাগল এসে উপস্থিত হয়। একটা ছাগল তার আঁচল ধরে টানে।

কাশ্যপের মা তার উদ্দেশ্যে বলে, বুঝেছি, বুঝেছি খিদে পেয়েছে, একটু সবুর কর্ বাবা, খেতে দিচ্ছি।

তারপরে জরাকে বলে, এরাই আমার ছেলেমেয়ে। আরও একজন আছে জগন্নাথ-বুড়ো, সে আমাদের ভরণপোষণ করে।

কুটিরে প্রবেশ করে দেখে সেখানে তৈজসপত্র খাট তক্তপোশ বলতে কিছু নেই। মনে পড়ে তার কুটিরের কথা, যে কুটির সেই কালরাত্রিতে পুড়ে গিয়েছিল তারপরে ভেসে গিয়েছে, এ কুটির তার চেয়েও নিঃস্ব। অথচ কুটিরবাসীদের মনে শান্তি ও সন্তোষের অভাব নেই।

আহার শেষ হলে প্রভুদয়াল জরাকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে গিয়ে একখানি পাথরের উপরে বসে। জরা বলে, প্রভুজী, এবার আমার উপর দয়া করুন, পূর্ণাবতারত্ব বুঝিয়ে দিন আমাকে।

প্রভুদয়াল বলে, দেখো বাবা, ঐ যে পাহাড়ের কোলে একখণ্ড জমি দেখা যাচ্ছে—যেখানে একটা লোক লাঙল দিয়ে জমি চষছে।

জরা বলে, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।

ঐ হচ্ছে পূর্ণাবতারের প্রথম কলা। শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ যেমন কলায় কলায় পূর্ণতর হতে হতে পরিপূর্ণ রাকায় পরিণত হয়, ঐ দেখো আকাশের প্রান্তে পূর্ণচন্দ্র, তেমনি মানুষের কলায় কলায় পূর্ণতর হতে হতে পূর্ণাবতার পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তবে প্রভেদের মধ্যে চাঁদের ষোলকলা, পূর্ণাবতারের অনন্ত কলা, যত মানুষ তত কলা। বাবা, তুমি আমি সকলেই পূর্ণাবতারের খণ্ডকলা।

প্রভু, আমার মতো কলঙ্কীও কি সেই পূর্ণাবতার চন্দ্রের অংশ?

কেন নয় বাবা, চাঁদে কি কলঙ্ক নেই?

প্রভু, তাহলে রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু ভগবদ্‌বিদ্বেষী প্রভৃতিও—এরা কি?

পূর্ণচন্দ্রকে মাঝে মাঝে রাহুতে আচ্ছন্ন করে না কি! এরা সেই রাহু।

এদের সৃষ্টি কেন?

এদের ক্ষণিকত্ব প্রদর্শনের জন্যই। দেখো বাবা, অনুগত ভক্তের কলঙ্ককে আদরে তিনি বক্ষে ধারণ করেন, আর অভক্তের নশ্বরতা জ্ঞাপন করেন চন্দ্রগ্রহণের দৃষ্টান্তচ্ছলে।

প্রভু, ক্ষমা করবেন, আমি স্বল্পবুদ্ধি। মানুষ তো অনন্তকাল ধরে জন্মগ্রহণ করতে থাকবে তবে অখণ্ড কলা সমন্বয়ে পূর্ণাবতার চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করবেন কবে? কবে হবে সেই পূর্ণাবতারের পূর্ণিমা?

বাবা, এ বড় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে।

আপনার কাছেও কঠিন?

আমার কাছেও—তবু বলবার চেষ্টা করি, দেখি পারি কিনা। এই যে সমগ্র মনুষ্য সমাজ, মৃত, জাত ও অজাত নিজেদের অগোচরে সেই পূর্ণতার দিকে চলেছে, এই পূর্ণতার অভিমুখিনতাই পূর্ণতা। তুমি আমি কে যে সেই পূর্ণিমা প্রত্যক্ষ করবার স্পর্ধা রাখি?

তবে পূর্ণাবতারের মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়?

তোমার আমার মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়?

কোথায়? প্রতিধ্বনি করে জরা।

হৃদয়ে হোক বা বুদ্ধিতে হোক বা ব্রহ্মরন্ধ্রে হোক অবশ্যই তিনি আছেন। সেই সমুদায় 'আছে'র সমষ্টিগতরূপে তিনিও আছেন, মানুষ যেদিন পূর্ণ হবে তিনিও হবেন পূর্ণ।

প্রভু, শুনেছি তিনি তো নিত্যপূর্ণ।

ভুল শোননি বাবা, তিনি নিত্যপূর্ণ।

তবে কেন এই অপূর্ণতার ভান?

এতক্ষণে ঠিক শব্দটি উচ্চারণ করেছ—ভানই বটে। তোমার জিজ্ঞাসা যিনি নিত্যপূর্ণ তার অপূর্ণতার ভান কেন? আচ্ছা বল তো, বাসুদেব হস্তিনায় গিয়ে রাজা মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ না করে বিদুরের খুদকুঁড়ো ভোজন করলেন কেন?

কেন?

তিনি যে ভক্তের অনুগত, ভক্তকে উৎসাহিত করতে চান, বলেন—দেখো আমি তোমার মতোই সামান্য ব্যক্তি। তিনি জানেন তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপ সহ্য

করবার শক্তি মানুষের নেই। অর্জুনের মতো বীর যোগী পুরুষও সে রূপ সহ্য করতে পারেনি। ভীত হয়ে অনুরোধ করেছিল—প্রভু, তোমার বিশ্বরূপ সম্বরণ করে বন্ধুরূপ আমাকে দেখাও। এ সেই বিদুরের খুদকুঁড়োর প্রার্থনা। শোন বাবা, তিনি অপূর্ণতার ভান করে মানুষকে উৎসাহিত করে আহ্বান করছেন পূর্ণতার পথে। শিশু চলতে গিয়ে পড়ে পড়ে যাচ্ছে তাকে উৎসাহিত করে বাপও মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে পড়ে যাচ্ছে—যাতে শিশু নিরুৎসাহিত না হয়। নিজেকে পূর্ণতার অভিমুখী করে রাখাই পূর্ণতা—যার শাস্ত্রীয় নাম পূর্ণাবতার। নিরুৎসাহ হলেই সব পণ্ড হয়ে গেল—নিরন্তর চলা চাই, থামলে চলবে না। আরও শোনো, সত্যযুগে চার পোয়া গতি, ত্রেতায় তিন পোয়া, দ্বাপরে দুই পোয়া, আর কলিযুগে এক পোয়া। পাছে মানুষ গতির মন্থরতা দেখে হতাশ হয়ে থেমে যায় তাই ভগবান বাসুদেব দ্বাপর আর কলির সন্ধি-সঙ্কটে জন্মগ্রহণ করে মানুষের সম্মুখে পূর্ণাবতারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন। পূর্ববর্তী যুগসমূহে যেসব অবতার জন্ম-গ্রহণ করেছেন তাঁদের পূর্ণাবতার হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। গতি তখন প্রবল ছিল, মানুষও ছিল চলিষ্ণু। কলিতে পাছে তার ব্যত্যয় ঘটে তাই কলির প্রারম্ভে তাঁর পূর্ণাবতার জন্মদৃষ্টান্ত। চলা চাই বাবা চলা, কখনো কোন বাধায় কোন বিপত্তিতে থামলে চলবে না। তবে শুধু দেহটা চললেই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি হৃদয় সমস্ত দিয়ে চলা চাই, তাতেই পাপের ক্ষয় তাতেই পূর্ণতার উপলব্ধি।

প্রভুদয়াল থামেন, ইচ্ছে করেই থামেন যাতে জরা সমস্ত বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তারপরে আবার, আবার আরম্ভ করেন, বাবা, তুমি কি পাপ করেছ জানি না, জানতেও চাই না, তবে এ জানি তুমি যত চলেছ, চলবার পথে বাধা-বিপত্তির ঐরাবত ঠেলে চলেছ, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তোমার মন বুদ্ধি হৃদয় তাতে তুমি তো সামান্য পাপী, পাপিষ্ঠের অধম জরাব্যাধেরও মুক্তিলাভ ঘটে যেতো।

বিস্মিত হয়ে জরা শুধায়, কি বলছেন প্রভু? সে লোকটা যে বাসুদেবকে হত্যা করেছিল!

চলার বেগে এতদিন সে পাপ ধুয়ে-মুছে গিয়েছে—যদি সে সত্যই তোমার মতো আর্তি নিয়ে নিরন্তর চলতে থাকে।

সত্যি বলছেন প্রভু?

সত্যিই বলছি।

তখন জরা আর্ত চিৎকারে কেঁদে উঠে তার পা জড়িয়ে ধরে মাথা কুটতে কুটতে

বলে, প্রভু, আমি সেই নরাধম পাপিষ্ঠের অধম জরা।

প্রভুদয়াল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা তুমি তো মুক্তপুরুষ, চলার গঙ্গাস্রোতে কবে তোমার পাপ-তাপ ধুয়ে মুছে গিয়েছে। পূর্ণাবতারের পথে তুমি আমার চেয়ে একধাপ এগিয়ে আছ।

জরা প্রবোধ মানে না, কেবলই মাথা কুটতে থাকে তাঁর পায়ে।

অনেকক্ষণ পরে জরা বলে, বাবা, আমি যদি মুক্তি পেয়ে থাকি তবে মনে এত তাপ কেন?

স্পর্শমণির স্পর্শে তোমার লোহার মাদুলি যে সোনা হয়ে গিয়েছে তা দেখবার অবসর হয়নি বলে।

তারপর বলেন, চলো বাবা, তোমাকে মুক্তিস্নান করিয়ে আনি। যে ভূখণ্ডে যে মহানিম বৃক্ষতলে তিনি লীলা সম্বরণ করেছিলেন সেই ভূখণ্ড, সেই বৃক্ষটি আজও অক্ষয় হয়ে আছে—হয়তো বা তুমি ফিরে আসবে প্রতীক্ষাতেই। এসো আমার সঙ্গে।

মন্ত্রচালিতবৎ প্রভুদয়ালের পিছু পিছু চলতে থাকে জরা।

॥ ৯ ॥

সমুদ্রপ্লাবনে যদু-রাজধানী সর্বাংশে ডুবে গেল কেবল জেগে রইলো দুটি উচ্চ ভূখণ্ড, প্রভুদয়ালের বাসস্থান আর যেখানে বাসুদেব নিহত হয়েছিলেন। জরতী বাস করতো প্রভুদয়ালের কুটীরে, মাঝে মাঝে যে বৃক্ষতলে শয়ান অবস্থায় বাসুদেব দেহত্যাগ করেছিলেন সেখানে গিয়ে প্রণাম করে আসতো। একদিন তার মনে হল এখানেই একখানা কুটির তুলে বাস করি না কেন। মনোবাসনা জানালো প্রভুদয়ালকে। প্রভুদয়াল ও কাশ্যপের মা প্রথমে আপত্তি করলেন, শেষে তার মনের অবস্থা অনুমান করে অনুমতি দিলেন, তাঁরাই কুটির তুলে দিলেন, গ্রাসাচ্ছাদনও যোগাতেন তাঁরাই, এই জল মরুতে জরতী আর কোথায় কী পাবে!

জরতী দিবারাত্র ঐ গাছতলায় পড়ে থেকে স্বামীর পাপস্খালন আশায় বাসুদেবের কাছে প্রার্থনা করতো, তার বিশ্বাস হয়েছিল যে জরা জীবিত আছে, প্রভুজীর আশ্বাসবাক্য তার একটি প্রধান কারণ। কালক্রমে মাটি দিয়ে বাসুদেবের একটি মূর্তি গড়লো সে, জলে ঝড়ে নষ্ট না হয় তাই তার উপরে একটা ছাউনি তুললো। আর কাজের মধ্যে একটিমাত্র বাসুদেবের পূজা ও আরাধনা। মাঝে

মাঝে প্রভুদয়াল ও তাঁর স্ত্রী আসতেন, যোগ দিতেন তার সঙ্গে পূজায়। প্রভুজী বলতেন, বাছা, জয়া যতই পাপিষ্ঠ হোক তুমি তার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছ, সে কি মুক্তিলাভ না করে পারে!

জয়তী শুধালো, বাবা, তার কি আর দেখা পাবো না?

প্রভুজী বলতো, সে কোথায় আছে জানি না তবে আমার কেমন বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ঘুরে আসবেই এখানে। নিমজ্জমান ব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠখণ্ড ধরে—আর প্রভুদয়ালের আশ্বাস তো নৌকো, জয়তী আশ্বস্ত হত, কালক্রমে সে আশ্বা প্রত্যয়ে পরিণত হল। এমনভাবে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হল।

জয়তীর আরাধনায় জয়া পাপমুক্ত হল কিনা জানি না, তবে তার দেহে মনে বিপুল পরিবর্তন ঘটলো। প্রৌঢ়া জয়তীর এখন দেবীমূর্তি, দেবকান্তি, একটা স্নিগ্ধ আভা, একটা পবিত্রতা সারা দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হত। এ যেন একালের তপস্যারতা উমা। তার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই চোখ আপনি নত হয়ে পড়ে। আর মনের পরিবর্তন! সে তো এত সহজে বুঝবার নয়, তবু বুঝতে বিলম্ব হয় না, কারণ দেহের সৌন্দর্য মনের সৌন্দর্যেরই প্রতিফলন। মন যার সুন্দর তার দেহ অসুন্দর হতে পারে না, মন যার পবিত্র দেহ তার অপবিত্র হওয়ার উপায় কি? পুষ্প ভিতরে বাইরে সুন্দর বলেই দেবতার অর্ঘ্য!

তখন পূর্ণ চাঁদের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আকাশ টলমল করছে, সমুদ্রও। প্রভুদয়াল ও জয়া চলেছে বাসুদেবের আশ্রমে। জয়তী ঐ স্থানটাকে বাসুদেবের আশ্রম বলতো।

জয়া শুধাচ্ছিল, প্রভু, আপনি এইমাত্র বললেন যে কলিযুগে এক পোয়া গতি তিন পোয়া স্থিতি, আরও বললেন যে ধর্ম ও পুণ্য এই গতিরই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বাবা, দেশে আজ যে সার্বজনীন অরাজকতা চলছে তা দেখে মনে হয় না যে ধর্মের এক পোয়াও অবশিষ্ট আছে!

প্রভুজী বললেন, দেখো বাবা, ধর্ম ও পুণ্য এখনো আছে তবে ঐ এক পোয়ার অধিক নয়, কারণ কলিতে এখন গতি এক পোয়া। এই যে অরাজকতা মারামারি হানাহানি, সমস্তই সে একপাদ গতি। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে লোকে এখনো চলিষ্ণু আছে, তবে যদি তারা ভুলপথ অবলম্বন করে কিংবা সঙ্কীর্ণ পথে সবাই মিলে চলতে শুরু করে তবে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি না হয়ে যায় না। তাকেই তো বলি অরাজকতা হানাহানি।

জয়া অবাক হয়ে শোনে, ভাবে, কি আশ্চর্য, এই নিদারুণ অব্যবস্থায় মধ্যেই ঠাকুর আশার আলো দেখতে পান, ভাবে সাধুপুরুষের চোখের গড়নই

আলাদা। তারপরে শুধায়, কখন কিভাবে এর অবসান হবে।

অবসান! চক্রাবর্তন পূর্ণ হলে তবে অবসান।

জরা বুঝতে পারে না চক্রাবর্তন বলতে কি বোঝায়।

প্রভুদয়াল বলেন, কলির শেষে একটা সময় আসবে যখন এই এক পোয়া গতিও লোপ পাবে, তখন চরাচর আর সেই সঙ্গে মনুষ্যসমাজ স্থবিরত্ব লাভ করবে, গতিশূন্য হবে তখন—

জরা প্রতিধ্বনি করে, তখন—

তখন বাসুকি মাথা নাড়া দেবেন, প্রচলিত ব্যবস্থা সমস্ত ওলটপালট হয়ে যাবে, বিধাতা ঢেলে সাজাবেন আপন সৃষ্টিকে। একেই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে মন্বন্তর, কল্পান্ত, মহাপ্রলয়, রাজনীতিকগণ বলে মহাবিপ্লব। তখনই পূর্ণ হবে চক্রাবর্তন, আবার আরম্ভ হবে সত্য যুগের—যার চার পোয়া গতি। কেন এমন হয়? নবনীত তুলতে গেলে দধিকে মন্থন করা আবশ্যক। যে দীর্ঘিকা একসময়ে অমৃত জলের আধার ছিল কালক্রমে তা পঙ্ককুণ্ডে পরিণত হয়—তখন আসে পঙ্কোদ্ধারের পালা, নাড়া খেয়ে ভেসে ওঠে কত যুগের আবর্জনা। বিধাতা মাঝে মাঝে বিশ্বসরোবরে পঙ্কোদ্ধার করেন। এই যে এসে পড়েছি—ঐ দেখো বৃক্ষতলে কুটিরের মধ্যে বাসুদেবের মূর্তি।

জরা এক মুহূর্ত সেই মূর্তি নিরীক্ষণ করে বলল, প্রভু, তাঁর কৌস্তুভমণি হারটি নানা হাত ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে, এটিকেই হরণ করবার উদ্দেশ্যে চটিতে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল, এবার যার জিনিস তাঁকে সমর্পণ করবো। কিন্তু ঠাকুর, এ কি, এখানে মনে হচ্ছে প্রত্যহ পূজার্চনা হয়—কে করে?

প্রভুদয়াল ভাবলো প্রথমেই জরতীর নাম বলা উচিত হবে না, তাই বলল, একজন ভক্ত আছে।

ঠিক সেই সময়ে জরতী অদূরস্থ পল্বলে পানীয় জল আনতে গিয়েছিল—তাই তারা পরস্পরকে দেখতে পেলো না। জরা যখন মণিহার নিয়ে অগ্রসর হতে যাচ্ছে সেই সময় জল নিয়ে ফিরে এলো জরতী।

প্রভুদয়াল বলল, এই সেই ভক্ত।

জরা চিনতে পারলো না, কেমন করে পারবে, একদিন স্বহস্তে যাকে হত্যা করেছে তার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু দশ বৎসরের পরিবর্তন সত্ত্বেও এক পলকেই জরতী চিনলো তাকে, ব্যাকুলভাবে বলে উঠলো, জরা, তুমি এসেছ, তুমি এসেছ, আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবেই, কালকে শেষরাত্রে বাসুদেব স্বপ্নে

দেখা দিয়ে বলে দিলেন।

আর গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল না, প্রভুদয়াল বলল, জরা, এই হচ্ছে জয়তী, সে মরেনি, বাসুদেবের কৃপায় সে বেঁচে উঠেছিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে, সেই বাসুদেব মূর্তি, সেই জয়তী, সেই স্থান, সেই কাল, সেই পূর্ণিমার চন্দ্র সবসুদ্ধ মিলে এক অভাবিত পরিবর্তন ঘটালো জরার জীবনে। জয়তীর সম্বোধনের উত্তর না দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, এ কি, এ কি, চাঁদে গেরণ লাগলো কেন, চারদিক যে অন্ধকার হয়ে এলো, আকাশে এত অসংখ্য উল্কাপাত কেন, এ কি, পায়ের তলার পৃথিবী কেন কাঁপছে, ঐ যে তাড়া করে আসছে সমুদ্র! রক্ষা করো, বাসুদেব রক্ষা করো!

জয়তী বলে উঠল, ঠাকুর, এ কি!

প্রভুদয়ালও বুঝতে পারলো না হঠাৎ কেন এই পরিবর্তন।

এ কি জরা, ও কোথায় চললে? ওদিকে যেয়ো না, যেয়ো না, ওখানে অতল সমুদ্র—চেঁচিয়ে বলে জয়তী।

রক্ষা করো! বাসুদেব রক্ষা করো! চিৎকার করতে করতে জরা ছুটেছে সমুদ্রের দিকে।

ঠাকুর, ধরো, ধরো, বলে পিছু পিছু ছুটলো জয়তী ও প্রভুদয়াল, কিন্তু তারা কাছে পৌছবার আগেই ব্যাকুল বাসুদেব ধ্বনি উচ্চারণ করে জোয়ারের উন্মত্ত জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জরা।

জয়তী লুটিয়ে পড়ে শুধালো, প্রভু, এ কি হল?

প্রভুদয়াল বলল, দুঃখ করো না মা, মুক্তপুরুষের জীবন-মৃত্যু সমান, জরা মুক্ত-পুরুষ।

শরাহত মৃগীর মতো ছটফট করতে করতে জয়তী বলল, সে কি বলা না কান্না, —প্রভু, আমার মুক্তপুরুষে প্রয়োজন নেই, আমি পাপী-তাপী নরাধম জরাকে চাই, মুক্তপুরুষ নিয়ে আমি কি করবো।

প্রভুদয়াল সান্ত্বনা দিয়ে বলল, বৎসে, দশ বৎসরের সাধনার এই কি পরিণাম!

প্রভু, আমি কি বাসুদেবের সাধনা করেছি? মনে মনে তাই ভেবেছি বটে, কিন্তু তখন কে জানতো কখন অগোচরে বাসুদেবের স্থানে বসিয়েছি জরাকে। আমি তো তাঁর কাছে পাপ থেকে মুক্তি চাইনি, চেয়েছি পাপপঙ্কে নিমগ্ন জরাকে। প্রভু, প্রভু, এতকাল নিজেকে নিজে ঠকিয়েছি আজ বুঝি তার দণ্ড দিলেন বাসুদেব, পেয়েও রাখতে পারলাম না, হাতে পেয়েও হারালাম। এখন আমার জীবনের আর কোন্ আশ্রয় থাকলো! এখন আমি কি নিয়ে বাঁচবো!

চলো, আবার সাধনায় বসি।

ক্ষিপ্তভাবে জয়তী বলল, জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মাঝামাঝি স্বরে, কিসের সাধনা, কেন আর সাধনা!

প্রভুদয়াল বলল, পাপ থেকে মুক্তির, আমরা সকলেই জরা, প্রত্যেকেই আমরা আদর্শঘাতী।

সেকথা বুঝি কানেও প্রবেশ করলো না জয়তীর, মণিহারা ফণিনীর মতো লুটিয়ে লুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছট্‌ফট করে মাথা নাড়তে লাগলো। হয় প্রভুদয়ালের কথা তার কানে ঢোকেনি, নয় মনে ধরেনি—হয়তো দু-ই।

—সমাপ্ত—